জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষান্মাসিক সূচীপত্র
১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ ঃ জানুয়ারি—জুন, ১৯৫০

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
৯৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষান্মাসিক বিষয় সূচী ঃ
জানুয়ারি হইতে জুন—১৯৫০

জানুয়ারি ঃ ১ম সংখ্যা

(ক)

ফেব্রুয়ারি ঃ ২য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

মার্চ ঃ ৩য় সংখ্যা

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জুনঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারি হইতে জুন : ১৯৫০

ক্রমিক সংখ্যা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

93, আপার সারকুলার রোড, 'বসুবিজ্ঞান মন্দির'

কলিকাতা—9

কর্ম-সচিব সমীপেষু

মান্যবর,

আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন/সাধারণ সভ্য হইতে ইচ্ছুক। আমি পরিষদের আদর্শে বিশ্বাস করি ও পরিষদের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে সম্মত আছি।

নিবেদক—

স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

তারিখ

প্রস্তাবক

সমর্থক

তারিখ

তারিখে কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে

নির্বাচিত হইলেন।

কর্মসচিব

উপবিষ্ট—হারম্যান মার্ক (ব্রুকলিন পলিটেকনিক), অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সায়েন্স কলেজ), সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

দণ্ডায়মান—ফণীন্দ্রনাথ বাগচি, শান্তিরঞ্জন পালিত (সায়েন্স এসোসিয়েসন), বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (বসু বিজ্ঞান মন্দির); কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

ভারতের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

গত ২৭শে জানুয়ারি ভারত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সাধারণতন্ত্রের সর্বপ্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

ভারতের সাধারণতন্ত্রের ভূমিকা

আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব সম্পন্ন (সার্বভৌম) গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতেছি এবং এইরূপ সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করার ব্রতও গ্রহণ করিতেছি যে,

ভারতের প্রত্যেক নাগরিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সুবিচার লাভ করিবে ঃ

চিন্তা, বাচন, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরারাধনায় তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে।

তাহারা সমান মর্যাদা ও সুযোগলাভ করিবে এবং

ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব উন্মেষের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিবে।

আজ আমরা এই সংবিধান গ্রহণ, অধিনিয়মণ এবং নিজদিগকে উহার অধীন করিলাম।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন

১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন বিষয়বস্তুই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।

২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজ ভাষায় বর্ণনা করা দরকার এবং ভাবার পরিপাট্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে উহা পৃথক সাদা কাগজে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠান দরকার।

৫। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪।৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।

৭। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শব্দগুলোকে বাংলা অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়।

৮। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠানো বাঞ্ছনীয় কারণ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে না। অবশ্য টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে।

৯। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে।

১০। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূরা নাম ঠিকানা থাকা দরকার।

১১। প্রবন্ধাদির মৌলিকত্ব রক্ষা করে' অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের অধিকার থাকবে।

১২। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদক অক্ষম।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ | জানুয়ারি—১৯৫০ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের আশ্রয় ত্যাগ করে কোন ক্রমেই এগিয়ে যেতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে আজ যদি অধিকাংশ লোক অজ্ঞ থেকে যায় তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। পরাধীন দেশে আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার মোহ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়ে বসেছিল, তাই সুস্থ সবল সমাজ-জীবন গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। আজ স্বাধীন দেশে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বদলাতে হবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সেতুবন্ধ রচনা করবে।

কবিরা বলেছেন, 'দুর্গং পথস্তৎ'। নতুন পথে যাত্রার বাধাবিঘ্ন অনেক। তবু আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারাকে বৈজ্ঞানিক নতুন খাতে প্রবাহিত করবার জন্যে। আশাকরি আমাদের এ মহান ব্রত উদ্‌যাপনে জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা লাভ করব।

গত বর্ষে আমাদের পত্রিকায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে মোটামুটি তার একটা হিসেব দেওয়া হলো: গণিত—৭; পদার্থ বিজ্ঞান—২৮; রসায়ন—১৭; পরিসংখ্যান—৩; কৃষি, শিল্প—১০; শারীরবৃত্ত—৩; প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব—১৬; নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—১০; উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—৮; ভূতত্ত্ব—৯; মনোবিজ্ঞান—২; ভেষজ ও পশুচিকিৎসা—৫; বিবিধ—৬৬।

পত্রিকার লেখক, লেখিকাদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশাকরি বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অবিকৃত রেখে প্রবন্ধাদি জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর সুখবোধ্য করবার জন্যে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। মানব-মনের প্রতিবিম্বই হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য রসসমৃদ্ধ না হলে জনগণের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানে সাহিত্য-রস সঞ্চার করতে পারলেই সাধারণ্যের অনুভূতিক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারবে—রচনাটি হবে যথার্থ উপভোগ্য। অবশ্য বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী স্থলবিশেষে এর ব্যতিক্রম অপরিহার্য বা অবশ্যম্ভাবী হলেও ভাষার পারিপাট্য অক্ষুন্ন রাখা সর্বথা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং জন-সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে লেখককে হতে হবে একাধারে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তাহলেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রচারের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়।

লৌহ ও ইস্পাত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

লৌহ ও ইস্পাত যে এক পদার্থ নহে—এই জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেরই নাই। সাধারণ লোকে জানে—লৌহ এবং ইস্পাত উভয়েই চুম্বকের দ্বারা একইভাবে আকৃষ্ট হয় এবং উভয়েই আকৃতিগত সাদৃশ্যে অভিন্ন; সুতরাং তাহারা এক। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। লৌহ এবং ইস্পাত দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। উহাদের স্বাতন্ত্র্য যে কোথায় সেই কথাটাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। তবে এই কথা জানিয়া রাখা ভাল যে, ইস্পাতের জন্ম লৌহ হইতেই।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই লৌহের সহিত মানুষ পরিচিত। সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা প্রাচীন ভারতই যে লৌহ প্রস্তুত বিষয়ে অগ্রণী ছিল, এই সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণের কোন অভাব নাই। যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লৌহ সে যুগে এদেশে প্রস্তুত হইত তাহার নিদর্শন আজও বিরল নহে। ঢালাই না করিয়া এবং আধুনিক যন্ত্র পাতির সহায়তা না লইয়াও কিভাবে যে দিল্লীস্থিত অশোক স্তম্ভের মত অতবড় সুবৃহৎ এবং মরিচা-বর্জিত লৌহস্তম্ভ প্রস্তুত সম্ভব হইয়াছিল তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। পুরী, ভুবেনশ্বর, কোনারক প্রভৃতি স্থানে যে ধরনের লোহার কড়ি ব্যবহৃত হইয়াছে, সিংহল দেশে যে ধরনের লোহার শিকল পাওয়া গিয়াছে. তাহা যে লৌহ উৎপাদন সম্বন্ধে এই দেশের উচ্চশ্রেণীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার পরিচায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক সময়ে দামস্কাস এবং হায়দ্রাবাদ ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাঙ্গলাদেশে কাঞ্চননগরে প্রস্তুত ছুরি, কাঁচিও একদিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু যাহা অতীতে ছিল তাহা অতীতের মধ্যেই লীন হইয়া রহিয়াছে। বর্তমানে আমরা মাঝে মাঝে তাহাদের স্বপ্ন দেখি মাত্র।

পিটাই লৌহের ইতিহাস পাওয়া যায় তুবল খাঁয়ের সময় হইতে। উহা খৃঃ পূঃ তিন হাজার আটশত বৎসর পূর্বেকার কথা। লৌহ হইতে প্রস্তুত যন্ত্রের উল্লেখ অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

লৌহের অস্ত্রশস্ত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মিশরের গিজে সহরস্থিত পিরামিডের ধ্বংসকার্যের সময় একটি অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে যাহার বয়স সম্ভবতঃ ৫০০০ বৎসর। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে, বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনার সময় লৌহের উল্লেখ আমরা প্রায়ই পাইয়া থাকি। পাশ্চাত্যের রণদেবতা মার্সের ঢাল এবং বর্শার আকারে লোহাকে চিহ্নিত করা হইত।

সংস্কৃত ভাষায় লৌহের আর এক নাম অয়স। চুম্বক ইহাকে আকর্ষণ করে বলিয়া চুম্বকের নাম অয়স্কান্ত। ল্যাটিন ভাষায় লৌহকে বলা হয় 'ফেরাম্' (Ferrum)। এই ফেরাম হইতেই রাসায়নিক ভাষায় লৌহের সাংকেতিক চিহ্ন হইয়াছে Fe.

যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ পার্থিব জগতে প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া আছে লৌহ তাহাদের অন্যতম। তবে বিশুদ্ধ ধাতু হিসাবে লৌহকে প্রাকৃতিক জগতে খুব অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। শুধু গ্রীনল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডিস্কো দ্বীপে ১০০ মণ ওজনের এক বিরাট লৌহস্তূপ (উল্কাপিণ্ড ?) পাওয়া গিয়াছে। উল্কাপিণ্ডের মধ্যে তামা, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায়

লৌহ পাওয়া যায়। যুক্ত পদার্থ হিসাবে নিম্নলিখিত খনিজ পদার্থের মধ্যে লৌহ প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করে।

১। ম্যাগ্নেটাইট (Fe_3O_4)। ইহা লোড্‌ষ্টোন বা চুম্বকপাথর নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

২। লাল হেমেটাইট্ বা লালমাটি ($Fe_2 O_3$).

৩। ব্রাউন হেমেটাইট বা লাইমোনাইট $2Fe_2O_3, 3H_2O$. ইহাকে বাদামী মাটিও বলা হয়।

৪। স্প্যাথিক আয়রন ওর,—$Fe CO_3$.

৫। লৌহ পাইরিটিজ—FeS_2 তাম্র পাইরিটিজ (Cu_2S, Fe_2S_3)। ইহারা গন্ধকযুক্ত লৌহ। লৌহ নিষ্কাশনের পক্ষে এই পদার্থগুলি আদৌ উপযোগী নহে। ইহা সালফ্যুরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিবার সময় সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গাছপালা এবং উচ্চশ্রেণীর জীবদেহের পুষ্টির জন্য লৌহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই জন্য উদ্ভিদ জগতে এবং আমাদের রক্তের মধ্যে 'হিমোগ্লোবিন' রূপে লৌহ অবস্থান করিতেছে।

ভারতবর্ষে প্রচুর লৌহের খনি আছে। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে এবং সিংভূম, ধলভূম, ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহজাত খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। জামসেদপুরে যে টাটার লৌহের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে এইটাই বড় কারণ যে, ইহার আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ লৌহের স্তর রহিয়াছে। খুব উচ্চশ্রেণীর 'হেমেটাইট্ ওর' এইসব স্থানে পাওয়া যায়। এতদঞ্চলে বাদাম পাহাড় ম্যাগ্নেটাইটের জন্য বিখ্যাত।

আমাদের দেশে যে পরিমাণ লৌহ এবং ইস্পাতের প্রয়োজন সে পরিমাণে উহা উৎপন্ন হয় না। বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টনের মত ইস্পাত আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। উহা আমাদের চাহিদার শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগের মত। সেই জন্য আমাদের দেশে ইস্পাত এত দুর্মূল্য। আমাদের এই বিরাট দেশে লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের দেশে জামসেদপুরে টাটার লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানাই একমাত্র নামজাদা কারখানা ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইস্পাতের কারখানাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। বাঙ্গালীর আবিষ্কার এবং জামসেদজী টাটার অর্থ, এই উভয়ের সম্মিলনে একদা যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল আজ তাহা ভারতবর্ষের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

টাটার কারখানার পরই নাম করা যাইতে পারে আসানসোলে প্রতিষ্ঠিত 'ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল' যাহা 'স্কব' নামে পরিচিত। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাটি যুদ্ধের সময় স্থাপিত হইয়া দেশের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা ছাড়া কুলটিতে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী লিমিটেড, আসানসোলে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশন, ভদ্রাবতীতে মহীশূরের লৌহের কারখানা, বালীগঞ্জে ভার্তিয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ওয়ার্কস, বেলুড়ে বেলুড় ষ্টীল ওয়ার্কস্ প্রভৃতি ছোট এবং মাঝারী ধরনের কারখানাগুলি হইতেও নিয়মিত ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। এইভাবে যুদ্ধের পর হইতেই ছোটখাটো কারখানা আমাদের দেশে স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এইসব কারখানা হইতে উৎপন্ন সমগ্র মালের পরিমাণ দেশের চাহিদার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসরই বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার লৌহ এই দেশে আমদানী করা হয়। এই জন্য স্বয়ং ভারত গভর্ণমেণ্ট এই দেশে একটা বিরাট লৌহের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছেন।

পৃথিবীতে যে সব দেশ লৌহ উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমেরিকার নাম করা যাইতে পারে।

লৌহ উৎপাদন বিষয়ে আমেরিকার স্থান আজ সব দেশের উপর। আমেরিকার পরই নাম করা যাইতে পারে—জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশের। ইহাদের তুলনায় ভারতবর্ষের স্থান অনেক নিম্নে। লৌহ উৎপাদন ব্যাপারে ভারতবর্ষকে অধমর্ণ দেশ বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার উৎপাদন ক্ষমতা প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম।

আমরা সচরাচর আমাদের চারিপার্শ্বে যে সব লোহার সামগ্রী—যেমন কড়ি, বরগা, রেলিং, শিক্ ইত্যাদি দেখিতে পাই আসলে তাহারা বিশুদ্ধ লোহা নহে। তাহারা জাতিতে ইস্পাত। প্রকৃতপক্ষে খাঁটী লোহা পাওয়া ভার। খাঁটী লোহা পাইতে হইলে লোহার জল (যেমন ফেরিক সালফেটের জল) বিদ্যুৎ-বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা হয়; অথবা লৌহের অক্সাইড, অকজ্যালেট কিংবা ক্লোরাইডকে হাইড্রোজেন প্রবাহের মধ্যে ৫০০°-৬০০°তে উত্তপ্ত করিয়াও প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

লৌহ নিষ্কাশন

লৌহ প্রাপ্তির উপাদান হইতেছে—লৌহাশ্রিত খনিজ পদার্থগুলি। তবে সকল খনিজ পদার্থ হইতে লৌহ নিষ্কাশন করা সহজসাধ্য অথবা লাভজনক নহে। গন্ধকযুক্ত পদার্থগুলি সাধারণতঃ লৌহ নিষ্কাশনের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

লৌহ নিষ্কাশনপ্রণালীর দ্বারা খনিজ পদার্থ হইতে যে পদার্থটিকে নিষ্কাশিত করা হয় তাহা আসলে বিশুদ্ধ লৌহ নহে। তাহাকে 'পিগ্-আয়রন' বলা হয়। পিগ আয়রনের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে অঙ্গার—৩·৫০ ভাগ; সিলিকন—১·৮০ ভাগ; গন্ধক—·০৮ ভাগ; ফস্‌ফরাস—·১০ ভাগ; ম্যাঙ্গানিজ—·৮০ ভাগ।

লৌহ নিষ্কাশন ব্যাপারে সাধারণতঃ অক্সাইড অথবা কার্বোনেটরূপী খনিজ পদার্থগুলিকে নিয়োজিত করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে যখন বাতাসের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয় তখন জল এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গত হওয়ার ফলে সমগ্র পদার্থটি ঝাঁঝরা হইয়া উঠে। তারপর এই ঝাঁঝরা পদার্থের সহিত চুনাপাথর এবং কোক কয়লা মিশ্রিত করিয়া ইহাকে ব্লাষ্ট ফার্নেস বা মারুৎ চুল্লীর মধ্যে গলান হয়। এইখানে ইহা 'রিডিউস্‌ড্' হইয়া লৌহ ধাতুতে পরিণত হয়।

ব্লাষ্ট ফার্ণেস বা মারুৎ চুল্লী

ব্লাষ্ট ফার্ণেস একটি সুদীর্ঘ চোঙ্গাকৃতি চুল্লী-বিশেষ। ইহার বহিরাবরণটি ইস্পাত বা কার্বনযুক্ত লোহার (রট্ আয়রন) পাত রিভেট্ করিয়া বা জোড়া দিয়া প্রস্তুত। লম্বায় ইহা ৮০—১২৫ ফিট এবং পরিধিতে ১৫-২৫ ফিট পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরভাগে অগ্নিসহ ইটের আস্তরণ দেওয়া থাকে। চুল্লীর যে অংশের বেড় সর্বাপেক্ষা বেশী তাহাকে 'বস্' নামে অভিহিত করা হয়। চুল্লীর মুখটি একটি বিশেষ ধরনের সরঞ্জামের দ্বারা রুদ্ধ করা থাকে। ইহা 'কাপ এণ্ড কোণ' সরঞ্জাম নামে বিদিত। এই সরঞ্জামের সাহায্যে ঝাঁঝরা খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর এবং কোক কয়লার মিশ্রণ একত্রে চুল্লীর মধ্যে মাঝে মাঝে যোগান দেওয়া হয়। চুল্লীর উপরের দিকে এক-পাশে একটি নির্গমন পথ থাকে। ইহার মধ্য দিয়া অব্যবহার্য উত্তপ্ত গ্যাস নির্গত হইয়া আসে। চুল্লীটির অধোদেশে কতকগুলি—সাধারণতঃ ছয়টি—নল সংযুক্ত করা থাকে। ইহাদিগকে বলা হয় 'টু ইয়ার'। টু ইয়ারের মধ্য দিয়া পাম্পের সাহায্যে ৭০০°-৮০০° তাপের উত্তপ্ত বাতাস সজোরে এবং সচাপে চুল্লীর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। বাতাসকে পূর্ব হইতে উত্তপ্ত করা হয় 'কুপার ষ্টোভ' নামক একপ্রকার স্তম্ভের সাহায্যে। এই ষ্টোভটিও দেখিতে মারুৎ চুল্লীর মত লম্বা ধরনের। অগ্নিসহ ইটকে আড়াআড়ি ভাবে সাজাইয়া (অনেকটা ঘুলঘুলির মত করিয়া) ইহার অভ্যন্তর ভাগ পূর্ণ করা হয়।

মারুৎ চুল্লীর উর্ধ্বদেশে অবস্থিত নির্গমন পথ দিয়া উত্তপ্ত বাতাস নির্গত হইয়া আসে। এই বাতাসের তাপকে অযথা অপব্যয়িত হইতে না দিয়া ইহার দ্বারা 'কুপার ষ্টোভের' ইটগুলিকে উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ইহাকে প্রথমে ধূলাবালি হইতে মুক্ত করিয়া ষ্টোভের মধ্যে আনিয়া প্রজ্বলিত করা হয়। এই ভাবে স্টোভের অভ্যন্তরস্থ ইটগুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে। টু ইয়ারের মধ্য দিয়া যে বাতাস চালনা করা হয় তাহাকে প্রথমে এই গরম ইটের সাহায্যে ৭০০°-৮০০°তে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়।

মারুৎ চুল্লীর সহিত দুইটি করিয়া কুপার ষ্টোভ সংশ্লিষ্ট থাকে। ইহারা তাপ পরিবেশনের কাজ করে। প্রথমে উপরোক্ত অব্যবহার্য গ্যাস পোড়াইয়া একটি ষ্টোভকে উত্তপ্ত করা হয়। যখন ইহা অগ্নুত্তপ্ত হইয়া উঠে তখন গ্যাস পোড়ান বন্ধ রাখিয়া ইহার সাহায্যে ঠাণ্ডা বাতাসকে ৭০০°-৮০০°তে উত্তপ্ত করিয়া লইয়া টু-ইয়ারের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। এই সময়ে অব্যবহার্য বাতাসের মোড় ঘুরাইয়া ইহাকে দুই নম্বরের ষ্টোভের মধ্যে জ্বালাইয়া ষ্টোভটিকে উত্তপ্ত করা হয়। প্রথম ষ্টোভটি ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে দ্বিতীয় ষ্টোভটি কার্যকরী হইয়া উঠে। এই ভাবে হেরফের করিয়া দুইটি ষ্টোভের সাহায্যে অব্যবহার্য তাপকে কার্যকরী করিয়া লওয়া হয়।

মারুৎ চুল্লীর নিম্নাংশে আরও দুইটি নির্গমন পথ থাকে। একটি অপরটির উপরে অবস্থান করে। উপরের পথের সাহায্যে 'গাদ' (Slag) এবং তলাকার নলের সাহায্যে গলিত ধাতুকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। গোড়াতে চুল্লীর মধ্যে কাঠের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। তারপর পাম্পের সাহায্যে বাতাস চালনা করিয়া তাপের মাত্রা বাড়াইয়া তোলা হয়। এই সময়ে উপর হইতে 'কাঁপ এবং কোণ' নামক সরঞ্জামের সাহায্যে ঝাঁঝরা খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর এবং কোক কয়লা পর পর ঢালিয়া দিয়া চুল্লীটিকে ক্রমশই পূর্ণ করিয়া ফেলা হয়।

লৌহ গলিবার সময় চুল্লীর মধ্যে যে সব রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে তাহা অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। চুল্লীর তলদেশে তাপ সর্বাপেক্ষা বেশী (১২০০°) এবং উপরের দিকে ইহা সর্বাপেক্ষা কম (৩০০°)। উপর হইতে খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর এবং কোক কয়লা নীচের দিকে নামিয়া আসিতে থাকে এবং নীচ হইতে কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি উত্তপ্ত গ্যাস উপর দিকে উঠিতে থাকে। চুল্লীর অধোদেশে কয়লা পুড়িয়া প্রথমে কার্বন-ডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড উত্তপ্ত কয়লার স্তূপকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিবার সময় কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। $C+O_2=CO_2$; $CO_2+C=2CO$. কার্বন মনোক্সাইড ৩০০°-৫০০° তাপে (অর্থাৎ চুল্লীর সর্বোচ্চ স্থানে যেখান হইতে ঝাঁঝরা পদার্থ, চুনাপাথর এবং কোক কয়লা সবেমাত্র তলার দিকে নামিতে আরম্ভ করে) লৌহের অক্সাইডের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া উহাকে লৌহ ধাতুতে পরিণত করে। $Fe_2O_3+3CO=2Fe+3CO_2$। এই মিশ্রণটি যতই নীচের দিকে নামিতে থাকে ততই উপরোক্ত প্রতিক্রিয়াটির গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বেশীরভাগ লৌহের অক্সাইডই 'রিডিউস্‌ড্' হইয়া লৌহধাতুতে পরিণত হয়। যে অংশটুকু এই প্রতিক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পায় তাহা শেষ পর্যন্ত অঙ্গারের দ্বারা বিয়োগ ধর্মান্তরিত হয়। $Fe_2O_3+3C=2Fe+3CO$ এইরূপে একটি লোহার তালের উৎপত্তি হয়। এই তালটি যখন আরও নীচের দিকে নামিয়া আসে তখন ইহা কার্বন মনোক্সাইডের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া উহাকে আংশিকভাবে বিয়োজিত করে। $2CO=CO_2+C$ অর্থাৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং অঙ্গার উৎপন্ন হয়। এই অঙ্গার গলিত লৌহের মধ্যে থাকিয়া যায়; অর্থাৎ গলিত লৌহ উহাকে শোষণ করিয়া

নয়। যখন তাপ ১০০০° কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছায় তখন লৌহের অক্সাইড প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিয়োগ ধর্মান্বিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে লৌহ-পিণ্ডটি খনিজ পদার্থ, চুনাপাথর প্রভৃতি হইতে আরও অঙ্গার, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌, সিলিকন প্রভৃতি পদার্থ শোষণ করিয়া লইতে থাকে। বিশুদ্ধ লৌহ অপেক্ষা অবিশুদ্ধ লৌহ অর্থাৎ অঙ্গারযুক্ত লৌহের গলনাঙ্ক অনেক কম। সুতরাং যে তাপে লৌহ গলিতে পারে না সেই তাপে এই মিশ্রধাতুটি গলিয়া তরল হইয়া পড়ে এবং এই তরল ধাতুটি গড়াইয়া আসিয়া টু-ইয়ারের নিম্নে অবস্থিত চুল্লীস্থিত একটি গহ্বরে সংগৃহীত হয়। আর গাদটি হাল্কা বলিয়া উহার উপর ভাসিতে থাকে। গাদকে উপর হইতে সরাইয়া লওয়া হয় এবং গলিত ধাতুকে মাঝে মাঝে নির্গমন পথের সাহায্যে বাহির করিয়া লওয়া হয়। তারপর ইহাকে বালির ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। বালির ছাঁচের মধ্য দিয়া গড়াইয়া যাইবার সময় লৌহের আকৃতি অনেকটা শূকর ছানার মত হয় বলিয়া ইহাকে 'পিগ্‌ আয়রন' বলা হয়।

গাদ—চুন, বালি প্রভৃতি পদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থটিকে গাদ বলা হয়। ৬০০° তাপের উপর চুনাপাথর বিশ্লিষ্ট হইয়া চুন (CaO) এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। চুনের কাজ হইতেছে গলনাঙ্ককে কমাইয়া আনা। সেই সঙ্গে ইহা বালি প্রভৃতি অন্যান্য আবর্জনার (অঙ্গারের ছাই, খনিজ পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কাদামাটি ইত্যাদি) সহিত মিলিত হইয়া গাদের সৃষ্টি করে। এই গাদ গলিয়া গিয়া গলিত লৌহের উপর সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার একটি কাজ হইতেছে যে, গলিত লৌহ যাহাতে টু-ইয়ার হইতে সঞ্চালিত বাতাসের অক্সিজেন কর্তৃক যোগ-ধর্মান্বিত (oxidised) হইতে না পারে তাহার প্রতিবিধান করা। এই গাদের প্রকৃতির উপর ব্লাষ্ট ফার্ণেসের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই গাদের সাহায্যে রাস্তা প্রস্তুত, গৃহাদি নির্মাণ, সিমেণ্ট প্রস্তুত ইত্যাদি কার্য করা হইয়া থাকে।

পিগ লৌহ

পিগ লৌহ—পিগ লৌহে অঙ্গারের পরিমাণ বেশী থাকে। সাধারণতঃ ইহার মধ্যে অঙ্গার থাকে ১'৬ হইতে ৪'৫ ভাগ। ইহা ছাড়া সিলিকন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পদার্থও কিয়ৎপরিমাণে ইহার সহিত থাকিয়া যায়। লৌহকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান কারণ হইতেছে ইহার মধ্যস্থিত অঙ্গার। অঙ্গারের পরিমাণের উপর লৌহের গুণাগুণ নির্ভর করে। সেই জন্য অঙ্গারের পরিমাণ অনুযায়ী লৌহকে ঢালাই লৌহ, ইস্পাত এবং রট আয়রনে ভাগ করা হইয়া থাকে। ঢালাই লৌহতে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে সর্বাপেক্ষা বেশী। ইস্পাতে তাহা অপেক্ষা কম এবং রট আয়রনে থাকে সবচেয়ে কম।

ঢালাই লোহা বা চীনা লোহা—যদিও পিগ আয়রন এবং সাধারণ কাষ্ট আয়রন বা ঢালাই লোহার মধ্যে গঠন প্রকৃতির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই তবুও পিগ আয়রনকে ঠিক ঢালাই লোহা বলা যায় না। অব্যবহার্য লোহাকে পিগ আয়রনের সহিত বিশেষ ধরনের চুল্লীতে বা লোহার মুচিতে গলাইয়া এবং তাহার সহিত অন্যান্য পদার্থ প্রয়োগ করিয়া ঢালাই লোহা প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে গলিত অবস্থায় ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

ঢালাই লোহাকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। সাদা রঙের ঢালাই লোহা এবং ধূসর রঙের ঢালাই লোহা। ইহার জন্য দায়ী অঙ্গার। অঙ্গার উচ্চতাপে লোহার সহিত রাসায়নিক ভাবে মিলিয়া লোহার কারবাইড (F_3C) উৎপন্ন করে। যদি ঢালাই লোহার মধ্যস্থিত বেশী পরিমাণ অঙ্গার লোহার সহিত মিলিয়া লোহার কারবাইড উৎপন্ন করে তাহা হইলে

ঢালাইয়ের বর্ণ অনেকটা সাদা দেখায়। এইজন্য উহাকে সাদা ঢালাই লোহা বলা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ অঙ্গার যদি লোহার সহিত যুক্ত না হইয়া, সামান্য পরিমাণে যুক্ত হয় এবং বেশী পরিমাণ গ্র্যাফাইট (উচ্চ তাপে অঙ্গার গ্র্যাফাইটে পরিণত হয়) হিসাবে পড়িয়া থাকে তাহা হইলে ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহা উৎপন্ন হয়। মুক্ত গ্র্যাফাইটের জন্য ইহার রং ধূসর বর্ণের দেখায়। সাদা এবং ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহার মধ্যে অঙ্গার কিভাবে অবস্থান করে তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে।

	সাদা রঙের ঢালাই লোহা	ধূসর রঙের ঢালাই লোহা
অঙ্গার (যুক্ত হিসাবে)	৩·০০ ভাগ।	·৯০ ভাগ।
অঙ্গার (মুক্ত হিসাবে)	০·১ ভাগ।	২·৮০ ভাগ।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঢালাই লোহা এবং পিগ আয়রনের গঠন প্রায় একরকম। সাধারণতঃ ইহাদের মধ্যে থাকে—

অঙ্গার—৩·৫০ ; সিলিকন—১·৮০ ; গন্ধক—·৫৮ ; ফস্‌ফরাস্ ·১০ ; ম্যাঙ্গানিজ—·৮০।

আজকাল ইস্পাতের ক্রমোন্নতির যুগে মিশ্র ঢালাই লোহা প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণ ঢালাই লোহা খুব শক্ত বটে ; কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গুর। ইহা পিটাইয়া বাড়াইতে পারা যায় না বা জোড়া লাগানও যায় না। ইহার ভঙ্গুরত্বের জন্য ইহাকে অনেক কাজে ব্যবহার করা চলে না। সেইজন্য আজকাল ইহার মধ্যে নিকেল, ক্রোমিয়াম্, মলিবডিনাম, টাংস্টেন্ প্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে নানা প্রকার মিশ্র ঢালাই লোহার উৎপন্ন করা হইতেছে। এই সব লোহাকে বিশেষ বিশেষ কাজে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

রট আয়রন—বাজারে চলতি লোহার মধ্যে রট আয়রনই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। ইহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ ০·১ ভাগেরও কম থাকে। অঙ্গার, ঢালাই লোহা বা ইস্পাতের অঙ্গস্বরূপ। অঙ্গার ছাড়া ইস্পাত বা ঢালাই লোহা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ইহাদিগকে প্রস্তুত করিবার সময় স্বেচ্ছায় উহাদের মধ্যে অঙ্গার প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু রট আয়রনের বেলায় সে কথা বলা চলে না। রট আয়রন প্রায় অঙ্গার বিমুক্ত হইয়া থাকে। তবে যে সামান্য পরিমাণ অঙ্গার উহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহা সংশ্লিষ্ট পদার্থ হইতে আবর্জনা স্বরূপ আসিয়া থাকে।

রট আয়রন প্রস্তুতপ্রণালী

পিগ আয়রন অথবা ঢালাই লোহাকে অব্যবহার্য লোহার সহিত একত্রে রিভারবারেটরী চুল্লীর মধ্যে গলাইয়া রট আয়রন প্রস্তুত করা হয়। চুল্লীতে লোহার অক্সাইডের (Fe_2O_3) একটি আস্তরণ দেওয়া থাকে। এই আস্তরণের সংস্পর্শে আসিয়া লোহার অন্তর্গত অঙ্গার, সিলিকন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি পদার্থগুলি আংশিকভাবে যোগধর্মান্বিত হইয়া গাদে পরিণত হয় এবং ধাতুটি গলিয়া তরল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় লম্বা লম্বা লৌহদণ্ডের সাহায্যে ধাতুটিকে উত্তমরূপে নাড়িতে হয়, যাহাতে উহা আস্তরণের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে আসিতে পারে। অঙ্গার, কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং কার্বন মনোক্সাইড প্রজ্বলিত হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হইয়া যায়। $Fe_2O_3+3C=2Fe+3CO$। সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি পদার্থগুলি যোগধর্মান্বিত হইয়া অক্সাইডে পরিণত হয় এবং লৌহের অক্সাইডের সহিত মিশিয়া গাদের সৃষ্টি করে। গাদটিকে সরাইয়া ফেলা হয়। এই সময় লৌহ তরল অবস্থায় থাকে না। আবর্জনা মুক্ত হওয়াতে বিশুদ্ধ লৌহের গলনাঙ্ক বাড়িয়া যায়, সুতরাং উহা ডেলা বাঁধিয়া একটা পিণ্ডের আকারে পরিণত হয়। এই পিণ্ডটিকে নাড়িয়া নাড়িয়া শেষ পর্যন্ত বলের আকারে পরিণত করা হয়।

এক একটি বল ওজনে প্রায় একমণ হইয়া থাকে। এই বলগুলিকে চুল্লী হইতে সরাইয়া লইয়া বাষ্প-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে ইহার মধ্যে যে গাদটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে নিংড়াইয়া বাহির হইয়া আসে এবং ধাতুটিও প্রায় বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। অবশ্য রট আয়রন একেবারে বিশুদ্ধ লোহা নহে। ইহার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ অঙ্গার এবং কিছুটা গাদ থাকিয়া যায়।

লৌহের ধর্ম— বিশুদ্ধ লৌহ সাদা উজ্জল বর্ণের ধাতু। ইহাকে পালিশ করিলে ইহার ঔজ্জ্বল্য সমধিক বৃদ্ধি পায়। শুষ্ক বাতাসের সংস্পর্শে এই ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায় না বটে; কিন্তু আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে ইহার উপর মরিচা পড়িতে আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ লৌহ জল অপেক্ষা ৭.৮৫ গুণ ভারী। ইহাকে উত্তপ্ত করিতে থাকিলে ১৫৩০° তাপে ইহা গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়। ২৪৫০° তাপে ইহা ফুটিতে আরম্ভ করে। পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফ্যুরিক অ্যাসিড, এবং নাইট্রিক অ্যাসিড লৌহকে দ্রবীভূত করিতে পারে। কিন্তু গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডে (ঘনত্ব ১.৪৫) লৌহ দ্রবীভূভ হয় না। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে লৌহের যেন এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। কারণ যে অংশটি অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে এবং যে অংশটি আসে না—এই উভয় অংশের গুণাগুণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। সাধারণ লোহা তুঁতের জল হইতে তামা, সীসক নাইট্রেট হইতে সীসা, রূপাকষের (সিলভার নাইট্রেট) জল হইতে রূপাকে অধঃক্ষেপ করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু গাঢ় অ্যাসিড সংযুক্ত অংশটি এ সবের কিছুই করিতে পারে না। সেইজন্য লৌহের এই অবস্থাটিকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়। নিষ্ক্রিয় ভাবাপন্ন লৌহ, পাতলা নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় না। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়া অন্যান্য যোগধর্মী পদার্থ, যেমন ক্রোমিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন পারক্সাইড প্রভৃতিও লৌহকে নিষ্ক্রিয় ভাবাপন্ন করে।

লৌহের এই নিষ্ক্রিয় ভাবের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও সাধারণ মতবাদ হইতেছে যে, যোগধর্মী পদার্থের সংস্পর্শে অক্সাইডের একটি আবরণ লৌহের উপর পড়িয়া যায় এবং এই আবরণটি লৌহকে অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে রক্ষা করে। লৌহের এই নিষ্ক্রিয় ভাবটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে দুর করিতে পারা যায়:—

(১) লৌহের উপরিভাগ ঘষিয়া ফেলা।

(২) কোন বিয়োগধর্মী গ্যাসে (Reducing gas) ইহাকে উত্তপ্ত করা;

(৩) লৌহটিকে এক টুকরা দস্তার সহিত পাতলা নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে নিমজ্জিত করা।

লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু, যেমন কোবাল্ট, নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতিও নিষ্ক্রিয় ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

লৌহে মরিচা ধরা

লৌহের উপর মরিচা ধরিতে আমরা সর্বদাই দেখিয়া থাকি। বিশেষতঃ লৌহকে আর্দ্র-বাতাসের সংস্পর্শে রাখিলে উহার উপর শীঘ্রই মরিচা পড়িতে আরম্ভ করে। মরিচা এক প্রকার লাল বাদামী রঙের পদার্থ। ইহা আলগাভাবে লৌহটিকে আবৃত করিয়া থাকে। মরিচা বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। ইহার মধ্যে থাকে—ফেরিক অক্সাইড, ফেরাস অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল। সময়ের পরিমাণের উপর মরিচার প্রকৃতি নির্ভর করে। মরিচা দীর্ঘ দিনের হইলে উহার মধ্যে ফেরিক অক্সাইডের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে। জলবর্জিত লৌহ শুষ্ক বাতাসের মধ্যে রাখিলে উহার উপর কোনরূপ মরিচা ধরে না। সুতরাং মরিচা ধরার পক্ষে, জলীয় বাষ্প বা আর্দ্রতার উপস্থিতি অপরিহার্য। যে প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী মরিচা পড়িতে থাকে তাহা বেশ একটি

জটিল ব্যাপার। মরিচা ধরা সম্বন্ধে যে সব মতবাদ প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল :—

১। কাহারও কাহারও মতে অ্যাসিডের উপস্থিতিই মরিচা পড়িবার কারণ। কারণ বিশুদ্ধ লৌহকে বিশুদ্ধ জল এবং বিশুদ্ধ অক্সিজেনের সংস্রবে রাখিলে মরিচা ধরে না। মরিচা পড়িবার সময় প্রথমে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে লৌহের উপর জলীয় বাষ্পের একটা খুব পাতলা স্তর পড়ে। উহা বাতাস হইতে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন দ্রবীভূত করিয়া অম্লাত্মক লৌহের কার্বনেট (অ্যাসিড ফেরাস কার্বনেট) $Fe(HCO_3)_2$ সৃষ্টি করে। এই অ্যাসিড কার্বনেট অক্সিজেনের সংস্পর্শে থাকিয়া ক্ষারাত্মক ফেরিক কার্বনেটে (বেসিক ফেরিক কার্বনেট) $Fe(OH)_2HCO_3$ রূপান্তরিত হয়। ইহা পরে জল-বিশ্লিষ্ট হইয়া ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। ফেরিক হাইড্রক্সাইড হইতে ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ফেরিক অক্সাইড জলাকর্ষী পদার্থ। ইহা বাতাস হইতে জল শোষণ করিয়া সন্নিহিত স্থানকে আর্দ্র করিয়া রাখে। সুতরাং মরিচা একবার পড়িতে থাকিলে এ কার্য দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে।

২। কাহারও কাহারও মতে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মরিচার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে বুঝান যাইতে পারে।

$$Fe+O_2+H_2O=FeO+H_2O_2$$

$$2FeO+H_2O_2=Fe_2O_3+H_2O.$$
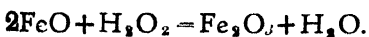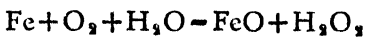
অবশ্য হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া না গেলেও যে সকল পদার্থের দ্বারা হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড বিনষ্ট হয় তাহাদের উপস্থিতিতে মরিচা ধরিতে পারে না বলিয়াই এই মতবাদের উৎপত্তি।

৩। আবার কেউ কেউ বলেন যে, জলের সংস্পর্শে থাকিয়া লৌহ এবং লৌহস্থিত ময়লার মধ্যে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক 'সেল'এর উৎপত্তি হয়। ইহাদের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহার দ্বারাই মরিচা পড়িতে থাকে। ইহাকে বৈদ্যুতিক মতবাদ বলা হয়।

মরিচার হাত হইতে রক্ষা

সাধারণতঃ লৌহ সামগ্রীর উপর তেল রং লাগাইয়া উহাদিগকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করা হয়। তেল-রঙের মধ্যে লালমাটি বা ফেরিক অক্সাইডের রং সর্বাপেক্ষা সস্তা। সুতরাং এই রংটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পিচ্ বা আলকাতরাও ব্যবহৃত হয়। উত্তপ্ত লৌহের উপর দিয়া যদি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প চালনা করা যায় তাহা হইলে ধাতুটির উপর Fe_3O_4এর একটি আস্তরণ পড়িয়া যায়। এই উপায়েও ধাতুটিকে মরিচার হাত হইতে রক্ষা করা হয়।

ব্যবহারিক জগতে যেসব ধাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে লৌহের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী। আমরা বর্তমানে লৌহ-যুগে বাস করিতেছি। একদিন কোন এক শুভ মুহূর্তে মানুষের সহিত লৌহের পরিচয় হইয়াছিল। সেই হইতে মানুষ লৌহের শক্তিকে চিনিতে পারিল এবং লৌহের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল। যাহার ফলে লৌহ-যুগের প্রবর্তন হইল। লৌহের প্রয়োজন সর্বত্রই। গৃহস্থালীর সামান্য তৈজসপত্রাদি হইতে জগতের বৃহত্তম ব্যাপারে লৌহের প্রয়োজন সর্বজনবিদিত। এক কথায় বলিতে গেলে লৌহ না হইলে আধুনিক জগতের প্রসার এবং উন্নতি সুদূরপরাহত হইত। তবে আধুনিক যুগে বিশুদ্ধ লৌহ অথবা রট-আয়রনের ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ। অস্থায়ী চুম্বক প্রস্তুতে রট-আয়রন ব্যবহৃত হয়। ক্রেনের শিকল এই লৌহ হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢালাই লোহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ঢালাই কার্যে ব্যবহৃত হয়। ঢালাই লোহার গলনাঙ্ক কম এবং ইহার তরলতাও বেশী। ইহা সূক্ষ্ম

ঢালাই কার্যের বিশেষ উপযোগী। গৃহস্থালীর সামগ্রী প্রস্তুতে, গৃহ-নির্মাণাদি কার্যে, যন্ত্রপাতির বিশেষ বিশেষ অংশ প্রস্তুতে এবং বড় বড় ঢালাই কার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। ঢালাই লোহা অত্যন্ত ভঙ্গুর। উচ্চস্থান হইতে পড়িলে ইহার ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। সেই জন্য আজকাল বিশেষ বিশেষ ধাতু প্রয়োগে মিশ্র ঢালাই লোহা প্রস্তুত করা হয়। মিশ্র ঢালাই লোহা অত বেশী ভঙ্গুর নহে। ইহার মধ্যে এমন কয়েকটি উন্নত গুণের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার জন্য ইহাকে বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যবহার করা হয়।

লৌহের গঠনাকৃতি

ইস্পাত সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে লৌহ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, সেটি উহার গঠনাকৃতি। ইহার আভ্যন্তরিক গঠন সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে দুই একটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। লৌহের, বিশেষতঃ ইস্পাতের গঠন-ভঙ্গিমার উপর ইহার সব কিছু নির্ভর করে। সেজন্য ধাতুবিদরা এই জিনিসটির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। একটুকরা লৌহ অথবা ইস্পাত কিংবা ঢালাই লৌহের মধ্যে প্রভেদ যে কোথায় তাহা খালি চোখে বোঝা মুশকিল। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের গঠন ভঙ্গিমা হইতে এই প্রভেদটুকু সহজেই বোঝা যায়। সেই কথাটাই বলিতেছি।

ধাতুকে উত্তপ্ত করিতে থাকিলে উহা ক্রমশঃই কঠিন হইতে তরল পদার্থে পরিণত হয়। আবার তরল পদার্থটিকে ঠাণ্ডা করিলে উহা পুনরায় কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তরল হইতে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হইবার সময় ধাতুর অণুগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। সেই সময় কতকগুলি দানা একত্রে জোট পাকাইয়া এক একটি বড় দানার সৃষ্টি করে। এই দানার প্রকৃতির উপরই ধাতুটির বিশেষত্ব নির্ভর করে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, বিশুদ্ধ ধাতুর দানাগুলি বহুভুজ-বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছবির মত যেন আঁকাবাঁকা রেখার সাহায্যে একটি দানা অপরটির নিকট হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয় যেন সমতল ক্ষেত্রটির উপর নক্সা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে জ্যামিতিক ছবির মত ঝকঝকে সাদা দানাগুলি
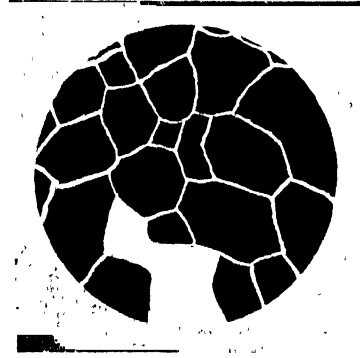
বিশুদ্ধ ধাতুর গঠনাকৃতি

ইহারাই বিশুদ্ধ লৌহের দানা। ইহাদিগকে 'ফেরাইট্' বলা হয়। বিশুদ্ধ লৌহ শুধু ফেরাইট্ দানা লইয়াই গঠিত। তাহার গঠনাকৃতি এইরূপ বহুভুজবিশিষ্ট। ফেরাইট্ দানাগুলি ক্ষেত্রটির উপর ছড়াইয়া থাকে। কিন্তু যদি অন্য কোন অসমজাতীয় পদার্থ, যেমন ময়লা বা গাদ লৌহের মধ্যে থাকিয়া যায়, তখন লৌহের গঠনাকৃতির পরিবর্তন ঘটে। তখন ফেরাইটের দানাগুলি অত পরিষ্কার ঝকঝকে থাকে না। উহার মধ্যে মাঝে মাঝে কালো কালো দাগ ফুটিয়া উঠে। সমগ্র ক্ষেত্রটি সাদা এবং কালো রঙে ছাইয়া যায়। এইরূপ ছবি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পদার্থটি বিশুদ্ধ নহে—উহার মধ্যে অন্য কোন পদার্থ রহিয়া গিয়াছে। ইস্পাতের বেলায় ছবিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে।

যে কোন লৌহের টুকরা লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলেই যে এরূপ বহুভুজ বিশিষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে।
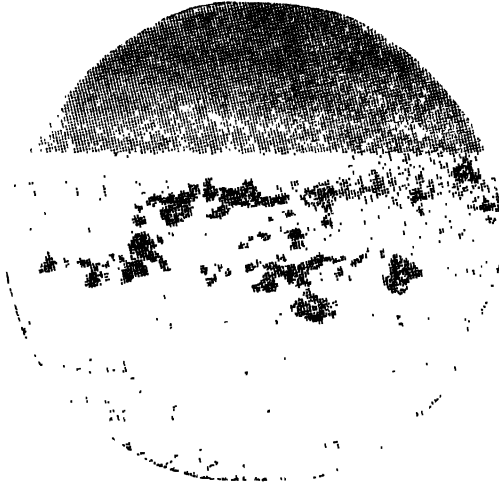
ধাতুর মধ্যে গাদ আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। গাদের জন্য কালো কালো দাগগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ দেখিতে হইলে লৌহটিকে বিশেষভাবে পরিষ্কার করিয়া লইয়া খোদাই করা (etching) প্রয়োজন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোন লৌহ সামগ্রীর গঠনাকৃতি দেখিতে হইলে সামগ্রীটির একাংশ হইতে ছোট একটি টুকরা (১"×½"×½") ভাঙিয়া বা করাত দিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তাহার পর উকার সাহায্যে করাতের দাগগুলিকে ঘষিয়া ফেলিয়া উহার উপরিভাগকে সমতল কষিয়া ফেলা হয়। এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে টুকরাটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উকার অসংখ্য দাগ লৌহটির উপর কাটিয়া বসিয়াছে। সুতরাং এমারি কাপড়ের উপর টুকরাটিকে ঘষিয়া ঘষিয়া উহার উপর হইতে উকার এবং অন্যান্য সমস্ত দাগগুলিকে নিখুঁতভাবে তুলিয়া ফেলা হয়*। এইজন্য প্রথমে মোটা তারপর মিহি হইতে অধিকতর মিহি (শূন্য নম্বর, দুই শূন্য নম্বর, এবং তিন শূন্য নম্বর) এমারি কাপড় ব্যবহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত টুকরাটিকে স্যাময় চামড়া বা সিলভেট কাপড়ের উপর ঘষিয়া ঝকঝকে করিয়া পরিষ্কার করা হয়।

ঘষিবার সময় স্যাময় চামড়াটিকে জলমিশ্রিত রুজ্ অথবা খুব মিহি অ্যালুমিনা চূর্ণের দ্বারা ভিজাইয়া রাখা হয়। এইভাবে লৌহ টুকরাটির উপর হইতে সমস্ত দাগ উঠিয়া মিলাইয়া যায় এবং টুকরাটি পালিশ হইয়া আয়নার মত ঝকঝকে হইয়া উঠে। এইবার টুকরাটিকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে ইহাকে ঠিক একখানা ঝক্‌ঝকে রূপার পাত বলিয়া ভুল হইবে। শুধু দুই একটি আঁচড়ের দাগ এবং লৌহটির মধ্যে ঢালাই করিবার সময় যদি কিছু গাদ থাকিয়া যায় তাহারই কতকগুলি কালো কালো দাগ ছাড়া অন্য কিছু দেখা যাইবে না। লৌহের গঠনাকৃতি দেখিতে হইলে এইরূপ ঝকঝকে সম্পূর্ণ দাগশূন্য সমতলক্ষেত্র অত্যাবশ্যক। ইহার উপর রাসায়নিক প্রণালীর সাহায্যে ইহার প্রকৃত রূপ ফুটাইয়া তোলা হয়।

নাইট্রাল—(৫ ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড এবং ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল) বা পিক্রাল—(৫ ভাগ পিক্রিক অ্যাসিড এবং ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল) নামক দ্রবণের মধ্যে লৌহের চকচকে অংশকে যদি

* লৌহের উপর হইতে সমস্ত দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া না ফেলিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহার গঠনাকৃতি দেখা সম্ভবপর নহে। দাগ থাকিয়া গেলে গঠনাকৃতি ভালভাবে অনুধাবন করা যায় না।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ডুবাইয়া তুলিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়া ভালভাবে ধুইয়া শুষ্ক করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় তাহা হইলে উহার প্রকৃত গঠন চক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। এইভাবে ধাতুটির খোদাই কার্য সম্পন্ন করা হয়। খোদাই করা লৌহটিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার চকচকে অংশটি অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। উহার কারণ অ্যাসিডের সংস্পর্শে পদার্থটির উপরিভাগ সামান্য মাত্রায় ক্ষয়িত হইয়া চাকচিক্য নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য পদার্থটির সকল অংশ ঠিক সমানভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যে অংশটি বেশী কঠিন তাহার ক্ষয় কম হয়। কিন্তু যে অংশটি কোমল সেই অংশটির ক্ষয় অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে অ্যাসিডের সংস্পর্শে লৌহের উপরিভাগ এবড়োখেবড়ো বা উঁচুনীচু হইয়া পড়ে। অবশ্য এই পরিবর্তন এত সামান্য যে, খালি চোখে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহা সহজেই ধরা পড়ে। কারণ পদার্থটির উপরিভাগ হইতে যখন আলো প্রতিফলিত হইতে থাকে তখন উঁচুস্থান হইতে বেশী আলো এবং নীচু স্থান হইতে কম আলো প্রতিফলিত হয়। সুতরাং যে স্থান হইতে বেশী আলো প্রতিফলিত হয় সেই স্থানটিকে বেশী উজ্জ্বল অথবা সাদা দেখায়, এবং যে স্থান হইতে কম আলো প্রতিফলিত হয় সেই স্থানটিকে অনুজ্জ্বল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কালো রঙের দেখায়। ফেরাইটের দানা অপেক্ষা গাদ কোমল পদার্থ। উহার ক্ষয় বেশী হয়। ফেরাইটের দানাগুলির ক্ষয় কম হয়। সুতরাং গাদ হইতে আলো কম প্রতিফলন হওয়ার দরুণ উহাকে কালো দেখায় এবং ফেরাইটের দানাগুলিকে সাদা দেখায়। এইভাবে সমগ্র জমিটি সাদা এবং কালো রঙে পূর্ণ হইয়া ওঠে। খোদাই কার্যটি খুব সাবধানে করিতে হয়, কারণ বেশীক্ষণ খোদাই করিতে থাকিলে অর্থাৎ বেশীক্ষণ অ্যাসিডের সংস্পর্শে থাকিয়া ধাতুটি বেশী ক্ষয়িত হইলে অযথা অনেকগুলি গর্তের সৃষ্টি হয়। সেসব ক্ষেত্রে গঠনাকৃতি ভালভাবে বুঝা যায় না। তখন লৌহটিকে পুনরায় পালিশ করিয়া লইতে হয়।

এইভাবে যে কোন ধাতু—শঙ্কর-ধাতু, ঢালাই লোহা প্রভৃতির গঠনাকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। তবে ধাতুর উপাদান হিসাবে খোদাইকারী দ্রবণটির পরিবর্তনের প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পান খাওয়া কি ভাল?

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পান খাওয়া বহুকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত। এমনকি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও "তাম্বুল-করঙ্কবাহী"র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিথি অভ্যাগতকে পান-সুপারী দিয়া অভ্যর্থনা এবং বিবাহের বরণডালায় পান-সুপারীর ব্যবস্থা স্মরণাতীতকাল হইতেই আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। এখনও পূজাপার্বণ বা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে (যদিও কালধর্মে এখন তাহা দুর্লভ) আকণ্ঠ ভোজনের শেষে পান-পরিবেশন একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। মুসলমান রাজত্বকালে নানাবিধ উত্তেজক ও উদ্দীপক উপকরণ সাহায্যে পান খাওয়া আমীর ওমরাহগণের একটা ব্যসনের মধ্যে

পরিগণিত ছিল। কন্‌কনে শীতের রাত্রে একটি পান খাইয়া বাদশার শরীর যখন গরম হইয়া উঠিত তখন দাসী বাঁদীদের পাখার বাতাসে বাদশার শরীরের উষ্ণতা নিবারণ করিবার গল্প এখনও শোনা যায়। শুধু আমাদের দেশেই নহে, ভারতবর্ষের বাহিরে—যথা মালয়, ইষ্ট ইণ্ডিজ্‌, শ্যাম, ব্রহ্ম, ফরাসী-ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও পানের ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়।

এ দেশীয় সমাজে পান-খাওয়ার প্রথা সবিশেষ প্রচলিত থাকিলেও বিদেশীয়গণ ইহাকে কখনও প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাম্বুল-চর্বণ-নিরত নেটিভগণের রক্তিম দন্ত-পঙ্‌ক্তি এবং ওষ্ঠপ্রান্তক্ষরিত রক্ত-রস-ধারা তাঁহাদের অন্তরে বিস্ময় ও ঘৃণারই উদ্রেক করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সভ্য সমাজে [illegible] পান খাওয়া অনেকে বর্জন করিয়াছেন বটে, তথাপি আমাদের সমাজের বৃহত্তর অংশ অন্যান্য চিরাচরিত প্রথাগুলির ন্যায় তাম্বুল-সেবনের প্রথাকে এখনও সমাদরে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পানের দোকান, এমনকি চলন্ত ট্রেণের কামরার ভিতরেও পানের বেসাতি লইয়া ফেরিওয়ালাগণের আবির্ভাব তাহারই পরিচয় দেয়।

পানের ব্যবহার কি ভাবে আমাদের দেশে প্রথম প্রচলিত হইল তাহার বিবরণ সঠিক জানা না গেলেও প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধের অনুপান ও ভেষজরূপে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। আয়ুর্বেদাচার্যগণ পান ও তাহার আনুষঙ্গিক উপকরণ, যথা সুপারী, খদির, চুন, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলার গুণাগুণ পর্যালোচনা করিয়া নানাবিধ পীড়ায় সে সকলের ব্যবহার অনুমোদন করিতেন। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব তাঁহার "আর্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আহারের পর মসলাদি সহযোগে তাম্বুল চর্বণ করা ভাল। কারণ আহারের পর শ্লেষ্মার যে আধিক্য হয় তাহা নিঃসরণের পক্ষে ইহা খুব সহায়তা করে। প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে পান ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রধান মসলাগুলির বিবিধ গুণাগুণ কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

পান :—সুগন্ধি, কষায়গুণযুক্ত ও কামোদ্দীপক। ইহা প্রফুল্লতা ও উত্তাপবর্ধক, উত্তেজক, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মানিবারক, রক্ত ও শুক্রবর্ধক, ক্লান্তিনাশক। ইহার ব্যবহারে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত হয় এবং গলার স্বর সুমিষ্ট হয়। প্রাচীনগণ ইহার ব্যবহারের ক্ষেত্র জানিতেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে এবিষয়ে কোন বিধিনিষেধ পালন করা হয় না। যাঁহারা চক্ষু কিংবা দন্তরোগে পীড়িত তাঁহাদের পক্ষে পান খাওয়া বিশেষ অপকারক। যাঁহারা সুরাসক্ত তাঁহাদের পক্ষেও ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। পান খাইলে মুখের শুষ্কতা দূর হয়, পিপাসা নিবারণ হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়। ইহা পাকস্থলীর গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া বর্ধিত করে।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডক্টর পুলিনবিহারী সরকার ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র রায় পানের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার ফল এইরূপ :—এক কিলোগ্র্যাম (প্রায় একসের) পরিমাণ পানে,—

লৌহ—৩৪·১ মিলিগ্র্যাম
তাম্র—২·৫৩ „
ম্যাঙ্গানিজ—৪ „
ক্যালসিয়াম—৯·৮৪ গ্র্যাম
ফস্‌ফরাস—০·৭ গ্র্যাম

(১ গ্র্যাম = ১০০০ মিলিগ্র্যাম = ১১·৩৪ তোলা
১ মিলিগ্র্যাম = ·০১১৩ তোলা)

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উচ্চতর প্রাণীর রক্তকণিকা গঠনে শুধু লৌহ অপেক্ষা লৌহের সহিত আণুবীক্ষণিক পরিমাণে তাম্রের অসম্ভব উপকারিতার বিষয় জানা গিয়াছে। প্রাণীর উপর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ম্যাঙ্গানিজ লবণ

প্রয়োগে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীররক্ষায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে। উল্লিখিত তথ্য হইতেও পানের উপকারিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাঃ হরগোপাল বিশ্বাসের 'খাদ্য-বিজ্ঞান' হইতে উদ্ধৃত)

খদির (খয়ের):—আন্‌কেরিয়া গ্যাম্বিয়া নামক বৃক্ষের পাতা এবং কচি শাখাপ্রশাখা হইতে তৈয়ারী সার হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ—কষায় এবং ইহা দেহের সজীব কোষসমূহ হইতে ক্ষরিতরসের প্রবাহকে মন্দীভূত করে। ইহা কামাগ্নি সন্দীপক। ইহাতে গন্ধযুক্ত, উদ্বায়ী "চ্যাভিকোল্" নামক ফিনোল জাতীয় একপ্রকার তৈল আছে। ইহা একটি শক্তিশালী বীজাণু নিরোধক। ইহা ছাড়া খদিরের মধ্যে "আরাকেন" নামক একজাতীয় উপক্ষার আছে। কালো খয়ের খদির গাছের কাঠের সার হইতে প্রস্তুত হয়।

চুন:—ইহার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম হাইড্রেট। ইহা তীব্র ক্ষার গুণ বিশিষ্ট এবং জলে দ্রবীভূত হয়। ইহা অম্লনাশক ও ইহার নিজস্ব একটি কষায় গুণ আছে। ইহা হৃৎপিণ্ড এবং দেহের শিরা উপশিরার ক্রিয়া সতেজ করে।

এলাচ:—সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, মৃদু উত্তেজক ও বায়ুনাশক।

দারুচিনি:—অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত মসলার সমধর্মী।

সুপারী:—উত্তেজক, কষায় গুণযুক্ত ও ক্রিমিনাশক। ইহা মুখের লালা বৃদ্ধি, দাঁতের মাঢ়ি শক্ত এবং মুখে সুগন্ধ আনয়ন করে। ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক অ্যাসিড, তৈলজাতীয় পদার্থ এবং তিনটি উপক্ষার পাওয়া যায়।

পান তৈয়ারীর সময়ে চুনের সহিত যখন খয়ের মিশান হয় তখন চুনের ক্ষারগুণে খয়েরের কষায় গুণ নষ্ট হইয়া গিয়া পানের এক বিশিষ্ট স্বাদ আনিয়া দেয়। তাহার সহিত অন্যান্য যে সকল মসলা ব্যবহৃত হয় সে সকল সাধারণতঃ সুগন্ধবর্ধক অথবা পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। সুতরাং পান খাওয়া যে দোষের নয়, বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী তাহা উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহার যথোচিত ব্যবহারে দাঁতেরও কোন পীড়া হওয়া সম্ভব নয় তাহাও বুঝা যায়। এই কারণেই আহারের পর পান চিবাইবার প্রথা সঙ্গত বলিয়া আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। পানের উপকারিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াই হিন্দুরা তাঁহাদের সামাজিক আচার, ব্যবহারে এবং বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ইহাকে অঙ্গীভূত করিয়াছেন। যাঁহারা পুরুষত্বহীন তাঁহাদের সতেজতা বর্ধন ও কামোদ্দীপনার সহায়তার জন্য প্রাচীন কবিরাজগণ তাম্বুল-সেবনের ব্যবস্থা দিতেন। কথিত আছে, পানের ডাঁটা খাইলে বন্ধ্যাত্ব জন্মে।

আনাম ও ফরাসী ইন্দোচীনের অন্তর্গত টৌকিন-এ প্রচলিত পানখাওয়ার প্রথা সম্বন্ধে ডাঃ বুরিশ "Le-Review de Stomatologie" পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন। পানে যে সকল মসলা ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট গুণ ছাড়া পানের যে তেজোবর্ধক ও বায়ুনাশক গুণ আছে একথা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, সুপারী কষায় গুণযুক্ত, রেচননিবারক, পরিপাক সহায়ক ও ক্রিমি-নাশক। পানের রস মুখের দুর্গন্ধ নাশ করে। চুন হইতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। সুপারী ও পান মুখ-গহ্বরে কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া প্রকাশ করে না এবং জলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় চুন দাঁতের উপরের মসৃণ আচ্ছাদনের অর্থাৎ এনামেলের কোন ক্ষতি করে না। মুখের লালার সহিত মিশ্রিত পানের রস দাঁতের মাঢ়ির পক্ষে কোন অপকার করে না, কিংবা এই রস গলাধঃকরণ করিলে স্বাস্থ্যেরও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, উপযুক্ত পরিমাণে পান খাইলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, মুখ-গহ্বর বিশুদ্ধ

হয়, দাঁতের অস্থিপীড়া নিবারিত হয় এবং দেহের রক্তসঞ্চালন উন্নত হয়।

কিন্তু কথায় আছে,—সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। কোন অভ্যাস যতই ভাল হোক না কেন তাহাকে যখন অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া হয় তখন তাহা দূষণীয় বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। পান-খাওয়া সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। আমাদের সমাজে এমন অনেকে আছেন যাহারা পানের এত বেশী ব্যবহার করেন যে, তাহাকে একপ্রকার ব্যাধি বলিলেও চলে। এমন কি রাত্রে বিছানায় শুইয়াও একটি পানের খিলি চিবাইতে চিবাইতে তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করেন। তাহা ছাড়া পানের সহিত দোক্তা, জর্দা বা তামাক পাতার ব্যবহার অবাধে চলিতেছে। পানের সহিত দোক্তা প্রভৃতি সংমিশ্রণের ফলে পান খাওয়ায় এখন উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। কাঁচা তামাক বা দোক্তা একজাতীয় বিষ। ইহার অযথা ব্যবহারে যে অকালে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। স্বাস্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ব্যবহারিক জগতে অন্যের অতিরিক্ত পান খাওয়ার কুফল অপরকে কখন না কখনও ভোগ করিতেই হয়। সারাদিন পরিশ্রমের পর কোন সুবেশ পথচারী হয়তো ফুটপাথ ধরিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, কিংবা অফিসের পোষাকে সজ্জিত হইয়া কোন ভদ্রলোক ত্রস্তপদে অফিসের দিকে চলিয়াছেন। এমন সময়ে উপরের জানালা দিয়া অলক্ষ্যে কাহার মুখ হইতে নিঃসৃত একগাল পানের রসে তাঁহার জামা, কাপড় সব নোংরা হইয়া গেল! গৃহের ভিতরে বাহিরে, ট্রেণের কামরায় সর্বত্রই এই কু-অভ্যাসের চিহ্ন অহরহই আমাদের চোখে পড়ে। দোক্তা দেওয়া পান চিবাইতে চিবাইতে সরস মুখে কথা বলিবার সময় মুখ হইতে থুথু ছিট্‌কাইয়া আলাপরত ভদ্রলোকের বদনমণ্ডলে গিয়া পড়িতে প্রায়ই দেখা যায়।

অতিরিক্ত পান খাওয়ার দোষ সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা এই—

(১) বেশী পান খাইলে মুখের ভিতরকার লালা-নিঃসারক গ্রন্থিগুলি হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হইতে থাকে এবং তাহা বৃথাই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পাচনের জন্য লালার বিশেষ প্রয়োজন হয়; কিন্তু লালার অপব্যয়ের জন্য সে প্রয়োজন সাধিত হয় না।

(২) অতিরিক্ত তাম্বুল চর্বণের ফলে দাঁতের ধারগুলি ক্রমশ ক্ষয় পায়।

(৩) পান, সুপারীর টুক্‌রা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকাইয়া গিয়া চাপ দেয়, তাহার ফলে দাঁতের মাড়ি ক্রমশ সরিয়া যায়।

(৪) প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যাঁহারা বেশী পান খান যদিও তাঁহাদের দন্তাস্থিরোগ প্রায় দেখা যায় না তথাপি তাঁহাদের শতকরা পঁচাত্তর জন পায়োরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকেন। তাঁহাদের মাড়ির ভিতরে যে গহ্বর প্রস্তুত হয় তাহা হইতে দূষিত পুঁজ নির্গত হইয়া থাকে।

(৫) চুনের ভিতরকার ক্যালসিয়াম প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে লালার সহিত মিশিয়া দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং পরিণামে তাহা দাঁতের পাথুরি প্রস্তুত করে।

(৬) খয়েরের লাল ছোপ দাঁতের স্বাভাবিক শুভ্রতা নষ্ট করিয়া দেয় এবং সেই ছোপ ব্রাস দিয়াও তোলা কঠিন হয়।

(৭) মুখ-গহ্বরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং মাড়ির কোমলতা ও অনুভব শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

(৮) ধূমপায়ীদের ন্যায় পান-সেবীদেরও কণ্ঠের অভ্যন্তর ভাগ অনবরত উত্তেজনা পাইতে থাকে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের প্রায়ই গ্র্যানুলার ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বা গলনালীপ্রদাহ রোগ দেখা যায়।

(৯) অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে জিহ্বা কিংবা গলনালীর অভ্যন্তরে কর্কট রোগ বা ক্যান্সার হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(১০) অতিরিক্ত পান খাওয়ার ফলে চক্ষু-রোগ, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত, ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি রোগেরও সম্ভাবনা থাকে।

(১১) বেশী পান খাইলে স্নায়বিক পীড়া জন্মিতে পারে। পূর্বে যে পায়োরিয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইতে নিঃসৃত পূঁজ অনবরত গলাধঃকরণ হওয়ার ফলে অন্যান্য পীড়ারও সূত্রপাত হওয়া অসম্ভব নয়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পানের উপযুক্ত ও সংযত ব্যবহারে যেমন উপকার সাধিত হয় তেমনি আবার ইহার অপব্যবহারে বা অতি ব্যবহারে যথেষ্ট ক্ষতিরও কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্য-সম্পদ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং দেহ-যন্ত্র যাহাতে বিকল হইয়া না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের পানের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আন্দোলক বা অসিলেটর

শ্রীচিত্তরঞ্জন সরখেল

বেতার টেলিগ্রাফি শিখতে হলে যেমন মোর্স্‌এর কোড অর্থাৎ বিন্দু ও ড্যাশের দ্বারা বর্ণবোধক প্রণালী শিখতে হয় তেমনি কোড-এর সাহায্যে সংবাদ পাঠানোও শিখতে হয়। অবশ্য মোর্স কোড, কিউ কোড ইত্যাদি আয়ত্ব করতে হয়। কিন্তু সর্বপ্রধান বিষয় হচ্ছে, আমাদের কর্ণপটহকে ওই শব্দগুলোর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করা ও যত দ্রুত সম্ভব ও গুলোর সাহায্যে বর্ণবোধক প্রণালী তথা সংবাদ গ্রহণ কৌশল শিক্ষা করা এবং নিজের হাতে ওই শব্দগুলোকে নির্ভুল ও দ্রুত পরিচালনা করা। অবশ্য শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে এসব বিষয় শিখানো হয়। কিন্তু ওই অভ্যাসই এর পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীর উচিত ঘরে বসে স্বহস্তে শিক্ষা বা প্র্যাকটিস্ করা।

ঘরে বসে শিখবার জন্যে প্রধানতঃ প্রয়োজন তিনটি জিনিস। একটি আন্দোলক বা অসিলেটর, একজোড়া হেড-ফোন ও একটি মোর্স-কী বা টেলিগ্রাফির চাবি। এর মধ্যে আন্দোলকটিই হচ্ছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।

আন্দোলক সম্বন্ধে জানতে হলে প্রথমেই কেমন করে আন্দোলকের মধ্যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তা জানা প্রয়োজন। নীচে একটি ছবি দেওয়া হলো।

এক নম্বর ছবি

১ নম্বর চিত্রে গ ও ঘ অংশটিকে বলা হয় ট্যাঙ্ক সার্কিট। ইহাকে একটি তিন তড়িৎদ্বার বিশিষ্ট টিউবের গ্রিড ও ক্যাথোড নামক তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। অ্যানোড সার্কিটে থাকে অপর একটি জড়ানো তার বা কয়েল (ক)। এই কয়েল ক ও কয়েল ঘ

পরস্পরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বক শক্তির দ্বারা সংযুক্ত। এখন ধরা যাক যে, চাবিতে চাপ দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের পথ খুলে দেওয়া হলো এবং প্রবাহ চলতে লাগলো। ফলে ট্যাঙ্ক সার্কিটে একটি বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং অসিলেশন বা আন্দোলন আরম্ভ হবে। কারণ, যদি একটি প্লেটে অতিরিক্ত ইলেকট্রন পূর্ণ একটি কণ্ডেন্সার একটি জড়ানো তারের (Inductance) মধ্য দিয়ে তার উভয় প্লেটের বিদ্যুৎকণার সমতা রক্ষা করে তবে এই বর্তনীর মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত হবে তা হবে পরিবর্তনশীল এবং তার পরিবর্তনের মাত্রা
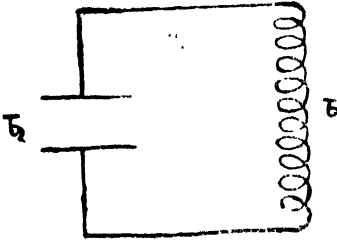
২নং চিত্র

হবে $\frac{১}{২\times৩\cdot১৪\sqrt{চছ}}$ $\left(\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\right)$ অর্থাৎ নির্ভর করবে চ ও ছ এর ক্ষমতার উপর এবং তরঙ্গের বিস্তার ক্রমশই কমতে থাকবে। এই অবস্থায় বর্তনীতে আন্দোলন বা অসিলেশন হচ্ছে বলা হয়। অতএব আমাদের ১নং চিত্রের আন্দোলনও ক্রমে লয় পেতে পারে। কিন্তু যদি ক কয়েল নির্ভুলভাবে জড়ানো হয় এবং যদি খ কয়েলের অনুপাতে ঠিক জায়গা মত স্থাপিত হয় তবে হয়তো বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির সংযোগের ফলে ট্যাঙ্ক সার্কিটে যথেষ্ট শক্তি ফিরেও আসতে পারে এবং ক্ষতিপূরণ হতে পারে। একবার যখন এই অবস্থায় আসে তখন আন্দোলন আর লয় পায় না। যদি ক কয়েলের শক্তি অনবরত খ কয়েলের শক্তির ক্ষতিপূরণ করতে থাকে তাহলে আন্দোলন চলতেই থাকবে। দুটি কয়েলের মধ্যে সংযোগ তীর চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে।

এখন দেখা যাক টিউবের মধ্যে কি ঘটছে। যখন বর্তনী বন্ধ করা হলো তখনি ট্যাঙ্ক সার্কিটে পরিচালিত প্রবাহ কণ্ডেন্সারে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-চাপের সৃষ্টি করলো। গ্রিড ও ক্যাথোডের মধ্যবর্তী এই বিদ্যুৎ-চাপ আবার অ্যানোড সার্কিটে পরিবর্তনশীল প্রবাহের সৃষ্টি করলো। সেহেতু ক ও খ কয়েল পরস্পরের সঙ্গে বৈদ্যুতিক-চুম্বক শক্তির দ্বারা যুক্ত ক থেকে খ এতে কিছু পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎচাপ প্রবেশ করবে এবং যদি তা ট্যাঙ্ক সার্কিটের আন্দোলিত প্রবাহের সঙ্গে একমুখী হয় তবে আন্দোলন চলতেই থাকবে। এভাবে টিউবটি একটি যন্ত্রের ন্যায় কাজ করে, যার দ্বারা ক্রমাগত ট্যাঙ্ক সার্কিটে শক্তি যোগান হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, শক্তির উৎস হবে অধিক চাপ বিশিষ্ট বিদ্যুতাধার। এই থেকে অ্যানোড প্রবাহ প্রবাহিত হয় এবং যখন আন্দোলন চলতে থাকে তখন অত্যধিক মাত্রায় এই বিদ্যুতাধারের শক্তিক্ষয় হতে থাকে।

এই তো গেল আন্দোলক বা অসিলেটর-এর কার্যক্রমের ব্যাখ্যা বা থিওরী। এখন বেতার টেলিগ্রাফি শিক্ষার্থীর কাজের উপযুক্ত একটি আন্দোলকের ছবি ও তার বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হলো।

এই আন্দোলকটি তৈরী করা খুবই সহজ। আর, সি, এ, প্রস্তুত ৩০ নং একটি টিউব। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্যাচের অনুপাত ১:৩ বিশিষ্ট একটি অডিও-ট্রান্সফরমার, ½ ওয়াটের ৫০,০০০ ওম্স্ শক্তিবিশিষ্ট একটি রেজিষ্ট্যান্স, ·০০২ মাইক্রোফ্যারাড শক্তিবিশিষ্ট একটি কণ্ডেন্সার ও কয়েকটি টর্চলাইটের সেলই যথেষ্ট। অবশ্য হেড ও কী থাকতেই হবে।

এখন ট্রান্সফরমারটির বেশী সংখ্যক প্যাচ গ্রিডের দিকে ও কমসংখ্যক প্যাচ অ্যানোডের দিকে
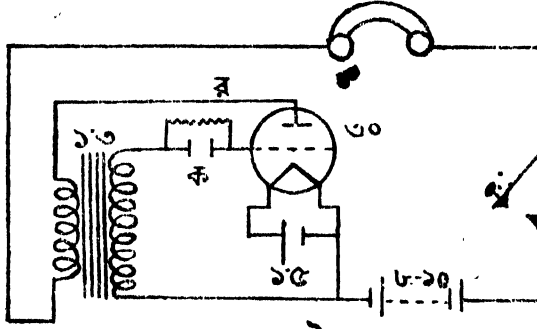
৩নং চিত্র

রেখে ছবি অনুযায়ী আন্দোলকটি তৈরী করলেই হলো। প্রস্তুত করার জন্যে আরও দুটি জিনিস প্রয়োজন। তা হচ্ছে চার পিনবিশিষ্ট একটি সকেট ও একটি সাসি। সাসি কাঠেরও হতে পারে, তবে অ্যালুমিনিয়ামের হলেই ভাল।

বিদ্যুৎ-চাপের জন্যে ১'৫ বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট ৬টি বিদ্যুতাধারকে পরস্পরের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে সংযুক্ত করতে হবে, যাতে একটির ধনাত্মক মেরু অপরটির ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। প্রথম ও শেষ আধারের ধনাত্মক মেরু থেকে একটি করে তার বাইরে আসবে, আর ঋণাত্মক মেরুর তারটি থাকবে সাধারণ। যে আধারটির উভয় মেরু থেকেই তার বেরিয়েছে তাকে টিউবের ফিলামেন্টের পিন্ দুটির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে; বাকী তারটি যাবে চাবির একদিকে। হেডফোন সংযুক্ত হবে চাবির অপর অংশে এবং ট্রান্সফরমারের কম প্যাঁচবিশিষ্ট অংশের দিকে।

যখন চাবিটি খোলা থাকে তখন বিদ্যুতাধারের বর্তনীও খোলা থাকে; তাই আন্দোলোকটিতে আন্দোলন হয় না। কিন্তু যখনই চাবিটি বন্ধ করা হয় তখনই বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে থাকে এবং অ্যানোডে বিদ্যুৎ-চাপ প্রযুক্ত হয়। ফিলামেন্টের বর্তনী ভিন্ন। এ বর্তনীর সঙ্গে চাবির বন্ধ বা খোলার কোন সম্পর্ক নেই। তাই ফিলামেন্টে বিদ্যুৎ-চাপ প্রযুক্ত থাকে এবং তার ফলে ফিলামেণ্ট থেকে অনবরত বিদ্যুৎকণা বা ইলেক্ট্রন বিচ্ছুরিত হতে থাকে। যখনি অ্যানোডে ধনাত্মক বিদ্যুৎ-চাপ প্রযুক্ত হলো তখনি ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণাগুলো তার দিকে আকৃষ্ট হলো; ফলে টিউবের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে লাগলো। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ যখন হেডফোনের ভিতর দিয়ে যায় তখন হেডফোনের পাতকে কাঁপিয়ে দেয়। তাহলে দেখা যায়, চাবি টিপলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলতে থাকে এবং হেডফোনে শব্দ হয়। আবার চাবি ছেড়ে দিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও হেডফোনের শব্দ উভয়ই বন্ধ হয়। অতএব যতবার চাবিতে চাপ দেওয়া যাবে ততবারই শব্দ হবে। চাবিটিকে বেশীক্ষণ চেপে রাখলে শব্দ লম্বা হবে, আর অল্পক্ষণ রাখলে শব্দও ক্ষণস্থায়ী হবে। এই চাপের মাত্রার তারতম্য করেই দুই প্রকার শব্দ উৎপন্ন করা হয়। যাকে বাংলায় বলা হয় "টরে" ও "টক্কা"।

আর একটি বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কণ্ডেন্সার 'ক" ও রেজিষ্ট্যান্স "র" এর কাজ হচ্ছে গ্রিডে "বায়াস্" প্রয়োগ করা। আশানুযায়ী ফল পেতে হলে গ্রিডযুক্ত টিউবের সর্বদাই গ্রিডের বিদ্যুৎ-চাপমাত্রা ঋণাত্মক রাখতে হয় অর্থাৎ শূন্য-চাপের নীচে রাখতে হবে। এই চাপকেই বলা হয় "গ্রিড বায়াস্"। বিশেষভাবে আন্দোলককে

স্বয়ংচালিত করতে হলে এর প্রয়োজন প্রায় অনিবার্য। যেহেতু যখন বর্তনী ভগ্ন অবস্থায় থাকে তখন রেজিষ্ট্যান্স "র"এর মধ্যে কোন প্রবাহ থাকে না; তাই বর্তনী বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিডের চাপের মাত্রা থাকে শূন্য। অতএব এ সময় গ্রিড ও ক্যাথোড সমচাপবিশিষ্ট অবস্থায় থাকে। এর পরেই অ্যানোড-প্রবাহ বইতে থাকে ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। আন্দোলন আরম্ভ হওয়া মাত্রই গ্রিডের চাপও আপনা আপনি নীচের দিকে নামতে থাকে। যেপর্যন্ত না অ্যানোড সার্কিটে আন্দোলন চালাবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তি উৎপন্ন হয় সেপর্যন্ত এই ধারা চলতে থাকে। এই ধরনের বায়াস্‌কে বলা হয় "অটোবায়াস্"। ট্যাঙ্ক সার্কিটের প্রবাহ পরিবর্তনশীল। তাই এই প্রবাহ যখন চলতে থাকে তখন ফিলামেণ্ট থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনগুলোর কিছু অংশ ক্রমে ক্রমে গ্রিডের ভিতর দিয়ে কণ্ডেন্সার "ক"এর গ্রিডের দিকস্থ প্লেটে জমা হতে থাকে এবং ফলে অ্যানোড-প্রবাহও কমতে থাকে। এমনি চলতে চলতে এক সময়ে ঐ প্লেটে এত ইলকট্রন জমা হয় যে, গ্রিড অতিমাত্রায় ঋণাত্মক হয়ে পড়ে এবং বিচ্ছুরিত ঋণাত্মক কণিকা বা ইলেকট্রনগুলোর অ্যানোড অভিমুখী স্রোতকে বাধা দিয়ে তাদের পিছনে ঠেলে দেয়। ফলে টিউবে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ আমাদের প্রয়োজন, গ্রিডকে একটি বিশেষ ঋণাত্মক চাপে রাখা। তাই একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রেজিষ্ট্যান্স, গ্রিড ও ক্যাথোডের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য, যখনই অধিক ইলেকট্রন গ্রিডে জমা হবে তখনই অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলো ঐ রেজিষ্ট্যান্সের ভিতর দিকে তাদের উৎস ক্যাথোডে চলে আসবে। এমনিভাবে গ্রিড একটি বিশেষ ঋণাত্মক চাপমাত্রায় থাকায় টিউবের অ্যানোড প্রবাহ চালু থাকবে এবং আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলবে।

ছানার জলের অপচয়

শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল

জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানাগারে পুষ্টিসংক্রান্ত গবেষণায় পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, ভারতীয় খাদ্য-তালিকায়, বিশেষ করিয়া অন্নগ্রহণ-পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়ামের অভাব বিদ্যমান। খাদ্যে উক্তপরিমাণ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দৈনিক ন্যূনপক্ষে ১০ আউন্স দুগ্ধপান দ্বারা পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ডায়েরি সমূহের উৎপন্নের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের সহিত উল্লিখিত পরিমাণ দুগ্ধগ্রহণের পক্ষে উহা আদৌ যথেষ্ট নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশের দুগ্ধ উৎপাদন ও গ্রহণের হার মাথাপিছু গড়ে প্রায় ৭ আউন্স। এই তুলনায় অন্যান্য দেশের হার মাথাপিছু গড়ে প্রায় ২৫ আঃ হইতে ৪০ আঃ বলিয়া জানা যায়। সুতরাং এতদ্দেশীয় দুগ্ধসংক্রান্ত মাথাপিছু গড় হার উক্ত দেশ-সমূহের উচ্চতম গড় হার হইতেই কেবল মাত্র ন্যূন নহে, পরন্তু এদেশে আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের জন্য মাথাপিছু দৈনিক নিম্নতম ১০ আঃ দুগ্ধগ্রহণের যে পরিমাণ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তাহা অপেক্ষাও কম। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার বৃহত্তম অংশ দরিদ্র সম্প্রদায়; দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উৎপন্নের উচ্চ মূল্যদানে তাহারা সমর্থ নহে। ফলে সমগ্র লোকসংখ্যার

এরূপ একটি বৃহত্তম অংশ সারাজীবন তাহাদের এই অত্যাবশ্যক খাদ্যোপাদান হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইতেছে। তাহার ফলে দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন সস্তা অথচ উন্নত ধরনের উৎস হইতে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম সরবরাহের ব্যবস্থা, ভারতীয় জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের নিদারুণ দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুষ্টিসংক্রান্ত গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং অল্পমূল্যে ক্যালসিয়াম সহজলভ্য করিবার মানসে গবেষণাগারে বহুমুখী প্রচেষ্টা চলিয়াছে।

ডাঃ আয়ক্রয়েড এবং ডাঃ কৃষ্ণন্ মাদ্রাজী-খাদ্যের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত পরিপূরক খাদ্য হিসাবে আবশ্যকমত ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবনসংক্রান্ত গবেষণার ফলে ইহা লক্ষিত হইয়াছে যে—চুন, সুপারি ও খদির সংযোগে তাম্বুলবিহার—(ভারতের সর্বজনবিদিত একটি জনপ্রিয় অভ্যাস)—যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম প্রদান করে। উক্ত প্রণালীতে বেশ কিছু ক্যালসিয়াম গ্রহণ ও ব্যবহার করা সত্ত্বেও একটি বৃহৎ পরিবারের ব্যয় অতি অল্পই হইয়া থাকে। কাঁচ্‌কি, মালা, চেলা, মৌরুলা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য গোটা মুখের মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবার যে রীতি আছে তাহা ক্যালসিয়াম পাইবার আর একটি সুলভ পদ্ধতি। ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যসমূহের কাঁটার মধ্যে দেহের প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ ক্যালসিয়াম নিহিত থাকে এবং আমাদের আহায-দ্রব্যে ব্যবহারযোগ্য ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে। বৃহদাকার মৎস্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্য সুলভ। সুতরাং দৈনিক ২ আঃ, ৩ আঃ পরিমিত ক্ষুদ্র মৎস্য ভক্ষণ করিয়া আমরা অল্প মূল্যে আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করিতে পারি। কিন্তু গবেষণাগারে বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার ফলে সম্প্রতি প্রাপ্তব্য ক্যালসিয়ামের আর একটি সুলভ পন্থা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

ছানা এবং মেওয়া প্রভৃতি হইতে রসগোল্লা, সন্দেশ, লালমোহন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন দ্রব্য ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত অংশেই প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানার জলে দুগ্ধ-শর্করা ক্যালসিয়াম, আমীষজাতীয় অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর উপাদান সমূহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ছানা প্রস্তুত করিবার পর অজ্ঞতাবশতঃ দৈনিক উহার সমগ্র অংশের মর্মন্তুদ অপচয় ঘটিয়া থাকে। বাজার হইতে বিভিন্ন প্রকারের ছানার জল সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে ৬২ হইতে ১৩০ মিঃ (per 100 c.c.) পরিমিত ক্যালসিয়াম বিদ্যমান থাকে। এইরূপে বাংলা দেশের মত প্রদেশে (অবিভক্ত) দৈনিক প্রায় ১২০০ টন বা ৩৪০০০ মণ ছানার জলের অপচয় ঘটিয়া থাকে এবং উক্ত পরিমাণ ছানার জলের সহিত প্রাপ্তব্য ক্যালসিয়ামের পরিমাণ স্থূল হিসাবে দৈনিক প্রায় ৯ টন।

মুষিক এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই পরীক্ষার দ্বারা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দৈনন্দিন অন্নভোজ্যের সহিত পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ছানার জল ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় এবং দেহাভ্যন্তরস্থ উক্ত ক্যালসিয়ামের প্রায় শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ শরীরের প্রয়োজনে লাগে। একজন ভারতীয় পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণের নিমিত্ত দৈনন্দিন ৪৩২ মিঃ ক্যাল-সিয়ামের প্রয়োজন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ভাত, ডাল, শাক-সবজি ও একখণ্ড মৎস্যের সমবায়ে আমাদের যে দীন অন্নভোজ্য প্রস্তুত হয় তাহাতে মাত্র ২০০ হইতে ৩০০ মিঃ ক্যালসিয়ামের সংস্থান হইয়া থাকে। সুতরাং দৈনিক খাদ্যের সহিত ৭ আঃ হইতে ৮ আঃ পরিমিত ছানার জল গ্রহণ করিলে ক্যালসিয়ামের উক্ত ঘাটতি পূরণ হইতে পারে। এইরূপে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে ছানার জল গ্রহণ করিলে বাংলা দেশের অপচয়িত ১২০০ টন ছানার জল হইতে এই প্রদেশের ৫৫

লক্ষ লোকের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে বেশ স্পষ্টই দেখা যায় যে, ছানা প্রস্তুত কালে পরিত্যক্ত অব্যবহার্য অংশ দ্বারাও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নর-নারীর জীবন রক্ষা হইতে পারে। বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের যুগে এদিকে জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অনাবশ্যক পদার্থরূপে যে ছানার জল নষ্ট হইয়া থাকে বর্তমান অন্নসঙ্কটের যুগে অন্নভোজীদের পুষ্টিসাধন ও ক্যালসিয়াম সরবরাহ কল্পে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে তাহার সর্বোত্তম ব্যবহার প্রয়োজন। ছানার জলের সহিত ডাল, মাছ শাক-সবজি এবং অন্যান্য খাদ্যোপকরণ উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাই প্রশস্ত। কারণ মিষ্টান্ন বিক্রেতার বিপণীতে সঞ্চিত অবস্থায় থাকা কালে ছানার জলে যে সমস্ত স্বাস্থ্যহানিকর সূক্ষ্ম জীবাণু জন্মিয়া থাকে, সিদ্ধ করিবার প্রণালীতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। শুধু বিবৃতি, অধিক শস্য ফলাও, আহার সংক্ষিপ্ত কর ইত্যাদি উপদেশে কিছু হইবে না—জাহাজের তলায় যেখানে ছিদ্র আছে সেখানে হাত লাগাইতে হইবে, বিভিন্ন দিক হইতে খাদ্যের অপচয় এবং অখাদ্যের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে, উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে দেশের চাহিদার অনুপাতে—তবেই সত্যি-কারের কিছু কাজ হইবে।

তড়িতাক্ষি

শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

বিজ্ঞানের জয় যাত্রার মধ্যে এক একটি আবিষ্কার এমন শুভক্ষণে ঘটে যায় যে, তাথেকে মানুষের জীবনযাত্রার অসংখ্য পাথেয় সংগৃহীত হয়ে থাকে। এক এক সময় এমনও হয় যে, আবিষ্কারটির ফলে মানুষের চিরাচরিত জীবন প্রণালীই বদলে যায়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—তড়িৎবাহী তারের উপর চুম্বকের প্রভাব সম্বন্ধে ফ্যারাডের আবিষ্কার, যা থেকে ডায়নামো ও বৈদ্যুতিক মোটরের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল। এই যন্ত্রগুলোর প্রচলন না হলে বর্তমান মানব সভ্যতা যে রূপ গ্রহণ করেছে, তা কি সম্ভব হতো? আবার যখন এই শতাব্দীর গোড়ায় বোঝা গেল যে, তড়িতাণু-গুলো ধাতুনির্মিত তারকে আশ্রয় না করেও প্রবাহিত হতে পারে এবং এই রকম প্রবাহ সৃষ্টি করার জন্যে যখন রেডিও 'ভাল্‌ভের' উদ্ভাবন হলো তার ফলে কত রকম প্রয়োজনীয় বস্তুই না সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাল্‌ভ যদি না থাকত তবে আমাদের নিয়ত ব্যবহৃত এত জিনিস অচল হয়ে পড়ত যে, আমাদের মনে হতো আমরা এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজেই বাস করছি।

সম্প্রতি আর এক প্রকারের ভাল্‌ভ উদ্ভাবিত হয়েছে, যার এত বিচিত্র ব্যবহারের চলন হচ্ছে যে, মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে এই ভাল্‌ভও রেডিও ভাল্‌ভের মতই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফটোইলেক্‌ট্রিক সেল, আর চলতি ভাষায় বলে তড়িতাক্ষি। রেডিও ভাল্‌ভে একটি বিশেষ তার তপ্ত হয়ে উঠলে তড়িতা-ণুর প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং এই তড়িৎ প্রবাহকে সাধারণ ধাতুবাহিত তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

করে নানা কাজে লাগান হয়। কিন্তু তড়িতাক্ষিতে তড়িতাণু প্রবাহের সৃষ্টি হয়, বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর আলোকরশ্মিপাতে। এইরূপে তড়িতাণু প্রবাহের জন্ম হলে তাকে সাধারণ তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে নানা কাজে লাগান যায়।

আলো ও বিদ্যুতের পরস্পর সম্বন্ধ ধরা পড়ে প্রথমে সেলেনিয়াম-এর গুণাগুণ পরীক্ষার সময়। সেলেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ, আর রাসায়নিক গুণে গন্ধকের সহধর্মী। এই মৌল বস্তুটির তড়িৎপ্রতিরোধ ক্ষমতা আলোকরশ্মি পাতে বাড়ে কমে। অর্থাৎ আলোতে যতখানি তড়িৎ প্রবাহ একটি সেলেনিয়ামের তারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে অন্ধকারে তার চেয়ে কম যায়। শুধু তাই নয়, আলোকের ঔজ্জ্বল্যের যত সূক্ষ্ম তারতম্যই হোক না কেন, সেলেনিয়াম বাহিত তড়িৎ প্রবাহও সঙ্গে সঙ্গে কমবেশী হয়। এই জন্যে প্রথম প্রথম 'ফটোইলেকট্রিক সেল' সেলেনিয়াম দিয়েই তৈরী হতো। লণ্ডনের এক সহরতলীতে সেখানকার পৌরপ্রতিষ্ঠান রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ-এর সঙ্গে এই রকম একটি সেল জুড়ে দিয়েছিলেন। দিনের আলো সূর্যাস্তের জন্যেই হোক বা ঘন কুয়াসার জন্যেই হোক একটি বিশেষ সীমার নীচে কমে গেলেই আলোগুলো আপনি জ্বলে উঠত আবার কুয়াসা কেটে গেলে কিংবা উষার উদয়ে একটু ফর্সা হলে আলোগুলো আপনিই নিবে যেত। আলো জ্বালা বা নিবানোর জন্যে লোকের দরকার হতো না। সেলেনিয়াম সেলের চলন খুব বেশী হয়নি এইজন্য যে, পরে দেখা গেল—সেলেনিয়ামের তড়িৎপ্রতিরোধ ক্ষমতা আলোকরশ্মি ছাড়া উত্তাপ ইত্যাদি দ্বারাও প্রভাবিত হয়। কাজেই সব সময় এর উপর নির্ভর করা যায় না।

সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করা গেল—পটাসিয়াম, সিজিয়াম ও ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর উপর আলো পড়লে তড়িতাণু বিকিরিত হতে থাকে এবং তড়িৎপৃষ্ট বস্তুর দ্বারা এই তড়িতাণুগুলোকে প্রবাহের আকারে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। বর্তমানে তড়িতাক্ষিগুলো সিজিয়াম ধাতু দ্বারা তৈরী হয়। একটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য কাচগোলকের ভিতর রূপার উপর সিজিয়ামের পাতলা কলাই লাগান হয়। কাচ গোলকের মধ্যে একটি নিকেলের তার থাকে। রূপার পাতটি সাধারণ তড়িৎ প্রবাহের নেগেটিভ পোল ও নিকেলের তারটি পজিটিভ পোলের সঙ্গে যোগ করা হয়। সিজিয়ামের কলাইর উপর আলোক রশ্মি পড়লেই তড়িতাণু বিকিরিত হতে থাকে। তড়িতাণুগুলো নেগেটিভ বিদ্যুৎ সংপৃষ্ট বলেই পজিটিভ বিদ্যুৎ সংস্পৃষ্ট নিকেলের তারের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এইভাবে রূপার পাত হতে নিকেলের তারের মধ্যে তড়িতাণু প্রবাহ চলতে থাকে, কাজেই তড়িতাক্ষি সংশ্লিষ্ট তড়িৎ চক্রের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকে এবং এই তড়িৎ-প্রবাহকে নানা যন্ত্র সাহায্যে অনেক প্রকার ব্যবহারে লাগান যায়। বলা বাহুল্য আলোক রশ্মির ঔজ্জ্বল্যের উপর বিকীর্ণ তড়িতাণুর সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আবার তড়িতাণুর সংখ্যার উপর তড়িৎ প্রবাহের প্রবলতা নির্ভর করে। কাজেই পতিত আলোকরশ্মির ঔজ্জ্বল্যের সূক্ষ্মতম তারতম্যের উপর প্রবাহিত তড়িতের তারতম্য নির্ভর করে।

এখন দেখা যাক, তড়িতাক্ষির এই সুবিধাজনক গুণটিকে কত রকমে কাজে লাগান হয়। রাস্তার মোড়ে এক দিককার ফুটপাত থেকে এক আলোক-রশ্মি অন্য দিকের ফুটপাতে তড়িতাক্ষির উপর ফেলা আছে এমনভাবে যে, রাস্তা দিয়ে গাড়ী গেলে আলোকরশ্মি ঢাকা পড়ে না; কিন্তু কোন লোক রাস্তা পার হতে গেলেই আলো ঢাকা পড়ে। যতক্ষণ আলোকরশ্মি অব্যাহত আছে ততক্ষণ তড়িতাক্ষির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইছে।

কিন্তু যেই আলো ঢাকা পড়ল, বিদ্যুৎ প্রবাহও কেটে গেল। যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণ রাস্তার মোড়ের নির্দেশক আলো সবুজ থাকে, আর বিদ্যুৎ প্রবাহ কেটে গেলেই আলো লাল হয়ে যায়। ফলে যতক্ষণ রাস্তা খালি থাকে ততক্ষণ গাড়ীর চালক সবুজ আলো দেখতে পায়, কিন্তু যেই কোন লোক রাস্তা পার হতে যায়, আলো লাল হয়ে যায় এবং গাড়ীও থেমে যায়। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে এই যন্ত্র মাত্র এক মিনিট বা দু'মিনিট অন্তর চালু হয়। কেননা এরূপ না করলে বড় রাস্তায় অনবরত লোক পারাপার করলে গাড়ী চলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এইভাবে দুই রাস্তার সংযোগস্থলে গাড়ী চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

তড়িতাক্ষি দ্বারা চোরের উপর চৌকিদারী করা খুব সহজ। লোহার সিন্দুকের চারদিকে এমন ভাবে আলোকপাত করা যায় যে, কেহ তার দিকে অগ্রসর হলেই আলোক রশ্মি কেটে যায়, আর তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে একটা ঘণ্টা বাজতে থাকে। বলা বাহুল্য, চোরেরা সাধারণতঃ রাত্রে কাজে বাহির হয়, আর সে সময় যে কোন আলোক রশ্মি সহজেই দেখা যায়। চোর আলোক রশ্মি দেখতে পেলে এমনভাবে অগ্রসর হবে যে, আলোক রশ্মি কেটে না যায়। এর প্রতিকারের জন্যে এই প্রকার যন্ত্রে দৃশ্যমান আলোক রশ্মি না ব্যবহার করে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়। অবলোহিত রশ্মি শুধু যে অদৃশ্য তাই নয়, তড়িতাক্ষির উপর ইহার প্রভাবও দৃশ্যমান আলো অপেক্ষা বেশী। যেখানেই তড়িতাক্ষি দ্বারা খুব সূক্ষ্ম কাজ করাতে হয় সেখানেই অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়। কিছুদিন আগে লণ্ডন সহরে এক প্রদর্শনীতে বহুমূল্য রত্নরাজি আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু কেহ যদি উহার দিকে হাত বাড়াত তা হলেই চতুর্দিকে এমন প্রবল ঘণ্টাধ্বনি হতো যে, লোকজন ছুটে আসত।

উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হলো তা থেকে অনুমান করা যাবে যে, আরও কত কাজে তড়িতাক্ষিকে লাগান যায়। ধরা যাক কোন দরজা বন্ধ রাখা দরকার, অথচ সেখানে কেহ হাতে বোঝা নিয়ে এলে খুলে দেওয়াও দরকার। দরজা খুলতে দেরী হলে, যে বোঝা নিয়ে আসছে তার কষ্ট তো বটেই, আবার একজন লোকেরও সেখানে যাওয়া দরকার। সেখানে যদি একটি তড়িতাক্ষি রাখা যায়, ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কেউ আলোক রশ্মির সামনে এলে, দরজা আপনি খুলে যাবে আর সে রশ্মি পার হয়ে দরজার মধ্যে ঢুকলেই আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে লিফ্‌টের দরজা আপনা আপনি খোলা বা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যায়। অনেক জায়গায় এমন নীচু দরজা বা সুরঙ্গ থাকে যে, কোন লোক মাথা নীচু না করে গেলেই সজোড়ে মাথা ঠুকবে। তড়িতাক্ষি এসব ক্ষেত্রে মানুষকে সতর্ক করে দেবার ভার নিতে পারে। তড়িতাক্ষির মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ কেটে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজতে পারে, এমন কি গ্রামোফন রেকর্ডে "সাবধান সাবধান" চীৎকার উঠতে পারে। আবার তড়িতাক্ষিযুক্ত এমন জলের কল আছে যার কাছে গেলেই জল পড়তে থাকে, আর লোক সরে গেলেই জল পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

খনির মধ্যে যদি ধূলা বেশী জমে তা-হলে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা। খনির রাস্তার একপাশ থেকে আলো আর এক পাশের তড়িতাক্ষির উপর খোলা থাকলে ধূলার পরিমাণ একটি বিশেষ সীমা ছাড়ালেই আলো এত কমে যাবে যে, তড়িতাক্ষির বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এইভাবে কর্তৃপক্ষ সাবধান হতে পারেন। বড় জাহাজের মধ্যে এক এক জায়গায় আগুন লাগলে জাহাজের কর্মচারীদের সহজে নজরে আসে না,

যখন আসে তখন হয়ত আর প্রতিকারের উপায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত জায়গায়, যেখানে হামেশা লোক যাতায়াত করে না—তড়িতাক্ষি চৌকিদারী করতে পারে। ধোঁয়ায় আলোক রশ্মি ম্লান হয়ে গেলেই কাপ্টেনের ঘরে ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁকে সাবধান করে দেয়।

তড়িতাক্ষির ব্যবহার সম্প্রতি এমনভাবে বেড়ে যাচ্ছে যে, সবগুলোর বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবু নীচে আরও কতকগুলোর নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলোতে নিম্নলিখিত কাজগুলো তড়িতাক্ষির সাহায্যে সম্পন্ন হচ্ছে:—(১) ফটো তোলার মত যথেষ্ট আলো আছে কি না পরীক্ষা করা (২) কাগজ বা কাপড়ের রং মেলানো (৩) ডিম পরীক্ষা করা (৪) উত্তাপ পরীক্ষা করা (৫) থিয়েটার, বায়োস্কোপে কত জন দর্শক উপস্থিত হলো, তার হিসাব রাখা (৬) মোটর গাড়ীর গতি সীমা লঙ্ঘিত হলে পাহাড়াওলাকে জানিয়ে দেওয়া (৭) ক্ষুরের ধার পরীক্ষা করা ইত্যাদি। এছাড়া টকি-বায়োস্কোপ ও টেলিভিসন তড়িতাক্ষির জন্যেই সম্ভব হয়েছে।

অর্থনৈতিক মুক্তিকল্পে ভারতে শিল্পোন্নয়ন

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা

মতের তিনধারা—

ভারতে শিল্পোন্নতির পরিকল্পনায় বিশেষভাবে তিনটি মতের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম দলের মত হলো এই যে, আমাদের দেশে কতকগুলো কলকারখানা, মিল ও ফ্যাক্টরী গড়ে উঠা উচিত। সেগুলো চালাবার জন্যে অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও যন্ত্রাদি এনে কাজে লাগান হবে। বিদেশী মূলধনকে আমন্ত্রণ করা হবে, আমাদের দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে এদেশের সস্তা শ্রম ও কাঁচামালকে কাজে লাগাবার জন্যে। আর ঐসব কারখানা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্যে বিদেশ থেকে আমদানী করা হবে অভিজ্ঞের দল। এমনিভাবে যে কলকারখানা গড়ে উঠবে সেগুলোর নাম দেওয়া হবে "জাতীয় শিল্প"; আর ঐ ধরনের শিল্পোন্নতিকেই বলা হবে—"জাতীয় শিল্পের অগ্রগতি।"

দ্বিতীয়দলের মত এই যে, বস্তুতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে গড়েওঠা যন্ত্রশিল্প ভারতবর্ষ ও তার জনগণের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। কারণ, ভারতের লোকেরা একটু বেশী আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শ্রমিকদের অর্থসঞ্চয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ। কলকারখানা শ্রমিকদের শ্রমকে করছে অপহরণ। তাই ঐসব কলযন্ত্রের অবসান না হলে তাদের বেঁচে থাকার আশা নেই। বৈদ্যুতিক পাখার পরিবর্তে যদি প্রবর্তন হয় টানা পাখার তাহলে এক একটি পাখার পেছনে তিনটি শ্রমিকের অন্নের সংস্থান হতে পারে। যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের রোজগার হয়েছে বন্ধ। সুতরাং যন্ত্রযুগের অবসান ঘটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ চিন্তাধারা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এই মতবাদ জনগণের মনকে করে তোলে বিষাক্ত, দেশকে এগিয়ে দেয় অনিবার্য ধ্বংসের পথে ও সমস্ত জাতিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে আদিমযুগের সভ্যতায়। এমনি করে উন্নত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতিগুলোর

কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে নিজের জাতিকে।

তৃতীয় মতাবলম্বীরা বলেন, আমাদের এই দেশ, সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা; তদুপরি জাতীয়তায় প্রভাবান্বিত। সুতরাং এই দেশের উর্বর মাটিতে নিজেদের পরস্পরের সাহায্য নিয়ে ও নিজেদেরই যন্ত্রপাতি ও শক্তি—বুদ্ধি দিয়ে দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করে জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা কর্তব্য। জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত নিখিল ভারত জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিই ছিল এই মতবাদের বিশেষ বাহক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ, সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কে, টি, শাহ, স্যার জে, সি, ঘোষ, অধ্যাপক ভি, এস, দুবে ও অধ্যাপক এ, কে, সাহা প্রভৃতি সদস্যদের উপস্থিতিতেই উক্ত সমিতিটি ভেঙ্গে যায়।

যাহোক, ভারতের সম্মুখে আজ মাত্র দু'টি পথ উন্মুক্ত আছে। হয় ভারতবর্ষকে পরাধীন যুগের ঔপনিবেশিক শাসনের নীতিই চালিয়ে ইংরেজ-আমেরিকার তাবেদারী করতে হবে, নতুবা স্বাধীনভাবে শিল্পোন্নত করে গড়ে তুলে দেশকে মুক্ত করতে হবে তার অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে। দু'বছর পূর্বে ভারত ত্যাগের সঙ্গে ইংরেজরা দেশকে ডুবিয়ে রেখে গেছে গভীর নৈরাশ্যের মাঝখানে। ইংরেজদের দেশত্যাগের পরেই দেখা গেল, ভারতবাসী যে কেবল শিল্পেই পরমুখাপেক্ষী তা নয়, কৃষিকার্যের ব্যাপারেও তারা পরনির্ভরশীল হয়ে আছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও যন্ত্রের প্রসারলাভ না হওয়ায় বর্তমানে আমাদের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে দারুণভাবে। এমনি-সব পরনির্ভরশীলতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ও নির্দিষ্ট শিল্পনীতিতে এগিয়ে চলা ভারতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

পেছনের দু'শ বছর—

গত দু'শ বছরের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা চোখ বুলিয়ে যাই তবে আমরা কি দেখতে পাই? বিশেষ করে আমরা দেখতে পাই—সারা বিশ্বজুড়ে এক বিরাট বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লব। এই বিপ্লব বিশেষকরে ঘটেছিল আমেরিকায়, ইংল্যাণ্ডে, ইউরোপে, জাপানে ও পরবর্তী সময়ে রুশিয়ায়। বাষ্পীয় যন্ত্র, বাষ্পীয় টারবাইন, ডিজেল তৈলযন্ত্র, তড়িৎ, বেতার, বিমান ইত্যাদির আবিষ্কার সমস্ত বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝেই আনল এক ব্যাপক বিপ্লব। কিন্তু এই সময়ে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষে কি হয়েছিল? ভারতবর্ষ এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি। নিশ্চেষ্ট হয়েই তাকে থাকতে হয়েছিল। দু'শ বৎসর পর্যন্ত পরাধীন ভারত তার ঔপনিবেশিক প্রভুদের শুধু সস্তা দরে শ্রম ও কাঁচামাল সরবরাহ করেই আসছিল।

আজকের ভারত—

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসক গ্রেটবৃটেন, উচ্চাভিলাসী জাতিকে কিছুটা সন্তুষ্ট রাখার জন্যে বিদেশ থেকে আমদানী করা কিছু কিছু কাপড় ও চিনির কল ও এই ধরণের অন্যান্য কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন দেখতে পেল যে, ভারতে শিল্পোন্নতির জন্যে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃটেনের নিজ স্বার্থেই দেওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে বৃটেন থেকে ভারতে কয়েকটি কমিশনও প্রেরণ করা হলো। কিন্তু এই সমস্ত সুযোগ পেয়ে যদি ভারতবাসীদের মধ্যে আবার সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠে এই আশঙ্কায় খুব বেশী অগ্রসর হতে বৃটেন সাহস করল না এবং নানাভাবে এই শিল্পোন্নতির কাজকে চাপা দিয়ে রাখল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশের কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি এরোপ্লেনের ইঞ্জিন, মোটর ইত্যাদি ভারতে প্রস্তুত করার জন্যে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর নিকট অনুমতি চাইলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিতে বললেন যে, ভারতে প্রস্তুত ঐসব যন্ত্রসম্ভার

বৃটিশভারতের সরকারকে ক্রয় করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বড়লাট বাহাদুর এই আবেদন মঞ্জুর করলেন না, বরং বললেন যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অপেক্ষা তার নিজেদের রাষ্ট্র থেকে ঐ সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে বেশী ইচ্ছুক। তাই আমরা দেখতে পাই শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পূর্বেও যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি রয়েছে।

বর্তমান যুগধারা—

আজকের দিনে বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে, সারা দুনিয়াই ঝুঁকে পড়েছে শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে। বর্তমানের শিল্পোন্নতির যুগে ভারতবর্ষকে পেছনে পড়ে থাকলেও চলবেনা; কিংবা যেমন আছে তেমনটি থাকলেও হবে না। এযুগে যদি তাকে নিজের স্বাধীনতা, এমনকি অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়, তবে অতি দ্রুত অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামত দেশের জনসাধারণের আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ভারতবাসী আজ সে ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ভারতবর্ষের আর্থিক মুক্তির প্রশ্নের সমাধান হয়নি আজও। এই প্রশ্নের সমাধান একমাত্র সঠিক শিল্পোন্নয়নের উপরই নির্ভর করছে; অর্থাৎ দেশের জনসাধারণকে শিল্পসভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কি করে এই সভ্যতাকে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মাঝে সঞ্চারিত করা যাবে? ভারতবাসীর বাস্তবজীবনে শিল্প ও শিল্পনৈপুণ্য সঞ্চারিত করবার সময় একই সঙ্গে নূতন শিল্পসভ্যতার উপযোগী করে তোলার জন্যে জাতির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের পরিবর্ত্তনেও সচেষ্ট হতে হবে বিশেষভাবে।

বাস্তব ও অবাস্তব—

অনেক সময় আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়, হয়ত কোন বিমানঘাটির পাশাপাশিই জনচারেক পাল্কীবাহক একজন স্ত্রীলোককে ঘেরাও করা এক পাল্কী করে বয়ে নিয়ে চলছে। পল্লীগ্রামের কথা ছেড়ে দিয়ে শহরেও এমন দৃশ্য বিরল নয় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তিনজন লোক তাদের আহার্য গ্রহণ করছে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে। কাজেই বাস্তব, অবাস্তব সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করে নিতে হবে। জগতে বাস্তব দৃশ্যই বা কি? আর ভ্রান্তধারণা জিনিসটাই কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, খাঁচার চাকার উপরে বসে কাঠবেড়ালগুলো মনে করে, মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা সীমাবদ্ধ থাকে নির্দিষ্ট খাচার মধ্যে। আবার গ্রামের চতুর কলু তার বলদের চোখ ঢেকে দিয়ে ঘানির কাজ আদায় করে নিচ্ছে। তার এই উদ্ভাবন সহজ এবং একে আরোপ করাও চলে অনায়াসে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষকে সম্ভব হলেও একজন শিক্ষিত লোকের চোখ ঢেকে দেওয়া এত সহজ নয়। অবশ্য তার চেয়েও অনেক বেশী শক্ত, সমস্ত জাতির চোখ বেঁধে দিয়ে তাকে অন্ধ করে ফেলা। তবে বৃটিশ রাজত্বে ভারতে এই চোখ ঢেকে দেওয়ার কাজ প্রভুহস্তের কারসাজিতে বেশ সুন্দরভাবেই করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আর বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই; কারণ আজও আমাদের নেতাদের কথা স্মরণ আছে। তাঁরা আমাদিগকে স্কুল, কলেজ ও অফিস ছাড়তে বলেছিলেন এবং ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রীতদাস তৈরীর কেন্দ্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কেমন করে আমাদের শিল্পোন্নয়নকে ব্যাহত ও অবাস্তব করে তোলা হয়েছিল তাও আজ সহজেই বুঝা যাচ্ছে। বৃক্ষের পত্রাচ্ছাদিত শাখা পল্লবাদি দেখেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকলে চলবেনা, মূলের তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত কাঁচামাল ও জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রাচুর্যে বিশ্বের তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ হিসেবে রুশিয়া প্রথম ও আমেরিকা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে।

শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি—

প্রয়োজনানুরূপ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও

লোকবল পেলে কি কি জিনিসের উপর ভিত্তি করে শিল্পগঠনের কাজ চলতে পারে? শিল্পের অবয়ব সৃষ্টির নিমিত্ত নীচের প্রধান চারটে শিল্পের উন্নয়নই অত্যাবশ্যক :—

১। খনিজ শিল্প ২। যন্ত্রনির্মাণ শিল্প ৩। ধাতুনিষ্কাশন শিল্প ৪। রাসায়নিক শিল্প।

বর্তমানে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্‌নিক্যাল স্কুলসমূহে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে ধাতুবিদ্যা অথবা যন্ত্রপাতি তৈরীর শিল্পকৌশল এবং তাদের বাস্তবমূল্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাও শুধু মাত্র বিদেশ থেকে আমদানী করা কলযন্ত্র নিয়ে কাজ করার এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই; যন্ত্রপাতি তৈরী করার উদ্দেশ্যে নয়। যদি উপরোক্ত চারটে শিল্পগঠনের কাজ গ্রহণ করা হয়, তবে তিনটি পাঁচবছরের মাঝেই আমাদের দেশ একটি শক্তিশালী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। এর জন্যে চাই শুধু প্রচুর সাহসের সঙ্গে গৃহীত এই ধরনের নির্দিষ্ট ও সঠিক শিল্পনীতি।

অতীতে জাতীয় প্রচেষ্টা—

অতীতে জাতীয় কার্যকলাপের উপর নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক অত্যাচার অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং জাতীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখা সত্ত্বেও আমাদের নেতৃবৃন্দ শিল্প ও শিল্পনৈপুণ্যের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উদ্ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের জ্ঞানের মূর্তপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ দেশের যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, নিশ্চেষ্ট হয়ে ঘরে বসে গীতাপাঠ না করে মাঠে গিয়ে ফুটবল অভ্যাস করতে। ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট থেকে শিল্পবিদ্যা শিখে নেবার জন্যেও তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমাদের বিপ্লবীরা কতকগুলো শিল্পশিক্ষার বিদ্যালয়, কিছু কিছু ফ্যাক্টরী ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও ধ্বংস করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, আমাদের এই পরাধীন দেশেও বহুদিন পূর্বেই শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী পণ্য ত্যাগ করা হয়েছিল, কিন্তু সুতা, চিনি, তৈল ইত্যাদির কারখানার যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে ক্রয় করার অবাধ সুযোগ দেওয়ার জন্যে এবং বিদেশী অভিজ্ঞদ্বারা যন্ত্রচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে প্রকৃত শিল্পোন্নতির পথ অন্ধকারেই পড়ে রইল। বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করা এবং বিদেশী যন্ত্রপাতি যার সাহায্যে ঐসব দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ খুব অল্পই। বাস্তবিক পক্ষে, কিছু সময়ের জন্যে অর্থাৎ যে পর্যন্ত আমরা যন্ত্রপাতি তৈরী করে ঐ দ্রব্য-সামগ্রী নিজে প্রস্তুত করতে না পারি ততদিন পর্যন্ত, শুধু বিদেশীয় যন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বরং সাময়িকভাবে বিভিন্ন বিদেশী পণ্য ক্রয় করে কাজ চালান অনেক ভাল। এই উপায়ে দেশকে আর্থিক বন্ধন ও নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পরে ১৯৩৮ সালে আমাদের জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করলেন শিল্পবিপ্লবের সমস্যাকে এবং গঠিত হলো সর্ব ভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি। এই পরিকল্পনা সমিতি দেখতে পেলেন যে, ধাতু ও অন্যান্য খনিজ এবং রাসায়নিক সম্পদের প্রাচুর্যে ভারতবর্ষ এমন অবস্থায় আছে যে, তার নিজের সম্পদেই তার শিল্পোন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। এই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সমিতি বরাদ্দ করেছিলেন যথাক্রমে ৩১৯ ও ৩০০ লক্ষ টাকার; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত পরিকল্পনা

শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হলো, উপরন্তু সমিতিটিও ভেঙ্গে দেওয়া হলো। এমনিভাবে দ্বিতীয় বার ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির সম্ভাবনাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১২ই জুন, ওতকামণ্ডে ই,.সি, এ, এফ্, ণু, এর সর্বশেষ সভা বসেছিল ও সঙ্গে সঙ্গে দু'শ বছরের জন্যে ভারতের আর্থিক মুক্তিলাভের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। অবশ্য যদি এর আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় এবং নূতন করে অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতি গ্রহণ করা হয় তবেই ত্বরান্বিত হতে পারে ভারতের আর্থিক মুক্তির সম্ভাবনা।

উদ্ভিদ ও জীবদেহে সূর্যরশ্মির রাসায়নিক ক্রিয়া

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

দীর্ঘবিস্মৃত যুগ থেকে সূর্যের আলোর উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করে আসছি। আমরা জানি, আলোকহীন বদ্ধঘর রোগের আবাসস্থল। আমরা সূর্যের যে বর্ণহীন বা সাদা আলো দেখি তার সৃষ্টি হয়েছে সাতটি রঙীণ রশ্মির সংমিশ্রণে। অন্ধকার ঘরের জানালার ছিদ্রপথে যদি সূর্যকিরণ ঘরের দেয়ালে এসে পড়ে তাহলে একটা সাদা আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই আলোর গতিপথে একটি ত্রিশির কাঁচ রাখলে তাকে ভেদ করে যে আলো আসবে তা' সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোয় বিভক্ত হয়ে পাশাপাশি সজ্জিত থাকবে। একে বলা হয়—সৌর বর্ণালী বা সপ্তরঞ্জন। লাল, কমলা ও পীত রশ্মির গতিপথ কম বক্র; কিন্তু নীল, অতিনীল ও বেগুনী রশ্মির গতিপথ বেশী বক্র। লাল ও বেগুনী আলোর পার্শ্বদেশে আরও দুটি অদৃশ্য আলোক রেখা আছে। এরা যথাক্রমে অতিলাল ও অতি বেগুনী। সূর্য রশ্মির পরিদৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য '০০০৩ মিলিমিটার থেকে '০০৭ মিলিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য অতি বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১৩৬ অ্যাংষ্ট্রম থেকে ৪০০০ অ্যাংষ্ট্রম* পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বেগুনী আলোর সঙ্গে মিশে গেছে। অতিলাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আবার '০০৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বিভিন্ন আলোর ভিতর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে সুপ্ত শক্তি বিদ্যমান। গাছের পাতার কোষগুলোর ভিতর পত্রহরিৎ নামে এক প্রকার সবুজ পদার্থ থাকে; তা সূর্যরশ্মির লাল আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে' কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলের পরস্পর ক্রিয়ায় শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তৈরী করে। গাছের কতকগুলো পাতাকে যদি কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখা যায় তবে কয়েক দিন পরে দেখা যাবে যে, সেই পাতাগুলো সাদা ও অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। কারণ, সবুজ পত্রহরিৎ সাদা ল্যুকোপ্লাষ্টিডে পরিণত হয়েছে—যার এই খাদ্য তৈরী করবার ক্ষমতা নেই। স্বেদন-কার্যের ওপর নাকি নীল ও বেগুনী রশ্মির প্রভাব বেশী। চর্বি জাতীয় পদার্থ অতিবেগুনীরশ্মি শোষণ করতে পারে। তাছাড়া জীবকোষের নিউ-ক্লিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিডও কিছু পরিমাণে এই রশ্মি শোষণ করে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি শোষণের ফলে জীবদেহে ত্বকের কোষগুলোর বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে—যার ফলে প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ এবং প্রাণশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

* ১ অ্যাংষ্ট্রম = ১ মিলিমিটারের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ।

সূর্যের আলোর জীবাণুনাশক ক্ষমতা অসীম। অনেক খাবার জিনিসকে রৌদ্রে দেওয়া হয়, জীবাণু অথবা ছত্রাক ইত্যাদি উদ্ভিজ্জাণু নষ্ট করবার জন্যে। সুতিকাগারের শিশুকেও দিনে অল্পক্ষণের জন্যে রৌদ্রে শুইয়ে রাখা হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে রীতিমত সূর্যস্নানেরও ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এখন নিশ্চিতরূপে জানা গেছে যে, সূর্যালোক-নিহিত অতিবেগুনী আলোর কার্যকারিতা অসীম এবং এর ক্ষেত্রও সুদূরপ্রসারী। বায়ুমণ্ডলের নিবিড় ধূম্রজাল ও ধূলির আস্তরণ ভেদ করে যে আলো পৃথিবীতে নেমে আসে তাতে অতিবেগুনী আলোর অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেলুলোজ অ্যাসিটেট নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ গ্যালভেনাইজ্‌ড্‌ তারে প্রস্তুত সূক্ষ্ম জালের সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ করে ভিটা-কাঁচ তৈরী হয়। এই কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যালোক প্রেরণ করলে অতিবেগুনী আলোর শতকরা আশী ভাগই পাওয়া যায়।

পারদ-বাষ্পের বাতি
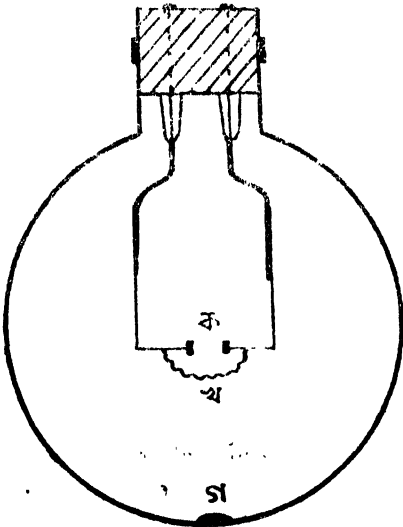
বিলাতের কিউ উদ্যানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই কাঁচের আবরণের নীচে বীজের অঙ্কুরোদ্গম অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই উদ্ভিদগুলো গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং পুষ্ট ও বলিষ্ঠ দেখায়। বিলাতী বেগুন খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়, ইক্ষুও বেশী রসাল ও দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, স্যালাড প্রভৃতি শাক-সবজী অতি অল্প সময়েই পুষ্টি লাভ করে। পারদ-বাষ্প সম্ভূত আলোক বা মার্কারী ভেপার ল্যাম্প থেকে কৃত্রিম উপায়ে অতিবেগুনী আলোক পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে এই রশ্মি উৎপাদনের একটি সহজ উপায় দেওয়া গেল। বাঁ-দিকের চিত্রের মত কোয়ার্টজ্‌ বা স্ফটিক-কাঁচের তৈরী একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব সাধারণ হোল্ডারের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই চলবে। ক হচ্ছে টাংষ্টেন ধাতুর তৈরী দুটা ইলেকট্রোড, যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুত স্রোত গমনাগমন করবে। খ, টাংষ্টেন ধাতুরই তৈরী পাতলা তার বা ফিলামেণ্ট। গ চিহ্নিত স্থানে বাল্‌বের ভিতর কয়েকবিন্দু পারদ রয়েছে। তাদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুতস্রোত সঞ্চালন করবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাপ উৎপন্ন হবে সেই তাপ পারদকে বাষ্পে পরিণত করবে এবং ক স্থানে একটি আর্ক লাইট জ্বলে উঠবে। এই আলোকে অতিবেগুনী আলো যথেষ্ট পরিমাণে নিহিত আছে।

সূর্যালোক নিঃসৃত অতিবেগুনী আলোক বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত এই আলোক কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহে প্রয়োগ করাকে বলে—ইরেডিয়েসন। উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞানে এই আলোক প্রক্ষেপণ প্রণালী এক যুগান্তর আনয়ন করেছে। এই আলোর সবচেয়ে শক্তিশালী রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ অ্যাংষ্ট্রম ইউনিট। ধান, যব, গম ও ভুট্টা প্রভৃতির বীজকে কিছুক্ষণ এই আলোতে রাখবার পর রোপণ করলে যে গাছ জন্মাবে সেগুলোর প্রাণশক্তি ও ফসল উৎপাদিকা শক্তিও হবে অনেক বেশী। বসুবিজ্ঞান মন্দিরের কৃষিক্ষেত্রে এই ইরেডিয়েসন প্রক্রিয়ায় (এক্স-রে'র সাহায্যে) পরীক্ষামূলক পাটচাষ করে দেখা গেছে যে, এই প্রণালীতে উৎপাদিত পাট গাছের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয়েছে ২২ ফুট। ধান ও গমের বীজকে এই আলোক সন্নিধানে কিছুক্ষণ

রাখবার পর ভিটা কাঁচের তৈরী কাঁচ-গৃহে সেগুলো রোপণ করা উচিত। ছোট ছোট চারা গাছগুলো যে প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মাবে, তাদের কাঁচ-গৃহ থেকে তুলে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রোপণ করার পরও সেই প্রাণশক্তিই পুষ্পপত্র ও শস্যসম্ভারে তাদের সমৃদ্ধ করে তুলবে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে বেশী ফসল লাভ করার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই আলোকের সংস্পর্শ হয়তো উদ্ভিদ দেহের পুষ্টিবিধানকারী হরমোনের কর্মশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই গাছ অতিদ্রুত বেড়ে ওঠে।

১৯০৫ সালে অধ্যাপক হলপিন—হাঁস, মুরগী ইত্যাদির ওপর সূর্যালোকের উপযোগিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯২০ সালের পূর্বে এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। মুরগীছানাকে ১০ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত অতিবেগুনী আলোতে রেখে দেখা গেছে যে, তাদের দেহ স্বাভাবিকরূপেই পুষ্টি ও বৃদ্ধি লাভ করেছে—পায়ের বা অস্থির দুর্বলতা দেখা দেয়নি। ভূষির মণ্ডের সঙ্গে শতকরা ১ ভাগ কডলিভার অয়েল মিশিয়ে মুরগী-শাবককে খাইয়েও একই ফল পাওয়া গেছে। সুতরাং অতিবেগুনী আলো ও কডলিভার অয়েল—এই উভয়ের মধ্যেই এমন কিছু জিনিস আছে যা মুরগী-শাবকের দেহের কাঠামো বা অস্থিতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস সঞ্চয় করতে সাহায্য করেছে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, এই পদার্থটি ভিটামিন-ডি। অতিবেগুনী আলো জীবদেহে ভিটামিন-ডি তৈরী করবার উপযোগী শক্তি সরবরাহ করেছে। কোলেষ্টেরল নাকি ভিটামিন-ডি-তে রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে, যে সকল অন্তঃসত্বা মুরগীকে ১০ থেকে ২০ মিনিট সূর্যালোকে বা অতিবেগুনী আলোতে রাখা হয়েছে, তারা—যাদের ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে বা ভিটামিন-ডি খাওয়ানো হয়নি—তাদের চেয়ে সাড়ে তিনগুণ বেশী ডিম পেড়েছে। আবার যে ডিমগুলো এই আলোতে রাখা হয় সেগুলো নাকি শতকরা ৭০ ভাগ বেশী শাবক প্রদান করে থাকে। আলোক-স্নাত ডিমের ভ্রূণ বা হলদে অংশ রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তাতে সাধারণ ডিমের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়, সাধারণ ডিমে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ কম থাকায়, ডিমের খোসা থেকে ভ্রূণে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম পরিচালিত হতে পারেনি। দরজা, জানালা বা ছাদের সাধারণ কাঁচ এই ভিটামিন-ডি সৃষ্টিকারী সূর্যালোকের অতিবেগুনী আলোর গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। যেসব হাঁস-মুরগী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই নবজাত হাঁস-মুরগী প্রভৃতির পায়ের দুর্বলতার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন, তাঁরা এই রশ্মি প্রয়োগে লাভবান হবেন। এই আলো ইঁদুরের ওপর প্রয়োগ করে তাদের রিকেট রোগ দূর করা সম্ভব হয়েছে।

লণ্ডনের রয়েল জুয়োলজিক্যাল সোসাইটির পরীক্ষার ফলে দেখাগেছে যে, ভিটা-কাঁচের ছাদ-বিশিষ্ট খাঁচায় রক্ষিত বানর, সিংহ, সর্প প্রভৃতির স্বাস্থ্য ও প্রাণ-শক্তি আশাতীতরূপে উন্নতি লাভ করেছে। মানব দেহের ওপরও আজকাল অতি-বেগুনী আলোর প্রয়োগ চলেছে। সাধারণ স্বাস্থ্যে উন্নতি ছাড়াও কেশহীনতা, অস্থিবিকৃতি, নিউমোনিয়া, কফজ্বর, তাণ্ডব রোগ ইত্যাদিতে এই রশ্মি ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পরিলক্ষিত হয়েছে।

মানবদেহে অতিবেগুনী আলো প্রয়োগ।

নিকেল অক্সাইড মাখানো কাঁচের ভিতর দিয়ে যদি অতি বেগুনী আলোকে প্রেরণ করা যায় তাহলে নির্গত আলোর রং হবে কালো। একে বলা হয়—কালো আলো। এই কালো আলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক অজ্ঞাত রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে। ভাইরাস্ বা অতি সূক্ষ্ম জীবাণুর উপর এই আলো নিক্ষেপের ফলে এগুলো প্রতিপ্রভ বা ফ্লুওরেসেণ্ট হয়ে পড়ে। তখন এদের
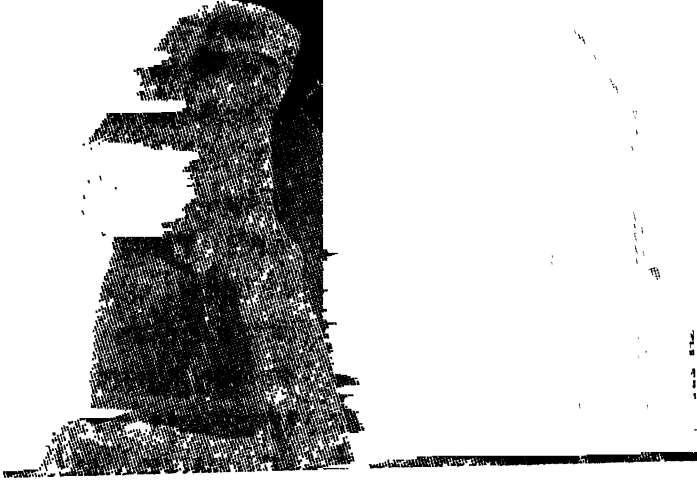
মানবদেহে অতিবেগুনী আলো প্রয়োগ

শক্তিশালী অণুবীক্ষণের দৃষ্টির আওতায় আনা যায়। এই কালো আলো জীবদেহের অদৃশ্য বা আপাত অদৃশ্য অঙ্গে নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে—যার ফলে সেই স্থল পরিদৃশ্যমান হয়ে বহু অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেয়।

সূর্যের আলোকে যে কেবল উপকারী শক্তিই বর্তমান তা নয়, সাধারণতঃ যে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩৩০০ অ্যাংষ্ট্রমের চেয়ে ছোট, জীবদেহে উপর তারই অনিষ্টকারী শক্তি দেখা গেছে। হাইপেরিকাম গণভূক্ত এক প্রকার বিষাক্ত গুল্মজাতীয় চিরহরিৎ আগাছা—আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ ও ভারতের হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায়। এই গাছের পাতা ভক্ষণের পর সূর্যের আলোতে বিচরণ করলে গো-মেষাদির শরীরে চর্মরোগ দেখা দেয়। পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই প্রকার গাছে হাইপেরিসিন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই পদার্থটি জন্তুর পাকস্থলী থেকে প্রথমে রক্তে ও পরে ত্বকের কোষের মধ্যে নীত হয়। দেহে রৌদ্র লাগার ফলে রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হয় এবং চর্মের বিকৃতি ও রোগ সৃষ্টি করে। পেইস, ম্যাকিনি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা হাইপেরেসিনের শোষণ-বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, উহা সূর্যের দৃশ্যমান আলোকের চেয়ে অতিবেগুনী রশ্মি অপেক্ষাকৃত কম শোষণ করে এবং রক্তের লোহিত কণিকাগুলো এই পদার্থের সাহায্যে অতিবেগুনী আলোতে বেশী সাড়া দিয়ে ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার কারু ক্ষেত্রে এক প্রকার পশুরোগ দেখা যায়—ওলন্দাজ ভাষায় তার নাম দেওয়া হয়েছে—'হলদে মোটা মাথা'। এটাও উদ্ভিদ সংক্রান্ত রোগ—উদ্ভিদটির স্থানীয় নাম ভূতের কাঁটা—আমাদের দেশের গোক্ষুর। এই গাছের পাতায় আছে পরফিরিন নামক রাসায়নিক পদার্থ। এই পাতা ভক্ষণের পর রৌদ্রালোকে ভ্রমণের ফলে যে রোগ হয় তাতে রক্তের তরল অংশ হল্‌দে হয়ে যায়; মুখ, কান অস্বাভাবিকরূপে ফুলে ওঠে, শিং ঘন লাল বর্ণ দেখায়, কখনও কখনও চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। এই রোগে আক্রান্ত পশু উন্মুক্ত প্রান্তরে

রৌদ্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছুটোছুটি করে তারের বেড়ার খুঁটির ধারে ক্ষীণ ছায়ায় আশ্রয় লাভের নিষ্ফল চেষ্টা করতে থাকে। এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় বাক হুইট নামে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে। খাদ্যশস্য হিসেবে উত্তর বঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানেই এর কিছু কিছু চাষ হয়। অধিক পরিমাণে ভক্ষণের ফলে সূর্যের আলোক সংস্পর্শে এরও রোগ উৎপাদনের ক্ষমতা দেখা যায়। শূকর, ভেড়া, গরু, ঘোড়া প্রভৃতিরই এই রোগ বেশী হয়। গরুর গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দিলে এই রোগ দেখা যায় না; কিন্তু রৌদ্রে আলকাতরা গলতে আরম্ভ করলে সেই তাপ সহ্য করা সম্ভবপর নয়।

অতিরিক্ত সূর্যালোক সেবনের ফলে মানব দেহেও রোদে-পোড়া নামক চর্মরোগ হয়ে থাকে। শোষণ-বর্ণালী থেকে দেখা গেছে যে, ত্বকের উপরিস্থ কোষগুলো সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ২৭০০—২৮০০ অ্যাংষ্ট্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রশ্মি শোষণ করে। কোষস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিডের কয়েকটি—এই রশ্মি শোষণের ফলে হিষ্টামিন জাতীয় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়ে প্যাপিলারী স্তরের সূক্ষ্ম কোষগুলোতে প্রবেশ করে এবং তাদের স্ফীতি ঘটায়। এলিঙ্গারের মতে—প্রত্যক্ষ আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো অ্যাসিড হিষ্টিডিন, হিষ্টামিনে পরিণত হয় এবং তার ফলেই চর্মে লাল লাল দাগ বা ইরিথেমা দেখা দেয়।

দীর্ঘকাল প্রখর সূর্যালোক সংস্পর্শে কোন কোন লোকের সুস্থ চর্মের বিশেষরূপ পরিবর্তন ঘটে। অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তর ভাগ আবিষ্কারে ক্যাপ্টেন ষ্টার্ট প্রভৃতি পর্য্যটকদের দীর্ঘ দিন অনুর্বর ভূমির প্রচণ্ড সূর্যতাপে দেহচর্ম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ষ্টার্ট প্রথম ভ্রমণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, পরে দেশে ফিরে চিকিৎসায় ভাল হন। বিজ্ঞানী রোফো চর্মের ক্যানসার রোগের পরীক্ষায় দেখেন যে, এই প্রকার রোগের সঙ্গে চর্মের অভ্যন্তরের কোলেষ্টেরল নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের সম্বন্ধ রয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চর্মে এর পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। বার্গম্যানের মতে এই পদার্থটির রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেই নাকি এই রোগ হয়ে থাকে। কালো আলোর সাহায্যে দেহে এর পরিমাণ নাকি নির্ধারণ করা যায়। কতকগুলো আলোকে সাড়াদায়ক পদার্থের বাইরের সংস্পর্শই চর্মের পরিবর্তন সাধন করে। ত্বকের কোন স্থান ব্লেড দিয়ে ঘষে তাতে আলোকে সাড়াদায়ক কোন রঙের দ্রাবণ লেপন করার পর সেই দ্রাবণ ত্বকের ভিতরের কর্নিয়ামের নীচের কোষে প্রবেশ করে। ফলে আলোকের সান্নিধ্যে সেখানে বিকৃতি বা চর্মরোগ দেখা দেয়। সুরাসার যোগে ডুমুর পাতার রস বের করে নিয়ে চামড়ার উপর লেপন করলে তার আলোকে সাড়া দেবার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে, সূর্যের আলোর সংস্পর্শে বসন্ত রোগের ক্ষত বৃদ্ধি পায়। এজন্যে রোগীকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা দরকার। রোগীর ঘরে লাল আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; কারণ লাল আলোর আরোগ্যশক্তি নাকি বেশী।

সূর্যের আলো—যা ভগবানের আশীর্বাদের মত পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে তার ভিতর নিহিত রয়েছে এমন অদৃশ্য শক্তি—যা কখনো অত্যন্ত উপকারী, আবার কখনো অত্যন্ত অনুপকারী মূর্তিতে উদ্ভিদ ও জীবদেহে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ফার্গুসন কলেজ ভবনে গত ২রা জানুয়ারি '৫০ থেকে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। অধিবেশনের উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করেন ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুকুন্দরাম রাও জয়াকর।

এবারের বিজ্ঞান-কংগ্রেসে পাঁচ সহস্রাধিক ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সুইডেন, ফ্রান্স ও জার্মেনী থেকে বাইশ জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগদান করে অধিবেশনের গৌরব বর্ধন করেন।

আগন্তুক বিজ্ঞানীরা গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিশ্ববিশ্রুত নোবেল লরিয়েট শ্রীমতী আইরিণ জোলিও-কুরি ও ফ্রেডরিক জোলিও-কুরি যথাক্রমে কৃত্রিম-স্বতঃদীপ্তি এবং পারমাণবিক বলবিদ্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। পেনিসিলিন ও উপক্ষার সম্বন্ধে বিবৃতি দিয়েছেন ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট রবিনসন। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধ্যাপক জে, ডি, বার্ণাল। প্রোটিন ও কতিপয় সক্রিয় জৈব-পদার্থ বিষয়ক অপর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধও তিনি পাঠ করেন। রাশিয়ার বিখ্যাত জৈব-রাসায়নিক অধ্যাপক ইঙ্গল্‌হার্ট আধুনিক জৈব-রসায়নের উপর আলোকপাত করেন। সাবানের গঠন সম্পর্কে বলেন মার্কিণ বিজ্ঞানী, অধ্যাপক জে, ডাব্লিউ ম্যাক্‌বেন।

অধিবেশনে কয়েকটি সিনেমা-ফিল্মও প্রদর্শিত হয়েছিল। তন্মধ্যে 'অ্যাটমিক ফিজিক্স' ও 'সিন্ধ্রি ফার্টিলাইজার ফাক্টরী'র নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের সমাজকল্যাণে ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত একটি বিশেষ বৈঠকেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অধিকন্তু একটি প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন আগামী ১৯৫১ সালে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হবে। খ্যাতনামা পদার্থবিদ্‌ ডাঃ জে, এইচ, ভাবা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এসোসিয়েশনের জেনারেল কমিটির সভায় এ-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ডাঃ পি, মুখার্জি ও অধ্যাপক সঞ্জীব রাও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইতিহাস

পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে বিজ্ঞান আলোচনার এই ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। আজ থেকে ৩৭ বৎসর পূর্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার নির্জনকক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানের সাধনায় ভারতীয়গণ আত্মনিয়োগ করলে তাঁরা যে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন না, এ কথা আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র সে সময়ে প্রমাণ করেছিলেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তখনও ছাত্র। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার প্রথম অধিবেশনের উদ্যোক্তাগণের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও ভাববিনিময়ের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস স্থাপনের স্বপ্ন যে উত্তরকালে চরম সফলতায় রূপায়িত হয়ে উঠবে একথা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হলে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজজীবনে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ কর্তৃক আনীত পাশ্চাত্য নব ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় ও যোগসূত্র স্থাপনে প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষাব্রতী বিজ্ঞানী ও খ্রীষ্টান পাদ্রীরা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনে কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তেমনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় রয়েছেন ছ'জন ইংরেজ রাসায়নিক—অধ্যাপক পি. এস, ম্যাকমোহন ও অধ্যাপক জি, এল, সি, মেনসন। অধ্যাপক ম্যাকমোহন ছিলেন লক্ষ্ণৌ -এর ক্যানিং কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। অপর অধ্যাপক সি, মেনসন ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের ঔদাসীন্য, সরকারের বিমুখতা, বিজ্ঞান-সাধনায় অর্থাভাব প্রভৃতি দেখে তাঁরা একান্ত ব্যথিত হন। বৃটিশ বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ভারতে গড়ে তোলার জন্যে ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের নিকট প্রস্তাবনা দেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবেদনে সাড়া দিলেও অনেকে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সম্পর্কে বিবেচনা ও ব্যবস্থা করবার জন্যে ১৭ জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিয়ে ১৯১১ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই বৎসর কমিটির এক মিটিং-এ প্রতি বৎসর কলকাতায় বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজনের ভার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার হস্তে অর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন—স্যার আশুতোষ। মূল অধিবেশনকে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও জাতিতত্ত্ব এই পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা হয়।

প্রতিবছর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও অন্যান্য প্রদেশের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে অধিবেশন অনুষ্ঠানের নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালনা করত রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল লেবরেটরীতে (কলকাতা) বিজ্ঞান কংগ্রেসের অফিস অবস্থিত। বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

বর্তমানে মূল অধিবেশনকে গণিত, সংখ্যাতত্ত্ব, পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি তেরটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পূর্ববর্তী অধিবেশনের স্থান, তারিখ ও সভাপতিবৃন্দ

১৯১৪	স্যার আশুতোষ	কলকাতা
১৯১৫	সার্জেন জেনারেল ব্যানারম্যান	মাদ্রাজ
১৯১৬	স্যার এস জি বারার্ড	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	স্যার আলফ্রেড গিব্‌স্‌ বোর্ণ	ব্যাঙ্গালোর
১৯১৮	স্যার জি টি ওয়াকার	লক্ষ্ণৌ
১৯১৯	স্যার লিওনার্ড রোজার্স	বোম্বাই
১৯২০	স্যার প্রফুল্লচন্দ্র	নাগপুর
১৯২১	স্যার রাজেন্দ্র মুখার্জি	কলকাতা
১৯২২	স্যার চার্লস এস মিডলসিস	মাদ্রাজ
১৯২৩	স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া	লক্ষ্ণৌ
১৯২৪	ডাঃ টমাস নেলসন অ্যানানডেল	ব্যাঙ্গালোর
১৯২৫	স্যার এম ও ফরষ্টার	বারাণসী
১৯২৬	স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড	বোম্বাই
১৯২৭	স্যার জগদীশচন্দ্র	লাহোর
১৯২৮	ডাঃ জে এল সিমেনসন	কলকাতা
১৯২৯	স্যার সি ভি রামন	মাদ্রাজ
১৯৩০	স্যার রিচার্ড ক্রিষ্টোফাস	এলাহাবাদ
১৯৩১	লেঃ কঃ আর বি সেমুর সেওয়েল	নাগপুর
১৯৩২	অধ্যাপক এস আর কাশ্যপ	ব্যাঙ্গালোর

১৯৩৩	স্যার লুইসলে খারমোর	পাটনা
১৯৩৪	ডাঃ মেঘনাদ সাহা	বোম্বাই
১৯৩৫	ডাঃ জে এইচ হাটন	কলকাতা
১৯৩৬	স্যার ইউ এন ব্রহ্মচারী	ইন্দোর
১৯৩৭	রাওবাহাদুর টি এস বেঙ্কটাকেস	হায়দরাবাদ
১৯৩৮	রজত-জয়ন্তী উৎসব	
	স্যার জেমস জিন্‌স্‌	কলকাতা
১৯৩৯	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	লাহোর
১৯৪০	অধ্যাপক বীরবল সাহনী	মাদ্রাজ
১৯৪১	স্যার আর্দেসীর দালাল	বারাণসী
১৯৪২	মিঃ ডি এম ওয়াদিয়া	বরোদা
১৯৪৩	মিঃ ডি এন ওয়াদিয়া	কলকাতা
১৯৪৪	অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দিল্লী
১৯৪৫	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	নাগপুর
১৯৪৬	অধ্যাপক আফজল হোসেন	ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৭	পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু	দিল্লী
১৯৪৮	কর্ণেল স্যার আর এন চোপরা	পাটনা
১৯৪৯	ডাঃ স্যার কে এস কৃষ্ণাণ	এলাহাবাদ

মূল সভাপতিঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

প্রখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ১৮৯৩ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় অনার্স সহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯১৪ সালে সেখান থেকে অঙ্ক শাস্ত্রের ট্রাইপস (প্রথম ভাগ) ও ১৯১৫ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানের ট্রাইপস (দ্বিতীয়ভাগ) পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কিংস কলেজ থেকে সিনিয়র রিসার্চ স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিছুকাল কলেজের অধ্যক্ষের কাজ করেন (১৯৪৫—৪৮)। কলকাতার আবহাওয়াতত্ত্ব বিভাগের তিনি মিটিওরোলোজিষ্ট ছিলেন (১৯২২-২৬)। ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই আসনে সমাসীন ছিলেন।

১৯৪৫ সালে তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি থেকে ওয়েলডন মেডেল এবং প্রাইজ লাভ করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রারম্ভ থেকে আজীবন সদস্য রয়েছেন। এছাড়া তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্স, রয়্যাল ষ্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন প্রভৃতির সদস্য।

১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তিনি উহার অবৈতনিক সম্পাদকের কাযে নিযুক্ত আছেন। সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কিত 'সংখ্যা' নামক যে ভারতীয় পত্রিকা ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়, তিনি তারও সম্পাদক। ১৯৪৭ সাল থেকে তিনি আন্তর্জাতিক সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট ও আন্তর্জাতিক বাইওমেটিক সোসাইটি স্থাপিত হবার পর ভাইস-প্রেসিডেণ্টের কাযে নিযুক্ত আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯২৫ সালের অধিবেশনে নৃতত্ত্ব-বিভাগের এবং

১৯৪২ সালের গণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯২১ সালে বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মূল সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন (১৯২১—৩১)। ইতিপূর্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৪৫—৪৮) সম্মেলনের মূল সম্পাদক ছিলেন।

বর্তমানে অধ্যাপক মহলানবীশ ভারত সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এখন তিনি ভারতীয় মন্ত্রী-সভার সংখ্যাতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা ও জাতীয় আয় কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত কর'ছন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনের কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। দেশী, বিদেশী নানা বৈজ্ঞানিক পরিষদের সদস্য এবং সংখ্যাতাত্ত্বিকরূপে তাঁর নাম বহুবিস্তৃত। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে বহুস্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। কার্যব্যপদেশে তিনি ব্যাপকভাবে বিদেশ পরিভ্রমণ করেছেন।

অধ্যাপক মহলানবীশ সংখ্যা-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ১৩০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এতদ্ভিন্ন ইংরেজী ও মাতৃভাষায় বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধও রচনা করেছেন।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন—"জাতীয় পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও গবেষণার সাহায্যে বাধাবিপত্তি দূর করবেন এবং নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করবেন। এসব কাজের জন্যে সংখ্যাতত্ত্ববিদ্দের সাহায্য অপরিহার্য।"

গণিত শাখার সভাপতি :
ডক্টর নলিনী মোহন বসু

অধ্যাপক বসু উত্তর বঙ্গের অন্তর্গত রংপুর জেলার গাইবাঁধায় বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯১২ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে গণিতে অনার্সসহ বি, এস-সি এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ফলিত গণিতে এম, এস-সি পাশ করেন।

১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে উপাধ্যায়রূপে যোগদান করেন। পাঁচ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সালে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান রীডারের পদে উন্নীত হন।

১৯২৩ সালে 'On the Diffraction of Light by Cylinders of large Radius and some Problems in the Dynamics of Particles and Fluids' শীর্ষক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস-সি হন। উচ্চতর গবেষণার কার্যে জার্মেনীর গটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং এই সময় তিনি বার্লিন, প্যারি, ক্যাম্ব্রিজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করেন (১৯২৮-৩০)। ১৯৩১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতে প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে উক্ত পদ ত্যাগ করে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন।

অধ্যাপক বসুর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলো প্রধানতঃ ফলিত গণিত, স্থিতিস্থাপকতা ও গতিধর্ম বিষয়ক। গণিত শাখার অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি, গণিত চর্চায় নবধারা প্রবর্তনের অনুরোধ জানান। ভারতীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত অধ্যয়ন সম্পর্কে গবেষণাকল্পে তিনি অবিলম্বে স্পেশ্যাল কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

সংখ্যাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ঃ
ডক্টর পি, ভি, সুখাত্মে

১৯১১ সালের ২৭শে জুলাই ডাঃ সুখাত্মে জন্মগ্রহণ করেন। পুণায় বাল্যশিক্ষা এবং ১৯৩২ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। পরে ১৯৩৩ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যোগদান করে সেখানে অধ্যাপক ই, এস, পিয়ার্সন ও জে, নেম্যানের অধীনে গবেষণা করেন এবং ১৯৩৫ সালে সংখ্যাতত্ত্বে পি, এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডের রদামষ্টেড কৃষিগবেষণাগারে গবেষণা সুরু করেন। অতঃপর তিনি অধ্যাপক আর, এ, ফিশারের পরিচালনায় লণ্ডনের গার্টন লেবরেটরীতে গবেষণায় রত হন।
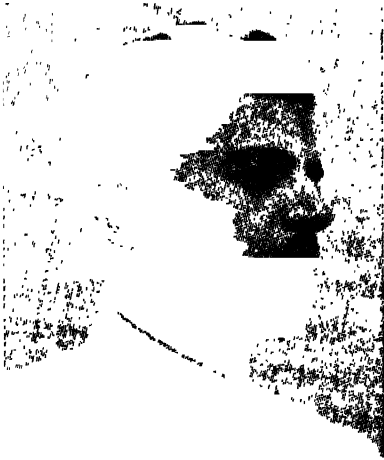
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি, এস-সি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৩৬ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কানপুরের 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজি'তে সংখ্যাতাত্ত্বিক নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার সংখ্যাতাত্ত্বিকের পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি এই পদ ত্যাগ করে কলকাতায় 'অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ'-এর সংখ্যাতত্ত্বের সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৪০ সালে ডাঃ সুখাত্মে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে সংখ্যাতাত্ত্বিকরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে পরিষদের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রদের উচ্চতর গবেষণার জন্যে তিনি একটি লেবরেটরি স্থাপন করেছেন। তিনি ভারতীয় 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স' এবং ব্যাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স'র সদস্য। জার্ণাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচার্যাল ষ্ট্যাটিসষ্টিকস' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ফুড অ্যাণ্ড এগ্রিকালচার্যাল অর্গ্যানিজেশনের' সংখ্যাতাত্ত্বিক স্থায়ী পরামর্শদাতা কমিটির তিনি সহ-সভাপতি।

১৯৪৭ সালে ওয়াশিংটনে সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতৃত্ব করেন।

১৯৫০ সালের জন্যে ডাঃ সুখাত্মে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি :
ডক্টর আর, এন, ঘোষ

ডাঃ আর, এন, ঘোষ ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালী। তিনি এলাহাবাদ ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে বি, এস-সি ডিগ্রি ও আগ্রার মুর কলেজ থেকে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ পি, এইচ, এডওয়ার্ড-এর প্রভাবে তিনি পদার্থবিদ্যার শব্দবিজ্ঞান শাখার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন। উচ্চতর গবেষণার জন্যে তিনি কলকাতায় এসে অধ্যাপক সি, ভি, রামনের অধীনে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানে গবেষণা সুরু করেন। ডাঃ রামন তাঁকে 'সাউণ্ড ফটোগ্রাফি' সম্পর্কীয় টেকনিক শিক্ষা দেন। এই সময় তিনি 'ডিমনেষ্ট্রেটার হিসেবে মুর কলেজে চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি গবেষণার কার্য পরিত্যাগ না করে ডাঃ রামনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন।
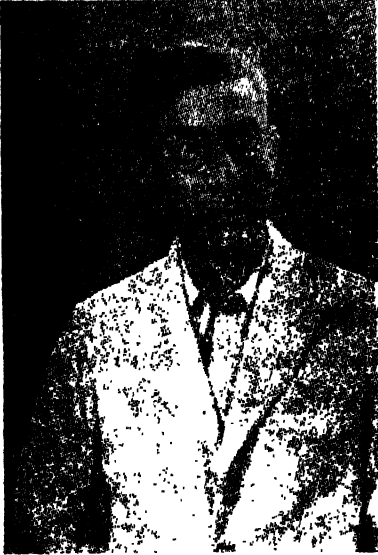
ডাঃ ঘোষ এই সময় 'সাউণ্ড অ্যাবসরপ্‌শন' সম্পর্কে গবেষণা করেন। এই বিষয়ে তিনি ডাঃ মেঘনাদ সাহার নিকট থেকে বিশেষ উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করেন। ১৯২৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, এস-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই সময় তিনি ভারতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ও আমেরিকার অ্যাকস্টিক্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি আণবিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাও করেছেন। বর্তমানে ডাঃ ঘোষ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

রসায়ন শাখার সভাপতি:
ডক্টর জে, কে, চৌধুরী

১৮৯২ সালে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত লামচরে বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ ও কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। তিনি কিছুকাল আসামের ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর চীফ কেমিষ্টের কাজ করে ১৯২১ সালে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে বার্লিন যাত্রা করেন। সেখানে কাইজার উইলহেল্‌ম্‌ ইনষ্টিটিউটে ডাঃ আর, ও, হেরজগের অধীনে গবেষণা করে ১৯২৪ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বার্লিনের শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার পরিদর্শন করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ চৌধুরী ১৯২৫ সালে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন। অতঃপর ডাঃ জে, সি, ঘোষ রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করার পর তিনি উক্ত পদে উন্নীত হন। ইহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি বোস ইনষ্টিটিউটের রসায়ন বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ চৌধুরী ফিউয়েল রিসার্চ কমিটি ও বিভিন্ন শিল্প বিজ্ঞান কমিটির সদস্য।

ডাঃ চৌধুরী তাঁর অভিভাষণে বলেন, আবর্জনা হিসেবে যে সকল জিনিস পরিত্যক্ত হচ্ছে, সেগুলো থেকে সালফার, বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্য, ধাতু, সার, গৃহ নির্মাণের মসলা উদ্ধার করে শিল্প প্রসারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবর্জনা স্তূপে থেকে সম্পদ আহরণের জন্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার আদর্শে একটি সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হলে এ-সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতি : মিঃ জে, কোট্‌স্‌

মিঃ জে, কোট্‌স্‌ ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিষ্টলের ক্লিফটন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর রয়্যাল স্কুল অব মাইন্‌স্‌ নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৈল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯২৩ সালে 'অ্যাসোসিয়েটশিপ' ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন।

১৯২৩ সালে তিনি বর্মা অয়েল কোম্পানীর ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। এখনও তিনি এই কোম্পানীর চাকুরীতে নিয়োজিত আছেন। মিঃ কোট্‌স্‌ ছ'মাসের জন্যে ভারতে 'সেডিমেণ্টারী পেট্রোলজী' সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি তৈল নিষ্কাশন ও উত্তোলন কেন্দ্রের উন্নয়ন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৪২ সালে জাপানীরা বর্মার তৈল কেন্দ্র ধ্বংস করায় তিনি ভারতে আসেন এবং সেই থেকে উক্ত কোম্পানীর প্রধান ভূতত্ত্ববিদের কাজ করছেন।

খনিজ তৈলের ভূ-স্তর সম্বন্ধীয় তাঁর গবেষণা স্বদেশে ও বিদেশে সমাদৃত।

মিঃ কোট্‌স্‌ ভারতের ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি, ইনষ্টিটিউট অব পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান শাখার সভাপতি : ডক্টর পি, মাহেশ্বরী

ডাঃ পি, মাহেশ্বরী ১৯০৪ সালে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে বি, এস-সি এবং ১৯২৭ সালে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ১৯৩১ সালে ডি, এস-সি উপাধি প্রাপ্ত হন। কিছুকাল আগ্রা কলেজ (১৯৩০-৩৭) ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৭-৩৯) অধ্যাপনা করবার পর ১৯৩৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের রীডার ও জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গত বৎসর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেছেন।

১৯৩৪ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস ও ১৯৩৫ সালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি মার্কিন উদ্ভিদবিদ্যা সমিতির সদস্য ও মার্কিন অ্যাকাডেমী অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস-এর সদস্য পদে বৃত হন। বর্তমান বৎসর ষ্টকহলমে যে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে তিনি তার একজন সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। 'প্ল্যাণ্ট এমব্রিয়লজি অব দি ইণ্টার-ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব বাইওলজিক্যাল সায়েন্সেস' বিভাগেরও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক পরিভ্রমণ করেছেন।

প্রাণিবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি: ডক্টর বি, সি, বসু

ডাঃ বি, সি, বসু হুগলী জেলার প্রতাপনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে তিনি সেকেন্দরপুর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে বি, এস-সি ডিগ্রি এবং ১৯২৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রাণিবিজ্ঞান' বিষয়ে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রোটো জুওলজি' এবং মেডিক্যাল এণ্টোমোলজি বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯২৪ সালে তিনি স্বর্গত ডাঃ সি, এ, বেণ্টলির ম্যালেরিয়া রিসার্চ লেবরেটরীতে যোগদান করেন এবং ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সবিশেষ শিক্ষালাভ করেন। বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ, ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত নানা বিভাগে কীটাণুবিদের কাজ করেন। কর্ণেল নোয়েলস, কর্ণেল অ্যাকটন, স্যার আর, এন, চোপরা, ডাঃ ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে তাঁর কাজ করার সৌভাগ্য হয়। গত ১৯৪১ সাল থেকে তিনি ইজ্জতনগরে ভারত সরকারের পশু চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ অফিসারের কাজ করছেন। ভেষজ, জনস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণাগারের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট আছেন।

নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি: ডক্টর সি, ভন ফুরার হাইমেনডর্ফ

ডাঃ ক্রিষ্টোভ ভন ফুরার হাইমেনডর্ফ ১৯০১

সালে ভিয়েনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যায় ও 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ নৃতত্ত্ব ও প্রাক্-ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের উপাচার্য হিসেবে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের সূত্রপাত হয়।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়ে নাগাপর্বত ও সাদিয়া সীমান্ত অঞ্চলে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৩৯ সালে পুনরায় হায়দরাবাদ রাজ্যের আদিবাসীদিগের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করবার জন্যে পুনরায় এদেশে আসেন। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই কার্যে রত থাকেন। অতঃপর তিনি ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। বালীপাড়া সীমান্ত অঞ্চলে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। এই সময় তিনি ভারত-তিব্বত সীমান্তে বহু ভৌগলিক অভিযান পরিচালনা করেন।

১৯৪৫ সালে হায়দরাবাদে প্রত্যাবর্তন করে তথাকার আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণী বিভাগের পরামর্শদাতা ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দেশীয় রাজ্যের সামাজিক সেবা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি হায়দরাবাদ সরকারের আদিবাসী সম্বন্ধে পরামর্শদাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ডাঃ ফুরার বলেন, নৃতত্ত্ব কেবল মাত্র আদিম প্রকৃতির সমাজের পক্ষেই উপযোগী নয়—ইহা অতি-আধুনিক সমাজের বহু সমস্যা সমাধানেরও ক্ষমতা রাখে।

ভেষজ ও পশু চিকিৎসা শাখার সভাপতি : ডাঃ এম, ভি, রাধাকৃষ্ণ রাও

১৯০৩ সালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ রাও অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তেনালি ও অন্ধ্র ক্রিশ্চিয়ান কলেজে প্রাথমিক শিক্ষার পর ভিজাগাপত্তম মেডিক্যাল কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-বি ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি শিশুদের যকৃত সংক্রান্ত রোগ বিষয়ে গবেষণা করেন। বোম্বাইয়ে লেডী টাটা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের

গবেষণাগারে রিসার্চ স্কলার হিসেবে কাজ করার সময় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন।

ডাঃ রাও কুন্নুরে নিউট্রিশন রিসার্চ লেবরেটরীতে

সাত বৎসরের জন্যে মানব দেহের পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করেন।

১৯৪৭ সালের গ্রেট ব্রিটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ডাঃ রাও লণ্ডন গমন করেন এবং সেখানে ইউনিভারসিটি কলেজ হসপিটাল মেডিক্যাল স্কুলে যকৃতের রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন। বোম্বাই এবং ভারত সরকারের পক্ষে মানব দেহের পুষ্টি সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অবগতির জন্যে তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পুষ্টিকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

১৯৪৮ সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসেস অন্ ট্রপিকাল মেডিসিন অ্যাণ্ড ম্যালেরিয়া'-এর অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বর্তমানে ডাঃ রাও বোম্বাই সরকারের পুষ্টি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

কৃষি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি :
রায় বাহাদুর রামলাল শেঠী

শ্রীরামলাল শেঠী ১৮৯৪ সালের ২০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এস-সি ডিগ্রি লাভ করে উচ্চতর শিক্ষার মানসে বিলাত যাত্রা করেন। ১৯২১ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে বি, এস-সি ডিগ্রি পেয়ে ভারতীয় কৃষি বিভাগে যোগদান করেন। পর বৎসর তিনি যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের ইকনমিক বটানিষ্টের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডের রদামষ্টেড গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টার স্যার জন রাসেলের সেক্রেটারী ও পরামর্শদাতার কার্য করেন। ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচ্যারাল রিসার্চ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে কৃষিবিদ স্যার রাসেলের সমভিব্যাহারে ভারতের বিভিন্ন কৃষি বিভাগের কার্য পরিদর্শন করেন। তিনি ভারত সরকারের সহকারী কৃষি কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন (১৯৩৭-৪০)। ১৯৪১ সালে কানপুরের কৃষি কলেজের অধ্যক্ষের কার্য করেন। এই বছরের শেষার্ধে তিনি যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের

ইক্ষু কমিশনার নিযুক্ত হন এবং চার বছর কৃতিত্বের সঙ্গে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের মহাধ্যক্ষের কার্য পরিচালনা করছেন। গত ১৯২৭ সালের জুন মাসে ভারত সরকার তাঁকে যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের কৃষি শাখার সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত শেঠী বলেন, অদূর ভবিষ্যতে কৃষি উন্নয়নের জন্যে যে সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, গ্রাম উন্নয়ন তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। বৃটিশ শাসন কালে গ্রামগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হয়। উর্বরতা বৃদ্ধির চেষ্টা না করে বহুকাল ধরে চাষ-আবাদ করার ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। গো-মহিষাদির গোবর ও মূত্র, মানুষের বিষ্ঠা ও অনুরূপ দ্রব্য যথাযথভাবে পচাই হবার পর সার হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা উচিত। মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণে আমেরিকার পদ্ধতি অবলম্বন করলে

যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলে ভারত খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারে।

শারীরবৃত্ত শাখার সভাপতি: ডক্টর কালিদাস মিত্র

ডাঃ কালিদাস মিত্র ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাদারল্যাণ্ড পদক লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি বিহার জনস্বাস্থ্য বিভাগে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন পদে কার্য করেন। ম্যালেরিয়া সম্পর্কীয় তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ বিহার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, পি, এইচ এবং ১৯৩৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, টি, এম অ্যাণ্ড এইচ ডিপ্লোমা লাভ করেন। অধ্যাপক এম, গ্রীনউড-

এর অধীনে লণ্ডনের স্কুল অব্ হাইজিনের মেডিক্যাল ষ্ট্যাটিসটিক্‌স্ অ্যাণ্ড এপিডেমিওলজি বিভাগে কার্য করেন। ১৯৩৭ সালে বিহার সরকারের পুষ্টিবিদের পদ প্রাপ্ত হন। ১৯৪৩ সালে বিহার প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। বর্তমানে তিনি ভারত সরকারের পুষ্টি বিষয়ক বিভাগের পরামর্শদাতা। তিনি ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব্ সায়েন্সের সদস্য।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শারীরতত্ত্ব শাখার সভাপতির ভাষণে ডাঃ মিত্র বলেন, ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শিল্প, কৃষি ও সৈন্যবাহিনীতে স্বাস্থ্যবান লোক সংগ্রহ করতে না পারলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে তার স্বাধীনতা বা অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নহে। খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে। তারা পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। জাতির কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এদেশে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত বিজ্ঞানসেবীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার পুনর্গঠন আবশ্যক এবং শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়া উচিত।

মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিজ্ঞান শাখার সভাপতি: অধ্যাপক কালীপ্রসাদ

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক কালীপ্রসাদের গৌরবময় ছাত্রজীবন অতিবাহিত হওয়ার পর

১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনশাস্ত্রের উপাচার্য হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি তথাকার শিক্ষা বিভাগ ও দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সম্প্রসারণ এবং এম, এ ক্লাসে এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছেন। তিনি একাধিকবার রোমে গমন করেন।

১৯৪৯ সালে রোমে মানব চরিত্র পর্যালোচনা সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাতে অধ্যাপক প্রসাদকে আমন্ত্রণ জানান হয়।

পূর্ত ও ধাতু বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ঃ ডক্টর ডি, আর মালহোত্র

ডাঃ ডি, আর, মালহোত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আমেরিকা

গমন করেন। বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজি ও হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধাতুবিদ্যা ও শিল্প-রসায়নশাস্ত্রে ডিপ্লোমা লাভ করেন। ভারতে ধাতুবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যে লণ্ডনের কাউন্সিল অব আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল ইনষ্টিটিউট তাঁকে একশ পাউণ্ডের কার্ণেগী রিসার্চ স্কলারশিপ প্রদান করেন। এই বৃত্তি ধাতু বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সম্মানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

ডাঃ মালহোত্র 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব মেটালস'-এর সহ-সভাপতি এবং রাজপুতনা বৈজ্ঞানিক সমিতির সভাপতি। তিনি ভারতীয় রেলসমূহের জ্বালানী কমিটির সদস্য। কয়লা সংরক্ষক কমিটিতে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, ভারতীয় রেলপথ-গুলোর যদি সত্যই সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হয়, তবে বিজ্ঞানকে বাদ দেওয়া চলবে না। রেলপথে প্রতি বৎসর ১ কোটি টন কয়লা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সকল চালান লওয়ার পূর্বে কয়লার গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখার কোনই ব্যবস্থা নেই। প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ গ্যালন লুব্রিকেটিং অয়েল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের পরেই ফেলে দেওয়া হয়। ভারতে বৃহৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে পূর্ব পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে। যে সকল জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়, সেগুলোর গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখার নিমিত্ত এবং রেলওয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার স্থাপন করতে হবে। রেলওয়ের কারিগরদের জন্যে স্বতন্ত্র ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

আলোর চাপ

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

আলোরও যে চাপ আছে—এ কথাটা যাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নন তাঁদের কাছে একটু অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কথাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত বা আশ্চর্যজনক নয়। যে ধরনের আলোর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজ-কারবার তার তীব্রতা এত বেশী নয় যে, তার জন্যে কোন চাপ অনুভূত হবে। তীব্র আলোকরশ্মি ফেলে তার চাপের দ্বারা যদি কোন মানুষকে ঠেলে ফেলা যায় তাহলে বড় অদ্ভুত বলে মনে হবে। কিন্তু সেরকম ঘটনা দেখা যায় না বা করা যায় না বলেই যে আলোর চাপ নেই—এ কথা বলাও ঠিক হবে না। যাহোক, আলোর চাপ যত কমই হোক, চাপ যে আছে একথা নিঃসন্দেহ।

চাপ অনুভব করবার মত আলোর তীব্রতা যদি বাড়ান হয় তাহলে সেটা এমন সাংঘাতিক হবে যে, সব কিছু দাহ্যপদার্থ তক্ষুণি পুড়ে যাবে। আলোর যে দাহিকা শক্তি আছে এ কথাটা ভুললে চলবে না। কাজেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার মত আলোর তীব্রতা বাড়াবার অনেক আগেই সেই আলোকরশ্মি মানুষকে সম্পূর্ণ দগ্ধ করে দেবে।

আলোর চাপ যত তুচ্ছই হোক না কেন, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এর অংশ খুব নগণ্য নয়। বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা নক্ষত্র পর্যালোচনায় এর প্রয়োজন খুবই বেশী। কারণ নক্ষত্র থেকে যে তীব্র রশ্মি বিকিরিত হয়, তার চাপ এত অধিক যে, নাক্ষত্রিক গঠনপ্রণালী পর্যালোচনায় একে উপেক্ষা করা চলে না।

যদি আমরা আলো এবং অন্যান্য তড়িৎ-চৌম্বক রশ্মিকে তরঙ্গের পর্যায়ে দেখি তাহলে আমাদের পক্ষে ধারণা করা একটু মুশকিল যে, কি করে এই তরঙ্গ চাপ প্রদান করবে। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যা দেখিয়েছে যে, তরঙ্গ ও কণা সমধর্মাবলম্বী এবং এই জন্যেই যে-কোন তড়িৎ-চৌম্বক রশ্মিকে খুব ছোট ছোট কতকগুলো শক্তির প্যাকেট বলে বর্ণনা করলে ভুল করা হবে না। এই প্যাকেট-গুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফোটোন। তরঙ্গের যে স্থানে ফোটোনের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক সেই স্থানে তরঙ্গ অতি তীব্র এবং যে স্থানে ফোটোনের সংখ্যা কম সেই স্থানে রশ্মি অতি ক্ষীণ এবং তরঙ্গও খুব দুর্বল।

আপাততঃ যদি আমরা ফোটোনগুলোকে বুলেটের মত কঠিন পদার্থ বলে মনে করি তা-হলে হয়তো ধারণা করা কঠিন হবে না যে, এইরকম এক ঝাঁক বুলেটকে যখন কোন এক টুকরা কাঠের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায় তখন টুকরাটি ধাক্কা খেয়ে পেছন দিকে পড়ে যাবে—অর্থাৎ বুলেটের ঝাঁক কাঠের টুকরার ওপর চাপ দিয়েছে বেশ বোঝা যাবে। আর যদি কাঠটি স্থিতিস্থাপক হয় এবং বুলেটগুলো যে গতিবেগ নিয়ে আঘাত করেছিল, ধাক্কা খেয়ে যদি ঠিক সেই গতিবেগ নিয়ে ফিরে আসে তাহলে প্রমাণ করা খুব কঠিন নয় যে, টুকরাটিকে ঠিক যায়গায় রাখতে হলে আগেকার চাইতে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

ঠিক একই ভাবে, যখন কোন কালো জিনিস, যেটা আলো শোষণ করতে পারে—তার ওপর আলো এসে পড়ে, তখন সেই জিনিসটা কিছু চাপ অনুভব করে। ঐ জিনিসটা যদি প্রতিফলক হয় অর্থাৎ আলো প্রতিফলিত করে দিতে পারে তাহলে দ্বিগুণ চাপ অনুভূত হবে। অবশ্য ফোটোনগুলো বাস্তবিকই কিছু বুলেট নয়। কিন্তু

তাদের সঙ্গে যুক্ত ভরবেগ বুলেটের ভরবেগেরই মত এবং এই বিশেষ ব্যাপারে তাদের ভেতর ব্যবহারের এতই সাদৃশ্য যে, যে তুলনামূলক ছবি আলো ও বুলেটের ভেতর আঁকা হলো সেটা অনেকাংশেই ঠিক।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম আলোর চাপ মাপবার জন্যে পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করেছিলেন একজন রুশীয় পদার্থবিদ্। তাঁর নাম পিটার লেবেডিভ্। এর কয়েক বছর পূর্বে ধূমকেতুর লেজের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁকে অনেকটা বাধ্য হয়ে আলোর চাপ সম্বন্ধে ধারণা করতে হয়। ধূমকেতু আকারে ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরী এবং সূর্যের চতুর্দিকে বিস্তৃত কক্ষপথে সতত ঘূর্ণায়মান। যখন ধূমকেতু সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন কোন অজ্ঞাত কারণের জন্যে কঠিন পদার্থ থেকে গ্যাসের উৎপত্তি ঘটে এবং এই গ্যাসই একটি লম্বা, উজ্জ্বল লেজের আকার ধারণ করে—যেটা লোকের চক্ষে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ধূমকেতুর লেজ সব সময়ই ধূমকেতুর পেছন পেছন যায় না; কিন্তু সব সময়ই সূর্য থেকে দূরে থাকে। এজন্যে লেবেডিভ্ মত প্রকাশ করলেন (এই মত এখনও সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়) যে, সূর্য থেকে বিকিরিত রশ্মির চাপের জন্যেই গ্যাসের পরমাণুগুলো সর্বদা সূর্য থেকে দূরে সরে থাকে।

দুটো কারণের জন্যে বিকিরিত রশ্মির চাপ মাপার সমস্যা খুব কঠিন। প্রথমতঃ যে জিনিসটা মাপতে হবে সেটা অতি ক্ষুদ্র। দ্বিতীয়তঃ এর সঙ্গে আর একটা ব্যাপার ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে যার সঙ্গে রশ্মির চাপের কোন সংশ্রব নেই। অনেকেই ক্রুক্‌সের রেডিওমিটার যন্ত্র দেখেছেন। যন্ত্রটি আর কিছুই নয়—একটি বায়ু নিষ্কাশিত কাঁচ-গোলকের ভেতর খুব পাতলা একটা উইণ্ড-মিলের মত যন্ত্র। যখন আলো এসে যন্ত্রটির ওপর পড়ে তখন পাতগুলো ঘুরতে আরম্ভ করে। দেখে মনে হয়—আলোর চাপের জন্যেই পাতগুলো ঘুরছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কাঁচ-গোলকটার ভেতর থেকে যতটা সম্ভব হাওয়া বের করে নেওয়া হয় বটে—কিন্তু তবুও কিছুটা হাওয়া থেকে যায়। পাতগুলোর এক দিক কালো এবং এই কালো দিকের ওপর আলো এসে পড়লে পাতগুলো আলো শোষণ করে গরম হয়ে ওঠে। পাতের গরম পিঠের ওপর হাওয়ার অণুগুলো যখন আঘাত করে তখন অণুগুলো পাত থেকে শক্তি সঞ্চয় করে বর্ধিত বেগে ফিরে যায়। হাওয়ার অণুগুলোকে এই বর্ধিত বেগ দেবার ফলে পাতগুলো বিপরীত দিকে চলতে থাকে এবং যন্ত্রটির ঘুর্ণন আরম্ভ হয়। গোলকের বায়ু নিষ্কাশন না করলে কিন্তু এই ব্যাপার পরিলক্ষিত হবে না। কারণ তাহলে বাতাসের অণুগুলো যে অতিরিক্ত শক্তি সংগ্রহ করল, গোলকের দেয়ালে পৌঁছবার আগেই অন্যান্য অণুর সঙ্গে ধাক্কার ফলে সে শক্তি হারিয়ে ফেলবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে গোলকের ভেতরকার সমস্ত হাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে ও কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রটির গতি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই ঘটনার সঙ্গে রশ্মির চাপের আদৌ কোন সম্বন্ধ নেই এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্থানকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুমুক্ত করা সম্ভবও নয়—সামান্য কিছু বায়ু সব সময়ই থেকে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে—এই ব্যাপারটি থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাওয়া দুঃসাধ্য। যাহোক, লেবেডিভ্ যতটা সম্ভব বায়ু নিষ্কাশন করে এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন যা দিয়ে রশ্মির চাপ এবং বাল্‌বে অর্থাৎ কাচগোলকে অবস্থিত সামান্য বায়ুর চাপকে আলাদা করে মাপা যায়। কাজেই আলোর চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক কার্যের প্রথম কৃতিত্ব লেবেডিভের। লেবেডিভের পরীক্ষার ফল অনেকটা গুণমূলক—পরিমাপমূলক নয়। তাহলেও একটি প্রয়োজনীয় পরিমাপমূলক ফল তাঁর পরীক্ষা থেকে পাওয়া গেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, একটি পূর্ণ

প্রতিফলকের কাছ থেকে যে ফল পাওয়া যাবে সেটা যে কোন পূর্ণ শোষকের ফলের চাইতে দ্বিগুণ এবং এই ব্যাপারটা লেবেডিভ্ হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।

তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যেও লেবেডিভের খ্যাতি আছে এবং তিনিই সর্বপ্রথম কয়েক মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের আবিষ্কার করেন। যুদ্ধের সময় র‍্যাডারে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গের চাইতেও এই তরঙ্গগুলো ক্ষুদ্রতর।

কালক্রমে লেবেডিভ্ তৎকালীন শাসকগণের কু-দৃষ্টিতে পতিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে ১৯১১ সালে মস্কো ত্যাগ করেন। তারপর কিছুদিন তিনি অতি দুরবস্থার মধ্যে শানিভস্কি পিপ্‌ল্‌স্ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে শরীর ভেঙ্গে পড়ায় ১৯১২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আজ তাঁরই নামানুসারে সোভিয়েট একাডেমী অব সায়েন্সের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স্-এর নামকরণ করা হয়েছে।

লেবেডিভের গবেষণা ১৯০১ সালে মুদ্রিত হয় এবং ঠিক একই সময়ে একই ধরনের কাজ করছিলেন দু-জন আমেরিকান বিজ্ঞানী—নিকল্‌স্ ও হাল। নিকল্‌স্ ও হাল নির্ভুলভাবে এই সম্বন্ধে পরিমাপমূলক পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁদের পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোর চাপ আছে এবং আলোর চাপের গণনালব্ধ ফল ও পরীক্ষালব্ধ ফল হুবহু এক। শুধু তাই নয়, আরো দেখান হয়েছে যে, এ ব্যাপারটা আলোর রঙের ওপর নির্ভরশীল নয়।

আণবিক শক্তি গবেষণার যে প্রচুর প্রচার করা হয়েছে তাথেকে একটা ব্যাপার সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, জড় ও শক্তি বিনিময়শীল। আজ আমরা সকলেই জানি যে, যদি জড়ের বিনাশ করা যায়, তাহলে শক্তির আবির্ভাব হয়। আবার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে বলা যায় যে, তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের আকারে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমাণ শক্তির সঙ্গে ভরবেগ যুক্ত আছে—ঠিক যেমন থাকে ভ্রাম্যমাণ জড়পদার্থের সঙ্গে। এ ধরনের ধারণা বহুদিন থেকে চলে আসছে, কিন্তু এসম্বন্ধে সক্রিয় উৎসাহ হয়েছে সম্প্রতি। এক সেকেণ্ডে আলো ১৮৬০০০ মাইল যায়। কাজেই এক বর্গফুট জায়গার ওপর যদি আলোকরশ্মি এসে পড়ে তাহলে সেই জায়গার ওপর ১৮৬০০০ মাইল লম্বা এবং এক বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট আলোর যে ভর—তার চাপ পড়বে প্রতি সেকেণ্ডে। এই ভর, আলোর গতি নিয়ে ছুটছে এবং যখনই এই আলো শোষিত হবে অথবা কোন প্রতিফলকের দ্বারা প্রতিফলিত হবে তখনই এই প্রচণ্ডগতিসম্পন্ন ভরের গতিবেগ নিরুদ্ধ হবে এবং তার ফলে চাপ অনুভূত হবে।

সামুদ্রিক আগাছা

সমুদ্রের আগাছাকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার জন্যে বৃটেনে কিছুকাল ধরে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়েছে। এই গবেষণা প্রধানতঃ 'স্কটীশ সী-উইড রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের' পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়ে এসেছে। তাদের মতে এই আগাছা দিয়ে বৃটেনে ২০ কোটি টাকা মূল্যের একটি শিল্প দাঁড় করানো দুঃসাধ্য নয়। তা যাই হোক এ সম্পর্কে তারা যে কাজ দেখিয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজকীয় বিমানবহরের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ কার্য শেষ করেছেন। তাঁরা অনুমান করেন যে, এই অঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ টন সামুদ্রিক আগাছা সংগৃহীত হতে পারে।
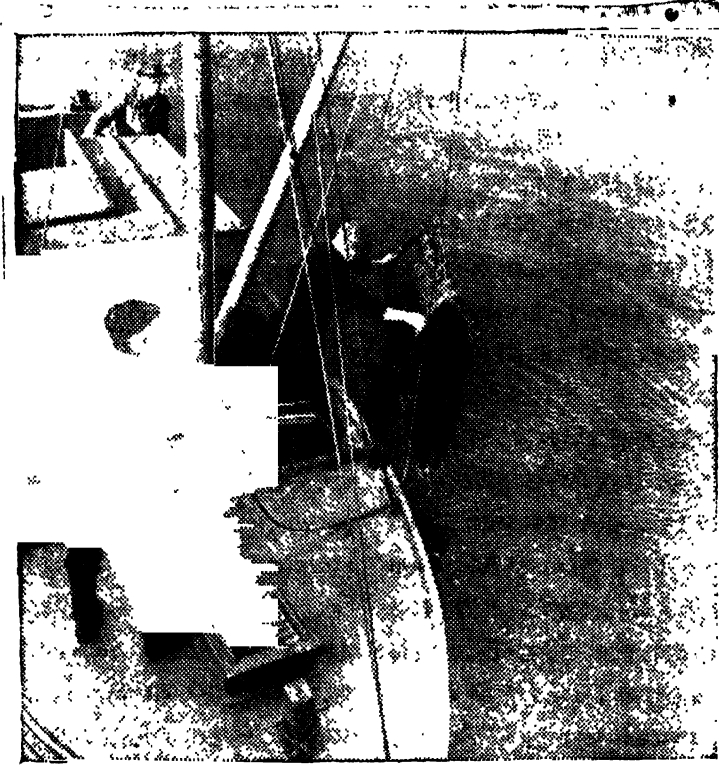
ছোট মোটর বোটের সাহায্যে সমুদ্র থেকে আগাছা সংগৃহীত হচ্ছে।

এই আগাছাগুলো প্রধানতঃ চার রঙের—লাল, বাদামী, সবুজ এবং নীলাভ-সবুজ। স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে বাদামী আগাছারই প্রাধান্য বেশী।
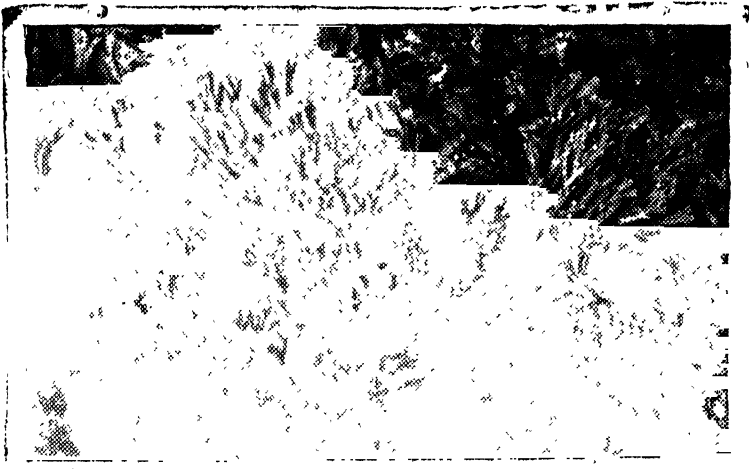
স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে সংগৃহীত বাদামী রঙের সামুদ্রিক আগাছা।

সোডিয়াম কার্বোনেট সংযোগে এই আগাছার নির্যাস থেকে অ্যালজিনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে স্ট্যান্‌ফোর্ড তা প্রথম আবিষ্কার করেন; কিন্তু শিল্পের উৎপাদন হিসেবে তার ব্যবহার স্বীকৃত হয় মাত্র ১৫ বছর পূর্বে। অ্যালজিনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সল্ট

পরীক্ষামূলক জলাধারে সামুদ্রিক আগাছা চাষ করে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

বয়নশিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সল্ট থেকে যে দ্রবণীয় তন্তু জাতীয় পদার্থ লাভ হয় তা হালকা পশম বস্ত্রশিল্পে বিপ্লবাত্মক উন্নতি সাধন করেছে।

অ্যালজিনিক সল্টগুলো বয়নশিল্পের বাইরেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব বলে জানা গিয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সামুদ্রিক আগাছাগুলো পুষ্টিকারক এবং সেগুলোকে মানুষের খাদ্য হিসেবে মুখরোচক করে তোলাও অসম্ভব নয়; কাস্টার্ড বা ক্রীমের সমস্ত গুণই তার আছে। তাছাড়া ভেষজ বিজ্ঞানেও সোডিয়াম অ্যালজিনেটের ব্যবহার আজ নতুন নয়।

'স্কটিশ সী-উইড রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে' এই বাদামী আগাছা থেকে ল্যামিনারিন (Laminarin) নামে আর একটি, নতুন পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ব্যবহার সম্পর্কে এখনও ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন

সমুদ্র থেকে এভাবে ক্রমশ যে সম্পদ আহৃত হচ্ছে তা মানুষের জীবনে নিতান্ত তুচ্ছ নয়।
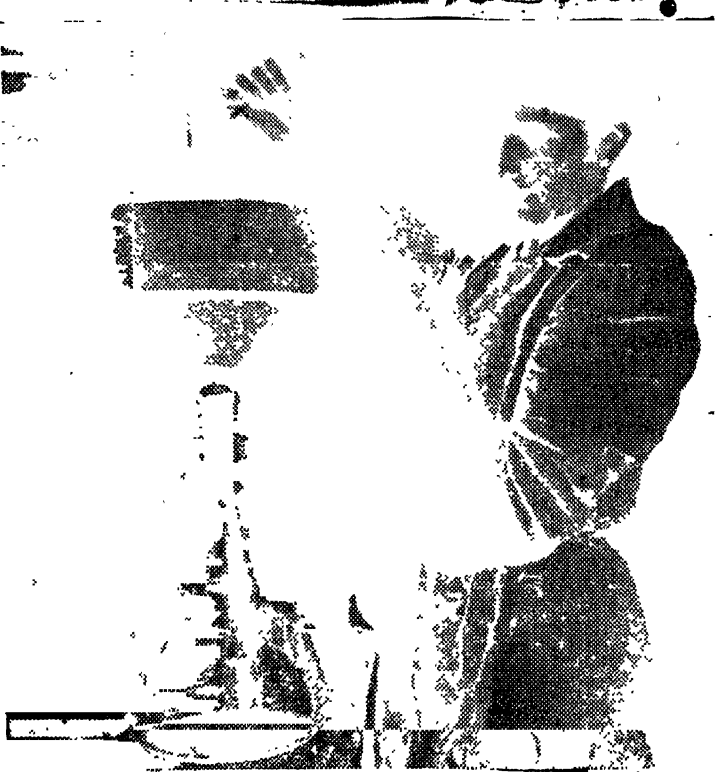
বাদামী রঙের সামুদ্রিক আগাছা থেকে প্রাপ্ত অ্যালজিনিক অ্যাসিড পরিশ্রুত হচ্ছে।

সামুদ্রিক আগাছা থেকে প্রাপ্ত অ্যালজিনেট্‌স্ সহযোগে দাঁতের মাজন, তরল সাবান, জেলী, চকোলেট প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস তৈরী হচ্ছে।
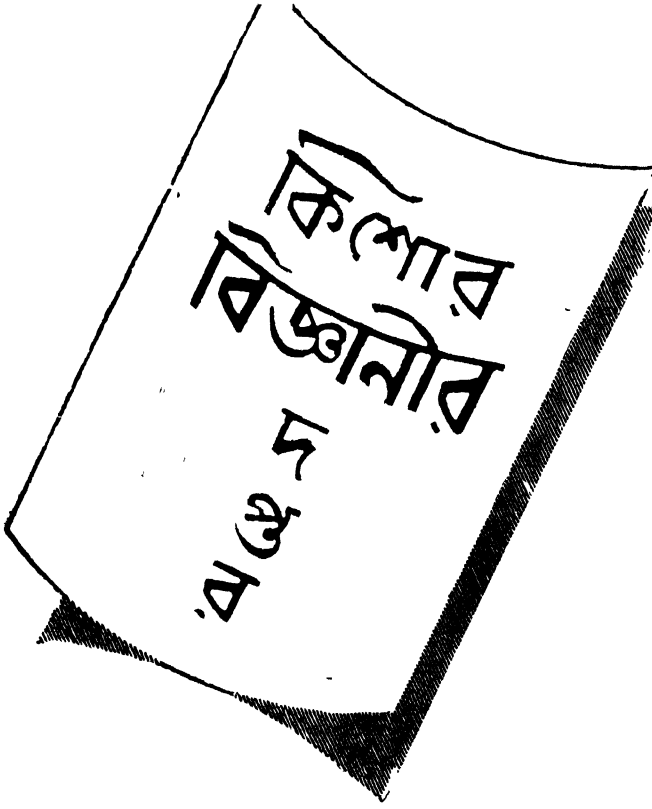
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারি—১৯৫০

পাশের ছবিখানা থেকে যা বোঝ, আগামী সংখ্যার কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরের জন্যে সে সম্বন্ধে ৩।৪ পৃষ্ঠার মত ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাও। উপযুক্ত বিবেচিত হলে কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে প্রকাশিত হবে। ছোট, বড় যে কেউ এবিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে পারবে। প্রবন্ধটিতে সাধারণের বোধগম্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু এবং ভাষার পারিপাট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপৃষ্ঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখতে হবে।

প্রকৃতি পরিচয়

তোমাদের পরিচিত গাছপালা, পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে কোন **অদ্ভুতত্ব** বা **বিশেষত্ব** লক্ষ্য করেছ কি? বীজ বা আঠি থেকে আম-জাম, লাউ-কুমড়া প্রভৃতির চারা গাছ উৎপত্তির সঙ্গে তাল, খেজুর ইত্যাদির চারা-গাছ উৎপত্তির পার্থক্য কি এবং কেন?

তোমাদের পরিচিত গাছপালার মধ্যে বংশবিস্তারের জন্যে কে কি **বিশিষ্ট** কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে? বীজের সাহায্য না নিয়ে বংশবিস্তারের কৌশল এবং পরাশ্রয়ী গাছের সম্বন্ধে তোমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণন কর।

তোমাদের পরিচিত মাছ, পাখী, গৃহপালিত বা বন্য জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে কি কি অদ্ভুতত্ব বা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ?

মশা, মাছি, মাকড়সা পিঁপড়ে ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ সম্পর্কে কি কি অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছ?

উপরোক্ত যেকোন বিষয়ে সরল অথচ সুষ্ঠু ভাষায় ছোট বড় প্রত্যেকের কাছে প্রবন্ধ লেখবার আহ্বান জানাচ্ছি। উপযুক্ত বিবেচিত হলে প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' ৩।৪ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কাগজের একপৃষ্ঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখতে হবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না।

করে দেখ

(১)

ধোঁয়ার অঙ্গুরী
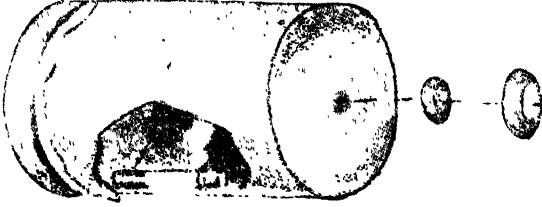
একটা টিনের কৌটা যোগাড় কর। কৌটার তলার দিকটায় প্রায় আধইঞ্চি গোলাকার পরিষ্কার একটা ছিদ্র করতে হবে। কৌটাটাকে বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে খোলা মুখটাতে শক্ত একখণ্ড পাতলা কাগজ মুড়ে সূতা দিয়ে বেঁধে দাও। জ্বলন্ত একটা সিগারেট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফেলে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌটাটা ধোঁয়ায় ভরে উঠবে। এবার ঢাকনা কাগজখানার উপর একটু একটু করে চাপ দিলে বা আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এক একটা করে ধোঁয়ার অঙ্গুরী বেরিয়ে আসবে।

(২)

চামচ থেকে শ্রুতিমধুর শব্দ

একখানা বড় চামচ সংগ্রহ কর। হাতলের মধ্যস্থলে সমান দৈর্ঘ্যের লম্বা দু-গাছা সূতায় গেরো বেঁধে চামচ-খানাকে ঝুলিয়ে দাও। সূতা দু-গাছার অপর প্রান্তে দুটা ফাঁস তৈরী কর। ফাঁস দুটোর ভিতর দিয়ে দু-হাতের দুটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে কানের ছিদ্রের উপর চেপে ধর। এবার চামচটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে চেয়ার অথবা টেবিলের গায়ে ঠেকালেই সুমিষ্ট আওয়াজ শুনতে পাবে।

(৩)

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা
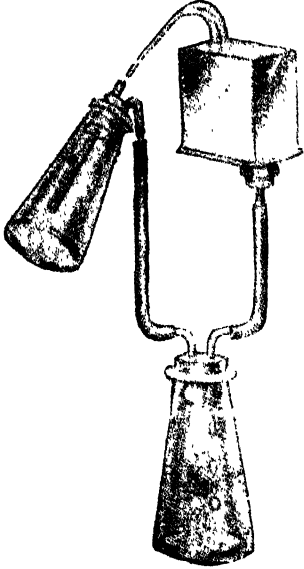
মোটা মুখওয়ালা দুটা বোতল, চোকা একটা টিনের কৌটা যোগাড় কর।

টিনের কৌটাটার তলায় ছিদ্র করে আধইঞ্চি মোটা একটা কর্ক্ পড়াতে হবে। কর্ক্টার মধ্যস্থলে সরু ছিদ্র করে তাতে ছোট্ট একটা কাচের নল গলিয়ে দাও। বোতল দুটার জন্যেও দুটা কর্ক্ দরকার। বোতলের কর্ক্ দুটার মধ্যেও দুটা করে ছিদ্র করে কাচের ছোট্ট নল পড়াতে হবে। এবার ছবির মত করে বোতল দুটা ও টিনের কৌটার সঙ্গে দু-টুকরা রাবারের নল জুড়ে সুবিধামত স্থানে বসাও। উপরের বোতলটার প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি থাকবে এবং তার একটা কাচের নল তলা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে। নীচের বোতলটা থাকবে খালি। উপরের টিনের কৌটাটাতে জল ঢেলে দিলেই জলটা নীচের বোতলে নেমে আসতে চাইবে। তার ফলে বোতলের বাতাসে চাপ পড়বে। বাতাসের সেই চাপ গিয়ে পড়বে আবার উপরের বোতলটার জলের উপর। এই চাপের দরুণ বোতলের জলটা নল দিয়ে ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসতে থাকবে।

(৪)

দেশলাই-বন্দুক
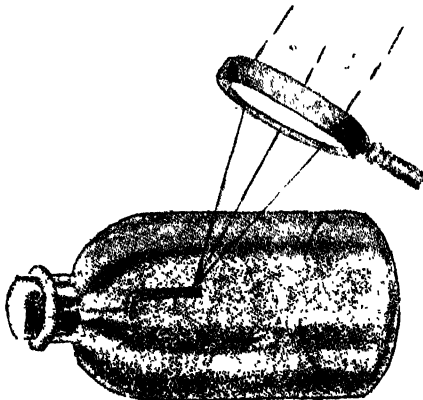
দুচারটে দেশলাই-কাঠির বারুদের দিকটা পিন দিয়ে একটা কর্কের পিছন দিকে

এঁটে দাও। কর্ক্‌টাকে একটা বোতলের মুখে এঁটে দিলে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো থাকবে বোতলের মধ্যে। বোতলটাকে শুইয়ে রেখে বাইরে থেকে একটা রিডিং গ্লাস সূর্যের আলোকে এমন ভাবে ধর যেন সংহত আলোকবিম্বটা গিয়ে কাঠির বারুদের উপর পড়ে। কাঠিগুলোতে আগুন ধরে যাবে। ভিতরের আবদ্ধ বাতাস প্রসারিত হওয়ার ফলে বন্দুকের মত আওয়াজ করে বোতলের মুখের কর্ক্‌টা ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

(৫)

সাইফনের ক্রিয়া

গোটা তিনেক কাচের গ্লাস লও এবং দুটো গ্লাসে জল ভর্তি কর। ইংরেজী U অক্ষরের মত বাঁকানো দুটা কাচের নল যোগাড় করতে হবে। বাঁকানো নলের পাশাপাশি বাহু দুটা হবে গ্লাসের চেয়েও লম্বা; মধ্যের অংশটা ইচ্ছামত লম্বা করতে পার। কাচের বাঁকানো নল দুটাকে জলে ভর্তি কর। আঙ্গুলে দু-মুখ চেপে ছবির মত করে নল দুটাকে গ্লাসের জলে উবুড় করে বসিয়ে দাও। এবার এক একটা গ্লাসকে একটু উঁচুনীচু করলেই, অথবা দুই গ্লাসের জলের 'লেভেল' সমান না থাকলেই দেখবে—এক গ্লাসের জল আর এক গ্লাসে চলে আসছে। এক বাল্‌তি জলের মধ্যে যদি এরকমের জলভর্তি একটা বাঁকানো নল বসাও এবং বালতির বাইরে নলের বাহুটা যদি বালতির তলা থেকে কিছুটা নীচুতে নামাও তবে দেখবে বালতির তলার শেষ জলটুকু পর্যন্ত নল বেয়ে বাইরে গড়িয়ে পড়ছে।

জেনে রাখ

রাক্ষুসে মাছ

তোমরা তো অহরহ অনেক রকমের মাছ দেখে থাক, তাছাড়া অদ্ভূত প্রকৃতির অনেক মাছের কথাও শুনেছ নিশ্চয়; কিন্তু হাঙ্গর-কুমীরের চেয়েও হিংস্র—পশুপক্ষী, এমন কি মানুষের পক্ষেও ভীতি উৎপাদক—মাছের কথা শুনেছ কি? আমরা যেসব রকমারি মাছের সঙ্গে পরিচিত সাধারণতঃ অনেকেই তারা নিরীহ প্রকৃতির। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো উদরপূরণ অথবা আত্মরক্ষার জন্যে হিংস্রতার

আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; কিন্তু যাদের কথা বলছি সে মাছগুলোর হিংস্রতার কথা শুনে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। অভাবনীয় হিংস্রতার জন্যেই এগুলোকে রাক্ষুসে মাছ বলছি, ঔদারিকতার জন্যে নয়। আমাদের দেশের চেতল মাছের কথা তোমরা সবাই জান। এ মাছগুলোর প্রকৃতিও হিংস্র। ডিম পাড়বার সময় এদের উগ্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন কারণে, অকারণে এরা মানুষকেও আক্রমণ করতে

এমাজন নদীর পিরান্না নামক রাক্ষুসে মাছ

ছাড়ে না। কিন্তু তাদের এ-আক্রমণ সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু রাক্ষুসে মাছের উগ্র হিংস্রতা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ছোট ছোট প্রাণীদের তো কথাই নেই, হাঙ্গর-কুমীর, গরু-ঘোড়া থেকে মানুষ পর্যন্ত যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই এরা দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে' মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলে। তোমরা নেকড়ে বাঘের দলবদ্ধ আক্রমণের কাহিনী শুনেছ নিশ্চয়! এ মাছগুলোও ঠিক নেকড়ে বাঘের মত হিংস্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এমন কি, শিকার আক্রমণের সময় দলের কেউ যদি কোনক্রমে আহত হয় তবে তারও নিস্তার নেই। দলের সবাই মিলে তৎক্ষণাৎ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। এ থেকেই মাছগুলোর হিংস্রতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে।

পৌরাণিক কাহিনীতে তোমরা রক্তবীজের কথা শুনেছ। এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই নাকি তাথেকে হাজার হাজার রক্তবীজের উদ্ভব ঘটতো। কাহিনীটা যা-ই হোক না কেন—আসল কথা, বোধ হয় স্বজাতীয়েরা রক্তপাত দেখলেই উত্তেজিত হয়ে দলে দলে ছুটে আসতো। রক্ত, মাংস বা অন্যান্য পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে সমবেত হয়—ক্ষুদ্রকায় পিঁপড়ে, মাছি থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীতে এরকমের বিচিত্র প্রাণীর অভাব নেই। কিন্তু এ রাক্ষুসে মাছগুলো বোধহয় দলবদ্ধ আক্রমণে, হিংস্রতায়,

উগ্রতায় অন্যান্য প্রাণীদের ছাড়িয়ে গেছে। রাক্ষুসে মাছের বিচরণ ক্ষেত্রের আশে-পাশে একমাত্র সুগঠিত বর্মাচ্ছাদিত প্রাণী ছাড়া মাছ বা অন্য কোন জলচর প্রাণীরই বাস করবার উপায় নেই। কুমীরের চামড়া তো কি রকম শক্ত, সুগঠিত! তারাও কিন্তু এই মাছগুলোকে দস্তুরমত ভয় করে চলে। কোনক্রমে এদের সান্নিধ্যে এসে

ছোট্ট একটা নদী সাঁতার কেটে পার হবার সময় বিশালকায় মোষটা রাক্ষুসে মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

পড়লে অথবা আক্রান্ত হলে কুমীর উল্টে আক্রমণ না করে পালাবারই চেষ্টা করে। কারণ, আক্রমণের ফলে দু-একটা মাছ আহত হলে তাদের রক্তের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে তাকে ছেয়ে ফেলবে—তখন আর প্রাণ বাঁচানো কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। এমন কথাও জানা গেছে—প্রকাণ্ড একটা মোষ নদী সাঁতরে পার হচ্ছিল। নদীটা সেখানে ত্রিশ. চল্লিশ ফুটের বেশী চওড়া নয়। খানিকদূর গিয়েই মোষটা এক ঝাঁক রাক্ষুসে মাছের পাল্লায় পড়ে। তাদের সমবেত আক্রমণে অত বড় জন্তুটা এই সামান্য দূরত্বটুকুও অতিক্রম করতে সমর্থ হলো না। নদীর প্রায় মধ্যপথেই হাজার হাজার মাছ জ্বলজ্যান্ত প্রাণীটার এক এক ছোবল মাংস কেটে নিয়ে তাকে শেষ করে ফেললো।

অনবধানতা বশতঃ কোন মানুষ জলে নামলেই হলো—মাছের ঝাঁক নিকটে থাকলে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না; দেখতে দেখতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই শতসহস্র মাছ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। নদীর ধারে কোন একটা গাছের ডাল জলের কাছাকাছি নুয়ে পড়েছে। একটা পাখী হয়তো উড়ে এসে সে ডালের উপর বসলো—সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষুসে মাছ জল থেকে লাফিয়ে উঠে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে ছো-মেরে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি নৌকায় চড়ে যাচ্ছ, হয়তো অনবধানতা বশতঃ হাতখানা তোমার নৌকার ধারে রয়েছে। রাক্ষুসে মাছের নজর পড়লেই সে জল থেকে লাফিয়ে উঠে তোমার হাতের একটা আঙ্গুল, নয়তো খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে পালাবে। এখন বুঝে দেখ—কিরকম হিংস্র স্বভাব এ মাছগুলোর!

শাস্তিবিধানের জন্যে একসময়ে নাকি অপরাধীর শরীরের মাংস ডালকুত্তা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাওয়ানোর রীতি ছিল। এদের কাছে কিন্তু অপরাধ, নিরপরাধের বিচার নেই—ছোট বড়, খাদ্য অখাদ্যের বালাই নেই। একসঙ্গে শত সহস্র ডালকুত্তার মত—স্বজাতীয়, বিজাতীয় প্রত্যেককেই এরা নির্বিচারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে।

এসব কথা শুনে তোমরা হয়তো ভাবছ—রাক্ষুসে মাছগুলো না জানি আকারে কত বড়ই হয়ে থাকে! প্রকৃতপ্রস্তাবে মাছগুলো কিন্তু বেশী বড় নয়—দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হতে দেখা যায়। পিঠের দিকটা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ ধবধবে সাদা। রাক্ষুসে মাছগুলো দেখতে মোটের উপর সুশ্রী, তবে উপরের চোয়ালটা খানিকটা খাটো হওয়ার ফলে মুখটাকে বুলডগের মত দেখায়। সৌভাগ্যের বিষয়, এমাজন নদী ছাড়া এ মাছগুলোকে অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা এ মাছগুলোকে পিরায়া, পেরাই বা কেরাইব নামে অভিহিত করে থাকে। এদের উপর ও নীচের চোয়ালে ত্রিভূজাকৃতি দু-সারি তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। দাঁতগুলো ক্ষুরের মত ধারালো। দাঁত বসানো মাত্রই চামড়া, মাংস ইত্যাদি ঠিক ক্ষুরের কাটার মত পরিষ্কারভাবে কেটে উঠে আসে। অনেক সময় ছোট জীবজন্তুরা জল পান করতে এসে এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এরা জল থেকে দলে দলে লাফিয়ে উঠে জন্তুটাকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে জলের ভিতর টেনে নামিয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। কুমীর অনেক সময় এদের দংশন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে—কিন্তু তার ফল হয় মারাত্মক। কারণ, প্রথমে হয়তো তাকে অল্পসংখ্যক শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সংঘর্ষের ফলে রক্তপাত ঘটলে সেই রক্ত জলে ছড়িয়ে পড়ামাত্রই অন্যান্য মাছের ঝাঁক রক্তের গন্ধে অকুস্থলে ছুটে আসে। কুমীর যত শক্তিশালীই হোক না কেন, হাজার হাজার রাক্ষুসে মাছের আক্রমণে তাকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতেই হয়।

ফুল ফোটে কেন ?

(৬)
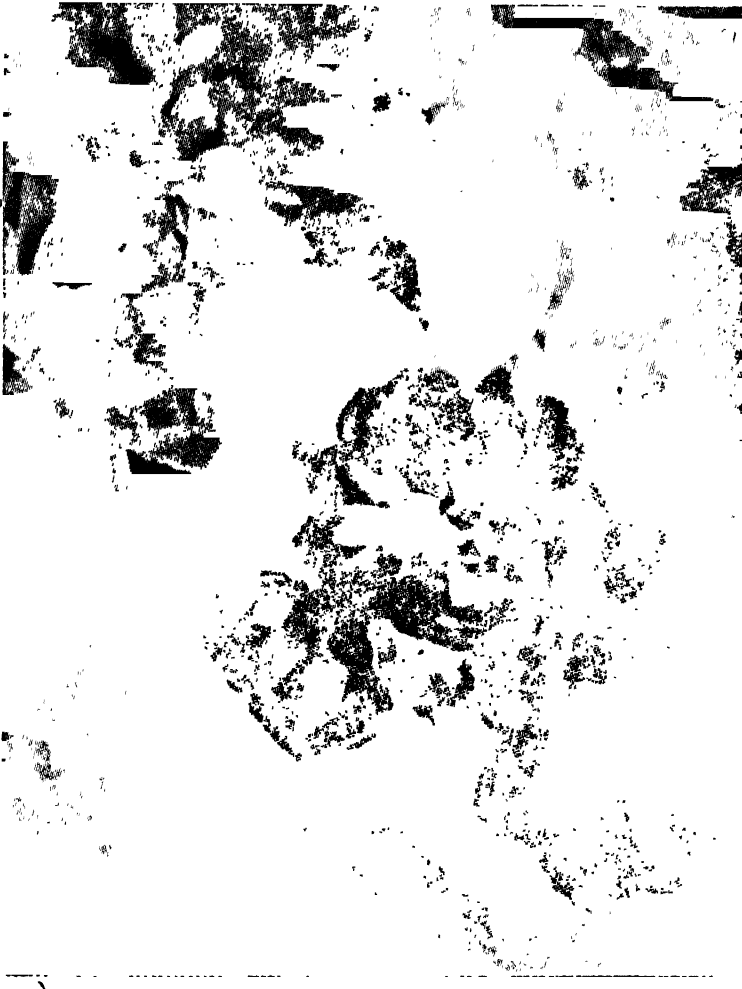
গাছ যখন তার ডালপালা উৎপাদনের কাজ শেষ করে তখন আসে তার ফুল ফোটাবার পালা। ফুল ফোটে ফল ধরাবার জন্যে, আর ফল ধরে বীজ উৎপাদনের জন্যে। এই বীজ থেকেই আবার নতুন গাছের জন্ম হয়।

ফুলের মধ্যেও প্রাণীদের মত স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে। কেবলমাত্র পুরুষ ফুলেই রেণু জন্মায়। এই রেণু যখন পোকা-মাকড়, বাতাস, জল ইত্যাদির সাহায্যে স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে তখনই ফলের উৎপত্তি হয়। কোন কোন ফুলে স্ত্রী এবং পুরুষ, উভয় অঙ্গই একসঙ্গে পাশাপাশি থাকে। এইরূপ ফুলের রেণু অন্য কোথাও পরিচালিত না

হয়ে ঐ ফুলেরই স্ত্রী অঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ এবং স্ত্রী অঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন ফুলে দেখতে পাওয়া যায় এবং পুরুষ ফুল থেকে কোন কিছুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে রেণু যখন কোনও স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে তখনই ফল ধরে।* ফুলগুলোকে সাধারণতঃ চারভাগে ভাগ করা যায়।

(১). এনটোমোফিলাস্—এদের রেণু, পুরুষ ফুল থেকে প্রজাপতি, ভোমরা ইত্যাদি কীট-পতঙ্গের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্ত্রী ফুলে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ ফুলগুলোর খুব চকচকে রং কিংবা মধু অথবা সুগন্ধ থাকে যার জন্যে পোকারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(২) অ্যানেমোফিলাস্ - এদের ফুলের রেণু বাতাস দ্বারা পরিচালিত হয়। ফুলগুলো সচরাচর খুব ছোট ছোট হয়।

(৩) হাইড্রোফিলাস্—এদের রেণু জল দ্বারা পরিচালিত হয়। জলের ভেতর যে সকল গাছ হয় একমাত্র তাদেরই ফুলের রেণু এভাবে পরিচালিত হয়।

(৪) জুওফিলাস্—বাদুড়, পাখী ইত্যাদির দ্বারা এসব ফুলের রেণু পরিচালিত হয়। ফুলগুলো প্রায়শঃ খুব বড় বড় হয়।

অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী)

(২)

প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি—ফুল। ইহার সৌন্দর্য ও গন্ধ আমাদিগকে অপরিসীম আনন্দ দান করে। কিন্তু ফুল ফোটে কেন? মানবের কর্মক্লান্ত জীবনে ক্ষণিক আনন্দ আনিবার জন্যই কি ইহার সৃষ্টি? না, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে আমাদিগকে আনন্দ দান করা ফুলের একটি গৌণ কাজ। সকল জীবই বংশবিস্তার করিতে ইচ্ছা করে। উদ্ভিদেরা প্রধানতঃ বীজের সাহায্যেই বংশবিস্তার করে। বীজ থাকে ফলের মধ্যে। ফুল হইতেই এই ফলের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সকল ফুল হইতেই ফল জন্মে না। কুমড়া ফুলের বেলায় দেখা যায় যে, কতকগুলি ফুলে ফল ধরিয়াছে এবং কতকগুলিতে ধরে নাই। যে ফুলগুলিতে ফল ধরে তাহাদিগকে স্ত্রী-পুষ্প ও যেগুলিতে ফল ধরে না সেগুলিকে পুং-পুষ্প বলে। কোন কোন গাছে পুং ও স্ত্রী উভয় প্রকার ফুলই পাশাপাশি দেখা যায়। যেমন—কুমড়া, লাউ ইত্যাদি॥ কিন্তু পেঁপে, তাল প্রভৃতি গাছের একটিতে একপ্রকার ফুলই ফোটে। কোন গাছে শুধু পুং-পুষ্প আবার কোন গাছে শুধু স্ত্রী-পুষ্পই ফোটে। সেইজন্য এই জাতীর উদ্ভিদের কোন গাছে ফল ধরে আবার কোন গাছে ফল ধরে না।

জবাফুলের পাপড়িগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া পরীক্ষা করিলে ভিতরে একটি লাল দণ্ড দেখা যায়। এই দণ্ডটির মাথা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচটি গোলাকার

অংশে শেষ হইয়াছে। মাথার গোল অংশগুলিকে গর্ভমুণ্ড বলে। লালদণ্ডটির গায়ে অনেক লোমের মত অংশ থাকে ; তাহাদের মাথায় একটি করিয়া গোলাকৃতি কোষ থাকে। ইহাদের নাম পরাগকোষ। এই কোষের মধ্যে যে হলদে রঙের গুঁড়া থাকে তাহার নাম পরাগরেণু। দণ্ডটির লাল আবরণ ছাড়াইলে ভিতরে একটি সাদা সূতার মত পদার্থ দেখা যায়। ইহার নাম গর্ভদণ্ড। যেখানে পাপড়ি, বোঁটার সহিত সংযুক্ত থাকে তাহা ঈষৎ ফাঁপা ও মোটা। ইহাকে গর্ভকোষ বলে। কিন্তু সকল ফুলেই উপরোক্ত অংশগুলি দেখা যায় না। পুং-পুষ্পে পুং-কেশর, পরাগকোষ ও তাহার মধ্যে পরাগ থাকে। স্ত্রী-পুষ্পে গর্ভকেশর, গর্ভকোষ ও গর্ভমুণ্ড থাকে।

গর্ভমুণ্ডে একপ্রকার আঠাল চটচটে পদার্থ থাকে। পরাগকোষ হইতে পরাগ আসিয়া গর্ভমুণ্ডে পড়িলে উহা এই চটচটে পদার্থে লাগিয়া যায়। কীট-পতঙ্গ, বাতাস ও অন্যান্য আরও অনেকে এই পরাগসংযোগে সহায়তা করে। যাহা হউক, এই পরাগ গর্ভমুণ্ড হইতে গর্ভদণ্ড দিয়া ক্রমে গর্ভকোষে পৌঁছায়। তথায় গর্ভকোষস্থিত ডিম্বের সহিত পরাগ নিষিক্ত হইলে গর্ভকোষটি ক্রমে ফলে পরিণত হয়। এইরূপে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি।

এখন দেখা যাউক, কি কি উপায়ে পরাগসংযোগ হয়। যে সকল ফুলে পুং-কেশর ও গর্ভ-কেশর উভয়ই বিদ্যমান থাকে তাহাদের অনেক সময়ে আপনা হইতেই পরাগসংযোগ হয়। পুং-কেশর হইতে পরাগ ঝরিয়া গর্ভমুণ্ডে লাগে ও ক্রমে গর্ভকোষে উপনীত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ফুলকে পরাগ সংযোগের জন্য বাতাস, জল ও নানাবিধ কীট-পতঙ্গের সহায়তা লইতে হয়।

বাতাসের সাহায্যে যে সকল ফুলের পরাগসংযোগ হয় তাহাদের মধ্যে ঘাসজাতীয় উদ্ভিদই প্রধান। এই জাতীয় ফুলের বিভিন্ন অঙ্গ বাতাসের সাহায্যে পরাগসংযোগের অনুকূলে গঠিত হয়। ইহাদের পরাগ শুষ্ক ও মসৃণ এবং পরাগের প্রাচুর্যও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ প্রচুর পরাগরেণু অযথা নষ্ট হয়। এই সকল ফুলে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করিবার জন্য মধু, গন্ধ অথবা নানা রঙের সমাবেশ দেখা যায় না। পরাগরেণু ধরিবার জন্য ইহাদের গর্ভমুণ্ড শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও পালকের মত হয়। যে সকল ফুল বায়ু কর্তৃক পরাগনিষিক্ত হয় সেসব গাছে বসন্তকালে পাতা বাহির হইবার পূর্বেই ফুল ধরে, যাহাতে ফুলের উপর অবাধে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে। কখন কখনও পাতার বাহিরে একটি লম্বা ডাঁটার উপর ইহাদের ফুল ধরে।

পতঙ্গের দ্বারা নিষিক্ত ফুলগুলির পরাগ রুক্ষ ও চটচটে হয়। মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ মধু আহরণের জন্য এক ফুল হইতে অন্য ফুলে যাইবার সময় এই চটচটে পরাগ তাহাদের দেহে লাগিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে চলিয়া যায়। পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার জন্য এই জাতীয় ফুলে সুমিষ্ট গন্ধ ও বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ হইয়া

থাকে। রজনীগন্ধা, বেলী প্রভৃতি ফুল রাত্রিতে ফোটে। রাত্রিতে অন্য রং অপেক্ষা সাদা রংই অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। সেইজন্য মথ প্রভৃতি নিশাচর পতঙ্গ আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহারা সাদা রং ও তীব্র গন্ধ লাভ করিয়াছে।

সকল পতঙ্গই সকল ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিতে পারে না। প্রজাপতি প্রভৃতি লম্বা শুঁড়যুক্ত পতঙ্গ যে সকল ফুলের মধু আহরণে সক্ষম মৌমাছির পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত। আবার মৌমাছি যে ফুলের মধু সংগ্রহে সমর্থ প্রজাপতি তাহাতে বসিলে তাহার পাখা আটকাইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় (দশম শ্রেণী)

পুস্তক পরিচিতি

রোগীর পথ্য—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা। পৃঃ—১১২। মূল্য ২৲ টাকা।

রোগ উপশমে উপযুক্ত পথ্যের কার্যকরী ক্ষমতা অপরিসীম। এ দুর্ভাগা দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে সুচিকিৎসকের একান্ত অভাব। এরূপ পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের নির্দেশক্রমে রোগীর উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা প্রায়শঃ ঘটে ওঠে না। তাছাড়া দেশের নিদারুণ খাদ্য-সঙ্কট, অর্থনৈতিক সমস্যা, রোগীর শুশ্রূষাকারী আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের পক্ষে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে থাকে। স্বল্পব্যয়ে সহজ এবং সরলভাবে যাতে রোগ-নিরাময় হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে লেখক বিজ্ঞান সম্মত কতকগুলো পথ্যের নির্দেশ এই পুস্তকে দিয়েছেন। রুদ্রেন্দ্র বাবুর সরল এবং সুচিন্তিত পুস্তকটি কালোপযোগী হয়েছে। এ দ্বারা জনসাধারণ সহজলভ্য বিভিন্ন খাদ্যের মান নির্ধারণে সক্ষম হবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বাংলার জনশিক্ষা—(১৮০০-১৮৫৬) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা। পৃষ্ঠা ৭৬। মূল্য ॥০ আনা।

বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যোগেশবাবু সবিশেষ পরিচিত। চিন্তাশীল প্রবন্ধকার হিসেবে বাংলা-সাহিত্যে তাঁর দান প্রশংসনীয়। এই পুস্তিকাখানিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত বেসরকারীভাবে পরিচালিত জনশিক্ষার মূল বিষয়গুলো তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে। এই পুস্তিকা প্রণয়ণে সমসাময়িক প্রমাণাদি সংগ্রহে লেখক যে আয়াস স্বীকার করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিলে বাংলার সমাজ-জীবনে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তৎকালে পাঠশালাই ছিল শিক্ষার বনিয়াদ। তৎকালে ইংরাজীকে যখন শিক্ষার বাহন করা হয় তখন বাংলাভাষার কথা শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মনে স্থান পায়নি। শিক্ষা বিভাগ 'Filtration theory' মতবাদে প্রণোদিত হয়ে দেশীয় পাঠশালার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট না হয়ে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। অ্যাডাম পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অ্যাডামের এডুকেশন রিপোর্ট ও তার পরিণতি সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তিকাখানিতে আলোচিত হয়েছে। ইংরেজ কর্তৃক আনীত পাশ্চাত্য ভাবধারায় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত হতে দেখে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এর প্রতিকারকল্পে হিন্দু কলেজ পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়ে অ্যাডামকেই তাঁরা কতকটা অনুসরণ করেন। কিন্তু কালক্রমে এই আদর্শ পাঠশালা দুটির কার্যকলাপ সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

এই পুস্তিকা পাঠে বিগত শতকের শিক্ষাসংক্রান্ত বহু তথ্য আমরা জানতে পারি। * আশাকরি, ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বিবিধ

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার রবার্ট রবিনসন

গত ২৭শে পৌষ, বুধবার প্রাতে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'-এর বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এসোসিয়েশন হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে জৈব রসায়নশাস্ত্রের অন্যতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার রবার্ট রবিনসনকে এসোসিয়েশনের বিমলাচরণ স্বুবর্ণ পদক দানে সম্মানিত করেছেন। সাধারণভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি উচ্চস্তরের অবদানের জন্যেই এই পদক দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে স্যার হেনরী ডেল ও ডাঃ অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনকে এই পদক দেওয়া হয়। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্যার রবার্টকে সম্বর্ধিত করেন।

স্যার রবার্ট এই পদক-দান প্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় রসায়নবিদগণের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি এই পদককে অমূল্য দান হিসেবে রক্ষা করবেন। স্যার রবার্ট বিজ্ঞান বিষয়ক এক সারগর্ভ ভাষণ দেন।

ভারতের একমাত্র আণবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান

গত ১১ই জানুয়ারি, বুধবার সাহাহ্নে কলকাতার বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে অধ্যাপিকা জোলিয়ো কুরী নবনির্মিত ত্রিতল নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছেন।

আণবিক শক্তিবিষয়ক বিজ্ঞানের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে উক্ত ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এতৎসম্পর্কীয় গবেষণাকার্য পরিচালনার ইহাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান।

অধ্যাপিকা জোলিয়ো কুরী ইনষ্টিটিউটের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, এ দেশে পরমাণু সম্বন্ধীয় পদার্থ বিজ্ঞান অনুশীলনের নিমিত্ত একটি নতুন গবেষণাগারের উদ্বোধনে তিনি বিশেষ আনন্দিত। মৌলিক গবেষণাক্ষেত্রে আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের অনুশীলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার গুরুত্বও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষ তার আণবিক সম্পদে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হলে আণবিক শক্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিবে এবং তিনি আশা করেন, এই প্রতিষ্ঠানটি বৈজ্ঞানিক কর্মী সৃষ্টির একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হবে।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা

গত ১১ই জানুয়ারি লণ্ডনের বারবেক কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডাঃ জে, ডি, বার্ণাল, আপার সারকুলার রোডে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে 'জীবনের উৎপত্তি' সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রকাণ্ড বক্তৃতা-কক্ষটি এই উপলক্ষ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ডি, এম, বসু, অধ্যাপক বার্ণালকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। বক্তৃতার প্রারম্ভে অধ্যাপক বার্ণাল বলেন যে, চার বছর পূর্বে তিনি একবার কলকাতা পরিদর্শনকালে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অতি প্রয়োজনীয় গবেষণার কার্যসমূহ পরিদর্শন করবার সুযোগ পান। এবারও এ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শাখা সমূহে যেসব গবেষণার কাজ চলছে তা দেখবার আশা রাখেন। এছাড়া ১২ই জানুয়ারি ডাঃ এইচ, মার্ক 'Diffraction of X-Rays, Electrons & Neutrons' সম্বন্ধে, ১৩ই জানুয়ারি অধ্যাপক বার্ণাল 'বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব' সম্বন্ধে এবং প্রোফেঃ ইঙ্গলহার্ট ১৬ই ও ১৭ই তারিখে দুটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

আগামী বছরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

১৯৫১ সালে ২রা থেকে ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ (বোম্বাই)-এর ডিরেক্টর ডাঃ এইচ, জে ভাবা জেনারেল প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

অন্যান্য শাখার প্রেসিডেণ্ট

গণিত—ডাঃ সি, রেসিন (মাদ্রাজ); সংখ্যা-বিজ্ঞান—এ, আর, সিংহ (কলকাতা) পদার্থ বিজ্ঞান—ডাঃ সি, এস, ভেঙ্কটেশ্বরণ (ট্রিভেণ্ড্রাম); রসায়নশাস্ত্র—ডাঃ আর, সি, সা (বোম্বাই); ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—ডাঃ জে, বি, আউডেন (কলকাতা); উদ্ভিদবিদ্যা—ডাঃ বি, বি, মজুমদার (নিউ দিল্লী); জীববিদ্যা ও কীটতত্ত্ব—ডাঃ এন, সি, চাটার্জি (দেরাদুন); নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব—ডাঃ এস, এস, সরকার (কলকাতা); ভেষজ ও পশু চিকিৎসা—ডাঃ জি, শঙ্করণ (কলকাতা); কৃষিবিদ্যা—ডাঃ জে, কে, বসু (শোলাপুর); শারীরবিদ্যা—ডাঃ এম, ব্যানার্জি (কলকাতা); মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান—এস, কে, বোস (কলকাতা); ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা—প্রোফেঃ এম, এস, থ্যাকার (ব্যাঙ্গালোর)।

মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নতুন মতবাদ

নিউ ইয়র্কের ২৭শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ, ডাঃ অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন ত্রিশ বৎসর গবেষণার পর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করেছেন। বিশ্বের শক্তি সম্পর্কে পদার্থবিদদের যে সমস্যা ছিল আইনষ্টাইনের নতুন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে তার সমাধান হয়েছে।

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন, মাধ্যাকর্ষণ ও ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম্ বলে' বিশ্বের যে দুটি মৌলিক শক্তি আছে ডাঃ আইনষ্টাইন 'ইকোয়েসনের' সাহায্যে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়েছেন।

বিজ্ঞানের প্রগতি নামক মার্কিণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। উক্ত অধিবেশনে ডাঃ আইনষ্টাইন উপস্থিত ছিলেন না। নতুন মতবাদটি মাধ্যাকর্ষণের বৈজ্ঞানিক রহস্যের উপর আলোকপাতে সমর্থ হবে বলে ডাঃ আইনষ্টাইনের বিশ্বাস। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সংশোধিত 'রিলেটিভিটি' বিষয়ক যে পুস্তক প্রকাশিত হবে ইহা তার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

ডাঃ আইনষ্টাইন তাঁর আবিষ্কৃত নতুন মতবাদকে 'মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ মতবাদ' নামে অভিহিত করেছেন। ইহাকে তাঁর জগৎ বিখ্যাত আপেক্ষিকতাবাদের সম্প্রসারণ বলে প্রকাশ করেছেন।

নতুন মতবাদটি এখনও পরীক্ষিত হয়নি। পরীক্ষার পূর্বে কয়েকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। ইহার দরুণ কয়েক বৎসর লাগবে বলে মনে হয়।

ভারতে পেনিসিলিন প্রস্তুতের কারখানা

নয়াদিল্লীর ২৪শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার পেনিসিলিন, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ ও সালফা ড্রাগ প্রস্তুতের জন্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন।

কেন্দ্রীয় ও বোম্বাই সরকার একযোগে উক্ত পরিকল্পনার ব্যয়ভার বহন করবেন। পুণার সন্নিকটে ডেপুরোডে কারখানার জন্যে স্থান সংগ্রহ হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়ার জন্যে একটি পরিচালক কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে।

সংবাদে আরও প্রকাশ, বাঙালাদেশে প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করার জন্যে একটি মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে আর একটি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠিয়েছেন।

অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে ট্র্যাক্টর

জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে যে দশটি ট্র্যাক্টর আছে তার মধ্যে ৩টি জলপাই-গুড়িতে, ২টি বর্ধমানে এবং অবশিষ্ট ৫টি অন্যান্য জেলায় কাজ করছে। এই বৃহদাকার আটান্ন অশ্বশক্তি সমন্বিত ট্র্যাক্টরগুলো দ্বারা পতিত জমি চাষ করা বিশেষ সুবিধাজনক। গড়ে ১২৲ টাকা ঘণ্টা হিসেবে চাষীরা এই ট্র্যাক্টরগুলো ভাড়া নিচ্ছে। ঘণ্টায় প্রায় দেড় একর জমি ইহার দ্বারা চাষ করা যেতে পারে। এতদ্ভিন্ন সরকারী ১০টি ট্র্যাক্টর হরিণঘাটার 'দুগ্ধ বসতিতে' কাজ করছে।

সরকারী ট্র্যাক্টর ছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের বহু ট্র্যাক্টর এই প্রদেশে কাজ করছে।

ভূগর্ভে প্রাচীন সহর

পূর্ব-পাকিস্তানের সাতক্ষীরার খবরে প্রকাশ, কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত কপিলমণি গ্রামের নিকটে অতীতের এক সমৃদ্ধ সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইটের তৈরী একটি প্রাচীর এবং ১০ হাত চওড়া একটি পাকা রাস্তার শেষ চিহ্ন রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইহা সম্রাট হর্ষবর্ধনের আমলের একটি উন্নতিশীল সহরের ধ্বংসাবশেষ হওয়াই সম্ভব। উক্ত অঞ্চলের জমি চাষ করবার সময় কৃষকেরা প্রায়ই প্রাচীন মুদ্রা ও ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্রাদি পেয়ে থাকে।

ভারতের খনিজ-সম্পদ

ভারতের ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ উবলিউ, ডি, ওয়েস্টন ইণ্ডিয়ান মিনারেল্‌স্‌ পত্রিকায় ভারতের সেবায় ভূ-বিজ্ঞান প্রয়োগ ও ভারতীয় ভূতত্ত্ব জরিপ বিভাগের অবদানের বিষয় আলোচনা করেছেন। দুইটি বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে কর্তৃপক্ষ অবহিত হয়েছেন যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন অনেক পরিমাণে খনিজ-সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং খনিজ-সম্পদের উন্নয়ন আবার ভূ-তাত্ত্বিকদের কাজকর্মের উপর নির্ভরশীল। ভারতের খনিজ-দ্রব্যের বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য ৫৬ কোটি টাকা। খনিজ-দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত ধাতব দ্রব্যের মূল্য ২৪ কোটি টাকা। এদেশের বৈদ্যুতিক শক্তির অনেকাংশই কয়লা থেকে উৎপন্ন হয়; আবার ভূ-বিজ্ঞানের উপর খনিজ শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করে। এদেশের ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরীর আবশ্যকতা আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ ওয়েষ্টন বলেছেন, এ পর্যন্ত ভারতীয় ডোমিনিয়নের শতকরা ২৮ ভাগ স্থান ভূ-তত্ত্বের দিক দিয়ে এক ইঞ্চি স্কেলে পরিমাপ করা হয়েছে। এখনও প্রায় ২,৯০,০০০ বর্গ মাইল জায়গা মাপ করতে বাকী আছে। এক এক মরসুমে এক এক জন ভূ তত্ত্ববিদ ৩৫০ বর্গ মাইল স্থান জরিপ করতে পারেন—এই হিসেবে এক ইঞ্চি স্কেলে জরিপ ৫০ জন ভূ-তাত্ত্বিকের ১৬ বছর সময় লাগবে। মানচিত্র তৈরী ছাড়া ভূ-তত্ত্ব জরিপ বিভাগের কাজ নানাদিকে প্রসারিত হয়েছে। এই বিভাগে নতুন নতুন বিষয়ের জন্যে কয়েকটি নতুন শাখাও খোলা হয়েছে। এই বিভাগ প্রাদেশিক ও উপরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। কেন্দ্রীয় নদী, নালা, সেচ, নৌ-চলাচল কমিশন, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণাপরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বিভাগের যোগাযোগ রয়েছে।

কাশীপুর বিদ্যুৎসরবরাহ কেন্দ্র

কাশীপুর নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কলকাতার বিদ্যুৎসরবরাহ ব্যবস্থাকে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে আরও দশ মাইল প্রসারিত করবার জন্যে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেডের নিকট অনুরোধ জানান। ডাঃ কাটজু বলেন উন্নয়নের পর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিন আজ আর নেই। বর্তমানে এটাই সত্য হয়ে উঠছে যে, শক্তি যেখানে যাবে সেখানেই আলোক ও প্রগতি তার পশ্চাদনুশরণ করবে।

আজকাল বৈদ্যুতিক শক্তির প্রসারের পরই সহর অঞ্চল ও অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটে থাকে।

তিনি আরও বলেন যে, কলকাতার ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা বিবেচনায় সরকার এর পরিপার্শ্বে ছোট ছোট সহর গড়ে তোলার কয়েকটি পরিকল্পনা বিবেচনা করছেন। এমতাবস্থায় কলকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড হাওড়া থেকে আমতা লাইনের দিকে আরও দশমাইল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চল বিদ্যুৎসরবরাহে আলোকিত করে তুলে বিশেষ সাহায্য করতে পারেন।

নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের বিষয় বলতে উঠে কোম্পানির সভাপতি স্যার জেমস ডোনাল্ড বলেন যে, উক্ত কেন্দ্রের সরবরাহ শক্তি দু-লক্ষ দশ হাজার কিলোওয়াট দাঁড়াবে। এখন পর্যন্ত দুটি বিদ্যুৎ সৃজন যন্ত্র দ্বারা মোট একলক্ষ দশ হাজার কিলোওয়াট পরিমিত শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে এতে ঘর-সংসারে যে ধরনের বাতি জ্বালান হয় সেরূপ বিশলক্ষ বাতি এক সঙ্গে জ্বালান চলবে। এতে কলকাতার চাহিদার অনেকখানি মিটান চলবে। উপরন্তু পুরাতন আরও তিনটি কেন্দ্র থেকে মোট দু-লক্ষ নব্বই হাজার কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, ১৯১২ সনের কলকাতার বিদ্যুৎ চাহিদা কি অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্যার জেমস আরও বলেন যে, এই কেন্দ্রটি গড়ে তুলতে মোট আট কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। অন্য কেন্দ্রের তুলনায় এখানে প্রায় দ্বিগুণ খরচ করা লেগেছে; কারণ যন্ত্রপাতিগুলো আরও নির্ভরযোগ্য ও উন্নততর করা হয়েছে।

কোম্পানির দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের পশ্চাৎ ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে স্যার জেমস্ বলেন যে ১৯১২ সনে কলকাতায় মোট এক কোটি বিশলক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হতো এবং ১৯১৯ সনে তা ৭২ কোটি ইউনিটে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে যে কেন্দ্র গড়া হয়েছে তা ভাবী শক্তি সৃজন কেন্দ্রের অংশবিশেষ মাত্র। উন্নয়ন পরিকল্পনার এটি প্রথমাংশ মাত্র। বিদ্যুতের চাহিদার আজ আর অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ইহা আর দৈনন্দিন জীবনের বিলাসের সামগ্রী নয়। ছোট বড় শিল্প সংস্থা বিদ্যুৎ শক্তির জন্যে দাবী জানাচ্ছে। গৃহস্থালীর ব্যাপারেও চাহিদা নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী বছরে আরও চাহিদার সম্মুখীন হতে হবে এবং এই বৃহৎ শক্তি কেন্দ্র দ্বারাও তা সম্পূর্ণ মিটান যাবে না। স্যার জেমস্ বলেন, কলকাতাকে নির্ভরযোগ্যভাবে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের গৌরবময় ঐতিহ্যকে আমরা রক্ষা করে চলব—এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই নতুন শক্তি সৃজন কেন্দ্র আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার প্রমাণ এবং কলকাতার ভাবী শিল্প ব্যবস্থার উপরই আমাদের পরিকল্পনাসমূহ ভিত্তি করে রচিত। অনুষ্ঠানের পর ডাঃ কাটজুকে কেন্দ্রটির বিভিন্ন অংশ ঘুরাইয়া দেখান হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ডিসেম্বর সংখ্যার ৭১৭ পৃষ্ঠায় ক্যালসিয়াম শতকরা ৩৩ ভাগ ও ফসফরাস ৩০ ভাগের স্থলে যথাক্রমে '৩৩ ও '৩০ ভাগ হবে; এবং ৭৫৪ পৃষ্ঠায় 'ব্রোমাইড্স্' অবসাদক পর্যায়ে যাবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ ফেব্রুয়ারি—১৯৫০ দ্বিতীয় সংখ্যা

জৈব রসায়নশাস্ত্রের ক্রমবিকাশে গন্ধদ্রব্য গবেষণার অবদান

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

বৈদিক যুগ থেকেই সুগন্ধি পুষ্পসম্ভার এবং ধূপ-ধুনো প্রভৃতি গন্ধোপচার আমাদের দেবার্চনার অপরিহার্য অঙ্গের মধ্যে গণ্য। খস, চন্দন, চুয়া, মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারও সুপ্রাচীন। বিবিধ সুগন্ধি মশলার ব্যবহারও কম দিনের নয়। আর গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ও যে প্রাচীন ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল গন্ধবণিক সম্প্রদায়ই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এতৎসত্ত্বেও গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্র আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতে আধুনিক রসায়নশাস্ত্র-চর্চার সূত্রপাত হলেও এখন পর্যন্ত এই শাস্ত্রে ভারতবাসীদের খুব উল্লেখযোগ্য কোন দান নেই বললেই চলে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয়েছে কিঞ্চিদধিক এক শত বছর। এই সময়ের মধ্যে ওই শাস্ত্র এতদূর উন্নতি-লাভ করেছে যে, তার যশঃসৌরভ সারা সভ্যজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এই শাস্ত্রে সাফল্যলাভে ইতিমধ্যে একাধিক বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। পাশ্চাত্য মনীষীদের গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত রসায়ন অনুশীলনের মোটামুটি আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

একটি গন্ধদ্রব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়েই জৈব রসায়নশাস্ত্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে। এ হচ্ছে তিত বাদাম তেল নিয়ে গবেষণা। গবেষক দু-জন তরুণ জার্মান রাসায়নিক—লিবিগ এবং ভোয়েলার। ১৮৩২ সালের ১৬ই মে তারিখে ভোয়েলার তাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ লিবিগকে লেখেন—"একটি কাজের মত কাজের জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করছে—তিত বাদামের তেল নিয়ে গবেষণা আপনার কেমন মনে হয়?" অতঃপর একযোগে কাজ আরম্ভ করে সেই বছরেই উভয়ে লিবিগের "আনালেন দের কেমি উণ্ড ফার্মেৎসীতে" 'বেনজয়েল র‍্যাডিক্যাল' সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান গবেষণা প্রকাশ করলেন। তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, এই বেনজয়েল র‍্যাডিক্যাল তিত বাদাম তেলের প্রধান সুগন্ধি উপাদান বেনজালডিহাইডের অংশমাত্রই নয়—পরন্তু আরও অনেক পদার্থই ইহাদ্বারা গঠিত। আর এই আবিষ্কারের দ্বারা কেবল বেনজয়েল

সংযুক্ত জৈব যৌগিক পদার্থের সুসম্বন্ধ শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত পরবর্তীকালে জৈব পদার্থ সমূহের সুশৃঙ্খল শ্রেণীবিভাগের পক্ষেও ইহা নজির স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অনেকেই জানেন, বেনজালডিহাইড নামটি এসেছে বেনজয়িক অ্যাসিড থেকে—আর এই অ্যাসিড বেনজয়েন নামক আঠা থেকে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিশুদ্ধ দানাদার অবস্থায় প্রস্তুত হয়েছিল।

তৎকালে খাঁটি রসায়ন-বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণী বিভাগ না হওয়াতে স্বভাবজাত জৈব পদার্থগুলো তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বাহ্য-প্রকৃতি (physical properties) অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হতো। রসায়নের তদানীন্তন পাঠ্যপুস্তকে 'সুগন্ধি পদার্থ' নামক অধ্যায় থাকত; কিন্তু তখন পর্যন্ত এ ধারণা আসেনি যে, গন্ধদ্রব্যগুলোর পরস্পরের অন্তঃপ্রকৃতি বা আণবিক গঠনের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র আছে। যে সকল গন্ধ-দ্রব্যের গঠনপদ্ধতি সহজে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল সেগুলোর মূলে বেনজিনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে ১৮৬০ সালে অগষ্ট কেকুলে ব্রুসেলস্ বিজ্ঞান সংসদে যে মৌলিক প্রবন্ধ দাখিল করেন তাতে তিনি জৈব পদার্থগুলোকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেন—সুগন্ধি পদার্থ এবং চর্বি সংক্রান্ত যৌগিক পদার্থ।

বর্তমানে সুগন্ধি বলতে আর শুধু বেনজিন-সম্ভব পদার্থই বুঝায় না, পরন্তু অ্যালিফ্যাটিক এবং অ্যালিসাইক্লিক বিভাগের বহু পদার্থকেও এই শ্রেণীভুক্ত বলে ধরা হয়ে থাকে।

সুগন্ধি দ্রব্যের গবেষণা জৈব রসায়নশাস্ত্রের উপর অনেক দিকেই প্রভাব বিস্তার করেছে। তিত বাদামের অপর একটি উপাদান অ্যামিগ-ডালিনের গবেষণা থেকে গ্লুকোসাইড নামে একশ্রেণীর উদ্ভিজ্জ যৌগিক পদার্থের বিষয় প্রথম জানা যায়। যদিও ইতিপূর্বে রুবিকে এবং অপর দু-একজন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছিলেন তথাপি ১৮৩৭ সালে লিবিগ ও ভোয়েলারের গবেষণার ফলেই অ্যামিগডালিন যে বেনজালডিহাইড, হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড এবং গ্লুকোজের সমবায়ে গঠিত তাও চরমভাবে স্থিরীকৃত হয়।

বেনজালডিহাইড নিয়ে গবেষণাকালে ১৮৫৩ সালে বারটাগনিনি সোডিয়াম বাইসালফাইটের সাহায্যে অ্যালডিহাইড পৃথক করবার উপায় উদ্ভাবন করেন। পিরিয়ার অ্যালডিহাইড তৈরীর পন্থাও এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৫৩ সালে ইটালীর রাসায়নিক ক্যানিজারো ঘনীভূত কষ্টিক সোডা দ্রবণযোগে বেনজালডিহাইড থেকে বেনজয়িক অ্যাসিড ও বেনজাইল অ্যালকহল প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কার করেন। জৈব রসায়নের ছাত্রদের কাছে ক্যানিজারোর রিঅ্যাকশন সুপরিচিত। গন্ধদ্রব্যের ব্যবসায়ে বহুল ব্যবহৃত বেনজাইল অ্যালকহল এইরূপে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে আলকাতরার অন্যতম উপাদান টলুয়িন থেকে বেনজাইল অ্যালকহল এবং বেনজালডিহাইড প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৮৩৪ সালে ডুমা এবং পেলিগো দারুচিনির তেল থেকে সিনামিক অ্যালডিহাইড নামক সুগন্ধি বের করে সিনামিক অ্যাসিডের সঙ্গে এর সম্বন্ধও স্থির করেন। ১৮৫৬ সালে শিয়োজা বেনজাল-ডিহাইড এবং অ্যাসেট অ্যালডিহাইডের রাসায়নিক সম্মিলনে সিনামিক অ্যালডিহাইড তৈরী করেন এবং সেই বছরই সার উইলিয়ম পারকিন বেনজাল-ডিহাইড, সোডিয়াম অ্যাসিটেট এবং অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড থেকে সিনামিক অ্যাসিডের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহাই পারকিনের রিঅ্যাকশন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১৮৬০ সালে কোলবে সোডিয়াম ফিনোলেট এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগে স্যালিসিলিক অ্যাসিড প্রস্তুত করেন। ইহা কোলবের সিনথেসিস নামে পরিচিত। এই নজির অনুসরণ করে রাইমার

এবং টিমান গুয়াকল ও ক্লোরোফরম থেকে পটাসের সাহায্যে ভ্যানিলিন নামক বহু ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য প্রথম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের নামও জৈব রসায়নের ছাত্রদের নিকট সুপরিচিত। অনেকেই জানেন, লবঙ্গের তেলের প্রধান উপাদান ইউজিনল থেকে রাসায়নিক উপায়ে প্রচুর পরিমাণে ভ্যানিলিন আজকাল তৈরী হয়ে থাকে। সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভার শহরতলীতে জিভোদাঁ কোম্পানীতে লবঙ্গের তেল থেকে প্রভূত পরিমাণে ভ্যানিলিন তৈরীর ব্যবস্থা গত বছর জানুয়ারি মাসে আমি দেখে এসেছি।

সার উইলিয়াম পারকিন উদ্ভিজ্জ সুগন্ধি কুমারিন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন এবং ফিটিগ উহার রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। অধুনা ল্যাক-টোন নামে পরিচিত অনেকগুলো পদার্থও ফিটিগ-ই প্রথমে তৈরী করেন।

১৮৭৫ সালের কাছাকাছি ভাণ্টহফ এবং ল'বেল 'ষ্টিরিও কেমিষ্ট্রির' গোড়াপত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে জৈব রসায়নের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের অবসান ঘটে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও গন্ধদ্রব্য সংক্রান্ত গবেষণার সম্পূর্ণ অভিনব পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়নি। ফরাসী জাতি সৌখিনতার জন্যে সুপরিচিত। নতুন নতুন গন্ধদ্রব্যের ব্যবহারও এদের মধ্যেই বেশী। ফরাসী রাসায়নিক ভিক্টর গ্রিগনার গন্ধ-দ্রব্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েই জৈব রসায়নশাস্ত্রে অসাধারণ মৌলিকত্ব প্রদর্শন পূর্বক ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। লেবু ঘাসের তেল থেকে পাওয়া যায় সিট্রাল নামক অবিকল লেবু পাতার গন্ধযুক্ত তেল। দক্ষিণ ভারতে লেবু ঘাস প্রচুর জন্মে এবং উহার তেলও সেখানে তৈরী হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকার লেবু ঘাসের তেল বিদেশে চালান গেছে বলে শিমেল কোং-এর রিপোর্টে দেখতে পাই। অনেকেই জানেন, এই সিট্রাল থেকে রাসায়নিক উপায়ে অতি মূল্যবান গন্ধদ্রব্য—আয়োনোন তৈরী হয়ে থাকে। আমরাও ল্যাব-রেটরিতে ইহা প্রস্তুত করেছি। এখন গ্রিগনারের কথায় আসা যাক। সিট্রাল রূপান্তরিত হয়ে জন্মায় মিথাইল হেপ্টিনোন। ১৮৯৮ সালে গ্রিগনার এই পদার্থের ইথর দ্রবণের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু এবং অ্যালকাইল-হ্যালোজেনাইড-এর পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং বহুফলপ্রসূ রিঅ্যাকশন আবিষ্কার করে ফেলেন। গ্রিগনারের এই রিঅ্যাকশন সাহায্যে নানা প্রকারের জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণ সহজ হয়ে পড়ে এবং এই কাজের দরুণ তিনি নোবেল পুরস্কার পান। ১৯০৪ সালে অপর দু'জন ফরাসী রাসায়নিক—বুভো এবং ব্ল্যাঙ্ক গোলাপ ফুলের সুগন্ধির প্রধান উপাদান ফিনাইল ইথাইল অ্যালকহল তৈরীর চেষ্টায় এষ্টার শ্রেণীর পদার্থের উপর নির্জলা সুরা এবং সোডিয়াম ধাতুর ক্রিয়ায় ওই শ্রেণীর প্রাইমারি অ্যালকহল তৈরীর একটি সাধারণ পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন। এঁদের সম্মিলিত নামেই ঐ রিঅ্যাকশন পরিচিত। মেরভাইন এবং পনডর্ফের 'রিডাকশন' পদ্ধতির আবিষ্কারও হয়েছে গন্ধদ্রব্যের সন্ধানেই। এস্থলে অ্যালুমিনিয়াম অ্যালকহলেট রিএজেণ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে সিনামিক অ্যালডিহাইড থেকে সিনামিক অ্যালকহল তৈরী সহজ ও সস্তা হয়ে পড়েছে।

১৮৮০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জার্মান রাসায়নিক অটো ভালাক এবং ইংরেজ রাসায়নিক জুনিয়র পারকিন তার্পিন শ্রেণীর গন্ধদ্রব্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন। এঁদের বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণমূলক গবেষণায় শুধু যে তার্পিন কেমিষ্ট্রিরই উন্নতি হয় তা নয়, পরন্তু ইহার ফলে জৈব রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তিও প্রশস্ততর এবং দৃঢ়তর হতে থাকে।

১৯০৩ সালে কম্পা রসায়নাগারে কর্পূর সংশ্লেষণ করে খ্যাতিলাভ করেন। এতাবৎকাল রাসায়নিক-

গণের চেষ্টায় 'মনো-তার্পিন' সম্বন্ধে বহু বিষয় পরিষ্কার হলেও এর চেয়ে জটিল তার্পিনগুলো সম্বন্ধে কেউ বিশেষ আলোকপাত করতে পারেননি।

১৯২০ সাল থেকে তার্পিন-কেমিষ্ট্রির ক্ষেত্রে একজন শক্তিশালী রাসায়নিকের আবির্ভাব হয়। ইনি স্বনামধন্য লিওপোল্ড্ রুজিকা। সিলেনিয়াম সাহায্যে ডিহাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়া অবলম্বনে উচ্চশ্রেণীর জটিল তার্পিন অণুর কঙ্কাল নির্ধারণে রুজিকা সফল হলেন। ইনি তখন জুরিখে অধ্যাপক স্টাউডিঙ্গারের সহকারীরূপে তত্রত্য টেকনলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করছিলেন। জেনেভার গন্ধদ্রব্যের তদানীন্তন বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা শুইট-নেফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ডক্টর ফিলিপ শুইট রুজিকার প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের কারখানার সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানান। বিচক্ষণ শিল্পনায়ক এবং জৈব রসায়নশাস্ত্রের একনিষ্ঠ গবেষক শুইট রুজিকাকে সর্বপ্রকার সুযোগ, সম্মান ও উপযুক্ত লভ্যাংশে সন্তুষ্ট করায় রুজিকা ফারনেসল এবং নেরলিডল নামক পুষ্পগন্ধি দুটি পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সংশ্লেষণ প্রণালীতে প্রস্তুত করবার পদ্ধতি শীঘ্রই কারখানাকে দিয়ে দিলেন।

রুজিকার অক্লান্ত সাধনায় তুষ্ট প্রকৃতিদেবী যেন তাঁর গুপ্ত রহস্যের সন্ধান দিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সেবককে। রুজিকা দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন যে, অধিকাঙ্গুরীয় জটিল তার্পিনগুলোও মূলতঃ আইসোপ্রিন নামক ক্ষুদ্রাবয়ব রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়েই গঠিত। অপর অনেক প্রকার জৈব পদার্থের আণবিক তথ্য সমাধানেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করল। ধূপের ভেতরের রেজিন অ্যাসিড, রিঠার ফেনা উৎপাদক স্যাপোনিন, গাজর, লঙ্কা প্রভৃতির রঙিন পদার্থ ক্যারোটিনয়েড, এমন কি ভিটামিন-এ'র রাসায়নিক প্রকৃতিও এই তথ্যের বলে সহজবোধ্য হয়ে পড়ল। রুজিকা অনেক প্রকার জটিল তার্পিনের প্রকৃতি নির্ণয় করলেন এবং সংশ্লেষণও করলেন অনেকগুলো। 'হেলভেটিকা কিমিকা আক্টা' নামক পত্রিকায় তাঁর এই সব গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকল।

অতঃপর তিনি ফিলিপ শুইটের পরামর্শমত মৃগনাভি এবং গন্ধগোকুলের (civet cat) দেহ-সঞ্জাত সুগন্ধির স্বরূপ আবিষ্কারে এবং সেগুলো কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। ১৯২৬ সালে তিনি জুরিখের ফিডারাল ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজির অধ্যাপকের পদ লাভ করেন; কিন্তু সেখানে থাকলে তাঁর ঈপ্সিত কাজ এগোবে না ভেবে শীঘ্রই তিনি জেনেভাতে শুইট-নেফ কোং'র নবনির্মিত উচ্চাঙ্গের গবেষণার ব্যবস্থাযুক্ত ল্যাবরেটরিতে যোগদান করলেন। কয়েকজন সুদক্ষ সহকর্মীও দিবারাত্র তাঁর সঙ্গে খাটতে লাগলেন।

এই গন্ধদ্রব্যগুলোর গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে রুজিকা রসায়নশাস্ত্রের আর একটি জটিল সমস্যার সমাধান করলেন। ইতিপূর্বে রাসায়নিকেরা তিন থেকে আট কার্বনযুক্ত অঙ্গুরীয়ক আকারের অণু গঠনে সমর্থ হয়েছিলেন—নয় বা ততোধিক কার্বন দ্বারা অঙ্গুরীয়ক আকারের যৌগিক পদার্থ (ring compound) সংশ্লেষণে কেউ সমর্থ হননি। জেনেভার ল্যাবরেটরিতে রুজিকা এই জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনে কৃতকার্য হলেন এবং শীঘ্রই বহু কার্বনযুক্ত ঈপ্সিত অঙ্গুরীয়ক আকারের অণু একজালটোন, সিভেটোন, মাসকোন প্রভৃতি পদার্থ হলো ভূমিষ্ঠ। এরা যে রাসায়নিক রুজিকার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল তাই নয়, পরন্তু অতিশয় স্থায়ী ও মিষ্টগন্ধযুক্ত এই সব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পূর্বক কোম্পানি অগাধ অর্থোপার্জনের সুযোগ পেলেন। ডক্টর শুইটের দূরদৃষ্টি এবং গুণগ্রাহিতার অপূর্ব পুরস্কার হাতে হাতেই মিলল!

অনেকেই জানেন, শুইট-নেফ কোম্পানি

বর্তমানে ফারমেনিশ কোম্পানি নামে পরিচিত। রুজিকা এই কোম্পানীর ল্যাবরেটরিতে সুদক্ষ সহকারীদলকে এই সব কাজে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ দিয়ে ১৯২৭ সালে হল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী ইউট্রেকট বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৩০ সালে আবার জুরিখের ফিডারেল ইনষ্টিটিউট অব টেকনলজিতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। এখনও তিনি ওই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৩৯ সালে তিনি রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রুজিকার ইউট্রেকটে অবস্থানকালে ইদানীং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্ধন তাঁর সঙ্গে বছরাধিককাল কাজ করে উচ্চাঙ্গের তাপিন-কেমিষ্ট্রির টেকনিক সুষ্ঠুভাবে শিখে আসেন। অধ্যাপক বর্ধন এই লাইনে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন; তদ্ভিন্ন তাঁর কাছে প্রেরণা ও সাহায্য পেয়ে অনেক বাঙালী ছাত্রই এদিকে ঝুঁকেছেন। এঁদের মধ্যে ডক্টর ফণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত তাপিন-কেমিষ্ট্রিতে বেশ নাম করেছেন। ইনি জুরিখে অধ্যাপক কারার ও পরে অধ্যাপক রুজিকার সঙ্গে কাজ করার পর সম্প্রতি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন। গত বৎসর জানুয়ারি মাসে জুরিখে ৬নং ইউনিভারসিটি ষ্ট্রীটে অধ্যাপক রুজিকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি। ইনি অতিশয় হৃদ্যতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং ডক্টর ফণী দত্তকে ডেকে আমাকে তাঁর ল্যাবরেটরি দেখাতে বললেন। আমার জার্মান প্রাইমারেরও ইনি প্রশংসালিপি দিয়েছেন। 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' সদাপ্রফুল্ল এই বর্ষীয়ান অধ্যাপকের প্রীতিমধুর ব্যবহার চিরদিন মনে থাকবে।

অধ্যাপক রুজিকার বসবার ঘরের পাশেই তাঁর প্রাইভেট ল্যাবরেটরি। সেখানে দুই তিন জন সুদক্ষ রাসায়নিক বিরাট আকারের ফ্লাস্ক প্রভৃতি নিয়ে ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন করছেন দেখলাম। এর কয়েকদিন আগে ফারমেনিশ কোং'র রিসার্চ ল্যাবরেটরিতেও অনুরূপ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ হচ্ছে দেখেছিলাম। অধ্যাপকের প্রাইভেট ল্যাবরেটরিতে কারখানার সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাজই সাধারণতঃ হয় বলে শোনলাম; অবশ্য কারখানাতেও তাঁর নির্দেশে কাজের বিরাম নেই। তাঁর সুযোগ্য সহকারীরাও কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর প্রিয় শিষ্য ম্যাক্স ষ্টোল কিছুদিন পূর্বে একজাল-টোলাইড নামে মূল্যবান সুগন্ধি প্রস্তুতের নতুন উপায় উদ্ভাবন করাতে ওই মহার্ঘ্য পদার্থের মূল্য শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রতিভাবান অধ্যাপকের সহযোগিতায় রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান কিরূপ বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে অধ্যাপক রুজিকার সঙ্গে ফারমেনিশ কোম্পানির ঘনিষ্ঠ যোগ থেকেই তা বুঝা যায়। গত বছর জানুয়ারি মাসে জেনেভাতে ফারমেনিশ কোম্পানির কারখানা পরিদর্শনকালে দেখলাম, অধ্যাপক রুজিকার নোবেল মেডাল এবং নোবেল ডিপ্লোমার প্রতিলিপি রয়েছে ওঁদের বসবার ঘরে।

যদিও পাশ্চাত্য রসায়নবিদদের সাধনায় বহু মূল্যবান গন্ধদ্রব্যই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হতে শুরু করেছে তথাপি এখনও অনেক প্রকার মহার্ঘ্য সুগন্ধির কাঁচামাল হিসেবে লেবু ঘাস, পামারোজা, সিট্রোনেলা, খস, চন্দন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির তেলের ব্যবহার তেমন হ্রাস পায়নি। ১৯৪৭ সালেও ভারতবর্ষ থেকে দেড় কোটি টাকা মূল্যের এই সব গন্ধ তৈল পাশ্চাত্য দেশে চালান গেছে বলে শিমেল কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। যদি আমাদের দেশে সুদক্ষ রসায়নী পরিচালিত উপযুক্ত রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকত তবে ওই সব কাঁচামাল থেকে দেশেই উচ্চ শ্রেণীর গন্ধদ্রব্য তৈরী করতে পারলে আজ ওই দেড় কোটি টাকার স্থলে হয়ত বিশ কোটি টাকা আসত। আমাদের অসংখ্য শ্রমিক এবং শত শত বিজ্ঞানীও এই ব্যপদেশে অন্নসংস্থানের

সুযোগ পেত। আমাদের মধ্যে যাঁরা রসায়নশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করেছি তারা এই শোচনীয় ব্যাপার উপলব্ধি করে অসহায়ের মত আপসোস করছি—"আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।"

দেশের বিত্তশালী বুদ্ধিজীবীরা এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের সামনে প্রাচীন ভারতের নিষ্ঠা, সাধনা, তপস্যা প্রভৃতির আদর্শ ধরছেন; কিন্তু কিরূপ পরিবেশের মধ্যে প্রাচীনেরা সাধনা বা তপস্যা করতেন তার চিত্র তো সেই সঙ্গে তাঁরা দেখাচ্ছেন না। মহামতি এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌ জার্মান বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূলসূত্র সম্বন্ধে বলেছেন:—"Knowledge, these Germans believed might be a cultivated crop, responsive to fertilizers. They did concede, therefore, a certain amount of opportunity to the scientific mind; their public expenditure on scientific work was relatively greater, and this expenditure was abundantly rewarded. By the latter half of the 19th century the German scientific worker had made German a necessary language for every science student who wished to keep abreast with the latest work in his department, and in certain branches, and particularly in chemistry, Germany acquired a very great superiority over her western neighbours."

বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে অর্থ ভিন্ন কোনও কাজই সার্থকতা লাভ করতে পারেনা। দূরদর্শী জার্মান চিন্তাশীল লোকেরা ইহা বুঝে বিজ্ঞানের তরুণ সাধকদের উপযুক্ত অর্থদান করে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন বলেই জার্মানি বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল।

আমাদের বিজ্ঞান কলেজে প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেরণার সঙ্গে ভাতও ছড়াতেন; তাই অনেকগুলো গরীব মধ্যবিত্তের সন্তান রসায়ন বিজ্ঞানক্ষেত্রে কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন। আজ দেশবিভাগ ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ মধ্যবিত্ত-শ্রেণী মরবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এসময় জাতীয় সরকার স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করে যদি উপযুক্ত বৃত্তি, গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি দান না করেন তবে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। লাখপতির ছেলেরা কোনও দেশেই বিজ্ঞান পড়তে বড় একটা আসে না। গত বছর জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর রবার্ট সোয়াইটজার বলেন, তাঁদের দেশেও ধনাঢ্য পরিবারের ছেলেরা আইন প্রভৃতি অধ্যয়ন করে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দেবারই বেশী পক্ষপাতী। মধ্যবিত্ত সন্তানেরাই তাঁদের সাধনাদ্বারা ওদেশের বিজ্ঞানের বাতি অত ভাস্বর করে রেখেছেন। আমাদের দেশের পক্ষে একথা যে আরও সত্য তা সকলেই জানেন। 'জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হও', 'দেশের উৎপাদন বাড়াও' বলে আমাদের যেসব রাজনীতিক বাণী দিচ্ছেন তাঁরা দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি মনোযোগী হয়ে জাতির অগ্রগতির পথে যেসব বাধাবিপত্তি আছে ও দাঁড়াচ্ছে সেগুলো অপসারণে উপযুক্ত শক্তি নিয়োগ করলেই আজকার দিনে দেশের সবচেয়ে বড় কাজ করা হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

চা শিল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

বর্তমানে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বৈদেশিক পণ্যের উপর নির্ভরশীল এবং এর জন্যে বৈদেশিক মুদ্রাও আমাদের প্রয়োজন। এই মুদ্রা অর্জনে চা আমাদের অনেকখানি কাজে লাগে। ভারত থেকে প্রতি বছরে প্রায় চল্লিশ কোটি পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতের রপ্তানি পণ্যের দিক থেকে চা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে চা খায় না, এমন সভ্য পরিবার আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। প্রায় সাত লক্ষ একর জমিতে বছরে প্রায় চুয়ান্ন কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় এবং এই শিল্প থেকে দেশের প্রায় দশ লক্ষ নরনারী জীবিকা অর্জন করে। এই চা শিল্প থেকে ভারত সরকারের রাজকোষে প্রায় ১৩ কোটি টাকা বছরে জমা হয়। চা শিল্প আজকাল অনেকটা প্রসার লাভ করেছে। এর ভাল মন্দ বিচার করবার জন্যে গবেষণাগার রয়েছে। কোন্ গাছ থেকে কোন্ মাটিতে কি প্রকার চাষ-আবাদে উন্নত ধরনের ফসল হতে পারে তারও গবেষণাগার আমাদের আছে। চা-এর আবাদ আমাদের দেশে প্রথম আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে। ভারতের দার্জিলিং, আসাম এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। এছাড়া শিলেট, শিলচর, পালামপুর, ছোটনাগপুর, দেরাদুন এবং সিংহলেও চা উৎপাদিত হয়। চা প্রধানতঃ দুই প্রকারের :—(১) ব্ল্যাক টী (কালো চা) ও (২) গ্রীন টী (সবুজ চা)। আমরা যে চা ব্যবহার করি উহা কালো চা। সিংহলের কোন এক বাগানের এক সাহেব ম্যানেজার প্রথমে গ্রীন টী সম্বন্ধে গবেষণা করেন এবং তিনি ১২।১৩ বৎসর পর সাফল্য লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুই শত পঞ্চাশটি চা-বাগান আছে এবং এগুলোতে প্রায় পাঁচ লক্ষ নরনারী জীবিকা অর্জন করে। এই সব বাগানের প্রতিষ্ঠাতাদের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা প্রশংসার্হ।

দেড় শত বছর পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে চায়ের আবাদ প্রসারের চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতের যে সমস্ত সুবৃহৎ জঙ্গল বহুকাল ধরে অব্যবহার্য অবস্থায় রয়েছে সে সমস্ত জঙ্গলে চায়ের বাগান প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে অনেকে চেষ্টা করে আসছেন। কোথাও তাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন, আবার কোথাও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যে বিফলমনোরথ হয়েছেন। প্রথমে মনোনীত জঙ্গল পরিষ্কার করে রাখা হতো। ওই স্থানেরই জঙ্গল পচে বা পুড়ে ওই জমিরই খাদ্যপ্রাণ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করত। কয়েক বছর ওই ভাবে ফেলে রাখার পর চায়ের আবাদ সুরু হতো। বহু গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা কৃষি বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, সাধারণ উর্বর জমিতে তিনটি প্রধান উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে যার দ্বারা অন্যান্য গাছের ন্যায় চা গাছের জীবনীশক্তি সংগ্রহের সহায়তা হয়। যেমন—(১) নাইট্রোজেন (২) ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও (৩) পটাস।

(১) নাইট্রোজেন :—পাতা ও কাণ্ড বৃদ্ধির সহায়ক।

(২) ফস্‌ফরিক অ্যাসিড :—কাণ্ড ও শিকড় গঠনের সাহায্যে পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক।

(৩) পটাস :—গাছটির সুস্থ দেহে বেড়ে উঠার পক্ষে এবং ভাল ফল ও সুন্দর পাতা উৎপাদনের সহায়ক।

চায়ের গাছ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হলে সাধারণতঃ ১০০ হতে ১২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে ; তবে ৭০।৮০ বছর পেরিয়ে গেলে তা থেকে আর ভাল পাতা পাওয়া যায় না। চায়ের গাছকে সাধারণভাবে নিজের ইচ্ছায় বৃদ্ধি পেতে দিলে ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা যায়। কিন্তু ব্যবসায়ের সুবিধার দিক থেকে তাকে সাধারণ গাছের ন্যায় বড় হতে দেওয়া হয় না। কারণ আমরা চাই তার পাতা, কাণ্ড ও ডালপালা নয়। সেজন্যে কোন গাছকে ৪২″ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পেতে দেওয়া হয় না।

মনুষ্য জীবনের সঙ্গে গাছের জীবনেরও অনেক সাদৃশ্য আছে। মানুষের জীবনে যেমন শত্রুর অভাব নেই, গাছেরও তেমন শত্রুর অভাব নেই। যে জমিতে চা গাছ রোপণ করা হয় তা যদি অপ্রচুর পরিমাণে অ্যাসিডিক হয় তবে শিশু চা গাছ লাল চিতা বা রেড রাষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে গাছ শুকিয়ে যায়। কয়েক বৎসর আগে নতুন চারা রোপণ করবার সময় সেটিকে Bordeaux mixture-এর মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়া হতো, লাল চিতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। কিন্তু নতুন থিওরি অনুসারে তা আর করা হয় না। আজকাল গাছ রোপণ করবার পর ১% Burgundy mixture-এর সঙ্গে Rosin adhesive অথবা ½% Perenox দিয়ে স্প্রে করা হয়। এ গেল চারা গাছের শত্রুর কথা। গাছ বড় হলেও তার নিস্তার নেই। তখন আরও বেশী শত্রু; যার জন্যে টী প্ল্যাণ্টার্সদের বেশী রকম সতর্ক হতে দেখা যায়। মশা ও হিলোপেল্‌টিস্‌ বড় গাছের বড় শত্রু। চা-বাগান এলাকাগুলোতে সাধারণতঃ জুন মাসে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। তখন অনেক সময় রাতদিন বৃষ্টি হয়। সেই সময়ে দেখা যায়, কোন কোন চা গাছের পাতা মশার দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং কালো কালো দাগে পাতা ভর্তি হয়ে পড়ে। যে সব গাছ মশা দ্বারা আক্রান্ত হয় সে সব গাছে ডি. ডি. টি. সলিউসিন স্প্রে করা হয়ে থাকে। মশক দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছের ফসল দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কোয়ালিটিও নেমে যায়। বিভিন্ন স্থানের চা বিভিন্ন সময়ে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয়। জুন মাসের উৎপন্ন চা আসাম অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ চা। ডুয়ার্স ও টেরাই অঞ্চলে তা নয়। বছরের শেষ-ভাগে উৎপন্ন চা এখানকার শ্রেষ্ঠ চা বলে পরিগণিত হয়।

মানুষের যেমন সহজ ও সুন্দর পথে চলতে হলে চাই—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, চাই—উপযুক্ত খাদ্য, চা গাছেরও ঠিক তেমনটি-ই দরকার। বাড়ীতে আমরা যদি সামান্য সবজী গাছও রোপণ করি তবে তার খাদ্যের অভাব হলে সেই গাছের গোড়াতে দিই মল-মাটি এবং জল, আর গোড়ার মাটি দিই মধ্যে মধ্যে আলগা করে। আবার পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই গাছের উপর আমরা উনুনের ছাই ছিটিয়ে দিই। এই ছাই ছিটানোর মধ্যেও বৈজ্ঞানিক হেতু রয়েছে। এই ছাই-এ যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষারজাত পদার্থ বিদ্যমান। অন্যান্য গাছের মত চা গাছের জীবনেও এই রকম যত্নের বিশেষ প্রয়োজন। সহজ ও সুন্দরভাবে বৃদ্ধি পাবার জন্যে এর জীবনেও দরকার মল-মাটি, খইল, নাইট্রেট অফ সোডা, বোন-ডাষ্ট, সালফেট অব অ্যামোনিয়া, ধঞ্চে ও নিম কেক্‌ ইত্যাদি। যে টী-প্ল্যাণ্টার সব দিকে নজর রেখে এদিকেও বিশেষ নজর দেন, তিনিই বিশেষ কৃতকার্য হতে সক্ষম হন।

কোন কোন চা বাগানে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা ছাড়াও কতকগুলো গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। চায়ের বীজ দেখতে প্রায় গোল। আমাদের দেশের মাঝারি ধরনের টক কুলের আঠির মত। যে গাছ থেকে চায়ের বীজ

সংগ্রহ করা হয়, সে গাছগুলোকে বাড়তে দেওয়া হয়। এই বীজ থেকেই সাধারণতঃ চা গাছ প্রসার লাভ করে। চায়ের বীজ বোনা হয় শীতের সময়; নভেম্বর মাসের প্রথম থেকেই। আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় যেমন ধান গাছের রোপণ প্রথা আছে অর্থাৎ প্রথমে কোন কর্ষিত জমিতে বীজ-ধান বোনা হয়, পরে গাছ কিছু বড় হলে সেখান থেকে অন্য জায়গায় লাগানো হয়, চা গাছও ঠিক ওই প্রথাতে লাগানো হয়। প্রত্যেক চা বাগানেই নিজস্ব একটি করে Nursery (অন্যত্র রোপণার্থ যেস্থানে চারা গাছ তৈরী করা হয়) থাকে। বীজ থেকে চায়ের গাছ বের হবার ভঙ্গিমাও অন্য ধরনের। সাধারণতঃ বীজ থেকে যে গাছ হয় তার শিকড় থাকে নীচে ও পাতা উপর থেকে বের হয়। কিন্তু চা গাছ সেভাবে গজায় না। ইহা উল্টো পথে বীজ থেকে গাছে পরিণত হয়। চারা গাছ বড় হওয়ার পর সেখান থেকে অন্যত্র রোপণ করা হয়। ইহাকে বলা হয় plantation বা নয়া রোপণ। এই নয়া রোপণের মধ্যেও যথেষ্ট কারুকার্য আছে। শিশু গাছ রোপণ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে প্রত্যেকটি গাছ একই লাইনে থাকে এবং প্রত্যেকের মধ্যকার দূরত্বও সমান থাকে। রোপণ প্রধানতঃ দুই প্রকার— ত্রিভুজাকার রোপণ ও সমকোণী রোপণ। চায়ের দেশে জমির মাপ একরে। রোপণের পূর্বে যে জায়গায় রোপণ করা হবে তা উত্তমরূপে তৈরী করা দরকার। ঐ জায়গায় বেশী পরিমাণে শিকড় থাকলে শিশু গাছের শিকড় বাড়তে পারে না; ফলে তার মূল শিকড় জলস্তরে পৌঁছুতে পারে না এবং গাছের সহজ বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে। চা গাছ শীতের প্রারম্ভে রোপণের হেতু হচ্ছে, এই সময় সূর্যের কিরণ থাকে অল্প, আর প্রায় সামনেই বর্ষাকাল। যে ক্ষেতে শিশুগাছ লাগানো হয় তাতে সারি দিয়ে "Bogu medeloa"-র গাছ লাগানো হয়। এই গাছের উপকারিতা হচ্ছে, এরা চারা গাছগুলোকে ছায়া দান করে এবং ঐ ক্ষেত্রের মাটিতে বালির ভাগ বেশী থাকলে সেই বালিকে মাটিতে পরিণত করবার ইহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

জলপাইগুড়ির পর্বতসান্নিধ্যে এবং আসাম দার্জিলিং-এ প্রচুর বারিপাত চা গাছের জীবন যাত্রার অনুকূল। এই জন্যেই এই সব অঞ্চলে চা বাগান গড়ে উঠেছে। চায়ের দেশের বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৭৫" থেকে ২০০" পর্যন্ত উঠা নামা করে। বিভিন্ন চা অঞ্চলের বারিপাত বিভিন্ন। যেমন আসাম ভ্যালি, ডিব্রুগড়—১১২.১১, শিবসাগর— ৯৪.৩৫, তেজপুর—৭৩.০৮, গৌহাটী—৬৭.১৯ ডুয়ার্স. জলপাইগুড়ি—১২৫.৭২, বক্সা—২০৮.৬১, দার্জিলিং—১২১.৪০ ও কার্শিয়াং—১৬০.৬৫। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, উচ্চতর জায়গার চা অধিকতর উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সেখানকার চায়ে Liquor ও Flavour দুই-ই পাওয়া যায়। ডুয়ার্স অঞ্চল অপেক্ষা দার্জিলিং অঞ্চলের উচ্চতা অধিক বলে' ডুয়ার্স অঞ্চলের চা অপেক্ষা দার্জিলিং অঞ্চলের চায়ে অধিকতর Flavour পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, উচ্চতর জায়গার মাটিতে Essential Oil (যা থেকে Flavour হয়) বেশী পরিমাণে বিদ্যমান।

চায়ের উৎকৃষ্টতা কতকগুলো জিনিসের উপর নির্ভর করে। সেইগুলোর সুযোগ-সুবিধা ঘটলে ও তাতে যত্ন নিলে উৎকৃষ্ট চা আমরা পেতে পারি। যেমন (১) উচ্চতা, (২) নিয়মিতভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বারিপাত (৩) মাটির চরিত্র ও তাতে সার প্রদান (৪) Kind of Pruning (চায়ের দেশে যাকে বলে কলম করা) (৫) পাতি তুলিবার নিয়ম (৬) Manufacturing অর্থাৎ যে উপায়ে চা পাতি থেকে বাজারের চায়ে পরিণত করা হয়।

প্রত্যেক চা বাগান কাজের সুবিধার জন্যে

কতকগুলো ব্লকে বিভক্ত করা হয়। যেমন কোন বাগানের আয়তন ৪২৩ একর; সেটাকে ভাগ করা হয়েছে ১২।১৩ ব্লকে। এখানে সারা বছরেই চাষ-আবাদ চলে। যেমন—ব্লক পরিষ্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, গাছের গোড়া খুঁচিয়ে দেওয়া, সার দেওয়া এবং পোকা-মাকড়ের দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। চা বাগানের Harvest Time হচ্ছে মার্চ মাস থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্তও কোন কোন জায়গায় চলে। এখানে কাজকর্ম সুশৃঙ্খলার সহিত নিয়মানুবর্তিতাতে চলে। যে ব্লকে '৪৮ সালে Pruning অর্থাৎ কলম করা হয়েছে, '৪৯ সালে সে ব্লকে আর কলম করা হয় না। সেখানে সেবার চলে Skiffing অর্থাৎ ঝুড়নি। সার দেওয়া ও মাটি চিলা করা কিংবা গাছ পরিষ্কার রাখা ছাড়া কলম ও ঝুড়নির উপর চা বেশী অথবা কম, ভাল অথবা মন্দ হওয়া যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে। এই দুটি কাজই Tea Cultivation-এ অপরিহার্য। প্রত্যেক লাইনের প্রতিটি গাছ Pruning অথবা Skiffing করবার পর সম উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। Harvest time পেরিয়ে গেলেই অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম দিক থেকেই Pruning ও Skiffing আরম্ভ করা হয়।

বর্ষার আরম্ভেই সেই কলম অথবা ঝুড়নি করা গাছ থেকে নতুন সবুজ পাতা গজাতে থাকে।

এর পরই দেখা যায়—চা বাগানের শ্রেষ্ঠ শোভা। বড় বড় টুকরী পিছনে ঝুলিয়ে মেয়ে কুলিরা ক্ষিপ্র-হস্তে আপন মনে নিজের সারিতে দাঁড়িয়ে নতুন কচি পাতা তুলে যাচ্ছে। দুটি পাতা ও একটা কুঁড়ি তোলবার নিয়ম। কিন্তু তা প্রায়ই হয় না। তারা তিন, চার, সাড়ে চার পাতা পর্যন্ত তুলতে থাকে নিজের ওজন বেশী করবার জন্যে। তারপর পাতাগুলো নিয়ে আসে ফ্যাক্টরীতে, যেখানে সবুজ পাতা থেকে আমাদের ব্যবহারোপ-যোগী চা ম্যানুফ্যাক্চার করা হয়। অবশেষে এই চা রূপালী রংয়ের প্যাকেটে ভর্তি করে দেশবিদেশে রপ্তানী করা হয়ে থাকে।

আলোকচিত্রের অবদ্রব

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

আধুনিক আলোকচিত্রে প্রথমতঃ বিষয়বস্তুর একখানা নেগেটিভ প্রস্তুত করিয়া পরে (১) ঐ নেগেটিভ হইতে অবদ্রব মাখানো অন্য আশ্রয়ের উপর ছাপ তুলিয়া একাধিক আসল চিত্র বা পজিটিভ পাওয়া যায়; অথবা (২) ঐ নেগেটিভকেই একটি মাত্র আসল চিত্রে রূপান্তরিত করা হয়। এই নেগেটিভের উপরই আসল চিত্রের সৌন্দর্য ও সজীবতা নির্ভর করে। তাই সুষ্ঠু কাজের জন্য নেগেটিভ প্রস্তুতের অবদ্রবকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

সুদীর্ঘ কালের অক্লান্ত চেষ্টায় ও গবেষণায় মানুষ যে কার্যক্ষম আলোকচিত্রের অবদ্রব বা ইমালসন প্রস্তুত করিল তাহাতে সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সত্য বটে যে, এই প্রথম আবিষ্কৃত অবদ্রবে প্রকৃতির প্রতিরূপ অক্লেশে স্পষ্ট পাওয়া যাইত; কিন্তু কোথায় যেন একটু ত্রুটি থাকিয়া যাইত। সরস লাল একটি অ্যাপেল ছবিতে নীরস বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আলোকচিত্রে আলোকই তাহার প্রাণ।

পদার্থের রং বা বর্ণের সহিত আলোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মোটামুটিভাবে সকল পদার্থেরই নিজস্ব একটা বর্ণ আছে; কিন্তু আলোর অভাবে সবই কালো দেখায়।

ইথার বাহিত আলোকরশ্মি আমরা সাদা চোখে সাদা বলিয়াই বুঝি। আসলে কিন্তু তাহা নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সার আইজ্যাক নিউটন সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহা বিভিন্ন বর্ণরশ্মির সমষ্টি। এই আলোক-বর্ণমালাকে বর্ণালী বলা হয়। মোটামুটি উহা সাতটি দৃশ্য বর্ণরশ্মি :—

বেগুনি, ঘননীল,* নীল, সবুজ, হলদে, নারঙ্ ও লাল।

আলোকচিত্র-বিশারদগণ কিন্তু বর্ণালীকে নিম্ন-লিখিতরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন :—

বেগুনি, নীল, সবুজ, হলদে, নারঙ্, উজ্জ্বল লাল ও গাঢ় লাল।

প্রত্যেক বস্তুর উপর আলোকের সাতটি রশ্মিই সব সময়ে গিয়া পড়ে; কিন্তু প্রত্যেক পদার্থের ধর্ম এই যে, উহা মাত্র বিশিষ্ট কয়েকটি বর্ণ-রশ্মি প্রতি-ফলিত করে এবং বাকী রশ্মিগুলি শুষিয়া লয়।

সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত আলোকচিত্রের অবদ্রবে† বিষয়বস্তুর দুই-তিনটি রং ছাড়া অন্যান্য রঙের অনুভূতি ছবিতে ফুটিয়া উঠিত না। গবেষণায় দেখা গেল যে, পৃথক পৃথক সিলভার সল্ট দ্বারা প্রস্তুত অবদ্রব ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারে মাত্র। আবার ঐ তিনটি সিলভার-হ্যালাইডস্-এর পারস্পরিক যৌগিক ব্যবহারেও মাত্র তিনটি রং ছাড়া অন্য রংগুলির অনুভূতি ধরা পড়িত না। সিলভার ক্লোরাইড অবদ্রব কেবলমাত্র অতিবেগুনিই গ্রহণ করে। স্বাভাবিক এক্সপোজারে সিলভার-ব্রোম-আয়োডাইড অবদ্রবে, অতিবেগুনি, বেগুনি, নীল ও আংশিক সবুজ রশ্মিরই অনুভূতি পাওয়া যায়; বর্ণালীর অন্য বর্ণগুলি ধরা পড়ে না। ঐ রংগুলি ছবিতে এরূপ কালো হইয়া প্রকাশ পায় যে, উহার স্বরূপ দৃশ্যতঃ বুঝা যায় না। আবার এই অবদ্রবে কোন একটি বিশেষ বর্ণের আনুপাতিক এক্সপোজার লইলে সেই বর্ণের অনুভূতিই ফুটিয়া উঠিবে মাত্র; কিন্তু অন্যান্য বর্ণগুলি কোনটা অত্যন্ত কালো, কোনটা বা ফ্যাকাশে সাদা হইয়া ছবিতে প্রকাশ পাইবে; অর্থাৎ আলোকের প্রতিফলন স্বাভাবিক চক্ষুতে যেরূপ আমরা দেখিয়া থাকি সেরূপ সামঞ্জস্য ছবিতে ফুটিয়া উঠিবে না। বর্ণের প্রকারভেদে আলোক প্রতিফলন-ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিই ইহার কারণ*। স্বাভাবিক এক্সপোজারে এই প্রথম আবিষ্কৃত অবদ্রবটিতে ঐ তিনটি বর্ণের (অতিবেগুনি, বেগুনি ও নীল) অনুভূতি পরিষ্কার পাওয়া যায় বলিয়া ইহার কার্যক্ষমতা ঐ তিনটি বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাই অর্ডিনারি বা সাধারণ অবদ্রব।

রঙীন বস্ত্রাদির রং আলোর সংস্পর্শে ক্রমশঃ হাল্কা হয়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মিলিত রঙের একটি রং উঠিয়া গিয়া মূল রঙের পরিবর্তনও হয়। আলোকস্পর্শে রঙের এইরূপ পরিবর্তনের সূত্র ধরিয়াই বোধহয় বার্লিনের ডক্টর হারম্যান ভোগেল আলোকচিত্রের ঐরূপ বর্ণ সম্বন্ধীয় কঠিন বিষয়ের মীমাংসার সংকেত দিয়াছিলেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট অনুভূতিপ্রবণ রঞ্জকপদার্থের উল্লেখ করেন নাই সত্য, কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কয়েক প্রকার রঞ্জক-দ্রবণের মধ্যে আলোকচিত্রের সিলভার-ব্রোম-আয়োডাইড মাখানো প্লেট ভিজাইয়া বর্ণালীর অতিবেগুনি হইতে হলদে পর্যন্ত রংগুলির আংশিক অনুভূতি আনাইয়া ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও

* কেহ কেহ আবার ঘননীল অংশটি বাদ দিয়া ছয়টি রং ধরেন।

† আলোকচিত্রের অবদ্রব (উপকরণ) "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ডিসেম্বর '৫০ দ্রষ্টব্য।

* "আলোকচিত্রে আলোক" প্রবন্ধ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এপ্রিল' ৪৯ দ্রষ্টব্য।

দেখাইয়াছিলেন। সেই সময়ে অনুভূতিপ্রবণ রঞ্জকপদার্থ সম্বন্ধে রসায়ন-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তেমন ছিল না বলিয়াই অতি ধীরে ধীরে ইহার গবেষণা চলিয়াছিল। গবেষণা দ্বারা জার্মেনী হইতেই সর্বপ্রথম এই কাজের উপযুক্ত রঞ্জকপদার্থ আবিষ্কৃত হয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (১৯১৪ খৃষ্টাব্দ) অন্যান্য দেশ এ বিষয়ে জার্মেনীরই মুখাপেক্ষী ছিল।

ডক্টর ভোগেলের সংকেত অনুসরণ করিয়া প্রথম আবিষ্কৃত অনুভূতিপ্রবণ রঞ্জকপদার্থযোগে ঐ অবদ্রবের অনুভূতি-সামর্থ্য অতিবেগুনি হইতে সবুজ ও আংশিক হল্‌দে পর্যন্ত প্রসারিত হইল। তখন ইহাকেই প্রাধান্য দিয়া অরথোক্রোম্যাটিক বা আইসোক্রোম্যাটিক অর্থাৎ যথার্থ বা সমবর্ণ বিশিষ্ট অবদ্রব আখ্যা দেওয়া হয়। নাম অনুযায়ী ইহার কাজ কিন্তু পূর্ণমাত্রায় হয় না; স্বাভাবিক এক্সপোজারে উহার বর্ণানুভূতি-সামর্থ্য হল্‌দে পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

গবেষণার ক্রমোন্নতিতে উহা হইতেও সত্যিকারের সমান বর্ণানুভূতিসম্পন্ন সিলভার হ্যালাইডস্-এর প্রচলন হইল। রঞ্জকপদার্থযুক্ত এই অবদ্রব বর্ণালীর দৃশ্য সমস্ত রঙেরই যথার্থ অনুভূতি গ্রহণ করিতে পারে। পরে ইহাকেই প্যান্‌ক্রোম্যাটিক অর্থাৎ সর্ববর্ণানুভূতিসম্পন্ন নাম দেওয়া হয় (গ্রীক শব্দ প্যান্ অর্থ সর্ব ও ক্রোমা অর্থ রং বা বর্ণ)। প্যান্‌ক্রোম্যাটিক নাম দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ইহাতে সামান্য ত্রুটি থাকিয়া যায়। অতিবেগুনি ও নীল রঙের ঔজ্জ্বল্য এই প্যান্‌ক্রোম্যাটিক অবদ্রবের উপর অপেক্ষাকৃত উগ্র তেজে কাজ করে; কিন্তু ছবি তুলিবার সময় ক্যামেরা-লেন্‌সের মুখে উপযুক্ত ফিলটার (বিশেষ রঙের পরকলা) ব্যবহারে ওই অসমঞ্জস উগ্রতা সংযত করা যায়। আবার এই অবদ্রবে গাঢ় লালের পূর্ণমাত্রার অনুভূতি পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাতে সাধারণ সুষ্ঠু কাজের কোনই বাধা হয় না।

গাঢ় লাল-এর যে অংশ প্যান্‌ক্রোম্যাটিকে পাওয়া যায় না, তাহার ও অদৃশ্য উজানি-লাল বা ইন্‌ফ্রা-রেড-এর অনুভূতির জন্য (১) এক্সট্রিম রেড ও (২) ইন্‌ফ্রা-রেড অবদ্রবের প্রচলন হয়। প্রথমটিতে, অতিবেগুনি, বেগুনি, নীল, গাঢ় লাল ও উজানি-লাল এবং দ্বিতীয়টিতে, অতিবেগুনি, বেগুনি, নীল ও উজানি-লাল-এর অনুভূতি পাওয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে এই দুই শ্রেণীর অবদ্রব ব্যবহার করা হয় তাহাতে সবুজ, হল্‌দে, নারঙ্ ইত্যাদি রং ধরা না পড়িলে কোনই ক্ষতি হয় না। আবার এক্সট্রিম রেড, ইন্‌ফ্রা-রেড ও প্যান্‌ক্রোম্যাটিক—এই তিনের সংমিশ্রণ ব্যবস্থায় দৃশ্য, অদৃশ্য নয়টি বর্ণানুভূতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত প্যান্‌ক্রোম্যাটিক-ইন্‌ফ্রা-রেড অবদ্রবেরও প্রচলন আছে; কিন্তু 'স্পেক্ট্রোস্কোপি'র ন্যায় বিশেষ কাজ ভিন্ন ইহার ব্যবহার হয় না। নিম্নে বিভিন্ন অবদ্রবের বর্ণানুভূতির একটি চিত্র দেওয়া গেল।
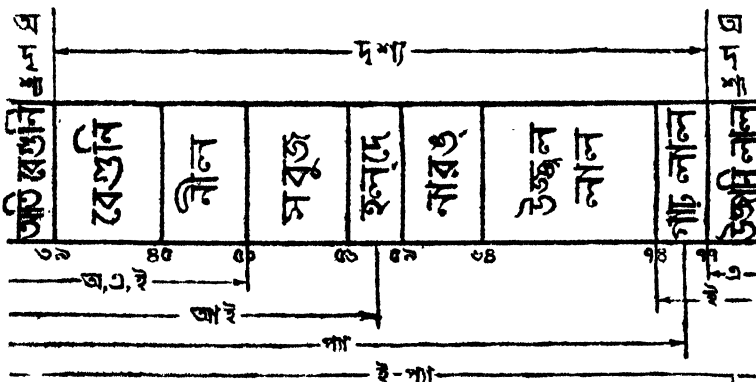
অ—অর্ডিনারি; আই—আইসো বা অরথোক্রোম্যাটিক; প্যা—প্যান্‌ক্রোম্যাটিক; এ, এ—এক্সট্রিম রেড; ই, ই—ইন্‌ফ্রা-রেড; ই-প্যা—ইন্‌ফ্রা-রেড প্যান্‌ক্রোম্যাটিক।

এই সকল অবদ্রব বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতিই গ্রহণ করে মাত্র; বিষয়বস্তুর আসল রং ধরা পড়ে না। একটি দৃশ্যে যতগুলি রংই থাকুক না কেন, সেই সব রঙের বিভিন্ন রূপ ধরা পড়িবে একমাত্র আলো-ছায়ার সমাবেশে সাদা ও কালো রঙের রূপ লইয়া।

ক্যামব্রিজের গণিত অধ্যাপক জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রঞ্জিত (টেক্নিকলার) আলোকচিত্রের কল্পনা করিয়া উহা যে সম্ভব তাহার প্রমাণ দেখান। ফরাসী দেশের লুইস্ ডুকোস্ ডু হারুণ এবং আমেরিকার এফ্, টি, আইভস্, লাল, সবুজ ও নীল রঙের তিনখানা কাচের মধ্য দিয়া আলো বিচ্ছুরিত করিয়া পৃথক পৃথক তিনখানা নেগেটিভ তুলিয়া দৃশ্যবস্তুর স্বাভাবিক রং যে অবদ্রবের উপর ধরা সম্ভব তাহার প্রমাণ দেখান। যদিও ইহাদের গবেষণা ১৮৬২ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইয়াছিল তবুও কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কাহারও দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মিস্টার জন জলী একখানা মাত্র প্লেটের উপরে মামুলী রঞ্জিত আলোকচিত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। এই সকল প্রমাণের সূত্র ধরিয়াই আজ রঞ্জিত আলোকচিত্র তোলা সহজ হইয়াছে।

রঞ্জিত আলোকচিত্র তুলিবার সমাবেশ প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের। কাচ কিংবা সেলুলয়েডের উপর জরদা মিশ্রিত লাল, সবুজ ও বেগুনি অথবা লাল, সবুজ ও নীল রঙের শ্বেতসার কণিকার দৃঢ় কলপ দেওয়া হয়। পরিস্ফুটন (ডেভেলপিং) ও অন্যান্য জলীয় দ্রবণের প্রক্রিয়ায় যাহাতে উহা ধুইয়া না যায় সেইজন্য ঐ কলপের উপরে একটি জলরোধক প্রলেপ দেওয়া হয়। পরে প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রব মাখানো হয়। কোন কোন প্রস্তুতকারক প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রব প্রলেপের উল্টা পিঠে ঐ রঞ্জিত শ্বেতসারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

স্বতন্ত্র একপ্রকার তিনরঙা স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম পর্দারও প্রচলন আছে। উহা যে কোন প্যানক্রোম্যাটিক প্লেটের উপর রাখিয়া স্বাভাবিক রঞ্জিত-চিত্র তোলা যায়। রঞ্জিত আলোকচিত্র তুলিবার জন্য প্লেট বা ফিল্মে রাসায়নিক বিন্যাস যত প্রকারই থাকুক না কেন আসলে প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রবই উহার মূল উপাদান।

জার্মেনীর ওরজ্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ, সি, রোণ্টগেন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কোন একটি বিষয়ের গবেষণা করিবার সময় একপ্রকার রশ্মির সন্ধান পান। তিনি উহাকে এক্স-রে অর্থাৎ অজানা রশ্মি বলিয়া অভিহিত করেন। জনসাধারণ কিন্তু তাঁহার নামানুসারে ঐ রশ্মিকে রোণ্টগেন-রে বা রঞ্জন-রশ্মি বলিয়া থাকে। এই রশ্মি অনেক প্রকার অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ করিয়া যায়। দেখা যায় যে, মোড়কের মধ্যে আলোকচিত্রের উপকরণগুলিও এই রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সুযোগ লইয়া ঐ রশ্মিপাতে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক চিত্র তুলিবার পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক্সপোজার লইয়াও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত না। পরে গবেষণা দ্বারা উদ্ভাবিত প্রতিপ্রভ ব্যবস্থায় এই রশ্মিকে সাধারণ আলোকে পরিণত করিয়া চকিত-চিত্র তুলিবার প্রচলন হয় এবং ঐ আলোকের অনুভূতির উপযুক্ত বিশেষ একপ্রকার অবদ্রবেরও প্রচলন হয়। ইহাই এক্স-রে ফিল্মের অবদ্রব।

বর্তমানে এমন একটি সুদৃঢ় ভিত্তি ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর "আলোকচিত্রের অবদ্রবের ক্রম-বিকাশ" প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, "বিজ্ঞান-লোক"-এর যে কোন নূতন আলোকের সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত অবদ্রব প্রস্তুত করিতে আলোক-চিত্রবিশারদগণের মোটেই বেগ পাইতে হইবে না।

চার্লস মার্টিন হল্

শ্রীসরোজকুমার দে

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্গে আজ সকলেই পরিচিত। এই জিনিসটি তৈরীর পিছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এই ধাতুটির কথা অনেকেই কিছু কিছু জানতেন; কিন্তু কেমন করে খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হতে পারে সে তথ্য কারুর জানা ছিল না। তাই ডোভ, ডেভাইল, উলার, মার্টিন হল্ প্রমুখ বিখ্যাত রসায়নবিদেরা অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; কিন্তু একমাত্র হল্ ও উলার এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২৭ সালে উলারই প্রথম অল্প পরিমাণে খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম তৈরী করতে সমর্থ হন। অ্যালুমিনিয়ামকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহজলভ্য করবার কাজে হল্ই হয়েছেন প্রকৃত জয়ী; কারণ সহজ উপায়ে ও অল্প ব্যয়ে অ্যালুমিনিয়াম তৈরীর প্রণালী তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন। তাই আজ অ্যালুমিনিয়াম শিল্পজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ওহিয়োর ওবারলিন নামে একটি গ্রামে ১৮৬৩ সালে চার্লস মার্টিন হলের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই রসায়নশাস্ত্রের প্রতি হলের বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। বাড়ীতে ছিল তাঁর পিতার আমলের একখানা রসায়নশাস্ত্রের বই। বই খানির মলাট ও প্রথম দু'খানি পাতা ছিঁড়ে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। এই বইখানিই ছিল হলের একমাত্র প্রিয় জিনিস। তিনি যখন ওবারলিন গ্রামের স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই বইখানি পড়তে সুরু করেন। স্কুলের পাঠ্য বই পড়ে থাকত, তিনি একমনে পড়ে যেতেন রসায়নের বইখানি। স্কুলের পড়া তৈরী না করলে যে মাষ্টারের কাছে বকুনি খেতে হবে, সেটা তাঁর খেয়ালই থাকত না। বইটিতে রসায়নের বিচিত্র বিবরণ পড়তে পড়তে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন, আর ভাবতেন—আমিও বড় হলে এ রকমের নানা জিনিস আবিষ্কার করব—আমার আবিষ্কারের কথা তখন সবাই আলোচনা করবে। অন্ততঃ একটি বিষয়ে হলের এই আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে সফল হয়েছিল।

ওবারলিন গ্রামে ছিল একটি কলেজ। হল্ প্রায়ই কলেজের রসায়নাগারে যেতেন। প্রতি দিন তিনি দু'একটি করে জলখাবারের পয়সা জমাতেন। সেই জমানো পয়সা দিয়ে তিনি কলেজ থেকে গ্লাস টিউব, টেষ্ট টিউব ও নানা রকমের অ্যাসিড প্রভৃতি কিনে আনতেন। এই সব জিনিস নিয়ে রসায়নের বই দেখে দেখে তাঁর বিবিধ পরীক্ষা চলত।

ঐ কলেজে জুয়েট নামে একজন অধ্যাপক ছিলেন। হলের প্রতি তাঁর প্রায়ই চোখ পড়ত। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে রসায়নের জিনিস কিনে নিয়ে যেতে দেখে হলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি ভাবলেন, ছেলেবেলা থেকে বিজ্ঞানের প্রতি যার এত টান বড় হলে সে নিশ্চয়ই একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবে। অধ্যাপক জুয়েটের এই ধারণা পরে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

কয়েক বছর পরেই স্কুলের পড়া শেষ করে হল্ ওবারলিন কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলেন। কলেজে রসায়নশাস্ত্র পড়াতেন অধ্যাপক জুয়েট। ক্লাসে পড়াতে পড়াতে একদিন হলের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হল্ বেশ মেধাবী এবং রসায়নশাস্ত্রের বিষয় জানতে খুবই উৎসুক। অধ্যাপক জুয়েট একদিন

হল্‌কে তাঁর বিজ্ঞানাগারে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁকে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে পাশে বসিয়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। হল্ মুগ্ধ হয়ে সে সব শুনতেন। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বস্তুগুলো তাঁর মনে তখন অপরিসীম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করত।

একদিন অধ্যাপক জুয়েট ক্লাসে পড়াতে পড়াতে বললেন, কেউ যদি অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম ধাতু তৈরীর প্রণালী উদ্ভাবন করতে পারে তাতে সে নিজেই কেবল লাভবান হবে না, সমগ্র জগৎও লাভবান হবে। কথা কয়টি হলের মনে গভীর রেখাপাত করলো। সেইদিন ক্লাসের শেষে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, আমি অ্যালুমিনিয়াম তৈরীর জন্যে চললাম।

চার্লস হলের সেইদিন থেকে চললো অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। তাঁর মনে সর্বদা একই চিন্তা ঘোরাফেরা করতে লাগল—কেমন করে অ্যালুমিনিয়াম তৈরী করা যায়। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হলো যদি মৃত্তিকা মিশ্রিত অ্যালুমিনিয়াম ধাতুতে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা যায় তাহলে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যেতে পারে। তখনই তিনি ছুটে গেলেন জুয়েটের কাছে কিছু সাহায্য পাবার আশায়। জুয়েট তাঁকে কয়েকটি যন্ত্র দিয়ে সাহায্য করলেন এবং তাছাড়া তিনি নিজেও কিছু তৈরী করে নিলেন। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রণালী তাঁর জানা ছিল। কাচের কাপ, জার প্রভৃতি যা কিছু পেলেন তাতেই বৈদ্যুতিক সেল্ তৈরী করে তিনি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কাজে লাগাতে লাগলেন। এমনি করে হলের বাড়ীতে একটা ছোটখাট বিজ্ঞানাগার তৈরী হয়ে গেল। সেখানেই চললো তাঁর দিনরাত্রি গবেষণা।

ছয় মাস ধরে হল্ অবিশ্রান্তভাবে গবেষণা করে যেতে লাগলেন। গবেষণার মাঝে কোথায় কিসের সন্ধান পেলেন, মাঝে মাঝে সে সংবাদ জানাতে লাগলেন অধ্যাপক জুয়েটকে। জুয়েটও তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন।

সেদিন ১৮৮৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। বাইশ বছরের তরুণ যুবক মার্টিণ হলের গবেষণা ফলবতী হলো। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন জুয়েটের অফিসে। হাতখানি অধ্যাপকের দিকে বাড়িয়ে বললেন, “মাষ্টার মশাই, এই আমি পেয়েছি।” অধ্যাপক বিস্মিত নেত্রে দেখেন, হলের হাতে গোটাকয়েক ছোট ছোট গুলির আকারে অ্যালুমিনিয়াম চক্‌চক্ করছে।

সেই সর্বপ্রথম অ্যালুমিনিয়াম বৈদ্যুতিক প্রণালীতে তৈরী হলো। ঘটনার মাত্র বছরখানেক পূর্ব পর্যন্ত সারা জগতে সাত আট টনের বেশী অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হতো না। তাছাড়া তখন এক সের ওজনের অ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল প্রায় ৪৮০ টাকা। হলের আবিষ্কারের ফলে সেই জিনিস আজ পর্যাপ্ত এবং সহজলভ্য।

হল্ দেখালেন যে, বক্সাইট্ নামে এক প্রকার মৃত্তিকামিশ্রিত ধাতু অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড্ বা ক্রাইয়োলাইটের সঙ্গে মেশালে অতি সহজেই গলে যায়। এই দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতি সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। এই ভাবে একটি লোহার চৌবাচ্চা তৈরী করা হলো। চৌবাচ্চার ভিতরের চারদিকে কার্বন দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো—এটি হলো ক্যাথোড। চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হলো বক্সাইট ও ক্রাইওলাইট মিশ্রিত দ্রবণটি এবং তাতে গোটাকয়েক কার্বন রড্ ডুবিয়ে দেওয়া হলো—এটি হলো অ্যানোড। হল্ এর মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ পরিচালন করে দেখলেন, অ্যালুমিনিয়াম ধাতু গলিত অবস্থায় চৌবাচ্চার তলায় দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে জমা হচ্ছে। এ জিনিসটাই হলো বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম।

মার্টিন হল প্রবর্তিত এই বৈদ্যুতিক প্রণালীতে আজ জগতে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ হাজার টন

হিসেবে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। অ্যালুমিনিয়ামের এরূপ প্রাচুর্যের জন্যে জগতের মানুষ কতখানি যে লাভবান হয়েছে তা ভাবলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে অটোমোবাইল ও এরোপ্লেনের কারখানায়। অ্যালুমিনিয়াম না থাকলে বোধহয় বর্তমানে মোটর-বাস, ট্রাম, এরোপ্লেন কিছুই তৈরী করা সম্ভবপর হতো না। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী চায়ের কেট্‌লী, কাপ, বাটি, থালা, গ্লাস, বিজলী বাতির শেড্‌ প্রভৃতি বহু জিনিস আজ পৃথিবীর প্রতি গৃহস্থালিতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। লোহার কারখানাতেও অ্যালুমিনিয়াম খুব কাজে লাগে। আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে গরম করলে প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং সেই গলিত মিশ্র ধাতুর সাহায্যে ভাঙা রেলের লাইন, প্রোপেলার প্রভৃতি জোড়া হয়ে থাকে। একে বলা হয়, থারমাইট ওয়েল্ডিং। এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম মারাত্মক অস্ত্রেও ব্যবহৃত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত থারমাইট ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী বোমই তার নিদর্শন। তাই একথা সকলকেই স্বীকার করতে হয় যে, মার্টিন হল্‌ জগতে এক যুগান্তর এনে দিয়েছেন।

এখানে আরও দু'একটি কথা না বললে অ্যালুমিনিয়ামের ইতিহাসের কিছু অংশ অসমাপ্ত থেকে যায়। মার্টিন হলের ভাগ্য ছিল ভাল। তিনি যদি আরও কিছুদিন বাদে তাঁর প্রণালী আবিষ্কার করতেন, মনে হয় তাহলে জগতে চার্লস মার্টিন হলের নাম পরিচিত হতো না। কারণ ঠিক কয়েক সপ্তাহ পরেই ফ্রান্সে পল্‌ হারুল্ট নামে এক যুবক ঠিক একই উপায়ে অ্যালুমিনিয়াম তৈরীর প্রণালী আবিষ্কার করেন। হল্‌ এবং হারুল্টের মধ্যে মোটেই জানাশুনা ছিল না। দুজনের মধ্যে কে কোন্‌ বিষয়ে গবেষণা করছেন, পরস্পর কেউ কিছুই জানতেন না। হল্‌ এবং হারুল্টের নাম যখন জগতে প্রচারিত হলো তখন আমেরিকা চাইলো হলের নামে প্রণালীটি পেটেন্ট করতে এবং ইউরোপ চাইলো হারুল্টের নামে পেটেন্ট করতে। অবশেষে দুই মহাদেশের মধ্যে মতস্থির হয়ে ঐ প্রণালীটির নাম দেওয়া হলো "হল্‌ অথবা হারুল্টের বৈদ্যুতিক প্রণালী।"

হলের শেষ জীবনটা কেটেছে লোকালয়ের অন্তরালে। তিনি ইচ্ছে করলে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা বসিয়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করে সারা-জীবন বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি মহৎ, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জগতবাসীর স্বার্থকেই বড় করে দেখেছিলেন। নম্র ও সরল ছিল তাঁর চরিত্র, সাধাসিধে জীবন যাপনই ছিল তাঁর জীবনের কাম্য। সঙ্গীত ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর শেষ জীবনটা কেটেছে সঙ্গীত ও চারুকলার মধ্যে।

১৯১৪ সালে হলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমেরিকাবাসীর শিক্ষা বিস্তারে দান করে যান। এই সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ—প্রায় ১৫০০০০০ ডলার—পায় তাঁর প্রথম জীবনের ওবারলিনের প্রিয় কলেজ। মার্টিন হলের অমর স্মৃতি স্বরূপ সেই কলেজে রসায়ন-বিজ্ঞানাগারে তাঁর একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী প্রতিমূর্তি বসান হয়েছে।

ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েও ভারতবর্ষ আজও শিল্পে ও শিল্পজাত দ্রব্যে পর-নির্ভরশীল; আভ্যন্তরীণ অর্থ-সংকটে শিল্প উন্নয়ন প্রচেষ্টাও ব্যাহত হতে চলেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জীবন-ধারণের মান উন্নত করে তোলবার উপযোগী অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য এবং উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিদেশে রপ্তানীর উপরই দেশের সমৃদ্ধি ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ ৭৬ কোটি টাকার কাঁচা মাল এবং ৫১ কোটি টাকার শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করেছিল; পক্ষান্তরে তার আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি টাকার কাঁচা মাল এবং ৯২ কোটি টাকার শিল্পজাত দ্রব্য। খাদ্যের আমদানী বা রপ্তানী এই হিসেবে ধরা হয়নি। দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্যের অভাব প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের খাদ্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে বাধ্য করেছে। কাজেই আমাদের দেশ ক্রমশঃ আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মোট রপ্তানী মুদ্রার পরিমাণ ৪২৩ কোটি টাকা এবং আমদানী মুদ্রা ৫১৮ কোটি টাকা। এই অস্বাভাবিক ঘাটতি দেশের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। ভারতীয় মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। কাজেই বিশেষজ্ঞেরা বলতে সুরু করেছেন, আমদানী কমিয়ে রপ্তানী বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। রপ্তানী-বিশেষজ্ঞ কমিটি একথাও বলেছেন যে, দেশের খাদ্য উৎপাদন যতটা সম্ভব কমিয়ে পাট, তুলা, চা ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন। দেশে উৎপন্ন কাঁচা মালেরও বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদরা পরামর্শ দিতে সুরু করেছেন। কাঁচা চামড়া, লাক্ষা, চাঁচগালা, অভ্র এবং বিবিধ অপরিশোধিত খনিজ পদার্থের রপ্তানি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। সম্প্রতি ম্যাঙ্গানিজের বদলে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করার যথেষ্ট চেষ্টা চলেছে। ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর অবস্থান, বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ, পরিশোধনপ্রণালী, শিল্পে এই ধাতুর ব্যবহার এবং ভারতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রভৃতি এই প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ম্যাঙ্গানিজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদ। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে রাশিয়ার স্থান শীর্ষদেশে। তার পরেই ভারতের স্থান। কিন্তু উৎকর্ষে সম্ভবতঃ ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজই সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮৯১ সালে সর্বপ্রথম এদেশে ম্যাঙ্গানিজ আহরণের চেষ্টা সুরু হয়। ভিজাগাপট্টম জেলার খনিতে উত্তোলন কার্য আরম্ভ করার জন্যে সেই সময় একটি কোম্পানী গঠিত হয়। তখন থেকেই এদেশে এই ধাতুর খনন কার্য আরম্ভ হয়েছে। ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থানে এই ধাতুর আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির নীচে কোন ধাতুই সাধারণতঃ মৌলিক ধাতুরূপে বর্তমান থাকে না। একটি ধাতুর সঙ্গে দুই বা ততোধিক ধাতু, অক্সিজেন, গন্ধক, অঙ্গার, বিবিধ লবণ ইত্যাদির সমবায়ে জটিল যৌগিক পদার্থরূপে মাটির নীচে প্রস্তর, কঙ্কর ও বালির সঙ্গে জমাট-বাঁধা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কাজেই খনি থেকে সদ্য-উত্তোলিত ধাতু, বিশুদ্ধ ধাতু নয়;

একে বলা যেতে পারে খনিজ ধাতু বা ধাতব প্রস্তর; ইংরাজীতে বলে 'ওর'। ম্যাঙ্গানিজ ধাতব প্রস্তরে এই ধাতু সাধারণতঃ গন্ধক, অঙ্গার বা অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। লৌহও যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রস্তরে অনুরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। উপাদানের বিভিন্নতায় এই ধাতব প্রস্তরের বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ আছে। যথা :—পাইরোলুসাইট, ম্যাঙ্গানিজ-ব্রেণ্ড, কোডারাইট, গোণ্ডাইট, ব্রনাইট, সিলোমেলেন ইত্যাদি। ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরকে সাধারণতঃ দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—(১) গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্টম জেলার কোডারাইট এবং ম্যাঙ্গানিজ গারনেট (২) ধারওয়ারের পার্বত্য শিলাতে পাইরোলুসাইট এবং গোয়া অঞ্চলের গোণ্ডাইট। ভারতীয় জিয়োলজিক্যাল সোসাইটির বিবরণী থেকে কয়েকটি স্থানের ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তরের উপাদান প্রভৃতির হিসেব দেওয়া গেল :—

অঞ্চল	খনিজ প্রস্তর	ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ	লৌহের পরিমাণ	বালুকণা (সিলিকা)
		শতাংশ	শতাংশ	শতাংশ
ভিজাগাপট্টম	কোডারাইট	৪০'৬৭	১২'৬৮	৪'৭৭
মধ্যপ্রদেশ	গোণ্ডাইট	৫১'৪৮	৬'৮	৫'৯৯
গাংপুর	,,	৪৯'৩১	৮'৪৪	৮'১৪
বেলগাঁও	ল্যাটারাইট	১০	৪৪'৭৭	১০'৩৩
ধারওয়ার	,,	৩১'৬১	১৬'৮	১৯'১
সাতারা	,,	৪০'৭৯	৬'৯৪	৩'৭৫
জব্বলপুর	,,	৪৫'৫৬	৬'৭৯	২'৬৮

মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশেই সবচেয়ে বেশী ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভিজাগাপট্টমের টোনাম অঞ্চলে ব্রনাইট, পাইরোলুসাইট, সিলোমেলান প্রভৃতি ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর আছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, এই সব প্রস্তরে গড়ে শতকরা ৪৪'৭৭ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ বিদ্যমান। এই অঞ্চলের সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় ৫০,৫০০ টন। লোলেঙ্গভদ্রা এবং পনসগড্ডার প্রস্তরে ৭'১ থেকে ২২'১৫% ম্যাঙ্গানিজ আছে এবং এই অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ টন। পাটনা দেশীয় রাজ্যে, উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে, সান্দুর রাজ্যে এবং আরও অনেক দেশীয় রাজ্যে যথেষ্ট ম্যাঙ্গানিজ বর্তমান। ১৯৪৫ ও ৪৬ সালে ভারতে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,১০,৫৮৩ টন এবং ২৫,২,৯১৬ টন এবং ভারতীয় বন্দরে তাদের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৪৮,২০,৩২৮ এবং ৫৫,২১০,৮১ টাকা। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশের বলগাট অঞ্চলের উৎপাদনই শীর্ষস্থান অধিকার করে। যথা :—১৯৪৫ সালে ৩৬,৬৭৯ টন এবং ১৯৪৬ সালে ৭৪,৮৪৫ টন।

বিদেশে ম্যাঙ্গানিজের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। আমেরিকা প্রধানতঃ রাশিয়া থেকেই এই ধাতু আমদানী করত। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে মন কষাকষি চলায় সে দেশ থেকে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কাজেই আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি রিসোর্স বোর্ড ভারত ও আফ্রিকা থেকে ম্যাঙ্গানিজ সংগ্রহ করতে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। ১৯৪৮ সালের প্রথমার্ধে ভারত থেকে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৬২০০০ টন, ১৯৪৯ সালের প্রথমার্ধে সেই রপ্তানীর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে

২৬৯০০০ টন। আরও জানা গেছে যে, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ৩,৪৪,৬০১ টাকা মূল্যের ৯০,০০০ হন্দর এবং ৪,২০,৭১৪ টাকা মূল্যের ১১০২৮০ হন্দর ম্যাঙ্গানিজ বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে বিদেশে চালান হয়ে যায়। এই ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরের মূল্যের হার এইরূপ ছিল; যথা:—৪৮% খনিজ-মাঙ্গানিজ প্রতি টন ৮০ টাকা, ৪৬-৪৮% খনিজ ম্যাঙ্গানিজের মূল্য প্রতি টন ৭৫ টাকা এবং ৪০-৪১ শতাংশের কম ম্যাঙ্গানিজ আছে এরূপ খনিজ প্রস্তরের মূল্য প্রতি টন ৪৮ টাকা মাত্র অনুমান করা যায়। এই ধাতুর রপ্তানী বাবদ ১৯৪৯-৫০ সালে যে শুল্ক আদায় হবে তার পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। আমেরিকাই সব চেয়ে বেশী ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহার করে থাকে। ১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে আমেরিকা কেবলমাত্র ভারত থেকেই ৯৯,৬৯২ টন ম্যাঙ্গানিজ সংগ্রহ করেছিল এবং আফ্রিকা ও রাশিয়া থেকে আমদানী করে যথাক্রমে ৯১,৮৪৯ টন এবং ২০১৬ টন।

বালি, কঙ্কর, মাটি মিশ্রিত খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর থেকে খাঁটি ম্যাঙ্গানিজ ধাতু বের করে নেওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। খনি থেকে সদ্য উত্তোলিত এই খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর থেকে বিবিধ প্রক্রিয়ায় যতটা সম্ভব বালি কঙ্কর ইত্যাদি দূরীভূত করা হয়। ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার প্রধানতঃ লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের মিশ্র ধাতু হিসেবে এবং ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ বিদ্যমান থাকায় এই মিশ্র ধাতু এক সঙ্গেই তৈরী করা সম্ভব। অক্সিজেনের যৌগিক অর্থাৎ অক্সাইড হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ পাইরোলুসাইট নামক খনিজ প্রস্তরে বর্তমান থাকে। অঙ্গার বা কোক কয়লার সঙ্গে চূর্ণীকৃত এই ধাতব প্রস্তর এবং পরিমাণ মত চুন একসঙ্গে মিশিয়ে ব্লাষ্ট ফারনেস নামক চুল্লীতে বা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে গলান হয়। কয়লার অঙ্গার এই প্রস্তরের অক্সাইডস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন করে এবং লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে এই দুটির মিশ্র ধাতুতে পরিণত হয়ে যায়। এই অক্সিজেন বিমুক্তিকরণ অর্থাৎ রিডাক্সন, হাইড্রোজেন গ্যাস সহযোগেও করা যায়। হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়ে গরম জলীয় বাষ্প-রূপে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এতেও প্রচণ্ড তাপের প্রয়োজন হয়। গোল্ডস্মিথ প্রণালীতে অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করা অল্প ব্যয় সাধ্য এবং অল্প শ্রম সাধ্যও বটে। এই প্রণালীতে একটি খুব বড় সিলিকা বা আগুনে পোড়ানো মাটির তৈরী পাত্র বা ঘড়ে অর্থাৎ ক্রুসিবল নেওয়া হয়। অক্সাইড জাতীয় চূর্ণীকৃত ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তর ১ ভাগ এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুচূর্ণ আড়াই ভাগ একত্র মিশ্রিত করে সেই পাত্রে ভর্তি করে কিছু অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ ও বেরিয়াম পারঅক্সাইড মিশ্রিত করে তার ওপর রাখা হয়। একটি ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর তার সেই মিশ্রিত পদার্থের ভেতর প্রবেশ করিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে দিলে ম্যাগনেশিয়ামের তার অতি উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে যে তাপ উৎপন্ন করবে। সেই তাপে বেরিয়াম অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ জ্বলে উঠে আরও প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করবে; তাতে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হবে। ২৭ গ্র্যাম অ্যালুমিনিয়ামের প্রজ্জ্বলনে প্রায় ১৮০,০০০ ক্যালোরী তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই তাপে ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং এই অ্যালুমিনিয়াম সেই অক্সিজেন গ্রহণ করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে রূপান্তরিত হবে।

ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড + অ্যালুমিনিয়াম → ম্যাঙ্গানিজ + অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। পাত্রের তলদেশে গলিত ম্যাঙ্গানিজ জমা হবে। এই ম্যাঙ্গানিজ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এতে অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ম্যাঙ্গানিজের মত অঙ্গার নিহিত থাকবে না।

প্রায় সর্বপ্রকার ইস্পাতেই ম্যাঙ্গানিজ একটি

অপরিহার্য উপাদান। ইস্পাতে এর পরিমাণ '২৫ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবহার করা চলে। ম্যাঙ্গানিজ খুব শক্ত ধাতু, তবে লৌহের মত তত শক্ত নয়। ইস্পাতে সামান্য ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি তার প্রকৃতির কোন বিশেষ পরিবর্তন করে না; কিন্তু অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ থাকলে ম্যাঙ্গানিজ ষ্টীল নামক বিশেষ ধরনের ইস্পাত তৈরী হয়। কারও কারও মতে অল্প অঙ্গার এবং অধিক ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত ইস্পাত নাকি ভঙ্গুর হয়; কিন্তু এই ভঙ্গপ্রবণতা মোটেই ম্যাঙ্গানিজের আধিক্যের জন্যে নয়, ইস্পাত প্রস্তুত-প্রণালীর গলদই এই জন্যে দায়ী। এর ব্যবহারে ইস্পাত অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্ত হয়। রেল লাইন, ট্রাম লাইনের ক্রসিং এবং লাইন যেখানে বেঁকে গেছে—সেই সমস্ত স্থান অধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলে সেখানে ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত ইস্পাত ব্যবহার করা হয়। এই সমস্ত রেল লাইনে ব্যবহৃত সাধারণ ইস্পাতে যেখানে মাত্র ৯ মাস চলবে সেখানে ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত ৯ বছর অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত বুলেট-রোধী শিরস্ত্রাণ এই ইস্পাতে তৈরী হতো। বিভিন্ন যন্ত্রে ব্যবহৃত স্প্রিং সিলিকো-ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাতে তৈরী হয়ে থাকে। পাথর ভাঙ্গা যন্ত্রের দাঁত, জাহাজের বয়লার, সিন্ধুক প্রভৃতি তৈরীতেও ম্যাঙ্গানিজ-ইস্পাতের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। তামা ও দস্তার মিশ্রণে শতকরা ২ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ম্যাঙ্গানিজ-পেতল তৈরী হয়ে থাকে। এই ধরনের পেতল বা ব্রোঞ্জ সমুদ্রের নোনা জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বলে জাহাজের চাকা, হাল এবং অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ম্যাঙ্গানিজ থেকে পটাশ পারমাঙ্গানেট নামক একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী হয়। জীবাণুনাশক পদার্থ হিসেবে, কূপের জলের জীবাণু নষ্ট করতে, ব্লিচিং বা স্বভাবজ রং দূরীকরণ কার্যে এবং অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়ায় অক্সিজেন সরবরাহকারক হিসেবে এই পদার্থটির প্রয়োজনও কম নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ম্যাঙ্গানিজ ধাতু একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় গাছের পাতা ও কাণ্ডে রাসায়নিক পরীক্ষায় ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্ব প্রদর্শন করেছেন এবং আরও দেখিয়েছেন যে, গাছের বৃদ্ধি ও সজীবতা বা শ্যামলতার জন্যে ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি অপরিহার্য।

আমাদের দেশে ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ-প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ ধাতু হিসেবে ম্যাঙ্গানিজকে পৃথক করা হয় না। ম্যাঙ্গানিজঘটিত লৌহকে ব্লাষ্ট ফারনেসে গলিয়ে ম্যাঙ্গানিফেরাস লৌহ তৈরী করা হয়। কিন্তু ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশী হলে লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজের মিশ্র ধাতু তৈরী হয়ে থাকে। বেসিমার প্রণালীতে ইস্পাত তৈরী কাযে এই মিশ্র ধাতু ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি লৌহকে অক্সিজেন গ্রহণে বাধা দেয়। কাজেই সমস্ত অঙ্গার অক্সিজেনের দহনে কার্বন মনোক্সাইড ও ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। আমাদের দেশে লৌহ-শিল্পের কারখানা খুব বেশী নেই। কাজেই দেশের উৎপন্ন ম্যাঙ্গানিজ আমাদের কারখানাগুলোর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশী পরিমাণে রয়েছে। সুতরাং এই মূল্যবান পদার্থটির বিদেশে রপ্তানী বর্তমানে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না, বরং বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণে কিছুটা সহায়তা করবে। জানা গেছে যে, এই ধাতুর রপ্তানীর পরিমাণ এ-বছর (১৯৪৯-৫০) সাত লক্ষ টনে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, খনিজ ম্যাঙ্গানিজ-প্রস্তরে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ রয়েছে। কাজেই ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানীর সঙ্গে সঙ্গে লৌহও বিদেশে চলে যাচ্ছে, অথচ ম্যাঙ্গানিজ থেকে লৌহ পৃথক করা বহু ব্যয়সাধ্য। আমেরিকার মত দেশে এই লৌহঘটিত ম্যাঙ্গানিজে প্রয়োজন মত লৌহ মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের সমস্ত ম্যাঙ্গানিজকে ম্যাঙ্গানিজ-ঘটিত ইস্পাতে পরিণত করার মত লৌহ আমাদের দেশে নেই, তাছাড়া এদেশে লৌহ-শিল্পের কারখানাও মুষ্টিমেয়।

আমন ধান

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ধান জন্মে, যথা—আমন, আউশ এবং বোরো ধান। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু রকমারি ধান আছে, বিশেষতঃ আমন ধানের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে আমন ধানই প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণীর ধানের জমির পরিমাণ এইরূপ :—

আমন ৭৭৯৫০০০ একর
আউশ ১৪৭০০০০ "
বোরো ৫৫০০০ "

কৃষি-বিভাগের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর ধানের চাউলের গড় ফলন হইতেছে—

আমন—১২.৪ মণ
আউশ—১০.৯ "
বোরো – ১৩.৬ "

মোটামুটি ১½ মণ ধানে এক মণ চাউল পাওয়া যায়। অনেকের মতে উপরোক্ত গড় ফলন অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন রকম ধানের ফলন বিভিন্ন পরিমাণে হইয়া থাকে। প্রকার ভেদে ধানের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের ; অর্থাৎ কোন কোন ধান অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ফলে, কোন কোন ধান অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে অল্প জলে জন্মে; কোন জাতীয় ধান অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে; আবার কোন কোন জাতীয় ধান অপেক্ষাকৃত আগে পরিপক্ব হয়। সুতরাং জমি এবং জল বায়ুর অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক কৃষক ধানের চাষ করে। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে কম ফলনের ধানের চাষ করিতে হয়।

আমন ধান দুই প্রকারে উৎপন্ন করা যায় :—(১) জমি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর বীজ ছড়াইয়া দিতে হয় এবং (২) প্রথমে বীজ-ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন করিয়া পরে আসল জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়। সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে বীজ ছড়াইতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ প্রথমে বীজ-ক্ষেত্রে চারা উৎপাদন করিয়া আমন ধানের চাষ করা হয়। এই দুই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ধান প্রায় এক সময়েই পরিপক্ব হয়।

সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে চারার জন্য বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। বীজ-ক্ষেত্র উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা দরকার। বীজ-ক্ষেত্র যত বেশী গভীর-ভাবে চষা হইবে এবং সারবান হইবে চারাও তত বেশী সবল হইবে। সবল চারা হইতেই সবল ফসল উৎপন্ন হয়। জমি অনুসারে চাষের ও পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ৫।৬ বার লাঙ্গল দিয়া বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্রে প্রায় ১৪।১৫ বিঘার উপযুক্ত চারা উৎপন্ন হয়। বর্তমান সময়ে এক বিঘা বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে মোটামুটি নিম্নলিখিত খরচ হয়। তবে অবস্থাবিশেষে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। প্রধানতঃ স্থানীয় শ্রমিকদের মজুরির হারের উপর ইহা নির্ভর করে।

	টা	আ	পা
(১) ছয়বার লাঙ্গল—			
(প্রতি লাঙ্গল ১ টা ১২ আ হিসাবে)	১০	৮	০
(২) বীজ ধান ২ মণ	২৪	০	০
(৩) গোবর সার ৮০ ঝোড়া (৩০ মণ)			
বহন ও প্রয়োগ খরচ	৪	০	০
(৪) আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ	৩	৮	০
	৪২	০	০

উক্ত হিসাবে গোবরের মূল্য ধরা হয় নাই। সাধারণতঃ কৃষকেরা নিজেদের গোয়ালের গোবর

ব্যবহার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে চারা শীঘ্র উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার (অ্যামোনিয়াম সালফেট), খইল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় ; কিন্তু ইহার প্রচলন খুবই কম। রাসায়নিক সার, খইল প্রভৃতি প্রয়োগের জন্য আরও ১০।১২ টাকা বেশী খরচ হয়। যে জমিতে চারা রোপণ করা হয় তাহা প্রস্তুত, ফসলের পরিচর্যা, ধান কাটা, আঁটি বাঁধা, বহন, গাদা দেওয়া, ঝাড়ন, মাড়ন প্রভৃতির খরচ এইরূপ :—

	টা	আ	পা
(১) তিন খানা লাঙ্গল— (প্রতি লাঙ্গল ৩ টা ৮ আ হিসাবে)	১০	৮	০
(২) রোয়া ৪ জন (প্রতি জন ২ টা হিসাবে)	৮	০	০
(৩) নিড়ান ২ জন (প্রতি জন ১ টা ১২ আ হিসাবে)	৩	৮	০
(৪) জমির আইল বাঁধা একজন	২	০	০
(৫) ধান কাটা ৪ জন	৮	০	০
(৬) আঁটি বাঁধা, বহন, গাদা দেওয়া ২½ জন (প্রতি জন ৩ টাকা হিসাবে)	৭	৮	০
(৭) ঝাড়ন, মাড়ন ৩ জন (প্রতি জন ১টা ১২ আ হিসাবে)	৫	৪	০
(৮) আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ	২	৪	০
	৪৭	০	০
চারার খরচ	৩	০	০
জমির খাজনা	৪	০	০
	৫৪	০	০

বর্তমান বৎসরে ধান ও খড়ের ফলন এবং মূল্য নিম্নলিখিত হিসাবে দেওয়া হইল—

	ফলন	মণ প্রতি মূল্য	মোট মূল্য টা	আ	পা
ধান	৮ মণ	১১ টাকা	৮৮	০	০
খড়	১ কাহন	২২ „	২২	০	০
			১১০	০	০

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়ার অন্তর্গত এলাকা সমূহ হইতে সংগৃহীত ধান-চাষের খরচ এবং ফলন ও মূল্যের হিসাব উপরে দেওয়া হইল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বর্তমান বৎসরে ধানের ফলন গড় ফলন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইয়াছে ; সুতরাং লাভের অঙ্কও অধিক। যাঁহারা নিজের জমিতে নিজ তত্ত্বাবধানে এবং নিজ খরচে ধানের চাষ করিয়াছেন তাঁহারাই বর্তমান বৎসরে উপরোক্ত পরিমাণে লাভবান হইবেন। কিন্তু ভাগ-চাষের জমি হইতে ভাগ-চাষী বিঘা প্রতি ৫০ টাকা (খাজনা বাদে) খরচ করিয়া মোটামুটি ৫০।৫৫ টাকাই পাইবেন। কারণ ভাগ-চাষী ফলনের অর্ধেক পায়। এই ক্ষেত্রে জমির অধিকারী কেবল মাত্র (জমির খাজনা বাদ) বিনা ব্যয়ে ৫০ টাকা পাইবেন।

বর্তমানে ভাগ-চাষীদের প্রধান অভিযোগ এই যে, জমির অধিকারী বিনা খরচে বিঘা প্রতি ৫০ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও ফলনের পরিমাণ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে কিছু মাত্র খরচ করিতেও কার্পণ্য করিয়া থাকেন। উন্নত শ্রেণীর বীজও তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দেন না, জমিতে সার প্রয়োগের দিকেও তাঁহাদের কোন দৃষ্টি নাই ; জল সেচন ও জল নিষ্কাশনের প্রতি তাঁহারা একেবারে উদাসীন। অথচ তাঁহাদের চেষ্টাতে অনেকটা সুব্যবস্থা হইতে পারে। উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ফলনের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পায় তাহা বলা বাহুল্য। ফলনের পরিমাণ বাড়িলে ভাগ-চাষীরাও অনেকটা উপকৃত হইতে পারে ; ইহাতে জমির মালিকগণেরও বেশী লাভের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা বিনা খরচে এবং বিনা চেষ্টায় যাহা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে জমির মালিক জমিতে কিছু রাসায়নিক সার প্রয়োগের খরচ বহন করিয়া থাকেন। বর্গাচাষীদের আর একটি অভিযোগ এই যে, অন্ততঃ বীজের

মূল্যের অর্ধেক অংশ জমির অধিকারীর বহন করা উচিত। তাদের আরও অভিযোগ এই যে, চাষের সময় সাধারণতঃ তাহারা জমির মালিকদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পান না। কিছু অর্থের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত সুদের হারে তাহা জমির মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হয়। এমন কি, ২।৪ মণ ধান লইলেও সুদ হিসাবে অতিরিক্ত পরিমাণ ধান দিতে হয়। এ সম্বন্ধে লিখিত কোন কাগজপত্র দলিলাদি থাকে না। ধান কাটার পর জমির মালিকেরা উহা কাটিয়া লন।

বর্গা-চাষীদের বিরুদ্ধেও জমির অধিকারীদের বহু অভিযোগ আছে। তন্মধ্যে প্রধান অভিযোগ এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্গা-চাষীরা রীতিমতভাবে জমি চাষ করে না। যে সকল বর্গা-চাষীর নিজেদের হাল-বলদ আছে তাহারা লাঙ্গল গরু ভাড়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া অন্যের জমি উপযুক্ত সময়ে চাষ করে এবং বর্গা-চাষের জমি সাধারণতঃ অবহেলিত হয়। জমির অধিকারীদের ইহাও ধারণা যে, বর্গা-চাষীরা নিজেদের জমি যেরূপ যত্নপূর্বক ও উপযুক্ত সময়ে চাষ করে বর্গা-চাষের জমি তেমন করে না। জমির অধিকারীদের শ্রমিকদের সম্বন্ধেও এই অভিযোগ যে, তাহারা পূর্বের কর্মকুশলতা হারাইয়াছে, কিম্বা ইচ্ছা করিয়াই পূর্বের কর্মকুশলতা অনুযায়ী কাজ করে না; আগের তুলনায় বর্তমানে তাঁহাদের কার্যের পরিমাণ কম। অনেকের মতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং নানারূপ ব্যাধির (প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া) আক্রমণে তাহারা পূর্বের কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বর্তমানে চাষীদের আরও অনেক রকমে বিপর্যস্ত হইতে হয়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যেস্থলে জমির স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের পথে পুকুর, বাঁধ প্রভৃতি প্রস্তুতের দ্বারা জমির জল নিষ্কাশন অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে জমির জল আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ধানের চাষের সময়ে উক্ত জমিতে এত বেশী জল থাকে যে, উহাতে ধানের চাষ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া পূর্বকালে সেচের জন্য গ্রামের মধ্যে যে সকল হানা, জাওনা প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল বর্তমানে তাহা বুজিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে এই সকল হানা ও জাওনা প্রভৃতি কাটিয়া দিলে জল সেচনের বর্তমান অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। ২।১ ক্ষেত্রে কৃষকেরা নিজেরাই এই সকল নালা, জাওনা প্রভৃতি কাটিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু স্থানীয় বাধা অনেক আছে। এ সম্বন্ধে ১৩৫৬ সালের ১লা শ্রাবণের "খাদ্য উৎপাদনে" শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী কর্তৃপক্ষের গোচরে এই বিষয়টি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ২।১টি এলাকার কৃষকদের এইরূপ অভিযোগ এই যে, জলকর দিয়াও তাহারা সময়মত জল পায় না। উদাহরণ স্বরূপ একটি এলাকার কথা উল্লেখ করিতেছি। বর্ধমান জেলার জামালপুরে অবস্থিত ইডেন ক্যানেল হইতে হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গীপাড়া থানার কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ছয়টি কবাট কল আছে। কৃষ্ণনগরের কবাট কলই শেষ কবাট কল; কিন্তু নির্ধারিত সময় এক একটি কবাট কল খোলা না হওয়ার জন্য শেষ এলাকায় জল উপযুক্ত সময়ে পৌঁছয় না। ফলে সেই সকল এলাকায় ধানের চাষ "নাবী" হইয়া পড়ে এবং চারা বেশী লাগে ফলনও কম হয়। ইহা ছাড়া কৃষকগণ কর্তৃক নদীর মধ্যে অস্থায়ী বাঁধ দেওয়ার জন্য জল আসিতে দেরী হয়। গত ১৩৫৫ সালের ১৬ই চৈত্রের "খাদ্য উৎপাদনে" এই সম্বন্ধেও কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছিল; কিন্তু উহা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ধানের চাষ সম্বন্ধে সর্ব প্রথম দুইটি কথা মনে রাখিতে হইবে—"সরাও

ও ভরাও”, অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে জল নিষ্কাশন কর এবং উপযুক্ত সময়ে ক্ষেত জলে পূর্ণ কর।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, ধানের চাষে সাধারণতঃ বিশেষ লাভ হয় না। কৃষকেরা বলে যে, গাঁয়ে গতরে পরিশ্রম করিয়া যতটা সম্ভব তাহারা নিজেদের ও গরুর আহারের সংস্থান করে। অবশ্য বড় বড় কৃষকদের কথা পৃথক। ছোট ছোট কৃষক ধানের চাষে লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে না; তাহাদের সংস্কার এই যে, নিজেদের আহারের সংস্থান করিতেই হইবে! ইহা ছাড়া ধানের চাষে ঘর হইতে তাহাদের নগদ অর্থ বাহির করিতে হয় না। বীজ ধান ঘরেই থাকে, সারের বিশেষ বালাই নাই; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোবর সারও প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু আলুর চাষের বেলায় তাহারা লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখে; কারণ আলুর বীজ, সার প্রভৃতি তাহাদের ঘরের টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হয়। বর্তমানে আলুর বীজের ও সারের মূল্য খুবই বেশী।

ছোট ছোট কৃষকদের সহিত বহু আলোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছি যে, বর্তমান সময়েও তাহারা ধানের মূল্য কমাইবার পক্ষপাতী। তাহাদের যুক্তি এই যে, হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ তাহাদের ২।১০ মণ ধান বিক্রয় করিতে হয় বটে এবং ধানের মূল্য কমিলে ২।১০ মণ ধান বিক্রয় করিলে তাহাদের ক্ষতিই হইবে; কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাদের ধান ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং ধানের মূল্য কমিলে তাহাদের উপকারই হইবে। এইরূপ ছোট ছোট কৃষকের সংখ্যাই বেশী।

জেরোগ্রাফী

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

সম্প্রতি আমেরিকায় ছাপানো বা ঐ জাতীয় দলিল ইত্যাদির বহুসংখ্যক ‘কপি’ খুব অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ‘ফটো-কন্‌ডাক্‌টিভিটি’ এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ প্রভাবান্বিত কণিকার পরস্পরকে আকর্ষণ করার শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ‘কপি’ করার যত রকম পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে কিছু না কিছু জলীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই পদ্ধতিটি অভিনব এবং কোনও প্রকার জলীয় পদার্থের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে—জেরোগ্রাফী। জেরস (Xeros) কথাটি গ্রীক্—অর্থ হলো ‘শুষ্ক’ এবং গ্রাফোস্ (Graphos) অর্থে লিখন।

প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো—সাধারণ ফটো তোলার জন্যে যেমন ‘প্লেট’ ব্যবহার হয় সেই ধরনের একটি ‘প্লেট’। এই প্লেটটি ফটো-প্লেটের মত কাচের নয়, অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী একটি পাতলা ফলক। এর গায়ে অ্যান্‌থ্রাসিন নামক একজাতীয় বস্তুর প্রলেপ লাগানো থাকে। ফটোপ্লেট একবারের বেশী ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু জেরোগ্রাফীর এই অ্যান্‌থ্রাসিনযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম প্লেট বহুবার ব্যবহার করা যায়। ফটোপ্লেটের মত এই জেরোগ্রাফীর প্লেটটিকেও আলো বাঁচিয়ে সাবধানে রাখতে হয়। কারণ অ্যান্‌থ্রাসিন বস্তুটিতে আলো লাগলেই বিদ্যুৎ পরিবহন করে। অ্যান্‌থ্রাসিন প্লেটের ওপর কোনও স্থানে আলোকসম্পাত করে বিদ্যুৎ চালনা করলে ঐ আলোকিত অংশটুকুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়; কিন্তু প্লেটটি অন্ধ-

কারে রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করলে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না—অন্ধকারে অ্যানথ্রাসিন বস্তুটি 'নন্-কন্ডাকটর' বা অপরিবাহী। অ্যান্থ্রাসিন জাতীয় বস্তু আরও আবিষ্কার করা যায় কিনা তার গবেষণা চলছে।

এই অ্যান্থ্রাসিন প্রলেপযুক্ত প্লেটটিকে যদি অন্ধকারে কোনও কাপড় দিয়ে ঘষা যায় তাহলে প্রলিপ্ত পৃষ্ঠটি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয় এবং যতক্ষণ অন্ধকারে থাকে ততক্ষণ তড়িৎসংস্থা লুপ্ত হয় না। এভাবে চার্জ বা তড়িৎগ্রস্ত করার আর একটি পদ্ধতি আছে। কোনও তারের মধ্য দিয়ে হাই ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনা করলে তারটির চারদিকে একটি জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে—তা খালি চোখে দেখা যায়। এর নাম হলো 'করোণা'। এই রকম হাই ভোল্টের ডি, সি, বিদ্যুৎ পরিবাহিত কোনও সরু তারের খুব কাছ ঘেঁসে অ্যান্থ্রাসিন প্লেটটিকে সঞ্চালিত করলে করোণার সংস্পর্শে এসে অ্যান্থ্রাসিন প্রলিপ্ত পৃষ্ঠটি ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়।

এইভাবে তড়িৎগ্রস্ত প্লেটটিকে সাধারণ ফটোপ্লেটের মত আলো বাঁচিয়ে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণ ক্যামেরায় বা কোনও ফ্রেমে এটিকে পরিয়ে দেওয়া হয়। লিখিত বা মুদ্রিত যে বস্তুর ছবি তোলা হবে সেটিকে একটি পরকলা বা লেন্সের মধ্য দিয়ে সাধারণ ফটো তোলার মত করে এই প্লেটটির উপর আপতিত করা হয়। এইভাবে বস্তুটিকে প্লেটের উপর ফোকাস্ করলে যে সব জায়গায় কালো কালি আছে সেই স্থানগুলো প্লেটের উপর অন্ধকার থাকবে এবং বাকি স্থানগুলোতে আলো পড়বে। যে সব জায়গায় আলো পড়ে সেই সব স্থানের পজিটিভ বা ধনাত্মক তড়িৎসংস্থা অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে চলে যায়। তার কারণ আলোর সংস্পর্শে এসে অ্যান্থ্রাসিন, বিদ্যুৎ পরিবাহক হয়। এখন প্লেটে আমরা একটি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক প্রতিচ্ছবি পেলাম। এইবার প্লেট্টিকে 'ডেভেলপ' করতে হবে। এর জন্যেও কোন রাসায়নিক জলীয় পদার্থের প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতের দ্বারাই এ কাজ নিষ্পন্ন করা হয়। ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত একরকম পাউডার এই প্লেটটির উপর ছড়ানো হয়। এই পাউডার মোটা এবং মিহি দু'রকম গুঁড়ার সংমিশ্রণ। মিহি বস্তুটি সাধারণতঃ কৃত্রিম রজন গুঁড়িয়ে তৈরী হয় এবং এর মেল্টিং পয়েন্ট বা গলনাঙ্ক খুব অল্প; অর্থাৎ অল্প উত্তাপেই গলে যায়। এইভাবে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত পাউডার ছড়ানো যে সব স্থানে প্লেটে ধনাত্মক তড়িৎসংস্থা বর্তমান আছে সেই সব স্থানে এই ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত কণিকাগুলো পারস্পরিক আকর্ষণের জন্যে আটকে যায় এবং যেখানে ধনাত্মক তড়িৎ নেই সেই সব স্থানে এই গুঁড়া লাগে না। এখন প্লেটটির ডেভেলপিং সমাপ্ত হলো। এই প্রক্রিয়ায় প্লেটটির উপর আসল বস্তুটির একটি প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই, যেমন কোনও আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমরা আমাদের প্রতিমূর্তি দেখে থাকি।

এখন এই প্লেট থেকে 'প্রিন্ট' বা ছাপ তোলার পালা। যে কাগজটির উপর ছাপ তোলা হবে সেটি প্লেটটির উপর রেখে আবার বৈদ্যুতিক করোণার সংস্পর্শ আনা হয়। এতে প্লেটের উপর লেগে যাওয়া কণিকাগুলো কাগজের গায়ে লেগে যায় এবং প্লেটের অদৃশ্য উল্টো ছবিটি কাগজের উপর সঠিকভাবে দৃশ্যমান হয়। এখন ছবিটিকে ফিক্স বা স্থায়ী করার কাজ। ইনফ্রা-রেড বা লাল-উজানি আলোর দ্বারা বা কোনও উত্তপ্ত চুল্লীতে কাগজটিকে দু-এক সেকেণ্ডের জন্যে উত্তপ্ত করা হয়। এই সামান্য মাত্র উত্তাপেই সূক্ষ্ম রজনের গুঁড়াগুলো গলে যায় এবং মোটা গুঁড়াগুলো শক্তভাবে কাগজে লেগে থাকতে সাহায্য করে। এইভাবে তোলা ছাপকে বলা হয়-জেরোপ্রিন্ট।

এ পর্যন্ত যতটুকু যান্ত্রিক কৌশল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তা দিয়ে ছাপা হরফের চিঠিপত্র, দলিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং রেখাঙ্কিত চিত্রের ছাপ তোলা সম্ভব হয়েছে। এখনও সাধারণ ফটোর ছাপ তোলা সম্ভব হয়নি। গবেষণার দ্রুততার কথা ভাবলে অদূর ভবিষ্যতে তা-ও সম্ভব হবে। এখন যাঁরা টাইপিষ্টের কাজ করেন তাঁদের আর কার্বন কপি না-ও করতে হতে পারে। একটিমাত্র বোতাম টিপে নিমেষের মধ্যে অনেক কপি তৈরী করতে পারবেন। জেরোগ্রাফিং মেসিন এখনও গবেষণাগারের শিশুমাত্র। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা একে নানাস্থানে দেখতে পাবো।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খবর

টি-বি প্রতিষেধক ওষুধ—টিবিওন

টি-বি রোগের প্রতিষেধক টিবিওন নামে জার্মান সিন্থেটিক একটি নতুন ওষুধ শীঘ্রই বাজারে চালু হবার আশা করা যাচ্ছে।

জার্মেনীতে গত দু-বছর ধরে কয়েক রকমের টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত সাত হাজারেরও বেশী রোগীর উপর এই ওষুধটি প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। আটলাণ্টাতে অনুষ্ঠিত গত অষ্টম ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন কনফারেন্সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পশ্চিম জার্মেনীতে টিবিওন প্রয়োগের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করেন। এই কনফারেন্সে ডাঃ হিন্‌স বলেন যে, টিবিওনের কার্যকারিতা থেকে মনে হয়—প্যারা-অ্যামিনো-স্যালিসিলিক অ্যাসিডের মতই এর টিউবারকিউলোসিস প্রতিরোধক ক্ষমতা রয়েছে এবং সিফিলিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আর্সেনিক ঘটিত পদার্থের মতই প্রায় এর বিষক্রিয়াও আছে। যদি এর চেয়ে আরও উন্নত ধরনের কোন অ্যান্টি-টি-বি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবিত না হয় তবে কিছু বিষক্রিয়া থাকা সত্ত্বেও এটা জীবাণু-যুদ্ধের সহজলভ্য একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসেবেই গণ্য হবে। তবে তিনি বলেন যে, টিবিওন ব্যবহারের ফলে ষ্ট্রেপটোমাইসিনের প্রয়োজনীয়তা লোপ পাবে না, বরং টিউবারকিউলোসিসের চিকিৎসায় এই উভয় ওষুধই একসঙ্গে ব্যবহৃত হবে।

যিনি সালফা ড্রাগ্‌সের বীজাণু প্রতিষেধক ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কার করে' ১৯৩৯ সালে নোবেল প্রাইজ পান সেই বিখ্যাত নোবেল লরিয়েট প্রোফেসর গারহার্ড ডোমাকই এবার টিবিওনের বীজাণু প্রতিষেধক ক্ষমতার বিষয় আবিষ্কার করেছেন। টিবিওন প্রস্তুত করেছেন—বেয়ার কোম্পানীর ডাঃ রবার্ট বেনিস, ডাঃ ফ্রিট্‌জ মিটাস্‌ এবং প্রোফেঃ হ্যান্‌স্‌ স্মিড্‌।

সাধারণ ব্যাক্টেরিয়া থেকে ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়ার উৎপত্তি

ফ্রান্সের স্কুল অব্‌ মেডিসিনের ডাঃ রবার্ট টুলাস্‌নে সাধারণ ব্যাক্টেরিয়ার আকৃতি পরিবর্তন সম্বন্ধে এক অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—পেনিসিলিন প্রয়োগের পর সাধারণ কয়েক রকমের ব্যাক্টেরিয়া থেকে অতি ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়ার (চলতি কথায় লোকে যাকে 'জার্ম' বলে থাকে) উদ্ভব ঘটে। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলো এতই ক্ষুদ্র যে, মাইক্রস্কোপেও

দেখা যায় না ; এমন কি, সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টারের ভিতর দিয়েও গলে যায়। ডাঃ টুলাস্নে অনুমান করেন—সাধারণ ,ব্যাক্টেরিয়াগুলো যেসব রোগ উৎপাদন করে—পেনিসিলিন প্রয়োগের পর নতুন উৎপাদিত ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়াগুলো বোধ হয় তাছাড়া ভিন্ন রকম রোগের উৎপত্তি ঘটায়। পেনিসিলিন প্রয়োগে প্রোটিয়াস ভালগারিস নামে এক জাতের ব্যাক্টেরিয়া থেকে উদ্ভূত ক্ষুদ্রকায় ব্যাক্টেরিয়াকে পেনিসিলিন না দিয়ে কালচার মিডিয়ামে বাড়তে দিলে তারা আবার সাধারণ ব্যাক্টেরিয়ার আকৃতি পরিগ্রহ করে। এ থেকে মনে হয়—অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়াগুলোও এরূপ পরিবর্তনে সক্ষম। বিশেষ অবস্থায় প্লেগ এবং খাদ্য-বিষ উৎপাদনকারী এক রকমের বীজাণু এরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি পরিগ্রহ করে। ডাঃ টুলাস্নের মতে ফিল্টারেব্‌ল্ ব্যাক্টেরিয়া, বিশেষ করে টিউবারকিউলোসিস এবং সিফিলিস উৎপাদক বীজাণু সম্বন্ধে এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন।

কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক

কার্বন মনোক্সাইড বিষাক্ত গ্যাস। বদ্ধ ঘর, গ্যারেজ, সাবমেরিন, খনি বা সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে এই গ্যাস শুঁকে কত লোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে খবর কারোর অজানা নেই। সম্প্রতি পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—একটা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে এই গ্যাসের বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া নষ্ট করা যায়। পদার্থটা হচ্ছে—সিলভার পারম্যাঙ্গানেট। বিভিন্ন ধাতব অক্সাইডের ছোট ছোট দানার গায়ে সিলভার পারম্যাঙ্গানেটের পাউডার মাখিয়ে দেওয়া হয়। দানার গায়ে মাখিয়ে দেওয়ার ফলে সিলভার পারম্যাঙ্গানেট অধিকতর স্থানে গ্যাসের সংস্পর্শে আসতে পারে। আবদ্ধ গৃহাদির দরজা, জানালা বা বাতাস চলাচলের পথে সিলভার পারম্যাঙ্গানেট মাখানো দানাগুলো রেখে দিলে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে।

অ্যালার্জি চিকিৎসায় নতুন রাসায়নিক

ওহিওর সিনসিনেটিতে অনুষ্ঠিত সাদার্ণ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের সভায় লুসিয়ানা ষ্টেট ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুল এবং নিউ অরলিন্স্-এর চ্যারিটি হসপিটালের ডাঃ লুই কুলিক ও ডাঃ হেনরি ডি, ওগ ডেন ঘোষণা করেছেন যে, নতুন একরকম রাসায়নিক পদার্থ হে-ফিভার ও অন্যান্য অ্যালার্জির প্রতিকারে সন্তোষজনক ফল দেখিয়েছে। এই রাসায়নিক পদার্থটির নাম—Perazil chlor-cyclizine. পেরাজিল একপ্রকার অ্যান্টি-হিস্টামিন রসায়নিক পদার্থ। কিন্তু হে-ফিভার, য়্যাজ্‌মা প্রভৃতি রোগ উপশমের জন্যে অন্য যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয় তাদের সঙ্গে এই ওষুধের পার্থক্য হলো দীর্ঘ সময় ব্যাপী প্রতিক্রিয়ায়। রোজ একটি কি দু'টি মাত্র পেরাজিল বড়ি রোগীকে গ্রহণ করতে হয়।

গর্ভকালীন পীড়া উপশমের ওষুধ

অধিকাংশ স্ত্রীলোকই গর্ভাবস্থায় বমন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জন্স্ হপ্‌কিন্স ইউনি-ভার্সিটি এবং বাল্টিমোর হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা এ রোগের একটি প্রতিষেধক পরীক্ষা করে বিশেষ সন্তোষজনক ফল পেয়েছেন। ওষুধটির নাম হচ্ছে—ড্রামামিন। ড্রামামিন প্রয়োগের পর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। শিকাগোর ডি, শার্লি অ্যাণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা হে ফিভার এবং অন্যান্য অ্যালার্জির সম্ভাব্য প্রতিষেধক হিসেবে ড্রামামিন প্রস্তুত করেন। জন্স্ হপ্‌কিন্স অ্যালার্জি ক্লিনিকের একটি রোগীর উপর প্রয়োগের ফলে আকস্মিকভাবেই এর বমনোদ্রেক প্রতিরোধ ক্ষমতার বিষয় টের পাওয়া যায়। জন্স্ হপ্‌কিন্স হাসপাতালে এখন ব্যাপক-

ভাবে ড্রামামিনের তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

ডি-ডি-টি প্রতিরোধকারী মশা

মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে ডি-ডি-টি'র তুলনা নেই। গতযুদ্ধে রোগবীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সৈন্যবাহিনীকে রক্ষার কাজে ডি-ডি-টি'র প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তাই এই ক্ষুদ্র শত্রুর উৎপাত এড়াবার জন্যে আজকাল অনেক স্থলেই ডি-ডি-টি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অব্যর্থ কীটঘ্ন আবিষ্কারে মানুষ এই ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে, একদিন হয়তো তাদের আবাস-স্থল এসব রোগবীজাণুবাহী কীট-পতঙ্গের কবল-মুক্ত হবে; ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, পীতজ্বর, নিদ্রা-রোগ প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে হয়তো আর বছর বছর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিসর্জন দিতে হবে না। কিন্তু সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধানের ফলে দেখা গেছে—মানুষের এই আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা খুবই কম। আটলান্টিক উপকূল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রজনন ঋতুতে সম্প্রতি এডিস্ সলিসিটান্স্ ও এডিস্ টিনিওর-হাইঙ্কাস্ নামে দু-জাতের মশার উপদ্রবে লোকের বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। উক্ত অঞ্চলের নোনা জলাভূমিতে বিভিন্ন জাতের যে সব মশা জন্মে থাকে তাদের মধ্যে এই দু-জাতের মশা-ই ডি-ডি-টি প্রতিরোধক শক্তি অর্জন করেছে অর্থাৎ ডি-ডি-টি এই দু-জাতের মশার কোনই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। কাজেই পর্যাপ্ত ডি-ডি-টি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এরা অব্যাহত গতিতে অগণিত সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে' ওইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্বাস্তু করবার উপক্রম করে তুলেছে।

যে অঞ্চলে ডি-ডি-টি রেজিষ্ট্যাণ্ট মশার আবি-র্ভাব ঘটেছে সেখানে পাঁচ বছর ধরে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিতভাবে ডি-ডি-টি স্প্রে করা হচ্ছিল। ফলে সে অঞ্চল আশ্চর্যভাবে মশকশূন্য দেখা যায়। কিন্তু পরে ডি-ডি-টি প্রয়োগ সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালে সেসব অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে শহর ও গ্রামে প্রবেশ করতে থাকে। পূর্বে যে পরিমাণ ডি-ডি-টি-তে মশার বাচ্চাগুলো বিনষ্ট হতো এখন তার দশগুণ বেশী পরিমাণেও তাদের কিছুই অনিষ্ট হচ্ছে না।

এডিস্ সলিসিটান্স্ ঘোড়ার নিদ্রারোগের বীজাণু বহন করে; মানুষও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফ্লোরিডাতে এডিস টিনিওরহাই-ঙ্কাস মশাকে ডেঙ্গুজ্বর সংক্রমণ করতে দেখা গেছে। অবশ্য এ পর্যন্ত ডি-ডি-টি প্রতিরোধক ম্যালেরিয়া মশা দেখা যায়নি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অনুমান ডি-ডি-টি প্রতিরোধক ম্যালেরিয়া মশারও আবির্ভাব ঘটবে—তবে সেটা কেবল সময়ের প্রশ্নমাত্র।

ডি-ডি-টি ব্যর্থ হলে নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ইউনাইটেড স্টেটস্-এর কৃষিবিভাগ ইতিমধ্যেই ব্যাপৃত হয়েছে। দু-একটা না কি ইতিমধ্যে উদ্ভাবিতও হয়েছে। লিনডেন তাদের মধ্যে অন্যতম। লিনডেনের কার্যকারিতাও প্রমাণিত হয়েছে, তবে জিনিসটা এখনও ব্যয়সাধ্য। বিজ্ঞানীদের নিকট এই পদার্থটা বেনজিন হেক্সাক্লোরাইডের গামা আইসোমার নামে পরিচিত। অন্যান্য ওষুধগুলোও কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে; কিন্তু কৃষি বিজ্ঞা-নীরা আরও পরীক্ষা করে এদের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হয়েই যে কোন একটাকে সাধারণের ব্যবহারের জন্যে অনুমোদন করবেন।

উত্তেজিত পশুর উগ্রতা হ্রাসে নতুন ইনজেকশনের ওষুধ

গরু, ঘোড়া, মোষ প্রভৃতি জন্তুদের কোন কোনটা সময়ে সময়ে দুর্দান্ত প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় তাদের বশে আনা খুবই মুশকিল। তাছাড়া শান্ত প্রকৃতির পশুরাও পশুচিকিৎসাগারে অস্ত্রোপচারের সময় বা অন্যান্য

কারণে সময় সময় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে অনর্থের সৃষ্টি করে। এ অবস্থা প্রতিকারের জন্যে সম্প্রতি নতুন একরকম ইনজেকশনের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আমেরিকার ভেটারিনারি মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের জার্ণালে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই ওষুধটি ইনজেকশন করে দিলে উত্তেজিত জন্তুরা বেশ কিছুক্ষণ সময়ের জন্যে শান্ত হয়ে পড়ে। ওষুধটা যে পশুর উত্তেজনাই হ্রাস করে তা নয়, অস্ত্রোপচারাদির ক্ষেত্রে যন্ত্রণারও উপশম ঘটিয়ে থাকে। এই ওষুধটি সাধারণতঃ বার্বিরিন নামে পরিচিত হয়েছে। এর পুরা নাম হচ্ছে—Di-methylberbeerine hydrochloride.

ডি-ডি-টির চেয়ে শক্তিশালী কীটঘ্ন

ডাঃ এন, বি, নেহার এবং ডাঃ আর, টি, ব্রিকেনটাক্সের সহযোগিতায় নিউইয়র্কের ডাঃ হেনরি বি. হ্যাস্ ডি ডি-টির চেয়ে পাঁচগুণ শক্তিশালী বি এন-বি এবং বি এন-পি নামে নতুন কীটঘ্ন সংশ্লেষণ করেছেন। এই কীটঘ্নকে গুঁড়োর মত ছড়িয়ে দেওয়া যায় অথবা কেরোসিন বা অন্য কোন তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ডি-ডি-টি'র মতই স্প্রে করা যায়। গ

গো-পুষ্টি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সিংহ

বিভিন্ন শারীরবৃত্ত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৌলিক খাদ্য বস্তুকে মৌলিক দৈহিক পদার্থে রূপান্তরিত করাই পুষ্টি সাধন। গরুর খাদ্যে জল, অম্লজান এবং কতকগুলি খনিজ পদার্থ ছাড়াও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকা ও বায়ুমণ্ডল হইতে অঙ্গারাম্ল, জল এবং আরও কয়েকটি লবণ জাতীয় দ্রব্য আহৃত হইয়া উদ্ভিদ-জীবন আরম্ভ হয়। এই গুলি ক্রমে জটিল পদার্থে পরিণত হইয়া উদ্ভিদ-গঠন বা ষ্ট্রাক্চার তৈয়ার করিয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল বিশোষণের পরিমাণ অনুযায়ী উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলে অম্লজান পরিত্যাগ করে। এই সাংশ্লেষিক কার্য পরিচালনায় সূর্যরশ্মি হইতে শক্তি সংগৃহীত হইয়া থাকে। সূর্যরশ্মি-শক্তি উদ্ভিদপত্রের সবুজ রঞ্জক বা ক্লোরোফিল দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদস্থিত জটিল পদার্থে শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত শক্তি বায়ুমণ্ডল হইতে বিশোষিত অম্লজান গ্যাস দ্বারা জারণে বা অক্সিডেশনে উদ্ভূত হয়। উদ্ভিদ পোড়াইলে বা অম্লজানযুক্ত হইলে উদ্ভিদ যৌগিকগুলি অঙ্গারাম্ল, জল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থে পরিণত হয়। জারণ বা অম্লজানযুক্তকরণ ক্রিয়া, পোড়ান ভিন্ন প্রাকৃতিক রীতিতে এবং উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীব-কোষে চলিতে থাকে। জারণ হইতে উদ্ভূত শক্তি কেবল তাপ আকারে না থাকিয়া নানাপ্রকার কার্যকরণের জন্যও লাগে। উদ্ভিদকোষের খাদ্যরূপে যে জটিল যৌগিক পদার্থগুলি ব্যবহৃত হয় তাহার অল্পাংশ অম্লজানযুক্ত হইয়া কোষের প্রয়োজন অনুযায়ী শক্তির জন্য রক্ষিত এবং আরও কতকাংশ বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে লাগে; কিন্তু ইহার অধিকাংশই উদ্ভিদবস্তুতে পরিণত হয়। উদ্ভিদ উহার শক্তি-উৎপাদন ও গঠনের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক খাদ্য আহরণ করে, তাহা বীজে বা মূলে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চিত থাকে।

প্রাণী, উদ্ভিদের ন্যায় বায়ুমণ্ডল বা মৃত্তিকা

হইতে বিশোষিত সরল দ্রব্যগুলি দ্বারা উহার খাদ্য সংশ্লেষণ করিতে পারে না। ইহাদের খাদ্য উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয়। এই খাদ্য অম্লজান যুক্তকরণে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তাহা প্রাণী-দেহের তাপ সংরক্ষণ ও নানা-প্রকার কার্যকরণে ব্যবহৃত হয়। শ্বসন ক্রিয়ায় প্রাপ্ত অম্লজান দ্বারা কোষ মধ্যে অম্লজানযুক্তকরণ ক্রিয়া সাধিত হয়। খাদ্য না পাইলে প্রাণীর জীবনধারা চলার জন্য আপন শারীরিক বস্তুর উপর অম্লজান-যুক্তকরণ ক্রিয়া চলিতে থাকে; ইহাতে অতি শীঘ্র গরুর দৈহিক ওজন কমিতে থাকে ও ক্রমে উহা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। দৈহিক গঠন ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গরুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের শক্তির প্রয়োজন প্রাণী অপেক্ষা কম; কারণ শক্তিপূর্ণ খাদ্য সঞ্চয়ই উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত ধর্ম। কিন্তু খাদ্যকে অম্লজানযুক্ত করিয়া তাপ ও কার্যরূপে শক্তি উৎপাদনই প্রাণীর প্রধান শারীরবৃত্তিক কর্ম। এই অম্লজানযুক্তকরণে খাদ্যদ্রব্যগুলি অঙ্গারাম্ল, জল এবং আরও কতকগুলি সরল পদার্থে পরিণত হইয়া রচিত হয়। জীবজগতে যে সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্যহিসাবে গৃহীত হয় না সেইগুলি প্রাকৃতিক রীতিতে বা অন্য কোন উপায়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদ জগতের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিশুতে যে জলীয় অংশ থাকে তাহা উত্তাপে দূরীভূত হয় ও শুষ্ক দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে। যে জটিল উপকরণ সমূহদ্বারা ঐ সকল শুষ্ক দ্রব্য গঠিত তাহা-দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—জৈব ও অজৈব। শুষ্ক দ্রব্য পোড়াইলে জৈব উপকরণগুলি প্রধানতঃ অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্পরূপে উড়িয়া যায় এবং অজৈব পদার্থ-গুলি দাহ্যভস্ম বা লবণরূপে অবশিষ্ট থাকে। জৈব বা দাহ্য উপকরণগুলি হইতেই উদ্ভূত 'শক্তি' কোষে সরবরাহ হয়। অজৈব বা লবণ জাতীয় উপকরণ 'শক্তি' উৎপাদন করিতে না পারিলেও শরীর গঠনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

জৈব ও অজৈব উপকরণ

জৈব উপকরণগুলি তিনভাগে বিভক্ত—(১) অসংস্কৃত বা ক্রুড্-প্রোটিন (২) চর্বি (৩) শর্করা জাতীয় উপকরণ বা কার্বোহাইড্রেট। উদ্ভিদ ও ও প্রাণী এতদুভয়ের মধ্যে মূলতঃ একই প্রকার উপকরণ বর্তমান; কেবল শর্করা জাতীয় উপকরণের অনুপাত উদ্ভিদে খুব বেশী; কারণ উদ্ভিদের গঠন-কার্যে সাধারণতঃ শর্করা জাতীয় উপাদানেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং কার্বোহাই-ড্রেটরূপেই উদ্ভিদ উহার খাদ্য সঞ্চয় করে। কিন্তু প্রাণীর গঠন—কঙ্কাল প্রভৃতি, খনিজ পদার্থদ্বারা নির্মিত হয় এবং প্রাণী চর্বিরূপে উহার খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। কাজেই প্রাণীর শর্করা জাতীয় উপকরণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

প্রাণী ও উদ্ভিদের দৈহিক সংযুতির শতকরা গড়

প্রাণী বা উদ্ভিদ	জলীয় অংশ	খনিজ পদার্থ	অসংস্কৃত প্রোটিন	চর্বি	শর্করা জাতীয় উপকরণ
৯ মণ ওজনের গরু	৬০'৭	৪'৬	১৮'৭	১৬'০	..
৫০ সের ওজনের গো-শাবক	৭২'০	৪'২	১৯'৮	৪'০	...
সবুজ লুসার্ণ	৭৪'৭	২'৪	৪'৫	১'০	১৭'৪
সংরক্ষিত সবুজ ভুট্টাগাছ বা ভুট্টা সাইলেজ	৭৩'৭	১'৭	২'১	০'৮	২১'৭
গমের ভুষি	১০'০	৬'৪	১৬'০	৪'৪	৬৩'২
ভুট্টাদানা	১২'৮	১'৪	৯'৬	৩'৯	৭২'৩

জীবন ধারণের জন্য খাদ্য আবশ্যক। কোন প্রাণীই খাদ্য ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না।

গো-খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও উহাদের কার্য

প্রাণীর বয়স ও কার্যের তারতম্যের উপর খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে। মূলতঃ শ্বাসকার্যচালন, রক্তসঞ্চালন, শরীরাভ্যন্তরে তাপ সংরক্ষণ ও পরিপাকক্রিয়া পরিচালনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য ; তদুপরি দুগ্ধউৎপাদন, শারীরিক বৃদ্ধি-সাধন ও ক্ষয় পূরণ, এবং অন্যান্য কার্যকরণের জন্যও খাদ্যের আবশ্যক।

গরু যে আহার্য গ্রহণ করে তাহাতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে :—

(১) প্রোটিন—আমিষ জাতীয় উপাদান।

(২) কার্বোহাইড্রেট—শর্করা জাতীয় উপাদান।

(৩) মিনারেল ম্যাটার—খনিজ পদার্থ বা লবণজাতীয় উপাদান।

(৪) ফ্যাট—চবি বা তৈল জাতীয় উপাদান।

(৫) ভিটামিন—খাদ্য-প্রাণ।

(৬) জল।

সাধারণতঃ একই খাদ্যে সমস্ত উপাদানগুলি নাও থাকিতে পারে; কিন্তু কয়েকটি বিভিন্ন খাদ্যের সংমিশ্রণে এই সমস্ত উপাদান পাওয়া যায়।

প্রত্যেক প্রাণী বা উদ্ভিদে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে। প্রাণীর জন্ম সময় গড়ে শতকরা

জল

৭৭ ভাগ ও পরিণত বয়সে শতকরা ৫৫ ভাগ জল থাকে। সবুজ ঘাস, সংরক্ষিত সবুজ ঘাস বা সাইলেজ এবং মূলজাতীয় খাদ্যে শতকরা ৬০ হইতে ৯০ ভাগ জল আছে। খড়, শস্যদানা এবং খৈল আপাতদৃষ্টিতে শুষ্ক মনে হইলেও ইহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ জল আছে। পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন ও শরীর হইতে দূষিত পদার্থ দূরীকরণের জন্য শরীরাভ্যন্তরে জলের একান্ত প্রয়োজন। জল শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। রসাল খাদ্য এবং প্রত্যক্ষ জল গ্রহণদ্বারা শরীরাভ্যন্তরে জলের প্রয়োজন মিটানো হয়। বেশী চর্বিযুক্ত প্রাণীর শরীরে জলীয় অংশ, শীর্ণকায় প্রাণী অপেক্ষা কম থাকে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের সোরাজান বা নাইট্রোজেন সম্বলিত জৈব পদার্থগুলির অধিকাংশই

প্রোটিন

প্রোটিন। একটি গরুর দেহের ওজনের ১৬-২০ ভাগ প্রোটিন। গরুর দৈহিক পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় পূরণে এই জাতীয় খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন সর্বাধিক। দেহের মাংস, পেশী, ধমনী, রক্ত, গ্রন্থি, ত্বক, শিং, ক্ষুর, প্রভৃতির অনেকাংশই প্রোটিন। গাভী খাদ্য হইতে যে প্রোটিন সংগ্রহ করে, তাহাই উহার দুগ্ধস্থিত প্রোটিনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন স্বাভাবিক আন্ত্রিক কার্য পরিচালন এবং কিছু কিছু তাপ ও শক্তি উৎপাদনে ইহা সাহায্য করে।

শারীরিক বৃদ্ধির সময় যে পরিমাণ প্রোটিনের আবশ্যক হয়, শারীরিক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর আর তত বেশী লাগে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন শরীরাভ্যন্তরে বিভক্ত হয় ও অবাঞ্ছিত সোরাজান প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া আসে।

কার্বোহাইড্রেট শব্দে অঙ্গার, উদজান ও অম্লজানের যৌগিক পদার্থ বুঝায়। অম্লজান সহযোগে জল

কার্বোহাইড্রেট

তৈয়ারীর জন্য যে মাত্রায় উদজান দরকার কার্বোহাইড্রেটে তাহা অপেক্ষা অধিক উদজান নাই। কাজেই কার্বোহাইড্রেট পোড়াইলে অম্লজানযুক্ত-করণ বা অক্সিডেশনের জন্য কেবল অঙ্গার থাকে। এই উপাদানে সাধারণতঃ দুইটি বিভাগ—(১) সোরাজান বিমুক্ত নির্যাস বা নাইট্রোজেন-ফ্রি-এক্সট্রাক্ট (২) অসংস্কৃত তন্তু বা ক্রুড্ ফাইবার। উদ্ভিদের কোষ-প্রাকার এবং কাষ্ঠ-তন্তু, অসংস্কৃত তন্তুর পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত দ্রব্যোপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই দুষ্পাচ্য। ইহাদের চর্বণে ও

পাচনে যে শক্তির অপচয় ঘটে, তাহাতে ইহাদের পুষ্টিমূল্য আরও কমিয়া যায়।

শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি সোরাজান-বিমুক্ত নির্যাস বা দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট বিভাগে পড়ে। দ্রবণীয় কার্বোহাইড্রেট হইতেই প্রাণীর শরীরে শক্তি, তাপ ও চর্বি সরবরাহ হইয়া থাকে এবং গো-দুগ্ধস্থিত ননী ও শর্করার উপাদান হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট চর্বিতে পরিবর্তিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদে এই জাতীয় উপাদান সর্বাধিক—মোট শুষ্ক দ্রব্যের প্রায় ৭০ ভাগ।

কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী দাহ করার পর যে ভস্ম থাকে তাহাই খনিজ পদার্থ বা মিনারেল ম্যাটার। ইহাতে প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফরাস্, পটাসিয়াম ও গন্ধক থাকে। অস্থি নির্মাণ ও ইহার ক্ষয়পূরণ, পাচকরস, রক্ত এবং দুগ্ধস্থিত খনিজ পদার্থের উপকরণ হিসাবে এই উপাদানের আবশ্যকতা। প্রত্যেক প্রাণী দেহের শতকরা ৪-৫ ভাগ খনিজ পদার্থ। বর্ধনশীল গোবৎস ও দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে ইহা অপরিহার্য। টিশু এবং অস্থির উপাদান হিসাবে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস ভিন্ন লৌহ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম তাম্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থগুলিরও আবশ্যক হয়।

মিনারেলস ম্যাটার

ফ্যাট অঙ্গার, উদজান এবং অম্লজানের যৌগিক; কিন্তু ইহাতে অঙ্গারের ভাগ বেশী। অম্লজান সহযোগে জল তৈয়ারীর জন্য যে মাত্রায় উদজান প্রয়োজন, ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক উদজান থাকে। চর্বি বা ফ্যাট পোড়াইলে অঙ্গার ভিন্ন যে উদজান অবশিষ্ট থাকে, উহাতে বাহির হইতে অম্লজান মিশ্রিত হইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক অংশ ও কোষে চর্বি বিদ্যমান; শক্তির উৎপাদক হিসাবে ইহা শরীরাভ্যন্তরে রক্ষিত থাকে। একটি গরুর মোট দৈহিক ওজনের শতকরা ১৫-৩০ ভাগ চর্বি। এক 'গ্রাম্' চর্বি, ২¼ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনের ইন্ধন মূল্যের সমান। তিসি, সরিষা বাদাম, নারিকেল, তিল, কার্পাস প্রভৃতি বীজে এই জাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

ফ্যাট

খাদ্য প্রাণ বা ভিটামিন জীবন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। ভিটামিনের অভাবে নানা-প্রকার রোগ সৃষ্টি হয় এবং বৃদ্ধি ও প্রজনন শক্তি ব্যাহত হয়। ভিটামিন বা ভিটামিন সংগঠক দ্রব্য সমূহ অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, সোরাজান এবং সম্ভবতঃ আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থের যৌগিক। নানা প্রকারের ভিটামিন আছে, তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি গরুর পুষ্টির জন্য আবশ্যক।

ভিটামিন

এই জাতীয় ভিটামিন উদ্ভিজ্জ বস্তুতে ঠিক ভিটামিন 'এ' রূপে না থাকিয়া—উহার পূরোবর্তী কেরোটিন্ হিসাবে থাকে এবং প্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে ইহা প্রকৃত 'এ' ভিটামিনে পরিবর্তিত হয়। 'এ' ভিটামিনের অভাবে নেত্ররোগ, দন্তরোগ, ক্ষুধা-মান্দ্য ও সেই হেতু রুদ্ধবর্ধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; এমন কি গোমাতার দৃষ্টিশক্তিহীন শাবক প্রসূত হইতে পারে। অম্লজান যুক্তকরণে ভিটামিন 'এ' বিনষ্ট হয়। বায়ুশূন্য অবস্থায়, অধিক উত্তাপেও ইহা নষ্ট হয় না। রৌদ্রশুষ্ক, গুদামজাত বা অন্য কোন প্রণালীতে সংরক্ষিত সবুজ ঘাসের অধিকাংশ ভিটামিন 'এ' নষ্ট হইয়া যায়। গরুর শরীরাভ্যন্তরে উহার কয়েক মাসের উপযোগী ভিটামিন 'এ' সঞ্চিত থাকিতে পারে। পরে অভাবের সময় প্রয়োজন অনুসারে এই সঞ্চয় হইতেই ব্যবহৃত হয়। টাটকা সবুজ ঘাস, ভুট্টা, জোয়ার, নিরুদিত লুসার্ণ ঘাস, মাখন, ডিম, বিলাতি বেগুন, কড্‌লিভার তৈল, পালং শাক প্রভৃতি খাদ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে।

ভিটামিন 'এ'

গরুর পাকস্থলীতে সাধারণ খাদ্যসংশ্লেষণ

হইতেই এই ভিটামিন সংগৃহীত হয়; কাজেই গো-খাদ্যে ইহার অভাবজনিত কোন অসুবিধা অনুভূত হয় না। এই জাতীয় ভিটামিন ক্ষুধাবর্ধক, জীর্ণ-কারক, পরজীবির আক্রমণ ও স্নায়ুরোগ প্রতিষেধক। খাদ্যে ইহার অভাবে 'পলিনিউরাইটিস্', খেঁচুনি ও বাতরোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইষ্ট, চাউলের ভুষি ও কুঁড়া, গমের ভুষি, গম, যব জাতীয় শস্যদানা, যে কোন টাটকা সবুজ ঘাস, গুড়, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি খাদ্যে ভিটামিন 'বি' যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি' (থিয়ামিন)

ইহা জলদ্রবণীয় ভিটামিন। শাবক হওয়ার পর গরুর রক্তে 'অ্যাস্কর্বিক্ অ্যাসিডের' পরিমাণ কমিয়া যায়; সেই জন্য কাউর বা নাভিরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও খাদ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাকস্থলীতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় এই ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়, তথাপি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনের উপযোগী সংগৃহীত না হওয়ায় বাহির হইতে আহরণ করিতে হয়। নেবু জাতীয় ফল, বিলাতি বেগুন, সবুজ পাতা, আলু এবং অন্যান্য শাক সব্জীতে এই জাতীয় ভিটামিন প্রচুর পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'সি' (অ্যাস্কর্বিক্ অ্যাসিড)

ইহা সাদা কেলাসিত, তৈল দ্রবণীয় ভিটামিন। শরীরাভ্যন্তরে ক্যালসিয়াম্ ও ফস্ফরাসের রাসায়নিক পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ডি১, ডি২, ডি৩, প্রভৃতি নানাপ্রকারের ডি ভিটামিন আছে। মৎস্যের যকৃৎ হইতে ভিটামিন ডি৩ পাওয়া যায়। এই জাতীয় ভিটামিন সাধারণতঃ ত্বকে, পালকে বা চুলে থাকে। ত্বকস্থিত পুরোভিটামিন ডি৩ সূর্যরশ্মি সহযোগে শরীরের ভিতর প্রকৃত ডি-ভিটামিন উৎপন্ন করে। ইহা রিকেট রোগের প্রতিষেধক, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সমতারক্ষক, খনিজ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের নিয়ামক, স্বাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বৃদ্ধির সহায়ক এবং জীবনীশক্তি পরিবর্ধক। এই ভিটামিনের অভাবে রোগসংক্রমণ প্রতিরোধশক্তি কমিয়া যায়, মাংস পেশীসমূহ দুর্বল হয়, স্নায়ুতন্ত্রের দৃঢ়তা নষ্ট হয়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে, অস্থি-সন্ধি নরম হয় ও ফুলিয়া উঠে, রক্তে ও অস্থিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ কমিয়া যায়। প্রত্যক্ষ কারণ বিনা শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যাইতে থাকে, অস্থির বিকলতা আসে, রিকেট রোগ হয় এবং কখনো কখনো মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি গ্রহণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। কড্‌লিভার তৈল, সার্ডাইন তৈল, সূর্যরশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট প্রদীপ প্রভৃতি হইতে এই ভিটামিন সংগৃহীত হয়।

ভিটামিন 'ডি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে প্রজনন শক্তি ব্যাহত হইতে পারে; কিন্তু গো-জাতি সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। সবুজ ঘাস-পাতা, লুসার্ণ ঘাস, পালং শাক, কার্পাস বীজ তৈল, অঙ্কুরিত গম তৈল, ডিমের হলুদ অংশ প্রভৃতিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই'

ইহা একটি জলদ্রবণীয় হরিৎ রঞ্জক। স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক। দুগ্ধ, মাখন-তোলা দুগ্ধ, ছানার জল, লুসার্ণ ও অন্যান্য সবুজ পাতায় এই ভিটামিন যথেষ্ট থাকে। গো-খাদ্যে ইহার অভাবজনিত অসুবিধা কখনও পরিদৃষ্ট হয় না।

ভিটামিন 'জি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে রক্তস্রাব-জনিত রোগ উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে; রক্তে প্রোথ্রম্বিনের মাত্রা কমিয়া গেলে রক্ত জমাট বাঁধিতে অধিক সময় লাগে। ভিটামিন 'কে' উহা নিয়ন্ত্রণ করে। জীবাণুর ক্রিয়ায় পাকস্থলীতে এই ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়। কাজেই গরুর পুষ্টির জন্য এই ভিটামিনের অভাব অনুভূত হয় না। সমস্ত সবুজ পাতা, মৎস্যচূর্ণ প্রভৃতি পদার্থে প্রচুর 'কে' ভিটামিন থাকে।

ভিটামিন 'কে'

চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি

শ্রীঅশোক রুদ্র

কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে তিনটি সরলরেখা পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায়; কিন্তু চারটি সরলরেখাকে একই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এমনভাবে টানতে পারা যায় না যে, তারা পরস্পরের উপর লম্ব হবে। এটা আমাদের জগতের একটা বৈশিষ্ট্য। জ্যামিতিক ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—আমাদের বিশ্ব ত্রৈমাত্রিক। এখানে মাত্রা বলতে আমরা Dimension বুঝাচ্ছি। ত্রৈমাত্রিক বিশ্বের একটি গুণ এই যে, যেকোন বিন্দুকে কেন্দ্র ধরে আর যেকোন বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি সংখ্যাই যথেষ্ট। যথা—শূন্যে ভাসমান একটি বেলুনের অবস্থান আমার বাড়ী থেকে নির্দেশ
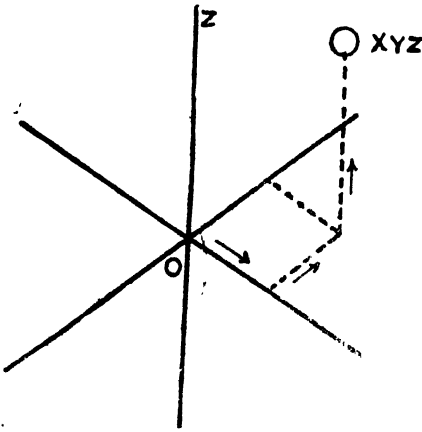
১নং চিত্র
ফ্রেম অফ্ রেফারেন্স

করতে হলে কত মাইল পূবে বা পশ্চিমে, কত মাইল উত্তর বা দক্ষিণে এবং কত ফুট উঁচুতে (অন্য ক্ষেত্রে নীচুতেও হতে পারতো) জানতে পারলেই যথেষ্ট। এখানে আমরা তিনটি পরস্পর লম্ব সরলরেখাকে আমাদের বাড়ীর মধ্য দিয়ে পরস্পরকে ছেদ করছে বলে কল্পনা করে নিয়েছি এবং তাদের থেকে বেলুনের অবস্থানটির কি সম্বন্ধ তা নির্ণয় করেছি। এই তিনটি সরলরেখাকে আমরা আমাদের frame of referenc বলে থাকি। ত্রৈমাত্রিক জগতের frame of reference-এ তিনটি সংখ্যার প্রয়োজন এবং অবস্থানজ্ঞাপক এই তিনটি সংখ্যাকে আমরা বলি কো-অর্ডিনেট। দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সমতলে আমাদের লাগে মোটে দুটি কো-অর্ডিনেট, আর একমাত্রিক জগতে একটিই যথেষ্ট। (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)

আমরা ত্রিমাত্রিক জীব। আমাদের চেতনা তিন মাত্রার সীমানায় আবদ্ধ। তার বেশী অথবা কম আমরা ধারণা করতে পারি না। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিনটি দিক নেই—এমন কোন বস্তুর কল্পনাই আমরা করতে পারি না। দ্বিমাত্রা বা এক মাত্রা কল্পনা করা অবশ্য অসম্ভব নয়। জ্যামিতিক রেখার প্রস্থ বা উচ্চতা নেই—খালি দৈর্ঘ্য আছে। সরলরেখা একমাত্রিক। আবার যে কোন বস্তুরই উপরিভাগ (surface) অথবা তার যে বিস্তৃতি সেটা দ্বিমাত্রিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে—রেখা বা surface কোন বস্তু নয়, জ্যামিতিক কল্পনা মাত্র। অপর পক্ষে এমন কিছু কি আমরা কল্পনা করতে পারি, যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা ছাড়া আরও দিক আছে? চার বা তারও অধিক মাত্রা কল্পনা করাই অত্যন্ত কঠিন এবং তাদের অস্তিত্ব আরও অসম্ভব বলে মনে হয়। চার বা ততোধিক মাত্রা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বলে কিছুদিন আগে পর্যন্ত জ্যামিতির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল দুই ও তিন মাত্রার সনাতনী ইউক্লিডের মধ্যে।
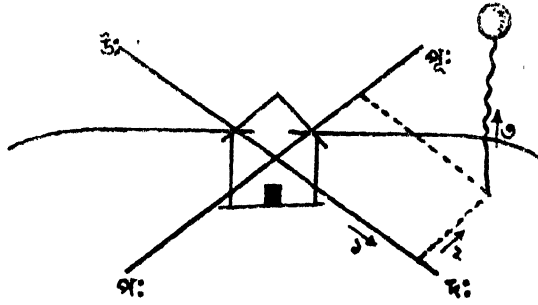
১ (ক)। বেলুনের অবস্থান নির্দেশ করতে তিনটি সংখ্যার প্রয়োজন

কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্রোহী বুদ্ধি বললো, তিন মাত্রার সংকীর্ণ সীমায় জ্যামিতিকে কেন বেঁধে রাখা হবে? বাস্তব জগতে চার বা অধিক মাত্রার কোন অর্থ থাক বা না-ই থাক, জ্যামিতিতে তার প্রয়োগ করতে বাধা কোথায়? জ্যামিতি তো প্রাকৃতিক সত্যের উপর নির্ভর করে না; জ্যামিতি গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান। যুক্তি-

২ (ক)। সরলরেখা: এক মাত্রা

বিজ্ঞানের নিয়ম হচ্ছে, মৌলিক কতকগুলো প্রস্তাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া এবং তার উপর ভিত্তি করে যুক্তির পরে যুক্তি জোড়া দিয়ে একটা কাঠামো খাড়া করা। এই যুক্তির মধ্যে কোন ফাঁকি বা গলদ না থাকলেই হলো—মৌলিক স্বতঃসিদ্ধান্ত তো আমি ইচ্ছামত নিতে পারি। সনাতনী ইউক্লিডিয় জ্যামিতিও তাই নয় কি?

২ (খ)। সমতল দুই মাত্রা

জ্যামিতিক বিন্দু, সরলরেখা, ত্রিভুজ বা বৃত্তের কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে কি? কিন্তু সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও এই কাল্পনিক বৃত্ত, বিন্দু, রেখা, ত্রিভুজ প্রভৃতি সমন্বিত যে সনাতনী জ্যামিতি, ব্যবহারিক জগতে তার প্রায়োগিক উপযোগিতা কি অসামান্য নয়? বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও তিনের অধিক মাত্রার জ্যামিতি নানাপ্রকার প্রায়োগিক ব্যবহারের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

অতএব বিদ্রোহী বিজ্ঞানী স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিলেন, যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে '*n*' সংখ্যক সরলরেখা পরস্পরের উপর লম্ব করে টানা যায়। এইভাবে রিম্যান প্রমুখ গণিতজ্ঞের নেতৃত্বে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সনাতনী জ্যামিতির বিরুদ্ধে যে বহুমুখী অভিযান সুরু হয় তার একটির রূপ নিল ত্রয়োধিক মাত্রার জ্যামিতির আকারে। দুই ও তিন মাত্রার জ্যামিতিকে

২ (গ)। ঘনক্ষেত্র: তিন মাত্রা

চোখের সামনে রেখে তুলনামূলক যুক্তির সাহায্যে তাঁরা একটার পর একটা উপপাদ্য রচনা করে একটি সম্পূর্ণ নতুন জ্যামিতির উদ্ভাবন করলেন। বহুমাত্রার জ্যামিতির নিছক যৌক্তিক মূল্য ছাড়া আর কোন আকর্ষণ নেই। কিন্তু চতুর্মাত্রিক জগৎ আমাদের নাগালের বাইরে নয় এবং সেজন্যে চেষ্টা করে কিছুটা ধারণা করাও একেবারে অসম্ভব নয়। প্রথমে আমরা দু'একটা সরল উপপাদ্যের বিষয় আলোচনা করব।

একটি সমতল ক্ষেত্রকে সীমিত করতে ন্যূন-পক্ষে তিনটি সরলরেখা লাগে; আর একটি ঘন
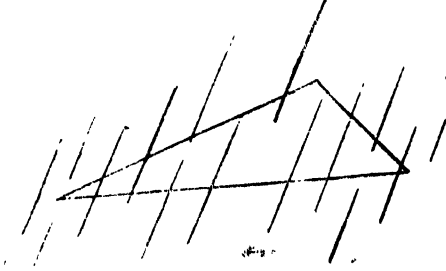
২ (ক)। একটি সমতলকে সীমাবদ্ধ করতে লাগে কমপক্ষে তিনটি সরলরেখা

ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করতে লাগে কম পক্ষে চারটি সমতল। ঠিক তেমনি, চার মাত্রায় কোন জ্যামিতিক চিত্রকে নির্দিষ্ট করতে কমপক্ষে পাঁচটি তিন মাত্রার সমতল ঘন ক্ষেত্রের প্রয়োজন। (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৩ (খ)। একটি ঘনক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে লাগে কমপক্ষে ৪টি সমতলের

একটি সরলরেখা দিয়ে আমরা একটা সমতলকে বিভক্ত করতে পারি। আবার একটি সমতল দিয়ে একটা ঘনক্ষেত্রকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি। ঠিক তেমনি, একটি চার মাত্রার ক্ষেত্রকে বিভক্ত করতে আমাদের লাগবে একটি তিন মাত্রার ঘনক্ষেত্র। দু'টি চার মাত্রার ক্ষেত্র যদি পরস্পরকে ছেদ করে তবে তাদের মিলন সাধিত হবে একটি তিন মাত্রার ক্ষেত্রে (চিত্র ৪ ও ৫)
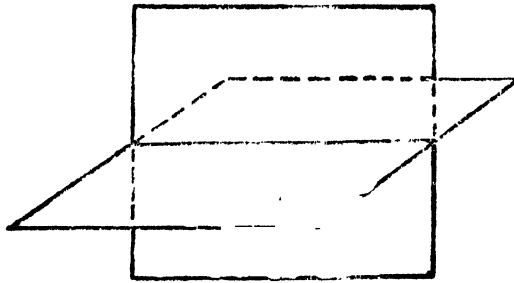
৪। দুটি সমতল পরস্পরকে ছেদ করে একটি সরল রেখায়
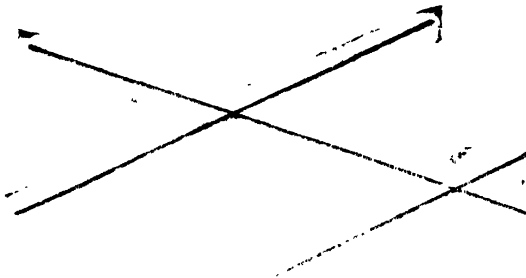
৫ (ক)। একটি সমতলকে একটি সরলরেখা দিয়ে দু-ভাগে ভাগ করা যায়

একটি সরলরেখাকে একটি বিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তিত করলে আমরা পাই একটি সমতল।
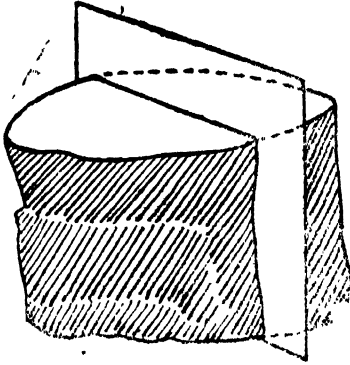
৫ (খ)। একটি ঘনক্ষেত্রকে একটি সমতল দিয়ে দু ভাগে ভাগ করা যায়

ঠিক তেমনি একটি চার মাত্রার ঘনক্ষেত্র পেতে হলে তিন মাত্রার একটি ক্ষেত্রকে একটি সমতলের চতুর্দিকে আবর্তিত করলেই যথেষ্ট। (৬নং চিত্র)

বর্গক্ষেত্রের একটি গোষ্ঠী আছে। এক মাত্রায় a দৈর্ঘ্যের একটি সরলরেখা, দুই মাত্রায় a^2 ক্ষেত্রফলের একটি বর্গ, তিন মাত্রায় a^3 ঘনফলের একটি cube এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের চতুর্মাত্রিক সভ্যটি কিরকম হবে? এর ঘনফল নিশ্চয়ই হবে a^4; আর সরলরেখা, বর্গ এবং cube আঁকবার পদ্ধতি অনুসরণ করে একটু চেষ্টা করলেই দেখা যাবে—এটি এমন একটি বস্তু যার আছে সবশুদ্ধ ৮টি cube, ২৪টি সমতল, ৩২টি কিনারা আর ১৬টি কোণ। (চিত্র ৭)। ইংরেজিতে একে
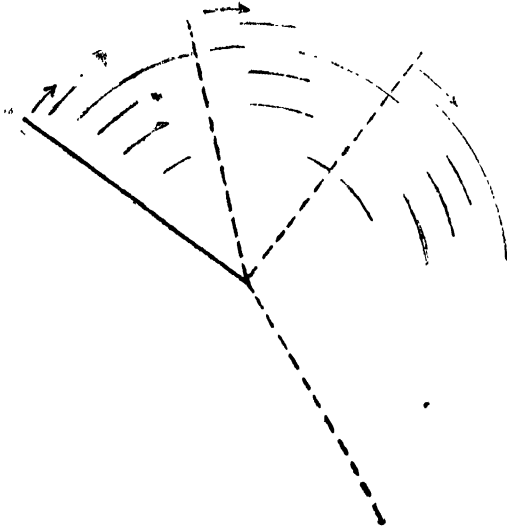
৬ (ক)। একটি রেখাকে একটি বিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তিত করলে পাওয়া যায় একটা সমতল
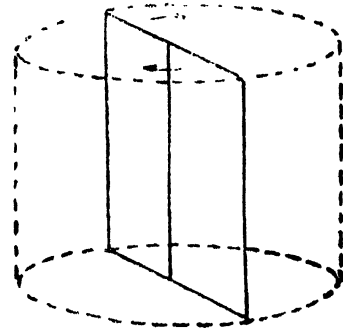
৬ (খ)। একটা সমতলকে একটা রেখার চারদিকে আবর্তিত করলে পাওয়া যায় একটি ঘনক্ষেত্র

cuboid বলে। এবার বৃত্তের কথা ভাবা যাক। বৃত্ত দ্বিমাত্রিক; ত্রিমাত্রিক সহোদরটি হচ্ছে গোলক (sphere); আর চতুর্মাত্রিকটি হচ্ছে এমন একটি জিনিস যার উপরিস্থিত প্রত্যেকটি বিন্দু একটি কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী। আমরা জানি, একটি গোলককে যদি একটি সমতল দিয়ে ছেদ করা যায় তবে পাওয়া যাবে একটি বৃত্ত। ঠিক তেমনি চতুর্মাত্রিক গোলককে একটি সমতল দিয়ে ছেদ করলে পাব একটি ত্রিমাত্রিক গোলক। (চিত্র ৮)

এবার জ্যামিতি ছেড়ে কিছুটা রূপকথা আলোচনা করা যাক। মনে করা যাক চতুর্মাত্রিক জগৎ আছে এবং এই জগতে বিচরণ করে এমন

জীবও আছে। একটু ভাবলেই দেখতে পাব—এই চতুর্মাত্রিক জীবেরা আমাদের সঙ্গে অতি সাংঘাতিক
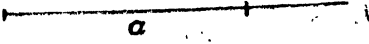
৭ (ক)। বর্গগোষ্ঠীর। প্রথম সভ্য—সরলরেখা-a

রকমের ঠাট্টা-তামাসা করতে পারে—ঠিক যে ধরনের ঠাট্টা-তামাসা ভূতেরা আমাদের সঙ্গে করে থাকে। বন্ধ ঘর থেকে বাইরে যাওয়া, সিন্ধুক থেকে টাকা উড়িয়ে নেওয়া, চোখের সামনে থেকে জিনিসপত্র অদৃশ্য করে দেওয়া, ডিমের খোলাটিকে কিছুমাত্র আহত না করেও তার ভিতরের সবটুকু খেয়ে নেওয়া প্রভৃতি আশ্চর্য
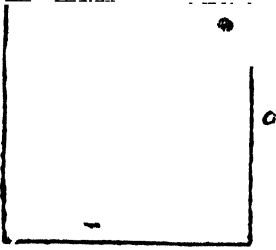
৭ (খ)। দ্বিতীয় সভ্য—বর্গ-a^2

ভোজবাজী দেখান তাদের পক্ষে ছেলেখেলা মাত্র। কারণ অত্যন্ত সোজা। যে ঘরটি আমি বন্ধ দেখছি, তার তিনটে দিক শুধু আমি দেখছি; কিন্তু তার
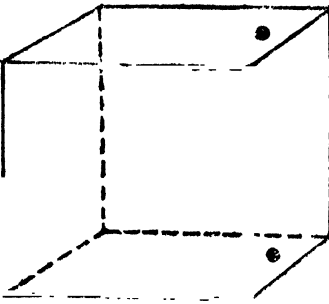
৭ (গ)। তৃতীয় সভ্য—Cube-a^3

হয়তো এমন আরও একটা দিক আছে, যার সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকা বা সেইদিকে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা হওয়া আমাদের ত্রৈমাত্রিক জীবদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই চতুর্থ দিকে এক পা এগুলেই যে কোন জিনিস আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং এই চতুর্থ দিক দিয়েই চার মাত্রার জীবেরা চলাফেরা করে যথেচ্ছ খেলা
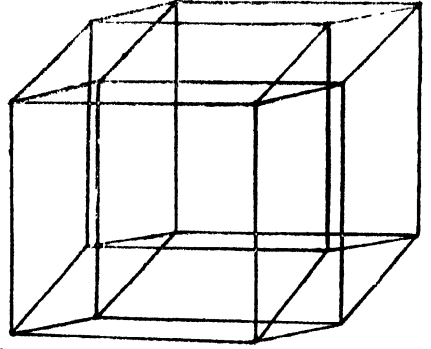
৭ (ঘ)। চতুর্থ সভ্য—Cuboid-a^4

দেখাতে পারে। দ্বিমাত্রিক যদি কোন জগৎ থাকত তবে সে জগতের ঘরবাড়ী, জিনিসপত্র সব কিছুই হতো রেখাবেষ্টিত কতকগুলো ছবি। দ্বিমাত্রিক গৃহস্থ যদিও বর্গাকার ঘরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতেন—দ্বিমাত্রিক চোর বর্গটির চতুর্দিকে বৃথাই ঘুরে বেড়াত, ঢোকবার কোন পথ পেত না; কিন্তু আমাদের দৃষ্টির কাছে ঘরের ভিতর-বার সর্বত্রই উন্মুক্ত থাকত। (চিত্র ৯)। চতুর্মাত্রিকদের কাছে
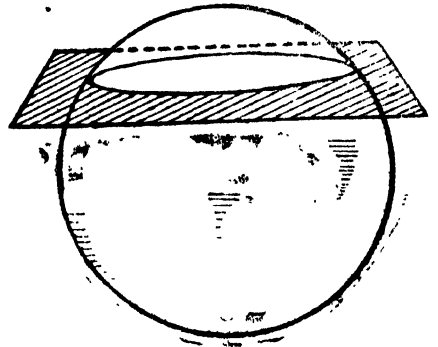
৮। গোলককে একটা সমতল দিয়ে ছেদ করলে পাই একটি বৃত্ত

আমাদের দশাও এই দ্বিমাত্রিকদেরই মত হতো।

আমাদের সব লুকোচুরিও তাদের কাছে হাস্যকর। একই সঙ্গে আমাদের সামন, পিছন, মাথার তালু, পায়ের তলা, এমন কি পেটের ভিতর পর্যন্ত তাদের
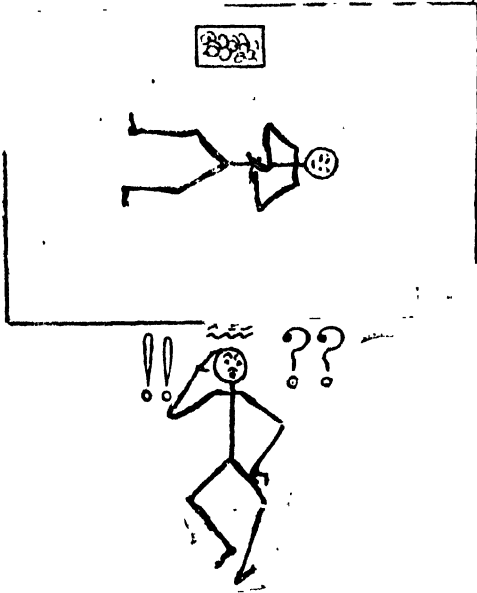
৯। দ্বিমাত্রিক গৃহস্থ বর্গাকৃতি গৃহে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁর ঘর চারটি রেখা বেষ্টিত একটি বর্গ। দ্বিমাত্রিক চোর রেখার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঢোকবার পথ পাচ্ছে না।

অবাধ দৃষ্টি প্রসারিত। বই না খুলেই তার আগা-গোড়া পড়ে ফেলা তাদের পক্ষে সম্ভব। একটি রবারের অঙ্গুরীকে মোচড় দিয়ে আমরা তার ভিতরের পরিধিটা উল্টে বাইরে আনতে পারি। ঠিক এই প্রক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করে সেই চতুর্মাত্রিক জীবেরা আমাদের দেহের কোন অংশ না কেটেই ভিতরটা বাইরে এবং বাইরেরটা ভিতরে পাঠিয়ে দিতে পারে। আর একটি অত্যন্ত সাংঘাতিক সম্ভাবনা আছে। চতুর্মাত্রিকেরা আমাদের দেহটিকে এমনভাবে বদলে দিতে পারে যে, সমস্ত ডাইনের অঙ্গ বাঁয়ে এবং বাঁয়ের অঙ্গ ডাইনে চলে আসবে। প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত সোজা। চতুর্থ দিকে আধ পাক ঘুরিয়ে আনলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এই ধরনের পরিবর্তনের নাম symmetrical interchange। একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। মনে করা যাক ABC একটি ত্রিভুজ। (চিত্র ১০)। ত্রিভুজটিকে যদি AB-র চারদিকে আধ পাক (১৮০°) ঘোরান হয় তবে আমরা এমন একটি ত্রিভুজ পাব যা সর্বতোভাবে AB-র সমান; কিন্তু C বিন্দুটা AB-র অপর দিকে, এইটুকু যা তফাৎ। ABC ত্রিভুজটিকে নিজ সমতলে যতই ঘোরান যাক না কেন ABC ও A′B′C′ কে পরস্পরের সঙ্গে কিছুতেই মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠিক তেমনি একটি ঘন পদার্থকে তিন মাত্রায় যথাসাধ্য নাড়াচাড়া করেও তাকে তার symmetrical counterpart-এ পরিণত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু চতুর্থ মাত্রার সাহায্যে অতি সহজেই তা
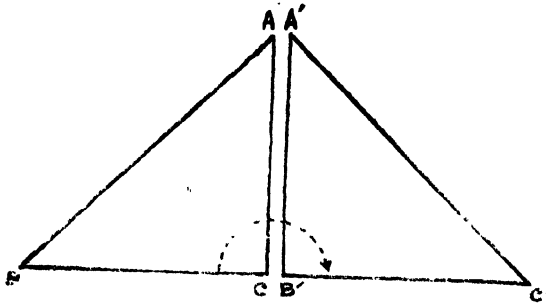
১০। ABC কে AC-র চারদিকে আধপাক (১৮০°) ঘুরিয়ে দিলে তা A′B′C′-তে পরিণত হয়

করা সম্ভব। এই উপায়ে বাঁ হাতের দস্তানাকে ডান হাতের দস্তানাতে এবং left hand drive গাড়ীকে right hand drive-এ পরিবর্তিত করা সম্ভব। বাঁ হাতে কাজ করতে অভ্যস্ত কোন লোক যদি ডানহাতের অক্ষমতা দূর করতে ইচ্ছুক হন তবে এই পদ্ধতিটা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব আছে কিনা বা অস্তিত্ব সন্দেহ করার কোন কারণ আছে কিনা। প্রশ্নটি অত্যন্ত দুরূহ। তবে এক কথায় বলা যায় যে, চতুর্থ মাত্রা আছে কি নেই, তা কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না। চারটি কেন, যে কোন সংখ্যক মাত্রাও যদি থেকে থাকে, আমাদের পক্ষে সে বিষয়ে কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সন্দেহ করার কারণ যথেষ্টই আছে। পদার্থবিদ্যায় এমন কতকগুলো সমস্যা আছে, কেবল মাত্র চতুর্থ মাত্রার অস্তিত্ব মেনে নিলেই যাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে, আধুনিক পদার্থবিদ্যার পটভূমিকার স্থানে সনাতনী ত্রৈমাত্রিক spaceকে অপসারিত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইনষ্টাইনের যে নতুন space, তা চতুর্মাত্রিক। তবে একটা কথা এখানে মনে রাখা উচিত—আমরা এতক্ষণ যে মাত্রার কথা আলোচনা করেছি তাদের প্রত্যেকটিই স্থানগত। কিন্তু আইনষ্টাইনের বিশ্বের আগন্তুক মাত্রাটি কালগত।

আইনষ্টাইনের মতবাদকে মানতে হলে আমাদের বিশ্বটাকে একটি চতুর্মাত্রিক গোলক বলে মনে করতে হয়, যার মাত্রা চারটি হচ্ছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং কাল। এই গোলকের গোলাকৃতি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করা অসম্ভব। কিন্তু এই গোলত্ব যে কতটা বাস্তব তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সত্য থেকে যে, এই গোলকেরও একটা ব্যাসার্ধ আছে এবং তা মাপাও হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যে কোন একটি বিন্দু থেকে. যে কোন দিকে সরলরেখায় রওনা হলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করে আবার ঠিক সেই বিন্দুটিতেই ফিরে আসতে হবে। ঠিক যেমন আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগটা—সসীম কিন্তু অসীম।

আর একটি জোরাল যুক্তি চতুর্থ মাত্রার পক্ষে দেওয়া যায়। যাদুকর, যোগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি লোকের অতিপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ এবং কুখ্যাত ভূতসম্প্রদায়ের আধিভৌতিক ক্ষমতার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে চতুর্থ মাত্রার মধ্যে। অবশ্য এক্ষেত্রে চারটি মাত্রাকেই স্থানগত হতে হবে। আইনষ্টাইনের বিশ্বে ভূত-প্রেতেরাও গণতন্ত্রসম্মত স্বীকৃতি পেয়েছে মনে করে বসলে মারাত্মক ভুল করা হবে। Zollner প্রমুখ জার্মেনির অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা চতুর্মাত্রিক জগতে পরলোকগত আত্মাদের স্থান দেবার পক্ষে মত প্রচার করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় তাঁদের কথা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রমাণ করতে পারেননি।

গণিতের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশিশিরকুমার দেব

গণিতেরও ইতিহাস আছে এবং এই ইতিহাসের শুধু যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে তা নয়, এর গাণিতিক মূল্যও যথেষ্ট। গণিত শিক্ষায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজগুলোতে এর স্থান একেবারেই নেই; অবশ্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার গুলোতে কয়েকখানা স্মিথ, ক্যাজোরী, মিলার, বেল প্রভৃতি দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৯৫ জন লোক গণিতের নীরসতা ও বিভীষিকা নিয়ে সরস ও ব্যঙ্গপূর্ণ আলোচনায় ওস্তাদ; কিন্তু আমার মনে হয় তারা গণিতের ইতিহাসের কথা জানেন না বা এটা পড়েননি। গণিতের ইতিহাস নীরস তত্ত্বের সরস ও স্বাভাবিক পরিপূরক। গণিতজ্ঞের জীবনী শিশু-ছাত্র, কিশোর ছাত্র, যুবক ছাত্র সবারই নিকট আনন্দদায়ক এবং ইতিহাস ও জীবনী দ্বারাই গণিতের ভীতি ও বিভীষিকা অনেকাংশে দূর করা যেতে পারে, গণিতকে গণিত রেখেই। আমাদের শিক্ষায়তনগুলোতে গণিত-পাঠ্যতালিকায় থাকা উচিত গণিতের ইতিহাস।

ইতিহাস সংকলনের ব্যাপারে 'Hall'iwel-Phillips-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Huntington dibrougqly-র এক প্রবন্ধে তার শ্রমের গুরুত্ব বোঝা যায়। ইংরেজী ভাষায় যে কয়েকখানি বিখ্যাত ইতিহাস বই আছে তাদের মধ্যে ক্যাজোরীর 'A Histroy of Mathematics' ও 'A History of Elementary Mathematics,' মিলারের বইখানি, স্মিথের ইতিহাস এবং সর্বোপরি বেলের 'Men of Math.' ও 'The development of Mathematics' বইগুলো উল্লেখযোগ্য। বেলের বই দুটি যেমন সহজ, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এত সহজ ও সুন্দর রচনা আর কারও লেখনীতে সম্ভব হয়নি—মনে হয় যেন কোন উপন্যাস পড়ছি। এই প্রসঙ্গে নাম করা যেতে পারে হগবেনের 'Mathematics for the million', বেলের 'The magic of numbers', সয়ারের 'The mathematicians' delights' ও "Math-in-theory & practice" কুরান্ট-রবিন্সের 'What is Mathematics ?', আণ্ডার-উডের 'Living Mathematics', বলের 'Mathematical Recreations' ইত্যাদি। এগুলো ইতিহাস নয় তবুও কাজের দিক দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য রয়েছে। গণিতকে জনপ্রিয় করে তোলবার প্রয়াসে আমেরিকার "Scripta Mathemeatica" নামক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত বই, ছবি ও বুলেটিনগুলো প্রশংসাযোগ্য। 'Galois Institute' ও 'Open Court Publishing Co'-র প্রকাশিত বই ও প্রচার পত্রিকাগুলো উল্লেখযোগ্য। Home University Library থেকে প্রকাশিত হোয়াইটহেডের 'Introd. to Mathematics' নামক বইখানি এই পর্যায়ে ফেলে শীর্ষস্থান দেওয়া যেতে পারে; কারণ তিনি বোধ হয় সর্বপ্রথম এই উদারনীতির প্রচার-কল্পে বইখানি লেখেন। বারট্রাণ্ড রাসেল তার 'Mysticism & Logic' নামক বইটিতে এই ধরনের কথা বলেন এবং জনসাধারণের নিকট গণিতজ্ঞের দায়িত্বের কথা স্বীকার করেন। তাঁর 'A History of Western Philosophy' বইখানি বের হবার পর আমাদের আশা হয়েছিল, হয়তো দর্শনের মতই গণিতের ঐ রকম একটা উপাদেয় বই তিনি প্রকাশ করবেন! কুরান্ট-রবিন্সের বইখানির গাণিতিক মূল্য যথেষ্ট; কারণ

এতে নতুনতম শাখাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—যেমন, Abstract Algebra, Topology Logistics ইত্যাদি।

উক্ত বইগুলো গণিতশিক্ষায় পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। ইতিহাস ও জীবনী থেকে আমরা প্রথমতঃ জানতে পাই—কোন্ তত্ত্বটি কোন্ বিশেষ সময়ে ও কোন্ বিশেষ দেশে আবিষ্কৃত হলো; দ্বিতীয়তঃ—কখন আবার এইগুলো থেকে শাখা প্রশাখা বেরুলো; তৃতীয়তঃ—সময়ের গতিতে তত্ত্ব ঠিকই রইলো, না বদলালো; চতুর্থতঃ—কোন্ সময়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কি ভাবে হলো; পঞ্চমতঃ—বিভিন্নদেশের সমসাময়িক গাণিতিক অবস্থা কিরূপ এবং কোন্ দেশে সব চাইতে বেশী ও ভাল চর্চা হয়েছে; ষষ্ঠতঃ—আবিষ্কারের পেছনে বাস্তব বা ব্যক্তিগত মানসিক তাগিদ আছে কিনা এবং সর্বোপরি আমরা জানতে পাই গণিতের অভিব্যক্তি, ধারা ও গবেষণার মূল তথ্য এবং আবিষ্কারের সম্ভাবনা। গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কারের অনেক কাহিনীই যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষনীয়। অনেক সময় দেখা গেছে, কোন তত্ত্ব কিছুটা আবিষ্কৃত হয়ে অনেক বৎসর পরে হয়ত অন্য দেশের কোন বৈজ্ঞানিক দ্বারা আবিষ্কৃত হলো। গণিতরুচিসঙ্গত এইগুলোর আলোচনা বড়ই মজার ব্যাপার। কতকগুলো ফরমুলার অন্ধ কচ্‌কচানিতে গণিতের অর্থ নেই। গণিতের অর্থ সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও গণিতকে সহসপাঠ্য করতে হলে গণিতের ইতিহাস আলোচনা একান্ত দরকার। দেশের ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই ইতিহাসের একদিকে যেমন থাকবে বিস্তৃতি তেমনি থাকবে তাত্ত্বিক গভীরতা। এ গভীরতা বেড়েই যাবে সময়ের অনুপাতে, মানুষের চিন্তাশক্তির ক্রমাভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে। গণিতের বিরাট সৌধ তৈরী করতে হলে একদিকে যেমন সুদৃঢ় ভিত্তির যথেষ্ট বিস্তৃতি চাই, তেমনি চাই কল্পনার গভীরতা। দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষায় না আছে বিস্তৃতি, না আছে গভীরতা—হয়ত কোথাও আছে হাল্কা প্রচার, কোথাও বা গভীরতার নামে সঙ্কীর্ণতা।

গণিতের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে—স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি (ইউক্লিডিয় ও বিশ্লেষণাত্মক (কোর্টিসিয়ান), ত্রিকোণমিতি. স্থিতি-গতি শাস্ত্র ও গাণিতিক ভূগোলের ক্রম-অভ্যুত্থান ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা। শিশু ও কিশোরদের জন্যে জীবনীর ভিত্তিতে এর আলোচনা হওয়া আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য কলেজোন্মুখী ছাত্রদের জন্যে এতে বিভিন্নদেশীয় আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা একটু থাকবে, কারণ এর মূল্য খুবই বেশী। যদিও অনেক বইয়ে আবিষ্কারকের নাম, দেশ ও সময়ের কথা দেওয়া হয় তবু তা পর্যাপ্ত নয়; কারণ একে পাঠ করতে হবে কতকটা ইতিহাসের ভিত্তিতে। এতে বিষয়টি নৈর্ব্যক্তিকতা ও চিহ্ন-অনাপেক্ষিকতার নীরসতা থেকে মুক্ত হবে। এতেই বাড়বে ছাত্রের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস। তুলনামূলক পাঠের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—পীথাগোরীয় উপপাদ্য প্রমাণিত হয়েছে ইউক্লিডের দ্বিতীয় খণ্ডে, কিন্তু ১ম খণ্ড দিয়েও হয়।—Math. from the far East—Y. Mikami.

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—কলেজের ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যবিষয়গুলোর ক্রমবিকাশ ও তুলনামূলক আলোচনা। এই স্তরে শিক্ষার্থীর জন্যে থাকবে গাণিতিক গবেষণার অনুপ্রেরণা। নিউটনের calculus ও লাইবনিৎসের calculus-এর গুরুত্ব ও প্রারম্ভিক প্রভেদ এই অংশে থাকবে। ইউক্লিডিয় ও অনিউক্লিডিয় জ্যামিতির প্রভেদ ও পারস্পরিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হবে এই অংশে। গণিতের বিশুদ্ধ তত্ত্বগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগও এতে থাকবে। অসম্পূর্ণ তত্ত্বের বা ভবিষ্যতে ভুল বলে প্রমাণিত তত্ত্বের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকবে এতে। সব দেশেরই গণিতের ধারা

একরূপ নয় এবং এই স্রোতের ব্যাখ্যা করবে গণিতের ইতিহাস। ভারতীয় গণিত, ইংরেজী গণিত, রুশীয় গণিত, জার্মান গণিত, পোলাণ্ডের গণিত, গ্রিসীয় গণিত, আরবীয় গণিত, ফরাসী গণিত, জাপানী গণিত ইত্যাদিতে গণিতকে ভাগ করা যেতে পারে এবং এতে গণিত প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট হবে না বরং এই দেশীয় ভিত্তিতে তুলনামূলক আলোচনা গণিতশিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহায়তা করবে। সময়ের পটভূমিকায় গণিতশিক্ষা অধিকতর আনন্দপ্রদ হয়ে উঠবে। বিশিষ্ট গণিতজ্ঞের বিশিষ্ট জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট হবার সময় যদিও স্কুলেই শেষ হয়ে যায় তবুও ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে সম্পূর্ণ এড়ানো না-ও যেতে পারে—এমন কি, হয়ত এই-ই ছাত্রের স্বাভাবিক প্রেরণা।

তৃতীয়টি হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণার স্তর। এইখানে তত্ত্বগুলোর আলোচনা হবে সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতিতে। সূক্ষ্ম ফাঁকগুলোর নির্দেশ থাকবে এতে এবং এই-ই দেবে গবেষণার প্রেরণা। অনেকে বলতে পারেন, এখানে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে সংবাদ থাকবে বেশী; কিন্তু মনে রাখতে হবে এর দামও কম নয়।

মোটামুটি এইভাবে গণিতের ইতিহাসকে বিভিন্ন স্তরের উপযোগী করে ভাগ করা যেতে পারে এবং অবশ্য শিক্ষণীয় বা পরিপূরক হিসেবে চালানো যেতে পারে। অবশ্য শিক্ষণীয় হলে পাঠ্যতালিকার কলেবর বড় হয়ে যেতে পারে; কিন্তু যাদের নিকট পাঠ্যতালিকা বড় মনে হয় তাদের পুরো সুযোগ হবে এতে।

গণিতের ইতিহাস প্রবর্তনে দুটি সুবিধা রয়েছে। একটি হচ্ছে—গণিত শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা, অপরটি হচ্ছে—গণিত-বিভীষিকার নিরসন ও গণিতকে সরস করে নেওয়া। অবশ্য শিশু-কিশোর ছাত্রদের গণিত-ভীতি দূর করে প্রীতি সৃষ্টি করবার অন্যান্য অনেক উপায় বের করেছেন মনস্তাত্ত্বিকেরা; যেমন—Visual aid, Experimental study, Project method, Motivation, Playway method ইত্যাদি। কিন্তু আমার মনে হয়, এই ইতিহাস পদ্ধতি যেমন সহজ তেমনি গরীব দেশের উপযোগী। সর্বোপরি এতে সর্বদাই থাকবে গাণিতিক গুঞ্জন ও বস্তুনিরপেক্ষতা।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে গ্রেট-ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ায় এ বিষয়ে বহু বই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সেখানে গণিতশিক্ষার প্রসার হচ্ছে খুব বেশী। অবশ্য সাবধান হওয়া দরকার, যাতে সরস করতে গিয়ে গণিত যাদুতে পরিণত না হয়—যদিও গণিত দিয়ে যাদু করা যায়। এই প্রসঙ্গে Maurice Kraitchik-এর Mathematical recreation, Bakst-এর Math & Magic', Dantzig-এর Number, The Language of Science প্রভৃতি বইগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশে এ নিয়ে আন্দোলন হয়নি—শুধু অর্থাভাবেই নয়, উৎসাহের অভাবেও। এ দেশের কয়জন গণিত-শিক্ষক গণিতের ইতিহাস ভাল করে জানেন বা তার দাম দিতে চেষ্টা করেন? বিশ্ববিদ্যালয় হতে এজন্যে প্রাদেশিক ভাষায় বই প্রচার করা ও লেখকদের উৎসাহ দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিভূতিভূষণ দত্তের 'Science of the Sulvas—a study in early Hindu Geometry' ও দত্ত নারায়ণের 'History of Hindu Math—a source book' বই দুটির নাম করা যেতে পারে। ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষের 'গণিতের ভিত্তি' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি অসম্পূর্ণ হলেও প্রশংসাযোগ্য। গণিতকে তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হলে এই সব বইয়ের প্রচার যে কত প্রয়োজনীয় তা প্রত্যেক গণিতানুসন্ধী ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারেন। বই না পেলে ছাত্রেরা পড়বে কি? শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উচিত এই ধরনের বইয়ের তালিকা ও পড়বার নির্দেশ দেওয়া। জানি না কয়জন অধ্যাপক

তাদের ছাত্রদের ইতিহাস প্রভৃতি পড়বার নির্দেশ দেন! সেদিন এক বিজ্ঞান-অধিবেশনে স্যার রামন লেখকদের বৈজ্ঞানিক-জীবনী লিখতে উপদেশ দিয়েছেন। শিক্ষক, লেখক, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের এদিকে নজর দেওয়ার ও কাজে নামবার যথেষ্ট সময় হয়েছে।

বাঙ্গালী ছাত্রের গণিতপ্রীতি ও গণিতকীর্তি অনুপাতে অনেক কমে গেছে। বাঙ্গালী ছাত্রমাত্রেই আশুতোষ মুখার্জী নয় যে, কয়লা দিয়েই আঁক কষে যাবে; কিন্তু আশা আছে, তাঁর বংশধর হয়ত তা না করলেও জীবনী ও ইতিহাস পড়বে আনন্দের সঙ্গে। স্কুল বা কলেজের ছাত্রদের উপযোগী কোন গণিত-পত্রিকাই নাই আমাদের দেশে। মাদ্রাজের 'The Mathematics Student' নামক পত্রিকাটি খুবই প্রশংসনীয় এবং সুখের বিষয় গণিতের ইতিহাস নিয়ে প্রায়ই (যদিও পত্রিকাটি পুরানো নয় এবং বের হয় না ঠিক সময়ে) এতে আলোচনা হয়। কলকাতা, বেনারস, ভারতীয় গণিতসংসদ থেকে পত্রিকাগুলোতে এর স্থান খুবই কম; সম্ভবতঃ এ বিষয়ে বিশেষ কোন মৌলিক আলোচনা হয় না বলেই! কয়েক বছর আগে ভারতীয় গণিত-সম্মেলনে একজন অধ্যাপক গণিতের ইতিহাস আলোচনার প্রস্তাব আনেন; কিন্তু তার পরের অধিবেশনগুলোতে এ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছুই হয়নি।

বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির অভাবে আসে নীরসতা, গভীরতার নামে সঙ্কীর্ণতা—এই-ই গণিত-ভীতির প্রধান কারণ। এ ভীতি দূর করবার প্রধান উপায় হচ্ছে সরস ও শিক্ষাপ্রদ গণিতের ইতিহাস ও গণিতজ্ঞের জীবনী আলোচনা। বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে লিখিত গণিতের ইতিহাস গণিত শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ, সরস ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে শূন্যে বিহার?

সি, বি, এস টেলিভিসন-রেডিওর শ্রোতৃমণ্ডলীকে শিকাগোর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ইউজিন মেইনর বলেছেন যে, শীঘ্রই তিনি রকেট যানের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে শূন্যে অভিযান করবেন এবং পুনরায় জীবন্ত অবস্থাতেই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। মেইনরের বয়স বর্তমানে ৫২ বছর। গত ত্রিশ বছর ধরে তিনি আধুনিক বিভিন্ন ধরনের বিমান চালিয়ে আসছেন। বায়ুমণ্ডলের বাইরে শূন্যে পরিভ্রমণের উপযুক্ত এক রকম রকেটের পরিকল্পনা করে নিজেই তিনি রকেটটি তৈরী করছেন। রকেট প্লেনটি হবে চোঙের মত ১৮ ফুট লম্বা, ওজনে হবে প্রায় ৭৫০০ পাউণ্ড। ১লা সেপ্টেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তিনি শিকাগো থেকে ২৫ মাইল দূরে মিচিগান হ্রদের মধ্যে অবস্থিত একটি বজরা থেকে রকেট যাত্রা সুরু করবেন। রকেটটি নাকি ঘণ্টায় ১৪০০ মাইল সর্বোচ্চ গতিবেগে ছুটে চলবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে তার এই উড্ডয়ন প্রায় ১৫ মিনিট কাল স্থায়ী হবে। উপরে পৌঁছুতে লাগবে ৩ মিনিট, আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে লাগবে ১২ মিনিট। প্রায় আধ মিনিটের মধ্যেই তিনি বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যাবেন। সুদূর শূন্য থেকে যেসব কসমিক রশ্মি আসছে, এই সময়টুকুর মধ্যেই তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি তাঁর এই পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে তবে এ-ই হবে রকেট-যোগে মানুষের প্রথম শূন্যে পরিভ্রমণ।

মেইনর আলাবামা পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউসনের একজন গ্র্যাজুয়েট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফিল্ড আর্টিলারীর পর্যবেক্ষক হিসেবে তিনি ক্যাপ্টেনের পদলাভ করেন। ১৯১৯ সাল থেকেই তিনি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে শূন্যে পরিভ্রমণের আশা পোষণ করে আসছেন।
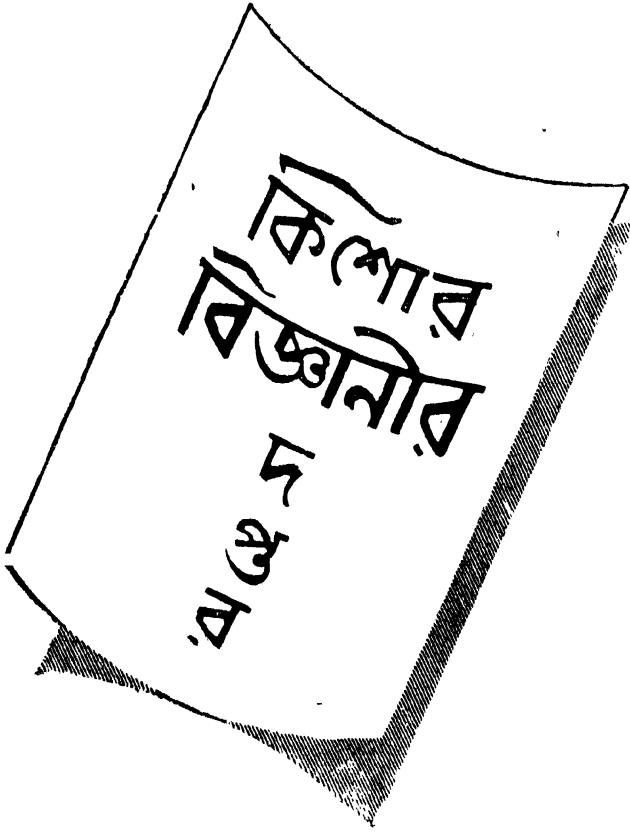
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারি—১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ,—২য় সংখ্যা

ছবির এই মাছটা বোধ হয় তোমাদের কারুরই অচেনা নয়। এই মাছের অদ্ভুত স্বভাবের বিষয় যদি কিছু লক্ষ্য করে থাক, সে সম্বন্ধে তিন পৃষ্ঠার মত কিছু লিখে পাঠাও।

গত জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত **প্রকৃতি পরিচয়** শীর্ষক বিষয়গুলো সম্পর্কে যে কোন সংখ্যার জন্যে প্রবন্ধাদি লিখতে পার। এসব সম্পর্কে নিজেদের তোলা ভাল ফটো পাঠালেও প্রকাশিত হতে পারে। স.

ফটো—গ চ ভ
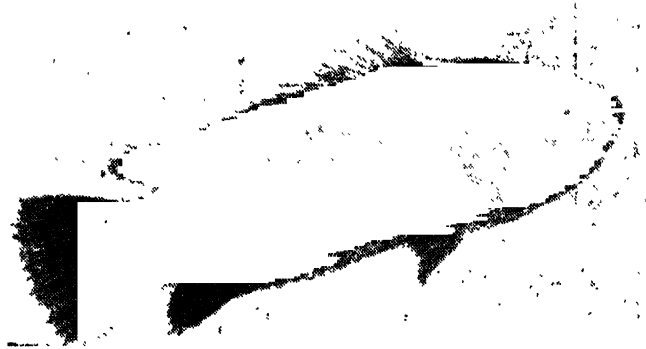
বনচাঁড়ালের গাছ

গ. চ. ভ. অঙ্কিত

এই গাছ সম্বন্ধে তোমরা যা জান সে বিষয়ে
ছোট্ট প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে পার।

করে দেখ

মাটি ছাড়া চাষ

(বালি-চাষ, জল চাষ ইত্যাদি)

এতদিন তোমাদিগকে খেলনা যন্ত্রপাতি তৈরীর কথা বলেছি। যাতে কার্যকরী কিছু একটা করতে পার সেজন্যে এবার তোমাদিগকে চাষ-আবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষা মূলক দু-একটা কাজের কথা বলব। তোমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা নিজেদের ছোট্ট বাগানে বা বাড়ীর আনাচে-কানাচে অথবা টবের মধ্যে দু-চারটে ফল-মূল ও ফুলের গাছ লাগিয়ে আনন্দ অনুভব করে। বিশেষ করে তাদের জন্যেই বালি-চাষ ও জল-চাষের কথা আলোচনা করছি।

পরীক্ষার জন্যে মাটি থেকে একটা চারা গাছ তুলে নাও। ধর, পাঁচ ছ' ইঞ্চি লম্বা একটা টোমাটোর চারা তুলে নিয়েছ। শেকড়ের গায়ে যেটুকু মাটি লেগে আছে সেটুকু জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করে ফেল। এখন গাছটাকে এক জায়গায় ফেলে রাখলে কি হবে? গাছটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাবে। কিন্তু এক জায়গায় ফেলে না রেখে পরিষ্কার বালির মধ্যে পুতে গাছটার শেকড়ের চারদিকে যদি জল দেওয়া যায় তবে কি হবে? নিশ্চয়ই গাছটা তখন পুনরায় সতেজ হয়ে উঠবে। কারণ জীবনধারণের উপযোগী জল এবং খাড়া থাকবার জন্যে বালির অবলম্বন,—অন্ততঃ এ-দুটো জিনিসও সে পেয়েছে। কিন্তু দস্তুরমত বেড়ে ওঠবার জন্যে কেবলমাত্র এ-দুটা জিনিসই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার খাদ্যেরও (রাসায়নিক পদার্থ) প্রয়োজন। কাজেই খাদ্য না পেলে শুধু জল আর বালির অবলম্বন তাকে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা, এবার বালির মধ্যে বসানো গাছটাকে যদি প্রয়োজনীয় আহার্য দেওয়া যায় তবে কি হবে? তখন দেখবে—যেন ম্যাজিকের মত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে। গাছটা বালির মধ্যেই তরতর করে বেড়ে উঠছে। মাটির মধ্যে সে যতটা বাড়তো হয়তো বা তার চেয়েও বেশী বেড়ে উঠবে এবং ফলও ধরবে প্রচুর। অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এ-ব্যাপার ঘটে উঠবে না—বেশ কিছুদিন সময় লাগবে এবং মাটি ছাড়া-ই এ-ব্যাপারটা সম্ভব হবে। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা অবস্থা অনুযায়ী পরিমিত মাত্রায় ক্রমাগত জল ও রাসায়নিক আহার্য পদার্থগুলোর যোগান দিতে হবে। দেহ-পুষ্টির জন্যে গাছ মাটি থেকে কি অনুপাতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা তা ভালরকমই জানেন। সে হিসেবে প্রথমে দিতে হয়—নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামের রাসায়নিক মিশ্রণ। তারপর ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সালফার প্রভৃতি

পদার্থগুলো দেওয়া দরকার। অবশ্য এমন জিনিসই ব্যবহার করতে হবে যেগুলো জলে গলে গিয়ে সে-অবস্থাতেই থাকে। সর্বশেষে অতি সামান্য মাত্রায় লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, দস্তা প্রভৃতি দিতে হবে। কোন্ কোন্ পদার্থ কোন্ কোন্ মাত্রায় দিতে হবে নীচে তার একটা তালিকা দিলাম। এ থেকে তোমাদের সলিউসন তৈরী করে বা সংগ্রহ করে নিতে হবে। গাছের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই রাসায়নিক পদার্থগুলোর মিশ্রণকে আমরা নিউট্রিয়েণ্ট বা কালচার সলিউসন বলে উল্লেখ করবো।

পরীক্ষার জন্যে ভিজা বালি বা ভিজা ব্লটিং পেপারের মধ্যে টোমাটোর বীজ রেখে প্রথমে চারা গাছ উৎপাদন করতে পার। একটু বড় হয়ে উঠলে সেগুলোকে বালি ভর্তি পাত্রের মধ্যে পুতে দিতে হবে। এতে নিয়মিতভাবে নিউট্রিয়েণ্ট সলিউসন ঢেলে দিতে পার অথবা সলিউসনের পাত্রটাকে উঁচুতে রেখে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করে অথবা ক্রমাগত প্রবাহিত করবার ব্যবস্থাও করতে পার। যাতে গাছ লাগাবে সেই বালির পাত্রটাকে একখানা এনামেল করা থালা বা ট্রে'র উপর রাখলে ভাল হয়। কারণ বালির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে অনেকটা সলিউসন তলায় গিয়ে পাত্রের মধ্যে জমা হবে। সেটাকে বার বার ব্যবহার করতে পারবে। ৫।৬ দিন পর পর নতুন নিউট্রিয়েণ্ট সলিউসন ব্যবহার করা দরকার। বালি-চাষে গাছের শেকড়গুলো অবাধে অনেকটা জায়গা জুড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বালির দানার ফাঁকে ফাঁকে যথেষ্ট বাতাসের সংস্পর্শেও আসতে পারে। কাজেই গাছগুলো যেমন আকারে বাড়ে তেমনিই ফলপ্রসূ হয়। চাষের জন্যে মাঝারি দানার বালিই সুবিধাজনক। চালুনি দিয়ে ছেঁকে মাঝারি দানার বালি আলাদা করে নেওয়া যেতে পারে। বালির দানা মোটা হলে তারা যথেষ্ট জল ও আহার্যপদার্থ ধরে রাখতে পারেনা; আবার বেশী সূক্ষ্ম হলে দানাগুলো শেকড়ের গায়ে কাদামাটির মত নেপ্টে বসে যায়। ফলে শেকড়গুলো যথাযথভাবে বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারেনা।

বালি-চাষে Quartz sand অর্থাৎ বালুকা-প্রস্তর থেকে উৎপন্ন বালি ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রথমে পরিমাণ মত বালি ছেঁকে নিয়ে সেগুলোকে ২০০° ফাঃ বা তারও বেশী উত্তাপে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গরম করে নেওয়া দরকার। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করেও নেওয়া চলে।

জল-চাষের ব্যবস্থাও অনেকটা বালি-চাষের মত, তবে এই ব্যবস্থায় বালির পরিবর্তে খড়কুটা অথবা শুধু কালচার সলিউসনেই কাজ চলে। একটা পাত্রের মধ্যে নিউট্রিয়েণ্ট বা কালচার সলিউসন রেখে সেটার উপর ছিদ্র করা অথবা তারের জালের একটা ঢাকনা দিতে হয়। ঢাকনার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তুলা অথবা কর্কের সাহায্যে গাছটাকে খাড়াভাবে রাখা দরকার। শেকড়গুলো কালচার সলিউসনের মধ্যে ডুবে থাকবে। সলিউসনের মধ্য দিয়ে বুদ্বুদের আকারে শেকড়ের গায়ে বাতাস লাগাবার

ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা গাছ সমেত ঢাকনাটাকে মাঝে মাঝে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে শেকড়ের গায়ে বাতাস লাগানো দরকার।

এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা না করে এবার একরকম কালচার সলিউসন তৈরীর কথা বলছি ঃ—

ষ্টক সলিউসন (ক)

আধ গ্যালন জলে এক এক চামচ বোরিক অ্যাসিড, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ও জিঙ্ক সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন মত পরে এই সলিউসনে ১/৮ চামচ কপার সালফেটও মিশাতে পার।

ষ্টক সলিউসন (খ)

এক পাইন্ট জলে ১/৪ চামচ আয়রন (ফেরিক) ক্লোরাইড গুলে নিতে হবে।

কালচার সলিউসন

পরিমাণ	মনোপটাসিয়াম ফস্ফেট	ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট (শুষ্ক)
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসনে গ্র্যাম হিসেবে	৫'৯	২০'১	১০'৭	১'৮
প্রতি ৫ গ্যালন সলিউসনে চামচ হিসেবে (মোটামুটি)	১ ১/৪	৪	২ ১/৩	১/২

ইহার প্রত্যেকটি রাসায়নিক পদার্থ আলাদা আলাদাভাবে প্রায় তিন পোয়া জলে গুলে নিতে হবে। রাসায়নিক পদার্থগুলো দ্রবীভূত হয়ে গেলে তাদের একত্র মিশিয়ে ফেল। এই মিশ্রণে জল মিশিয়ে পাঁচ গ্যালন পর্যন্ত করতে হবে।

প্রতি ৫ গ্যালন কালচার সলিউসনে (বিশুদ্ধ রাসায়নিক থেকে প্রস্তুত হলে) ২ চামচ ষ্টক সলিউসন (ক) মিশিয়ে নাও।

যখন ব্যবহার করবে ঠিক সেই সময়ে ষ্টক সলিউসন (খ) কালচার সলিউসনের সঙ্গে মিশাতে হবে। এক গ্যালন কালচার সলিউসনে ৪ চামচ ষ্টক সলিউসন (খ) মিশিয়ে দিবে।

জেনে রাখ

দূরদর্শন বা টেলিভিসন *

আজ তোমাদের কাছে যে যন্ত্রের কথা বলব তার নাম তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো শুনেছ, অনেকে হয়তো শোন নাই। টেলিভিশন বা দূরদর্শন যন্ত্র আমাদের দেশে এখনও আসে নাই, কিন্তু আমেরিকায় এর যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে—যদিও রেডিও'র তুলনায় এর প্রচলন খুবই সামান্য। ত্রিশ বৎসর আগে আমাদের কথা দূরে থাক, আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ডের লোকেরাও কল্পনা করতে পারে নাই—ঘরে ঘরে এমনভাবে রেডিও'র প্রচলন হবে। কাজেই কয়েক বছরের মধ্যে যদি ঘরে ঘরে এরূপ দূরদর্শনের প্রচলন হয় তাহলেও আশ্চর্যের বিষয় মনে করবার কারণ নেই।

দূরের মানুষকে জীবন্তভাবে দেখবার ও তার কথা শোনবার আগ্রহ মানুষের বহুদিনের। দেখবার জন্যে প্রথমে ছবি আঁকা ও পরে ফটোগ্রাফির সৃষ্টি হয়। কথা শোনবার জন্যেও গ্রামোফোন ও টেলিফোনের সৃষ্টি। তাতে কিন্তু মানুষের মন উঠলো না। ফটোগ্রাফে যাকে দেখি তার একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছবিই দেখতে পাই; কিন্তু জীবন্তভাবে না দেখতে পেলে আমাদের ঠিক মনের মত হয় না। আমরা চাই ছবির সচল অবস্থা দেখতে, বাস্তব অবস্থায় ঠিক যেমন ভাবে চলাফেরা করে। সিনেমা আবিষ্কার হওয়ায় গতিশীল ছবি দেখা সম্ভবপর হয়েছে; কিন্তু তাতেও মানুষের মনে তৃপ্তি আসেনি। গতিশীল জিনিসের শব্দহীন মূর্ত্তি দেখে আর ভাল লাগলো না। নানাভাবে চেষ্টা হলো গতিশীল ছবি দেখার সঙ্গে কথাবার্তা ও শব্দ যেন স্বাভাবিকভাবে শোনা যায়। এই চেষ্টার ফলে আমরা পেয়েছি 'টকি'। তাতে চলাফেরা, কথাবার্তা ইত্যাদি সবটারই হুবহু অনুকরণ দেখে শুনে আমরা আনন্দ পাই।

কিন্তু সিনেমা, গ্রামোফোন—এমন কি টকিতেও যা দেখি বা শুনি, তা ঠিক এই মুহূর্তে কি হচ্ছে তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এত সব করেও আমরা দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি যে জিনিস তা পুরণো হয়ে গেছে। যে ঘটনা বা যে কথা বা গান আমাদিগকে টকিওয়ালা দেখাচ্ছেন, শোনাচ্ছেন তা হয়ে গেছে অনেক আগে। তাঁরা

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে

দেখে শুনে মেজে ঘষে আমাদের দেখা শোনার জন্যে যা বেছে রেখেছেন তাই আমরা দেখতে শুনতে পাচ্ছি।

দূর থেকে শুনতে পাওয়ার সুযোগ বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই আমাদের করে দিয়েছেন। টেলিফোনে আমরা বহু দূর থেকে কথাবার্তা বলতে ও শুনতে পারি; কিন্তু তাতে বহুলোকের পক্ষে একজনের কথা শোনা সম্ভবপর নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন গড়ের মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তোমাদের মধ্যে যাদের বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তাদের মধ্যে অনেকেই ঘরে বসে রেডিওতে শুনেছ। খুব নামজাদা গায়কের গান সকলেই শুনতে চাও; এখন যে তোমাদের এতজনকে আমার কথা শোনাচ্ছি টেলিফোনে এসব সম্ভব হয়নি। রেডিও'র তাই এত প্রচলন।

কিন্তু শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেখার সাধ হওয়াও স্বাভাবিক। তোমাদের অনেকেই নিশ্চয় ভেবেছ—পণ্ডিতজীর গড়ের মাঠের বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার সময়কার ছবি যদি আমাদের সামনে ভেসে উঠত তবে কতই না আনন্দ হতো। শিল্ড ফাইন্যাল খেলাটা রেডিওতে না শুনে সেই সময় তার চলন্ত ছবিটা যদি আমাদের চোখের সামনে দেখতে পেতাম তাহলে খেলাটা বহুগুণ ভালভাবে উপভোগ করতে পারতাম। মানুষের এই সাধ পূরণ করার জন্যেই বিজ্ঞানীরা দূরদর্শনের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

দূরদর্শন যন্ত্রের বর্তমান পরিণতি কতকগুলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সম্ভব হয়েছে। অবশ্য দূরদর্শনের গোড়াপত্তন হয় টেলিগ্রাফে দূর থেকে ছবি পাঠাবার প্রণালী আবিষ্কারের সঙ্গে। কি করে তারে ছবি পাঠান হয় সে প্রণালীটা খুব সহজেই বোঝা যায়। একটা হাফটোন ছবিকে লেন্‌স্ দিয়ে দেখলে দেখবে যে, তা অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি। বিন্দুগুলোর ঘনত্ব অনুসারে কমবেশী কালো দেখায় এবং তা থেকে ছবির ধারণা জন্মে। বিন্দুগুলোকে কমবেশী কালো করেও ঠিক একই ফল পাওয়া যেতে পারে। যে জিনিসের ছবি আমরা তারে পাঠাতে চাই, আলো ও লেন্‌সের সাহায্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া দরকার। মনে করা যাক গ্রাফের কাগজের মত করে প্রতিচ্ছবিটা ছোট ছোট খোপে ভাগ করা আছে। এই ভাগগুলো এত ছোট ভাবতে হবে যে, খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। প্রত্যেকটি ভাগ থেকে একটার পর একটা বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানো হয়। যদি গ্রাহক ষ্টেশনে এই সংকেতগুলো ধরে ঠিক আগের মত ধারায় খোপে খোপে আলো উৎপাদন করা যায়, যার ঔজ্জ্বল্য হবে প্রেরক ষ্টেশনের ছবির খোপগুলোর অনুপাতে, তাহলে প্রেরক ষ্টেশনের অনুরূপ একটি ছবি দেখা যাবে গ্রাহক ষ্টেশনে। ঠিকমত একটি প্রতিচ্ছবি পেতে হলে দৃশ্যমান বস্তুটিকে অনেকগুলো খোপে ভাগ করতে হয় এবং এই খোপগুলো থেকে একটার পর একটা তড়িৎ-সংকেত এসে গ্রাহক ষ্টেশনে ধরা দেয়; কাজেই সমস্ত ছবিটা একবার পেতেও কিছু সময় দরকার।

স্থির বিষয়বস্তুর ছবি তুলতে অবশ্য এতে অসুবিধা নেই, কারণ যত সময়ই লাগুক ছবি পাওয়া যাবেই।

চলন্ত বিষয়ের ছবি যখন আমরা দেখতে চাই তখনই নানারকম অসুবিধার উদ্ভব হয়। এসব অসুবিধার দরুণই দূরদর্শন ব্যাপারে কয়েক বছর পূর্বেও খুব কার্যকরী পন্থা বের হয়নি। পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলোর সাহায্যেই এই সব অসুবিধা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

খোপে খোপে ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষণ করার জন্যে বহু বছর পূর্বে বিজ্ঞানী নিপ্‌কভ্‌ এক রকম চাক্‌তি আবিষ্কার করেন। তাতে অনেকগুলো গর্ত এমনভাবে সাজানো থাকে যে, চাক্‌তিটি একবার ঘোরালে প্রতিচ্ছবির প্রত্যেকটি অংশ একবার করে গর্তের মুখে আসে। বেয়ার্ড প্রমুখ দূরদর্শনের আদি বিজ্ঞানীরা নিপ্‌কভ্‌ চাক্‌তির সাহায্য নিতে চেষ্টা করেছিলেন।
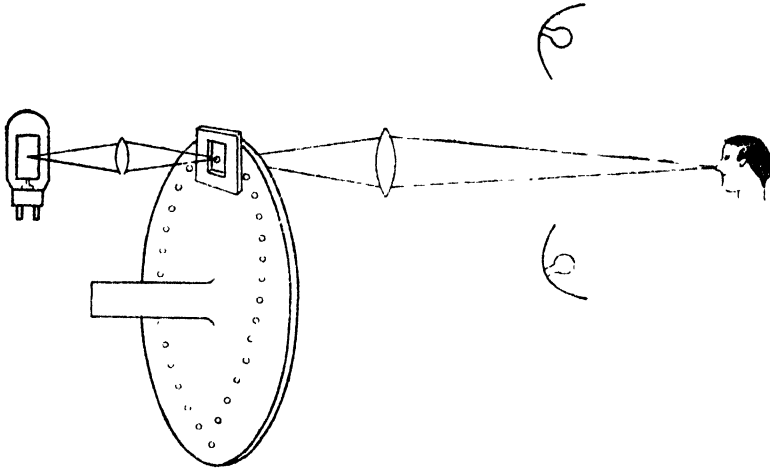
আলোকপাতের ব্যবস্থা সমন্বিত নিপ্‌কভ্‌ চাক্‌তি

তোমরা বোধ হয় জান যে, সিনেমাতে চলন্ত ছবি দেখাতে হলে পর্দার উপর একটার পর একটা করে সেকেণ্ডে ২০।২৫ বার ছবি ফেলতে হয়। এত তাড়াতাড়ি ছবির পরিবর্তন মানুষের চোখ ধরতে পারে না; কাজেই একটানা ছবি দেখা হচ্ছে বলে মনে ধারণা জন্মায়। দূরদর্শনের দ্বারা চলন্ত ছবি ঠিকমত দেখতে হলেও সম্পূর্ণ ছবিটা অন্তত সেকেণ্ডে ২০।২৫ বার হওয়া দরকার। কিন্তু একবার সম্পূর্ণ ছবিটা তৈরী করতে প্রেরক-যন্ত্রে প্রতিচ্ছবির প্রত্যেকটি খোপ থেকে একবার করে বৈদ্যুতিক সংকেত আসা চাই। দেখা গেছে, দৃশ্য বস্তুকে চার পাঁচ শ' সারে এবং প্রত্যেক সারকেও ততগুলো খোপে ভাগ করলে বেশ ভালভাবে সাধারণ আকারের ছবি গ্রাহকযন্ত্রে পাওয়া যায়। ৪০০ করে লাইন এবং প্রত্যেক লাইনে ৪০০ খোপ থাকলে ১,৬০,০০০ খোপ হয়। কাজেই

সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ লক্ষ বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠানো প্রয়োজন। প্রতিচ্ছবি থেকে দ্রুত বৈদ্যুতিক সংকেত পাঠাবার জন্যে কয়েক বছর পূর্বে বিজ্ঞানী জ্বোরিকিন "আইকোনোস্কোপ" নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তার ফলে দূরদর্শন কার্যকরী করা সম্ভব হয়। ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেলের নাম বোধ হয় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনেছ, বিজ্ঞানের একজিবিশনে হয়তো দেখেও থাকবে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আলো পড়লে এ-যন্ত্র থেকে ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট পাওয়া যায়। আইকোনোস্কোপে মৌচাকের মত করে ক্ষুদে ক্ষুদে ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেল একসঙ্গে সাজানো থাকে। অবশ্য সেগুলো মৌচাকের খোপের চেয়ে অনেক ছোট, খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না। এই কয়েক বছরের মধ্যে আরও উন্নত ধরণের যন্ত্র বেরিয়েছে। কিন্তু সেগুলো আইকোনোস্কোপেরই রকমফের মাত্র।

গ্রাহক ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে ধারাবাহিকভাবে আলোকরশ্মিতে রূপান্তরিত করে কাঁচের পর্দার উপর ফেলা হয়। এ কাজে যে যন্ত্রের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার নাম হচ্ছে অসিলোগ্রাফ।

রেডিও'তে যে তরঙ্গ ব্যবহার হয় তাতে কম্পনসংখ্যা থাকে ১০ লক্ষ থেকে ২।১ কোটি। প্রতি সেকেণ্ডে ৩০।৪০ লক্ষ সংকেত পাঠাতে হলে যে রেডিও তরঙ্গের প্রয়োজন তার কম্পনসংখ্যা অন্ততপক্ষে ২৫।৩০ কোটি হওয়া দরকার। এরকম দ্রুত কম্পনের রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার বেশীদিন হয়নি। এজন্যেও দূরদর্শনের উন্নতি পূর্বে তেমন হতে পারেনি।

আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে এই কয়েক বছরের মধ্যে দূরদর্শন যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। আমেরিকায় বহু হোটেল ও রেস্তোরাঁতে দূরদর্শনের রিসিভার বসানো হয়েছে এবং অনেকগুলো বড় বড় সহর থেকে নিয়মিতভাবে দূরদর্শনের প্রোগ্রাম ব্রড্‌কাষ্ট করা হয়। রেডিওতে তোমরা থিয়েটার শোন, সেখানে দূরদর্শনের রিসিভারের সাহায্যে ঘরে বসে থিয়েটার দেখা সম্ভব হয়েছে। সহজেই বুঝতে পার, সেটা কত বেশী উপভোগ্য! খেলাধূলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা দেখার আগ্রহ যাদের আছে তাদের মধ্যে কত সামান্য সংখ্যক লোকের দেখবার সৌভাগ্য হয়! কিন্তু দূরদর্শনের সাহায্যে তাদের মধ্যে অনেকের সে সাধ সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেক পরিমাণে পূরণ হয়।

শিক্ষা ব্যাপারেও দূরদর্শনের অবদান খুব বেশী হবে বলে আশা করা যায়, বিশেষ-ভাবে বিজ্ঞানশিক্ষায়। অতি ব্যয়সাধ্য কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দূরদর্শনের সাহায্যে বহুলোকের পক্ষে দেখা সম্ভব। আবহাওয়ার সংবাদ প্রচারে দূরদর্শনের সাহায্যে প্রতিদিনের বায়ুমণ্ডলের সংস্থান দেখানো চলে এবং তার ফলে নিজের ঘরে বা কর্মস্থলে থেকেও দৈনন্দিন আবহাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা যায়।

এখন পর্যন্তও দূরদর্শনের গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ ৫০।৬০ মাইল দূর পর্যন্ত

ভালভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এইজন্যে বড় বড় সহরে আলাদা আলাদা প্রেরকযন্ত্র বসাতে হয়েছে। আশা করি আমাদের দেশেও অদূর ভবিষ্যতে দূরদর্শনের প্রচলন হবে।

শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইড্রোজেন হিলিয়াম বোমা

[হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে আজ সারা দুনিয়ায় একটা চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমাদের কেউ কেউ জানতে চেয়েছ—অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে তফাৎটা কি এবং এদের নির্মাণ-কৌশলই বা কি রকম? কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করা আপাততঃ মোটেই সম্ভব নয়। তবে বিশেষজ্ঞেরা মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে যে সামান্য মতামত প্রকাশ করেছেন, তোমাদের অবগতির জন্যে তা থেকেই সংক্ষেপে কিছু জানিয়ে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে ছোটদের পাতায় অ্যাটম বোমা সম্পর্কে তোমাদের জন্যে কিছু লেখা হয়েছিল—সেটাও পড়ে নিও। এ থেকে মোটামুটিভাবে যদি কিছু বুঝতে পার—ভালই, না বুঝলেও তেমন কিছু ক্ষতি নেই। কারণ এ সব বিষয় ভালভাবে বুঝতে হলে—হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস কি, হিলিয়াম নিউক্লিয়াস কি, নিউট্রন বুলেট, 'মাস্-এনার্জি' প্রভৃতি অনেক কিছুই বুঝতে হবে। তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যতটা সম্ভব বিশদভাবে তোমাদিগকে জানাতে চেষ্টা করবো। জ্ঞা, বি, স,]

হিরোসিমা ও নাগাসাকির বিপর্যয় কাণ্ডের পর থেকে আজ পর্যন্ত অ্যাটম বোমা সম্পর্কে যে কত রকমের জল্পনা-কল্পনা চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা বোমা তৈরীর কাজে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এর গঠন-কৌশল সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে না পারলেও পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের মৌলিক রহস্যের কথা অনেকেরই জানা আছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন দেখান যে, পদার্থ ও শক্তি—পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে; যখনই কোন প্রতিক্রিয়ায় পদার্থের বিলোপ ঘটে তখনই প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। এক গ্র্যাম ইউরেনিয়ামকে যখন নিউট্রন বুলেট সংঘাতে সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করা হয় তখন প্রায় এক গ্র্যামের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র পদার্থ লুপ্ত হয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় কত শক্তির উদ্ভব হয় জান? প্রায় আড়াই টন কয়লা পোড়ালে যত শক্তির সৃষ্টি হয় মাত্র এক গ্র্যাম ইউরেনিয়ামের বিভাজনে সেই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

সম্প্রতি হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে চারিদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ভারী পরমাণু ভেঙে যেমন শক্তি পাওয়া যায়, হাল্কা পরমাণুগুলোকে একত্র জুড়ে দিতে পারলেও সেরূপ

শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এক জটিল পারমাণবিক চক্রে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম রূপান্তর পরিগ্রহের ব্যাপারে সূর্যদেহে অনবরত প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হচ্ছে—এ তথ্য বিজ্ঞানীরা প্রায় গত বার বছর অবগত আছেন। একগ্র্যাম হাইড্রোজেন কেন্দ্রিন যদি প্রচণ্ড তাপ ও চাপের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় তবে একগ্র্যামের হাজার ভাগের প্রায় সাত ভাগ ভর লুপ্ত হবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় কি প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয়, অনুমান করতে পার। ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরন পরমাণুর ছুইটি কেন্দ্রিন একত্র জুড়তে পারলেও হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিন উৎপন্ন হয় এবং এই উপায়েও প্রচুর শক্তির আবির্ভাব ঘটে। তবে এই ব্যাপার ঘটাতে হলে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি তাপ এবং কয়েক লক্ষ পাউণ্ড চাপের প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন পরীক্ষাগারে এরূপ অভাবনীয় চাপ ও তাপ উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তা' যদি সম্ভব না-ই হয় তবে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম বোমা সম্ভব হবে কেমন করে? কিন্তু ইউরেনিয়াম অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের সময় ক্ষণিকের জন্যে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের উদ্ভব হয়। এই প্রচণ্ড তাপ ও চাপকে কাজে লাগিয়ে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করা সম্ভব কিনা এই হলো প্রশ্ন। যদি সম্ভব হয় তবেই হয়তো সাধারণ অ্যাটম বোমার চাইতে অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক হাইড্রোজেন-হিলিয়াম বোমার আবির্ভাব ঘটবে।

‘ব্যাঙেরছাতা’

বর্ষাকালে স্যাঁৎসেতে জায়গায় পচা জিনিসের উপর ব্যাঙেরছাতা জন্মাইতে দেখা যায়। দেখিয়া মনে হয় ইহা বুঝি ব্যাঙের তৈয়ারী ছাতা। ব্যাঙ বুঝি বৃষ্টি-বাদল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য এই ছোট্ট ছাতা নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একপ্রকার উদ্ভিদ।

জীবজন্তুর ন্যায় উদ্ভিদেরও উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাগ আছে। সচরাচর আমরা যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই এবং যাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় অধিক তাহারা বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীভুক্ত; যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল ইত্যাদি। নিম্ন-শ্রেণীর উদ্ভিদের সহিত আমাদের পরিচয় সাধারণতঃ কম। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পত্রে বিভক্ত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পত্রে বিভক্ত নহে। ব্যাঙেরছাতা এই নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গিরিশঙ্ক, ফার্ণ, মস্ প্রভৃতি উদ্ভিদও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাঙেরছাতার দেহে সবুজ কণা না থাকায় ইহা নিজদেহে খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। গাছের পাতায় যে সবুজকণা আছে, যাহার জন্য গাছের পাতা সবুজ
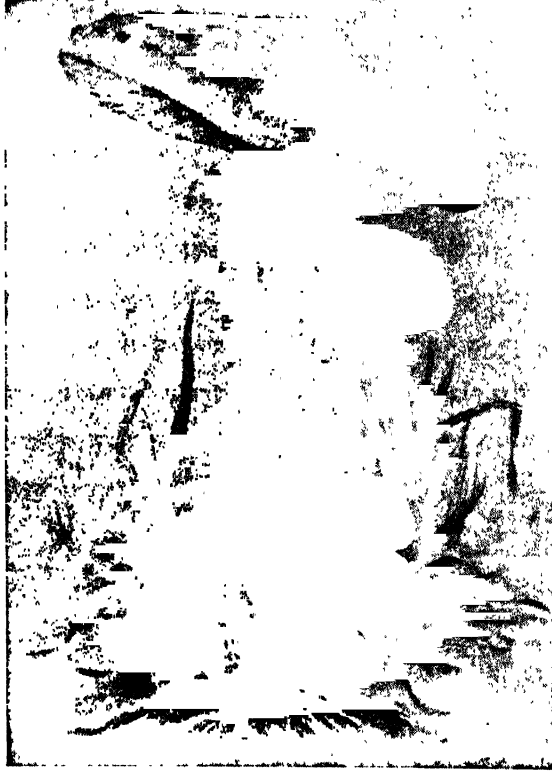
ব্যাঙেরছাতার তলায় একটা ব্যাং বসে আছে। দেখে মনে হয়—এই ছাতাগুলো বোধ হয় ব্যাঙেরই তৈরী। কিন্তু ব্যাপারটা তা' নয় মোটেই। ব্যাঙের সঙ্গে ছাতার কোন সম্পর্ক নেই।

দেখায়—তাহাই সূর্যালোকে গাছের খাদ্য তৈয়ারীতে সহায়তা করে। এই সবুজকণা না থাকিলে গাছ নিজে খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। ব্যাঙেরছাতার দেহে এই সবুজ-কণা না থাকায় ইহারা নিজেদের খাদ্য তৈয়ারী করিতে পারে না। কাজেই ইহারা মরা বা পচা উদ্ভিদদেহ, এমনকি মৃতপ্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং উহা হইতেই প্রয়োজনীয় আহার্য গ্রহণ করিয়া বাড়িয়া উঠে। এই জন্যই গোবরের গাদা, পচা খড়, কাঠ বা পচা বাঁশ প্রভৃতি পদার্থের মধ্যেই ব্যাঙেরছাতা গজাইতে দেখা যায়। তৈয়ারী খাদ্য গ্রহণ করিয়া ইহারা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন আকৃতির এবং বিভিন্ন বর্ণের ব্যাঙেরছাতা দেখা যায়। ইহাদের বীজ হয় না। ছাতার তলায় যে পাতলা ফলক দেখা যায় তার পাশে পাশে রেণুর মত এক-প্রকার পদার্থ জন্মে। সেই রেণুর মত পদার্থগুলিকে বলা হয়—স্পোর।' স্পোর মাটিতে ঝরিয়া পড়ে ও তাহা হইতে ইহাদের বংশবিস্তার হয়।

মরেল, ভূকুঁত্তি, হাঁসাওল প্রভৃতি অনেকরকম ব্যাঙেরছাতা আছে যাহা রান্না করিয়া খাইবার পক্ষে বেশ উপাদেয়। এইরকম ব্যাঙেরছাতা আমরা অনেকেই খাইয়াছি। মসলা সহযোগে রান্না করিলে ইহা খাইতে মাংসের মতই সুস্বাদু। কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় অধিকাংশ ব্যাঙেরছাতাই বিষাক্ত এবং তাহা খাইলে বিপদে পড়িতে হয়। সুতরাং খাইতে হইলে ব্যাঙের ছাতা চেনা দরকার। যে সব ছাতা বেশ সাদা ও মসৃণ এবং তন্তুগুলি সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না সেইগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এই কয়টি গুণ দেখিয়াই ব্যাঙেরছাতা খাদ্যরূপে গ্রহণকরা বিপজ্জনক। যাহারা খাদ্যোপযোগী ব্যাঙেরছাতার সঙ্গে পরিচিত তাহাদের সাহায্যে না চিনিয়া কোন ছাতাই আহারের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

ব্যাঙের ছাতা অনেকেই আহার্য হিসাবে ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাঙেরছাতার চাষ কেহ করেন না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশে খাদ্যোপযোগী ব্যাঙেরছাতার প্রচুর পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। ঐ সব দেশের লোকেরা ব্যাঙেরছাতা জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইহার চাষ করে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইহা খাইবার উপযোগী বড় হইয়া উঠে। আমাদের দেশেও যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ইহার চাষ করা যায় তাহা হইলে অতি অল্প খরচায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এক অতি উপাদেয় আহার্য পদার্থ পাইতে পারি।

শ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী

প্রকৃতি-পরিচয়

উদ্ভিদের বংশবিস্তার কৌশল

প্রাণীদের মত গাছপালাও বংশবিস্তার করিয়া থাকে। উদ্ভিদজগতের বংশবিস্তার প্রণালী প্রাণীজগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গাছপালা প্রধানতঃ বীজের সাহায্যেই বংশবৃদ্ধি করে; কিন্তু কতকগুলি গাছ বংশবিস্তারের জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের দুই একটির কথাই বলিতেছি। প্রাণীরা যেমন একস্থান হইতে অপর স্থানে যাতায়াত করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ লাভ করে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের ক্ষমতা না থাকিলেও উদ্ভিদও সেইরূপ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে। গাছ হইতে বীজ এদিক ওদিক পড়িয়া অসংখ্য বৃক্ষশিশু জন্মায়। ইহাতে গাছগুলি বড় হইয়া আলো, বাতাস ও খাদ্য সংগ্রহে পরস্পরের অন্তরায় হয়। ফলে, অনেক গাছ অকালেই মরিয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কোন কোন উদ্ভিদ, বায়ু ও

জলের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে। কোন কোন উদ্ভিদ, ফল দূরে ছড়াইয়া বংশ বিস্তারের সুবিধা করিয়া লয়। কোন কোন উদ্ভিদের বীজ প্রাণীদের গাত্রসংলগ্ন হইয়া দূরে ছড়াইয়া পড়িবার কৌশল অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের খাল-বিল, নালা-ডোবার ধারে ধারে বড় বড় একজাতীয় বুনো গাছ দেখা যায়। অনেক স্থলে ইহারা শ্বেত মাকাল নামে পরিচিত। ইহাদের ফলের দুর্গন্ধে কেহই কাছে ঘেঁসিতে চায় না। সুতরাং সকলেই ইহার বংশ লোপ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহারা যেন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া ধীরে ধীরে বংশ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। বর্ষাকালে ইহাদের ফল পাকে। ফল জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া বহু দূরে নীত হয় এবং জল কমিয়া গেলে সেখানে বীজ হইতে চারাগাছ উৎপন্ন হয়।

হিজল নামে এক প্রকার বৃক্ষও বুনো গাছের মত উপায় অবলম্বন করিয়া বংশ বিস্তার করে। জলের ধারেই ইহাদের বেশী দেখা যায়। বর্ষাকালে ইহাদের ফল ধরে এবং জল নামিয়া যাওয়ার পূর্বেই ইহা পাকিয়া জলের উপর পড়ে এবং ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূরে চলিয়া যায়। জল নামিয়া গেলে ভিজা মাটিতে গাছ জন্মায়।

নারিকেল ফলও হয়তো সুদূর অতীতে এক সময়ে জলস্রোতের সাহায্যেই বংশবিস্তার করিত। নানাকারণেই ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। এক সময়ে হয়তো ইহারা সমুদ্রের উপকূলে নোনা জায়গায়ই জন্মিত। শুষ্ক নারিকেল সমুদ্রের জলে ভাসিয়া সুবিধামত স্থানে চারাগাছ উৎপাদন করিয়া বংশবিস্তার করিত।

কোন কোন গাছ বংশবিস্তারের জন্য তাহাদের মূল কাণ্ড হইতে লতার মত এক-প্রকার প্রবহণী বাহির করিয়া দেয়। বংশবিস্তারের জন্য ইহারা বীজের উপর নির্ভর করে না। কচুরি পানা, কচুগাছ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

আমাদের দেশে ধানের মত একপ্রকার ঘাস জন্মে। এই ঘাসের বীজে শাঁস হয় না। সুতরাং বীজ হইতে ইহাদের বংশবিস্তারের সম্ভাবনা নাই। এই গাছের গোড়া হইতে লম্বা লম্বা অসংখ্য ডাঁটা বাহির হয়। এই ডাঁটার গাঁট হইতে ছোট ছোট চারাগাছ নির্গত হয়। ইহারা বড় হইলে তাহাদের ভারে ডাঁটাগুলি মাটিতে নুইয়া পড়ে। এইভাবে তাহারা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

পাথরকুচি গাছের বংশবিস্তার প্রণালী আরও অদ্ভুত। ইহাদের পাতার ধারে ছোট ছোট খাঁজকাটা আছে। পাতা মাটিতে পড়িয়া রোদ-জল পাইলেই প্রত্যেক খাঁজ হইতে চারাগাছ উৎপন্ন হয়। পাতাগুলি গাছ হইতে পড়িয়া বাতাসের সাহায্যে দূরে দূরে নীত হইয়া বংশবিস্তার করিতে পারে।

বনেজঙ্গলে একপ্রকার দূর্বাঘাস দেখা যায়। একটি লম্বা ডাঁটার মাথায় ক্রুশ চিহ্নের মত তাহার চারিটি বাহুতে বীজ ধরে। বীজগুলি পরিপক্ক হইলে একপ্রকার

সূক্ষ্ম শুঁয়ার সাহায্যে মানুষের কাপড়ে আটকাইয়া বংশবিস্তার করে। চোরকাঁটার বীজগুলি একইভাবে মানুষের কাপড়ে আটকাইয়া বংশবিস্তার করিবার উপায় অবলম্বন করিয়াছে। ঘাঘড়া, তেঁতুলে প্রভৃতি গাছের ফলও এইভাবে বংশবিস্তার করিয়া থাকে।

সিমুল, আকন্দ ও অন্যান্য অনেক গাছ বংশবিস্তার করে বায়ুর সাহায্যে। বীজের গায়ে পালক বা পর্দার মত পদার্থের সাহায্যে তাহারা বাতাসে উড়িয়া দূরদূরান্তরে চলিয়া যায়। পশুপক্ষীর সহায়তায়ও গাছ তাহার বংশ বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে।

এখানে মাত্র অল্প কয়েকটি গাছের বংশবিস্তারের কৌশলের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে, যাহাদের বংশবিস্তার প্রণালী আরও কৌতূহলোদ্দীপক।

শ্রীরাণী ভট্টাচার্য (প্রথম বার্ষিক শ্রেণী)

কাগজ তৈরীর নতুন উপকরণ
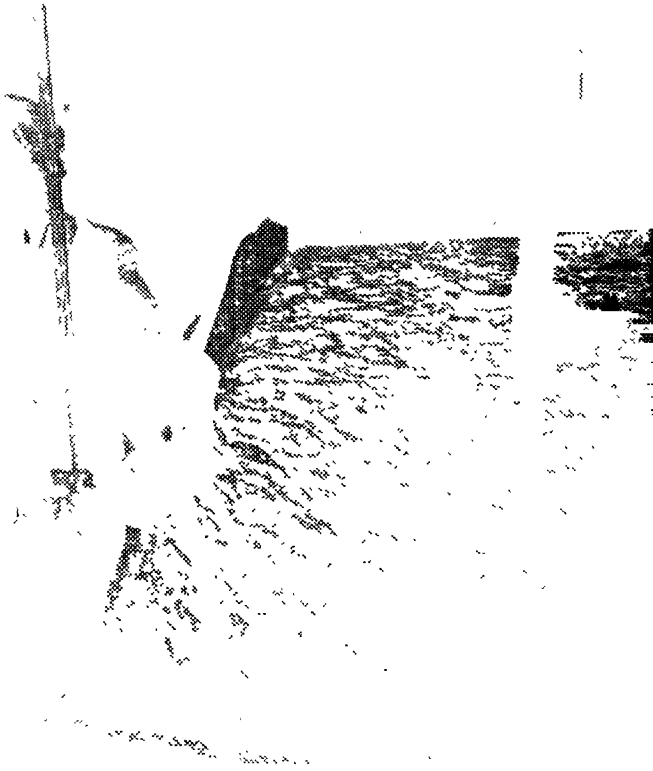
কাগজের মণ্ডকে ব্লিচিং লিকারের সাহায্যে ব্লিচ করা হচ্ছে
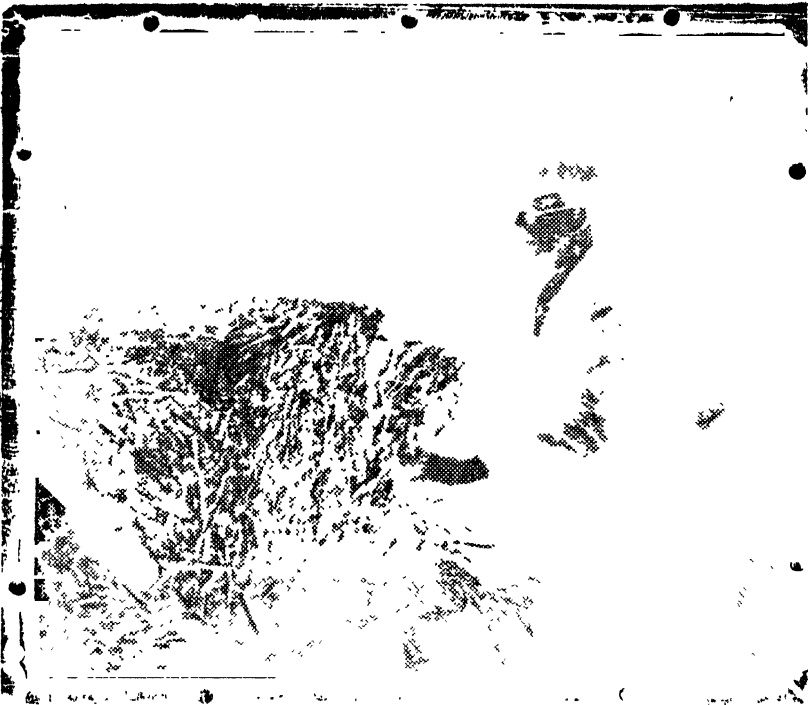
ছোবড়াগুলোকে সূক্ষ্মভাবে কেটে পাল্প-মিলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে

ডালমিয়া নগরের ভারতীয় কাগজের কলে ব্লিচ করা মণ্ড থেকে নিউজপ্রিণ্ট তৈরী হচ্ছে

জানা গিয়েছে যে, বিহারের ডালমিয়ানগরে যে একটি কাগজের কল স্থাপন করা হচ্ছে সেখানে ইক্ষুর পরিত্যক্তাংশ থেকে সুন্দর সাদা কাগজ তৈরীর পরিকল্পা করা হয়েছে। বৃটেনের একটি ফার্ম ডালমিয়ানগরের এই কারখানার জন্যে সমগ্র প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে—তারা ইতিমধ্যে ফ্রান্স্, হল্যাণ্ড এবং উত্তর আমেরিকায় অনুরূপ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। কাঁচামাল হিসেবে সেখানে ইক্ষুর বদলে খড় ব্যবহৃত হচ্ছে।

তৈরী কাগজকে যন্ত্র সাহায্যে শুষ্ক করা হচ্ছে

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে কাগজের চাহিদা এতদূর বেড়ে যায় যে, ক্রমশ কাগজ তৈরীর উপকরণের অভাব ঘটতে থাকে। সেজন্যে রসায়নবিজ্ঞানীরা বৃক্ষাদির শাঁস বা কোমল অংশ থেকে কাগজ তৈরীর উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, উপযুক্ত কোমল কাঠ প্রধানতঃ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং উত্তর আমেরিকাতেই পাওয়া সম্ভব এবং তা-ও পরিমিত পরিমাণে। তাই খড় এবং ইক্ষুর পরিত্যক্তাংশ থেকে কাগজ

তৈরীর নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভবিষ্যতে কাগজ তৈরীর উপকরণের আর অভাব হবে বলে আশংকা হয় না।

খড় ব্যবহারের একটা সুবিধা এই যে, এগুলো সর্বত্র পাওয়া যায় এবং খুব সস্তাও বটে। অনুমান করা হয় যে, বৃটেনে প্রতি বছর দশ লক্ষ টন খড় অপচয় হয়। আজ তা' দিয়ে সেখানে প্রায় ৫,০০,০০০ টন কাগজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

ছবিতে খড়কে কিভাবে দুই পর্যায়ে কস্টিক সোডা এবং ক্লোরিন গ্যাসের সাহায্যে কাগজ তৈরীর উপযোগী মণ্ডে পরিণত করা হয় তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে।
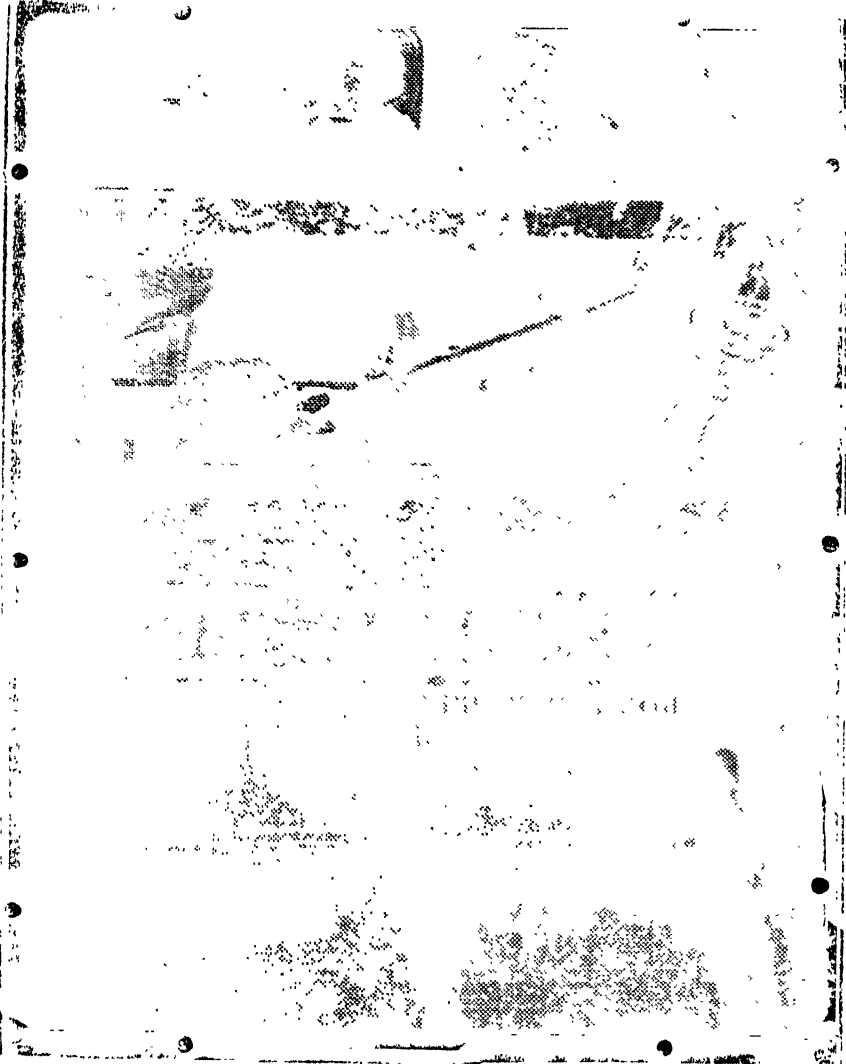
বিহারের ডালমিয়া নগরে ভারতীয় কাগজের কলে আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরীর প্রথম পর্যায়। কলের সাহায্যে ছোবড়া থেকে গাঁট, শিকড় ও অন্যান্য বাজে জিনিস পৃথক করা হচ্ছে

বিবিধ

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান

তিন বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বৃটিশ উপনিবেশ সাইপ্রাস দ্বীপকে ম্যালেরিয়া রোগের কবল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এই অভিযানকে কার্যকরী করবার জন্যে রোগবাহী মশককুলের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমতঃ যাতে রোগবীজাণুবাহী নতুন মশকের আমদানী না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মশকের বংশবিস্তারের প্রধান কেন্দ্র জলাভূমিগুলোকে কীটবিধ্বংসী ডি-ডি-টি মিশ্রিত তৈল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এদ্বারা ডিমগুলো সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। আবাসগৃহ ও পশুশালার দেয়ালে স্বল্প ব্যয়ে একপ্রকার তরল ডি-ডি-টি লেপন করা যায়; এগুলো শুকিয়ে গেলেও অতি সূক্ষ্ম ডি-ডি-টি চূর্ণের একটি আস্তরণ থেকে যায়। মাত্র দু-তিনবার প্রলেপ দিলেই বছরের মধ্যে আট মাস এর মশকবিধ্বংসী শক্তি বজায় থাকতে পারে। রক্ত-লোভাতুর স্ত্রী-মশক দিনের পর দিন এই মরণ ফাঁদে পা দিয়ে নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত এই উপায় অবলম্বনে বৃটিশ গায়েনার সমুদ্রোকূলের এবং দক্ষিণ আমিরিকার উষ্ণ অঞ্চলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

সিংহল দ্বীপে ম্যালেরিয়া প্রবল মহামারীরূপে দেখা দিত। সিংহল গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগ উক্ত উপায় অবলম্বন করায় এই দ্বীপে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। মধ্য আফ্রিকা, মালয় এবং আসামের ভেক্টর নামে এক জাতীয় ম্যালেরিয়া-বাহক মশকের উপর বৃটিশ বিজ্ঞানীরা উক্ত পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

উল্লিখিত উপায়ে মশকসংখ্যার হ্রাস করা সম্ভব হয় এবং তার ফলে রোগ আক্রমণ ও বিস্তারের আশঙ্কাও লোপ পায়। যে কোন দেশ থেকে ম্যালেরিয়া রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর করা আর অসম্ভব নয়। মশককুল বিধ্বস্ত করার পক্ষে শক্তিশালী ডি-ডি-টি এবং সেবনের জন্যে কার্যকরী বিজ্ঞান সম্মত ওষুধ প্যালুড্রিন বর্ত্তমানে সহজ লভ্য হয়েছে।

পঙ্গপালের আক্রমণে বিমান ব্যবহার

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের সাহায্যে পতঙ্গের সঙ্গে সংগ্রামে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করা গেছে এবং মার্কিণ কৃষিবিভাগের বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পতঙ্গ অধ্যুষিত স্থানে ও কৃষিক্ষেত্রসমূহে বিমানবহর থেকে শক্তিশালী কীটঘ্ন ওষুধ ছড়িয়ে সহজেই পঙ্গপালের উপদ্রব বন্ধ করা যেতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, মাত্র ১৫টি পতঙ্গ এক বর্গ গজ পরিমিত স্থানের দুই তৃতীয়াংশ ঘাস-পাতা খেয়ে শেষ করতে পারে। ১৯৩৯ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতি বর্গ গজ জমিতে ২০০০ পতঙ্গ দেখা দেয় এবং মার্কিণ কৃষিবিভাগের লোকজন ৪০খানা বিমানে বিষাক্ত কীটঘ্ন ওষুধ মিশ্রিত ভুষি বোঝাই করে পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ক্লোর-ডেন ও টোকসাফিন নামক বিষাক্ত কীটঘ্ন ওষুধ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পঙ্গপাল উপদ্রুত অঞ্চলে ওই ওষুধ মিশ্রিত ভুষি যন্ত্রের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়; একখানা বড় বিমানে সাড়ে সাত মিনিটে ১৮০০ একর পরিমিত জমিতে বিষাক্ত ভুষি ছড়ানো যায়। এইভাবে দু-সপ্তাহের মধ্যে ২৭ লক্ষ একরেরও অধিক জমিতে ভুষি ছড়ানো হয়; ফলে কোটি কোটি পতঙ্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভবিষ্যতে আর কোনও দিন পঙ্গপালের দ্বারা ব্যাপক শস্যহানি ঘটতে পারবে না বলে কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ভারতের ইস্পাত, সিমেণ্ট ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি

নয়া দিল্লীর ৪ঠা ফেব্রুয়ারির সংবাদে প্রকাশ, ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও সাহায্যের ফলে শিল্পোৎপাদনের মান উন্নয়ন হয়েছে। প্রকাশিত সরকারী তথ্যে দেখা যায়, ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৫.৮ ও সিমেণ্ট উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৮ সাল অপেক্ষা ওই বছরে কয়লা ১০ লক্ষ টনেরও বেশী উত্তোলিত হয়েছে।

অন্যান্য কয়েকটি প্রধান শিল্পেও ওই সালে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে উৎপাদন বেশী হয়েছে। তন্মধ্যে ৩,৪৮৬ টন অ্যালুমিনিয়াম, ৬৯,৫৪৭ অশ্ব-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মোটর, ১,০৩,১৩৩ কে. ভি. এ ট্রান্সফর্মার, ১,৩৫,৬৫০০০ ইলেকট্রিক বালব, ৭৯,২৯০ বাইসাইকেল, কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ ফুট জলের পাইপ, ২১,১০,০০,০০০ টন রিফ্রেক্টরি, ৮৯,০০০০০০ টন সালফেট অ্যাসিড, ১,০৪,০০০ টন কাগজ।

উক্ত সালে ৩৯১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র এবং ১৩৫ কোটি ৬০ লক্ষ গজ সূতা উৎপাদিত হয়েছে। আগের বছর ওই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ ও ১৪৪ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ছিল।

লবণ, বাইক্রোমেট, সোডা অ্যাশ, সাবান, প্লাইউড, সেন্ট্রিফুগ্যাল পাম্প, বৈদ্যুতিক পাখা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কতিপয় শিল্পের উৎপাদন প্রতিকুল আবহাওয়ার দরুণ বিগত বৎসর অপেক্ষা ওই সনে কম হয়েছে। পাকিস্তান থেকে কাঁচা মাল না পাওয়ায় অ্যান্টিমনি উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে অন্য জায়গা থেকে খনিজ ধাতু সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে।

১৯৪৯ সালে শিল্পোৎপাদনের তথ্য প্রকাশে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, দেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে আবশ্যকীয় শিল্পগুলোর সাহায্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সক্রিয় অংশ গ্রহণ অপরিহার্য।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, মার্কিণ আণবিক বিশেষজ্ঞগণ আগামী ১৯৫১ সালে কিম্বা তার পূর্বেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হবেন বলে আশা করছেন। এনিওয়েটকের ন্যায় প্রশান্ত মহাসাগরের দূরতম কোন এক দ্বীপে এই নবাবিষ্কৃত বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে বলে অনুমান করা যায়। এনিওয়েটকে ইতিপূর্বে তিনবার নতুন আণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ডাঃ হানস থায়ারিং এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, যদিও হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসকারী শক্তি আণবিক বোমার চেয়ে ২০ হাজার গুণ বেশী, কিন্তু ইহার ফল তেমন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ থায়ারিং জাপানে আণবিক বোমা বর্ষিত হবার এক বৎসর পরেই হাইড্রোজেন-লিথিয়াম বোমা উৎপাদনের মূল তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, হাইড্রো-জেন বোমা এবং প্লুটোনিয়াম বোমার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। প্লুটোনিয়াম বোমার আণবিক পদার্থ কম থাকলে উহা আদৌ বিস্ফোরিত হবে না, আবার আণবিক পদার্থ বেশী থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উহার বিস্ফোরণ ঘটবে। প্লুটোনিয়াম বোমা নির্মাণ করা সহজসাধ্য নয়—কারণ সমগ্র পৃথিবীতে খুব সম্ভব এক টনের বেশী প্লুটো-নিয়াম মজুত নেই। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা যে কোন আকারে তৈরী করা যেতে পারে; কারণ পৃথিবীতে অফুরন্ত হাইড্রোজেন রয়েছে। যদি একই পরিমাণের ইউরেনিয়াম ও হাইড্রোজেন-লিথিয়াম বিস্ফোরিত করা হয়, তবে হাইড্রোজেন বোমায় দ্বিগুণতর কাজ পাওয়া যাবে।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেন, দশ টন ওজনের একটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হলে

হিরোসিমার চেয়ে ২০ হাজার গুণ বেশী ধ্বংসকাণ্ডের সৃষ্টি হবে এবং সম্ভবতঃ চারদিকের একশ মাইলের মধ্যে কোন জন-প্রাণী ও তরুলতা রক্ষা পাবে না। কিন্তু, এ ধরনের একটি বৃহৎ বোমা ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ বিস্ফোরণের পূর্বেই বহুলাংশে হাইড্রোজেন নষ্ট হয়ে যাবে। এ ধরনের বিস্ফোরণে বায়ুমণ্ডলে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করেন না। হিরোসিমায় আণবিক বোমা যে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করেছিল, হাইড্রোজেন বোমা কোনক্রমেই তা করতে সক্ষম হবে না।

পরমাণুশক্তি গবেষণা

মার্কিণবার্তার এক খবরে জানা গেছে, বর্তমানে ইডাহোর অন্তর্গত আর্কো সহরে বিভিন্ন পদার্থের অন্তর্নিহিত পরমাণুশক্তি নির্ণয়ের উপযোগী একটি নতুন গবেষণাগার নির্মাণের কথা চলছে। মার্কিণ পরমাণুশক্তি কমিশনের কয়েকজন মুখপাত্র সম্প্রতি বলেছেন যে, পরমাণুশক্তির শান্তিকালীন ব্যবহারের দ্বারা মানব-কল্যাণের যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাকে সার্থক করে তোলার জন্যেই এই নতুন পরীক্ষাগারটির বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

গত নভেম্বর মাসে মার্কিণ পরমাণুশক্তি কমিশন একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তদনুসারে এই পরিকল্পিত বিজ্ঞানাগারে পরমাণু-শক্তিযুক্ত পদার্থ ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে। জাহাজ এবং বিমান চালনায় এই শক্তি প্রয়োগ করা হবে বলে প্রকাশ। উক্ত কমিশন ইডাহোতে দু'টি রিঅ্যাক্ট গবেষণাগার নির্মাণ করবেন। রিঅ্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে বিরাট পরমাণুশক্তিকে ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। প্রস্তাবিত পরীক্ষাকেন্দ্রে নিউট্রন-সংঘাতের দ্বারা পরমাণুশক্তিযুক্ত পদার্থ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ইডাহোতে আর একটি বিজ্ঞানাগার নির্মিত হচ্ছে। এখানে কৃত্রিম উপায়ে এই শক্তি সৃষ্টি করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। উক্ত কমিশনের জনৈক কর্মচারী বলেছেন যে, এইভাবে সম্ভবতঃ পরমাণু বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতা ১৪০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই এর ফলে পরমাণুশক্তির উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হবে।

আইনষ্টাইনের নতুন মতবাদ

অধ্যাপক আইনষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে যে নতুন মতবাদ প্রচার করেছেন তাতে মাধ্যাকর্ষণ ও তড়িৎ চুম্বকত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি সামঞ্জস্য বিধান সত্য হয় তাহলে 'বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্ব' ও 'সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব' সম্পর্কে তিনি যে দুটি মতবাদ প্রচার করেন বর্তমান মতবাদ তার চেয়ে আরও বিস্ময়জনক।

বিশেষ আপেক্ষিকতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, বস্তু ও শক্তি এক। ইহাই বর্তমানের আণবিক বোমা ও আণবিক শক্তির মূল ভিত্তি। সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব নিউটনের মতবাদ অপেক্ষা ভালভাবে মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা করে এবং মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি করে।

জড় ও শক্তির সমবায়েই জীবনের বিকাশ। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, মাধ্যাকর্ষণ ও তড়িৎ-চৌম্বকের একত্ব প্রমাণের দ্বারা এই জড় ও শক্তির মধ্যে যে রহস্যময় যোগাযোগ রয়েছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে পারে।

যন্ত্র সাহায্যে ব্যাপক জমি চাষ সম্পর্কে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিমত

গত :লা জানুয়ারি মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষি অর্থনীতি সম্মেলনের দশম অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান

পরিস্থিতিতে যেদিক দিয়েই হোক ভারতে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা করা অসম্ভব; কারণ এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে কৃষি জমিগুলোর যেরূপ আকার দাঁড়াবে ও যতলোক বেকার হয়ে পড়বে, তা সমর্থনযোগ্য নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার ও সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে ব্যাপকভাবে চাষের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির অস্তিত্ব লোপ করে ওইগুলোকে যুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কোনও জমির মালিক একটি ক্ষুদ্র জমি ভালভাবে চাষ করে প্রতি একরে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন করে, এরূপ ব্যাপকভাবে চাষের দ্বারা যে তার চেয়ে অধিক ফসল উৎপন্ন হবে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি। তিনি বলেন যে, পল্লী অঞ্চলের চাষীগণকে উন্নত ধরণের বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে উন্নত ধরনের চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা হলে ব্যাপক আকারে চাষের দ্বারা যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে তার চেয়ে অধিক ফসল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে বর্তমানে চাষের কাজে যত লোক নিযুক্ত আছে, তার মাত্র এক চতুর্থাংশ লোককে কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হবে, ফলে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি-শিল্পের পক্ষে যে গভীরভাবে ভূমি কর্ষণের উপযোগী যন্ত্র ও ব্যাপকভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার আবশ্যক, সকল বৈজ্ঞানিক তা স্বীকার করেন না। তিনি আরও বলেন যে, কৃষি জমিগুলো থেকে যা গ্রহণ করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তা পূরণ হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার ওপরেই এদেশের কৃষি-অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক দেশগুলো সম্পর্কে একথা বলা যায় না। কারণ গত এক-শ' বছর বা তার কিছু বেশী সময়ের মধ্যে ওই সকল দেশে চাষ আবাদ সুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ওই সকল দেশে কৃষির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করলেই তা জানা যাবে। সুতরাং বর্তমানে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের জন্যে তাড়াহুড়া না করাই মঙ্গলজনক। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্ট এরূপ পরিকল্পনায় বহু অর্থ ব্যয় করেও এ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমবায়ের অভাবও এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

ভারতের গবাদি পশুর উন্নয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা

নয়াদিল্লীর এক সংবাদ প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গবাদি পশুর উন্নয়ন সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভারতের গবাদি পশু, জাতীয় সম্পদবিশেষ। এই সম্পদ থেকে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকার মত আয় হয়। দেশবিভাগের পর ভারতে প্রায় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ গবাদি পশু ও ৪ কোটি মহিষ আছে বলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতের গবাদি পশুর সংখ্যা অধিক। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে ইহাদের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের পশু প্রজনন বিভাগ, ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ও ভারতীয় পশু চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান গাভী ও ষণ্ডের উৎকর্ষতা বিধানের জন্যে চেষ্টিত হয়েছেন।

উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে; যথা—(১) ভারতে সুপরিচিত উৎকৃষ্ট জাতের গো-মাতার দুগ্ধদান ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ষণ্ড এবং বলদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি; (২) মিশ্র শ্রেণীর গবাদি পশুর উন্নতি বিধান; (৩) উন্নততর পুষ্টির ব্যবস্থা; (৪) রোগ নিবারণ; (৫) অনুপকারী পশুগুলোর স্বতন্ত্র করা; (৬) পশু চিকিৎসা সম্পর্কীত জ্ঞানের প্রসার।

দ্রষ্টব্য:—গত জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংক্রান্ত ব্লকগুলো 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারের' সৌজন্যে প্রাপ্ত। স.

ভ্রম সংশোধন:—গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'পান খাওয়া কি ভাল?' শীর্ষক প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় গ্রাম ও তোলার স্থান ওলট-পালট হয়েছে। এরূপ হবে—১ তোলা = ১১·৬৪ গ্রাম
১ গ্রাম = ১০০০ মিলিগ্রাম

—লেখক

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ — মার্চ—১৯৫০ — তৃতীয় সংখ্যা

পরমাণু জগৎ

শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী

যাঁহারা দোষ দেন যে বিজ্ঞানের তথ্যকে জানিলেই কৌতুহলের নিবৃত্তি হয় তাঁহারা ভুল বোঝেন। তাই যদি হইত তবে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিকেরা যেদিন প্রথম বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কণার দ্বারা সৃষ্ট, সেই দিনই সে কথার শেষ হইয়া যাইত। কখনও কণা, কখনও তরঙ্গ, কখনও বা কণা ও তরঙ্গের অতীত অনির্দেশ্য অবাস্তব উভয় অস্তিত্বের আভাস মানুষকে বিস্ময়ে চঞ্চল করিয়া দিত না। আমরা যুগে যুগে বিজ্ঞানীর কণ্ঠে কখনও 'পাইয়াছি' (Eureka) কখনও 'পাই নাই' (Uncertainty Principle—অজ্ঞেয়বাদ—হাইসেনবার্গ) বলিয়া বারংবার উচ্ছ্বাসের সুর শুনিতে পাইতাম না।

যাহা হউক, সেই সুপ্রাচীন অস্পষ্ট কণাবাদ এলোমেলো বহু বিক্ষিপ্ত ধারণার মধ্য দিয়া শেষে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জন ডাল্টনের জগৎ পারমাণবিক—এই তথ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দেখা দিল। তিনি বলিলেন, বস্তু-জগৎ পরমাণু (atom) দ্বারা গঠিত, তাহাকে খণ্ডিত করা যায় না, তাহার ধ্বংস নাই, তাহাই চরম। যেন সেইখানেই বস্তুর আয়তনের শেষ সীমা—ক্ষুদ্রত্বের দিকে। তিনি আরও বলিলেন, এই পরমাণু Simple অথবা Compound, অর্থাৎ মৌলিক পদার্থের পরমাণু মৌলিক এবং যৌগক পদার্থের পরমাণু যৌগিক। যেমন বহু তরুশ্রেণী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া দিগন্তের অবিচ্ছিন্ন এবং স্থুল অরণ্যের সৃষ্টি করে, যেমন বহু প্রাসাদময়ী নগরী বিমান আরোহীর চক্ষে নিশ্ছিদ্র বলিয়া মনে হয় তেমনই ইহাদের ঘন সন্নিবেশ এবং বিপুল অগণিত সমষ্টিই দৃশ্যবস্তুরূপে দেখা দেয়। এই সব পরমাণু তাহাদের বিচ্ছিন্নতার দ্বারা, তাহাদের পরস্পরের মধ্যবর্তী অবকাশের দ্বারা স্বতন্ত্র। ইহারা অদৃশ্য এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও মানুষের অক্ষম দৃষ্টিযন্ত্রের আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

শুনিতে আশ্চর্য শোনাইলেও এই সবই ডালটনের অনুমান। ডালটনের এই অনুমানের সবচেয়ে বড় আশ্রয় বোধ হয় মানুষের চিন্তার সেই সহজ প্রবণতার মধ্যে যেখানে সে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে অতি সহজে স্বীকার করে। তাহা ছাড়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের এই তথ্যের আগেই কতকগুলি

নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিল। যথা:— লেভয়সিয়রের (১৭৮৯ খৃঃ) "বস্তুর সংরক্ষণ নীতি" বা Law of conservation of mass; প্রাউস্টের (১৭৯৯ খৃঃ) "যৌগিক পদার্থের উপাদানের নির্দিষ্টতা নীতি" বা Law of constant proportion; ডালটনের (১৮০৩) "গুণনীয়ক অনুপাত নীতি" বা Law of multiple proportion; এবং রিক্‌টারের (১৭৯২) "বিপ্রতীপ অনুপাত নীতি" Law of reciprocal proportion। দেখা গেল ডালটনের পরমাণুবাদের মধ্যেই এই সব তথ্যহীন প্রমাণ পরীক্ষিত নীতি সমূহের ভিত্তি নিহিত এবং এই চারিটি নীতিকেই ডালটনের তথ্যের অনুসিদ্ধান্তরূপে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায়। সুতরাং ডালটনের পরমাণুবাদ অনুমান (hypothesis) থেকে তথ্যের মর্যাদা পাইল। এই সময় বার্জেলিয়াস বলিয়াছিলেন—সমান আয়তনের যে কোন বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর সংখ্যা সমান। এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করিতে গেলে ডালটনের পরমাণুকে অখণ্ড ধরিয়া নেওয়া যায় না বলিয়া বার্জেলিয়াসের সেই মতকে স্থান দেওয়া হইল না। অ্যাভোগ্যাড্রো বার্জেলিয়াস ও ডালটনের নীতির সামঞ্জস্য সাধন করিলেন এবং বার্জেলিয়াসের পরমাণুর স্থলে নূতন ধারণার যোজনা করিলেন। বস্তুর যে ধর্ম আমাদের কাছে প্রকাশ, তাঁহার মতে— বস্তুর অণু (Molecule) তাহার ধারক পরমাণুতে সেই ধর্ম না-ও থাকিতে পারে। দুই বা ততোধিক পরমাণুর দ্বারা অণু গঠিত।

এই সবই ডালটনের যুগের কথা। এইবার বিচার করা যাক, ডালটন আমাদের কোথা হইতে কোথায় আনিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে এই দৃশ্যমান, আকারের দ্বারা স্থূল, আয়তনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন জগৎ হইতে আমাদিগকে এক আকারহীন সূক্ষ্ম পরমাণুময় জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহার কথার মর্মার্থ এই:—রূপের দ্বারা বিচিত্র এই বিশ্ব, ইহা মৌলিক নহে; ইহার পিছনে ইন্দ্রিয়ের অতীত এক ধ্বংসহীন পারমাণবিক বিশ্বই সত্য। কিন্তু ডালটনের কাছে পরমাণু রহিয়া গেল বস্তু অনুসারে বিভিন্ন, বহু প্রকার। তাহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র তাহাদের ওজনে, তাহাদের জড় ধর্মীয় আচরণে। ডালটন বিস্তৃত জগৎকে অনেকটা সঙ্কুচিত করিলেন; কিন্তু তিনি পরমাণুর অসংখ্য বিভিন্নতাকে ছিন্ন করিতে পারিলেন না।

কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না। প্রাউস্ট ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বহু পরমাণুকে বিলোপ করার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন এক হাইড্রোজেন পরমাণুই মৌলিক আর সমস্তই এক বা একাধিক মৌলিক পরমাণুর দ্বারা গঠিত। প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক অনুপাত নির্ণীত হইল। সে আর কিছু নয়—কোন পদার্থের পরমাণু হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর চেয়ে কতগুণ ভারী। যদি পরমাণুকে ভাঙ্গা না যায় এবং প্রাউস্টের কথা সত্য হয় তবে একথা ঠিক যে, নির্দিষ্ট আয়তনের যে কোন পদার্থের ওজনকে সম আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন দিয়া ভাগ দিলে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু এইখানে প্রাউস্টের অনুমান মিথ্যা হইয়া গেল। দেখা গেল, ক্লোরিনের পরমাণু ১টা হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ৩৫½ গুণ ভারী। আধখানা পরমাণু ডালটনের মতের বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রাউস্টের কথা কেউ গ্রহণ করিল না। অথচ আজ আমরা জানি, মোটামুটি প্রাউস্টের মৌলিক হাইড্রোজেন পরমাণুই (Proton) বিভিন্ন জটিল পরমাণুদেহের অস্থিস্বরূপ।

এই সময় বিজ্ঞান নানাদিকে তার চর পাঠাইয়া দিল। পরমাণু সম্বন্ধে নানা তথ্য নানা দিক হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। জৈব রসায়ন ও অজৈব রসায়ন বিশ্লেষণের দ্বারা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অসম্ভব দ্রুত হ্রাস করিয়া আনিতে-ছিল। এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা গেল, মুষ্টিমেয় ৯২টি মৌলিক উপাদানকে মাত্র সম্বল করিয়া এক অজ্ঞাত রহস্যময় রাসায়নিক

বন্ধনের দ্বারাই এই অগণ্য বিচিত্র বস্তু-পুঞ্জের সৃষ্টি —যাহাদের মধ্যে রঙে, আচরণে, ধর্মে পরস্পর হইতে আপাততঃ সমুদ্রাচল ব্যবধান। অথচ সেই বৈসাদৃশ্য দূর করিয়া রসায়ন এই স্থির বিশ্বাসে উপনীত হইল যে, এই বস্তুজগৎ কেলিডোস্কোপের মত যতই বৈচিত্র্যের ফুলঝুরি দেখাক না কেন, রসায়ন তাহার কাগজের চোঙ টাকে খুলিয়াছে এবং ভিতর হইতে রঙীন কয়েকটা কাচের ছোট টুকরা ছাড়া আর কিছুই পায় নাই। এই বিশ্বাসে অভিযান আরও ব্যাপক, আরও তীব্র হইয়া উঠিল। শুধু রসায়নই নয় পদার্থবিদ্যার রশ্মিবিশ্লেষণ যন্ত্র হইতেও নিঃসন্দেহে প্রমাণ সংগ্রহ হইল যে, শুধু আমাদের এই পৃথিবী নয়, এই বিপুল বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহও আমাদের পৃথিবীর মত এবং সূর্য ও তারকারাজি এই ৯২টি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটির জ্বলন্ত বায়বীয় পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবীর এই ৯২টি উপাদানের ৬১টি আমাদের সৌরদেহে পাওয়া গিয়াছে।

এই অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল? কোটি কোটি যোজন দূরান্তরবর্তী জ্বলন্ত নক্ষত্র, নীহারিকা একটি ক্ষুদ্র মানুষের যন্ত্রের কাছে সহস্র কোটি পৃথিবীর আয়তন সদৃশ তাহার বিরাট দেহের গঠন উপাদানকে কি করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিল? কি করিয়া পুচ্ছময় আকাশবিহারী ধূমকেতু তাহার নামের সঙ্গে জড়িত সমস্ত ধূমাচ্ছন্ন কুসংস্কারকে হারাইয়া ফেলিল? বিশ্ববিশ্রুত নিউটনে সে কাহিনীর আরম্ভ এবং জার্মান বিজ্ঞানী কির্কফ সেই গৌরবের অধিকারী। সকলেই জানেন ত্রিশির কাচের মধ্য দিয়া সূর্যের আলো পাঠাইয়া নিউটন দেখাইলেন সাত রঙের বর্ণালী। রশ্মি বিশ্লেষক যন্ত্রের যখন আরও উন্নতি হইল তখন দেখা গেল যন্ত্রের আলোক প্রবেশ-পথে ভিন্ন রঙের আলোক ধরিলে বর্ণালীপটে এক একটা রং সুনির্দিষ্ট স্থানে সরু রেখার আকারে দেখা দেয়। ফ্রনহফার এই যন্ত্র সাহায্যে রবি-রশ্মির এক বিস্তীর্ণ বর্ণালী পাইলেন। নিউটনের বর্ণালীর মত ইহা অবিচ্ছিন্ন নয়। অসংখ্য কালো সমান্তরাল রেখার দ্বারা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বোঝা গেল, এই অন্ধকার রেখাগুলি লাল হইতে বেগুনি আলো পর্যন্ত বিস্তৃত অবিচ্ছিন্নভাবে বিলীয়মান অসংখ্য রঙের মধ্যে কতকগুলি অনুপস্থিত প্রতিবেশীর পদচিহ্ন। কিন্তু সূর্যরশ্মির এই হারাইয়া যাওয়া রংগুলি গেল কোথায়? যাহাই হউক, অন্যদিকে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সোডিয়াম প্রভৃতি জ্বালাইয়া তাহাদের আলো বিশ্লেষক যন্ত্রের আলোর প্রবেশ-পথে ধরিয়া আর এক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। দেখা গেল, বিভিন্ন উপাদানের আলোর ভিন্ন ভিন্ন রং-রেখা বর্ণালী-পটে ফ্রনহফারের অন্ধকার রেখার অনুরূপ স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন বস্তু জ্বালাইয়া তাহাদের আলো বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গেল, ফ্রনহফারের বিভিন্ন অন্ধকার-রেখার অনুরূপ অসংখ্য আলো-রেখা। বোঝা গেল, মানুষকে যেমন তাহার কণ্ঠস্বর দ্বারা চেনা যায় তেমনি মৌলিক পদার্থকে চেনা যেতে পারে বর্ণালীপটে তাহার নিজস্ব রং-রেখার সুনির্দিষ্ট অবস্থান দেখিয়া। যেমন হাইড্রোজেন দেয় H_a, H_b, H_y ইত্যাদি রেখা। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, তীব্র সাদা আলো কোন পদার্থের ক্ষীণ স্তরের ভিতর দিয়া পাঠাইয়া তারপর বিশ্লেষণ করিলে বর্ণালীতে সেই পদার্থের আলো-রেখার স্থান ফ্রনহফারের অভিজ্ঞতার মতই সূক্ষ্ম অন্ধকার রেখায় পরিণত হয়। অতএব যে বস্তু যে আলো বিকিরণ করে সে বস্তু সেই আলো শুষিয়া নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ উদাহরণ দেই। আমরা জানি বস্তু কালো, কারণ সে সব রংকেই শুষিয়া নেয়। কালো রঙে কাজ করা একটা চিনামাটির পাত্র আগুনে খুব উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ অন্ধকারে নিলে, তাহার কালো ছবিগুলি অনেক বেশী জ্বলজ্বল করে। এইবার ফ্রনহফার-বর্ণালী, কির্কফ সহজে

ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, সূর্যের অল্প উত্তপ্ত বহির্মণ্ডল (chromosphere) বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গ্যাস দ্বারা নির্মিত। সুতরাং তার অন্তরস্থ অতি উত্তপ্ত রশ্মি-মণ্ডলে (Photosphere) অবস্থিত জ্বলন্ত উপাদান হইতে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাহাকে অল্প উত্তপ্ত বহির্মণ্ডলের অনুরূপ উপাদান শুষিয়া নেয়। তাই ফ্রনহফার বর্ণালীতে তাহারা অনুপস্থিত। তিনি আরও বলিলেন, যদি বহির্মণ্ডল না থাকে, অথবা আমরা যদি শুধু বহির্মণ্ডল হইতে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করিতে পারি তবে ফ্রনহফারের অন্ধকার রেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা। এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞানী ইয়ং ছুটিলেন গিরিদরী পার হইয়া এমন এক জায়গায় যেখানে ১৮৭২ সালে অল্প সময়ের জন্য সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা যাইবে বলিয়া জ্যোতির্বিদেরা ঘোষণা করিলেন। দেখা গেল, ঠিক সময়ে বিশ্লেষণ যন্ত্রের সঙ্গে সজ্জিত দূরবীনের অন্ধকার রেখাদ্বারা বিচ্ছিন্ন বর্ণালী অকস্মাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিয়া দিল। তখন ফ্রনহফার রেখার অনুরূপ রং-রেখা কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের, সেই অনুসন্ধান চলিল এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর ৬১টি উপাদানের রং-রেখার সঙ্গে ফ্রনহফার-রেখার বর্ণালীপটে স্থানগত সাদৃশ্য উদ্ভাবিত হইয়া গেল। প্রমাণ হইল, শুধু পৃথিবী নয়, দূর জ্যোতিষ্কবিধৃত বিশ্বের মূল উপাদান মাত্র ৯২টি। অতএব ডালটনের বহু পরমাণু হ্রাস হইয়া মাত্র ৯২তে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার নয়। জিজ্ঞাসুর পিপাসাকাতর চিত্তে সেই শাশ্বত প্রশ্ন কণ্টকবিদ্ধ রক্তকমলের মত উদ্ভিন্ন হইয়া রহিল —"ততঃ কিম্"—"ন ইতি।"

"বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোর্তুগীজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন করে' আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি—'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেটফুল হয়েছে', তবে ভাষাজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি—'মোটরের ম্যাগ্নেটোটা বেশ ফিনকি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদানপ্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একেবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত করে' মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক।"

বাংলা পরিভাষা—রাজশেখর বসু।

বিবর্তনের পথে মানুষ

শ্রীকান্তি পাকড়াশী

জীবজগতের জটিল বিবর্তনের পথে মানুষের সঠিক জন্মক্ষণ আজও নির্ধারিত হয়নি। বিবর্তন-বাদের কল্যাণে কিন্তু এই সত্য মেনে নিতে হয় যে, কোন নিম্নতর প্রাণী থেকেই মানবশরীরের বিবর্তন ঘটেছে। দেহের গঠনের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব, বিশেষতঃ প্রাইমেট শ্রেণীর অন্তর্গত জীবের এত মিল রয়েছে যে, বিবর্তনবাদগত সিদ্ধান্ত অবশ্যই মেনে নিতে হয়। মানুষের মন এই পথে বিবর্তিত হয়েছে কিনা বলা কঠিন হলেও মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি যে, কোন না কোন নিম্নতর প্রাণী থেকে প্রকাশ পেয়েছে সেকথা নিশ্চয় করেই বলা যায়।

মানবশরীরের বিভিন্ন লক্ষণই মানুষকে প্রাইমেট শ্রেণীর এক সভ্য হিসেবে পরিচয় দেয়। এই বিশেষ শ্রেণীতে শুধুমাত্র মানুষ নয়, লাঙ্গুল-বিহীন বানর এবং লাঙ্গুলযুক্ত বানরদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার বানরদের দৈহিক গঠন মানুষের গঠন থেকে অনেকটা ভিন্ন ধরনের হলেও অন্যদিকে কিন্তু অ্যানথ্রোপেয়ড বা মানবসদৃশ্য লাঙ্গুলবিহীন বানরগোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের অনেক মিল রয়েছে। মোটের উপর মানুষের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক থেকে এসব মনুষ্যেতর প্রাণীদের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। শরীর ব্যবচ্ছেদের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই দেখা যায়—মারমোসেট থেকে শিম্পাঞ্জী পর্যন্ত সমস্ত প্রাইমেট শ্রেণীর জীবই মানুষের সঙ্গে কমবেশী দূর-আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ।

প্রাইমেটদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় হচ্ছে বৃহৎ লাঙ্গুলবিহীন বানরগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীই অ্যানথ্রোপেয়েডস্ হিসেবে পরিচিত। এই গোষ্ঠীতে আবার চারটি 'গণে'র সন্ধান পাওয়া যায়। যথা—শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাংউটান ও গিবন। এদের মধ্যে শিম্পাঞ্জী ও গরিলাই শারীরিক গঠনে অনেকাংশে মানুষের মত। মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জীর মিল বা অমিল সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে মানুষের দৈহিক গঠনের মিল এত বেশী যে, অনেক সময় নিখুঁত পরীক্ষা ছাড়া সহজে বলা যায় না—কোনটা শিম্পাঞ্জীর দেহের হাড়, আর কোনটা মানুষের। এমন কি, শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্ক আকারে ছোট হলেও অনেকাংশেই মানুষের মস্তিষ্কের মত। শিম্পাঞ্জীর দর্শনশক্তি এবং ঘ্রাণশক্তি প্রায় মানুষেরই মত এবং তাদের মানসিক বৃত্তিও তিন চার বছরের মানব শিশুর মতই স্বাভাবিক। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চায় আবার বানর ও মানুষের রক্তের মধ্যেও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তুলনামূলক পরীক্ষাতেও মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল পাওয়া গেছে।

জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার পদ্ধতি ও ফলাফল যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয় তবে একথাও মানতে হবে যে, বানর এবং মানুষের মধ্যে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয় না, উভয়ে উভয়ের নিকট আত্মীয়ও বটে। যাহোক, একথা কিন্তু সবসময় মনে রাখতেই হবে যে, এই বানর কোনদিনই মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ নয়। এই সমস্ত বানরকে জীবন্ত ফসিল বললে ভুল হবে ; বরং বিবর্তনের বহুদূরপ্রসারী পথের শেষ নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা উচিত। বিবর্তনের পথে মানুষ এক বিশেষ পথ ধরে স্থূল অবস্থা থেকে উন্নততর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে ; আর

মানবসদৃশ বানরের দল গিয়েছে অন্য পথে। সুদূর অতীতে কোন এক সময়ে মানুষ ও এই বানরের যে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই; কিন্তু এই পূর্বপুরুষের ধারা অনেক আগেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বানর থেকে মানুষের উৎপত্তি—এই বিশ্বাস সাধারণভাবে বেশ চালু আছে বলেই এই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তগুলো বেশী করে বোঝা দরকার যে, কোনদিনই বানরগোষ্ঠী বিবর্তনের পথে মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ হিসেবে প্রাধান্য পায়নি, আর পেতেও পারে না কোনমতে। নিকট আত্মীয় বলে স্বীকার করা আর পূর্বপুরুষ বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে প্রচুর গুণগত পার্থক্য আছে তা বোঝা উচিত। জীববিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি তাই এ সত্যতা নিয়ে গড়ে তুলতে হবে যে, বিবর্তনের ধারা কোনদিনই সরল সহজ পথে অগ্রসর হয়নি এবং মানুষের বিবর্তনও সহজপথে বানরের পর্যায় পার হয়ে সরাসরি আধুনিক মানবগোষ্ঠীর দিকে চালু হয়নি। বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণার পথে সেই আদি জন্মমুহূর্তটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে চলেছেন এখনও।

কিন্তু যেহেতু মানুষের বংশানুক্রমিক বিবর্তনের পথে জীবাশ্ম বা প্রশীলের সংখ্যা খুব কম সে কারণে যে অবস্থা থেকে বর্তমান মানুষের উন্নততর বিকাশ সে অবস্থাটা জীবজগতের অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীদের পরীক্ষা করে ঠিক করে বুঝে নেওয়া অন্যায় হবে না। কোন না কোন নিম্নতর জীব থেকেই যখন মানুষের বিবর্তন, তখন সে সমস্ত নিম্নতর জীবকে তার অতীত ও বর্তমান জীবনের পটভূমিকায় উপযুক্ত-ভাবে পরীক্ষা করে দেখলে পর মানুষের পূর্ব-পুরুষদের দৈহিক গঠন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নানারকমের পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্তই সহজে বুঝতে পারা যায়। বর্তমানে প্রায় সমস্ত প্রাইমেট জীবই গাছে বসবাস করে এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষেরাও যে এককালে তাই করতো সেটাও অস্বাভাবিক নয়। গাছের ডালে ডালে ঝুলে চলাফেরার বহুকালের অভ্যাসের প্রমাণ আজও আধুনিক মানুষের হাত ও কাঁধের গঠন পরীক্ষা করে পাওয়া যায়। মানুষের ফ্লেক্সিবল বা নমনীয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলের গঠন পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায় যে, কোন সময়ে দেহের এই অঙ্গ কোন কিছু আঁকড়ে ধরবার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। শরীরটা সোজা অবস্থায় রাখবার ক্ষমতাও বোধহয় সে সময়ে হয়েছিল, যখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা বেশীর ভাগ সময় পায়ের ওপর ভর না দিয়ে হাতের সাহায্যে গাছের ডালে ডালে ঝুলে যাতায়াত করতো। এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণার পর এ ঘটনা সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, বিবর্তনের পথে কোন না কোন অবস্থায় গাছে গাছে যাতায়াত করার উপযোগী জীব নিশ্চয়ই জন্মেছিল এবং সে সমস্ত জীব বর্তমানের প্রাচীন ভূ-খণ্ডের বানরদের থেকে খুব বেশী ভিন্ন ধরনেরও ছিল না। সে সমস্ত জীব নতুন ভূ-খণ্ডের বানরদের মত লেজের সাহায্যে ঝুলতে পারতো না। লেজের সাহায্যে ঝোলার বিশেষ ক্ষমতা পরে নতুন ভূ-খণ্ডের বানরগোষ্ঠী আয়ত্তাধীনে আনে।

এখন মানুষ ও মানুষের মত বানর উভয়েই যে গাছে গাছে বসবাস করার উপযোগী কোন এক ক্ষুদ্র জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখন, কি অবস্থার চাপে মানুষের বিবর্তনের ধারা বানরের ধারা থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে এখনও সঠিকভাবে বলা কঠিন। এই আলাদা হয়ে যাবার সময় নিয়ে বিভিন্ন জীব-বিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কাজেই জোর করে কোন এক বিজ্ঞানীর মত গ্রহণ করা যায় না; যেহেতু বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

তবে এটুকু বললে অন্যায় হবে না যে, বোধহয় মানুষের ও বানরের বিবর্তনের গতি বেশ কিছুদিন একই সঙ্গে চলেছিল। পরে অতীতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দুটো ধারা আলাদা হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময় এখানে বলা কঠিন সুতরাং অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। এই অনুমানের প্রভাবেই বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন মত আজ সাধারণের মনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে।

এই প্রসঙ্গে ভূ-তত্ত্ববিদদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি ফেরানো দরকার। কারণ, তাঁরা পৃথিবীর অতীতকে কতকগুলো যুগে ভাগ করে দিয়েছেন এবং যুগগুলোকে আবার কতকগুলো সময়ে ভাগ করেছেন। অন্যদিকে প্রত্যেকটি যুগকে কোন না কোন বিশেষ জীবের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেনোজয়িক যুগের আরম্ভে তাই আমরা স্তন্যপায়ী জীবজন্তুর প্রাধান্য লক্ষ্য করি। এই কেনোজয়িক যুগ আবার ইওসিন, অলিগোসিন, মাইওসিন, প্লাইওসিন ও রিসেণ্ট বা আধুনিক সময়ে ভাগ করা হয়েছে। এই ইওসিন যুগে আমরা প্রাইমেট জীবের প্রকাশ দেখতে পাই এবং অলিগোসিন যুগের প্রথম দিকেই এই প্রাইমেট জীবরা বিভিন্ন বংশে বৃদ্ধি লাভ করে। অলিগোসিনের গোড়ার দিককার এক লাঙ্গুলবিহীন বানর প্রোপিওপিথেকাসের ফসিল এমনসব বিশেষ লক্ষণ দেখালো যা থেকে এই বানরকেই মানুষ ও মানুষের মত বানর উভয়ের সম্ভবপর পূর্বপুরুষ বলে মেনে নিতে হয়। এই বানর আকারে ছোট এবং তাদের দেহের গঠনও গাছে গাছে বসবাস করার উপযোগী। কিন্তু এই বানরের বংশধরেরা যে পরে মাইওসিন যুগের গোড়ার দিকে কি অবস্থায় পৌচেছিল সে বিষয়ে কোন জীবাশ্মের প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অন্যদিকে মাইওসিন যুগের মধ্যভাগে কিন্তু প্রচুর বিভিন্ন জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ঘটনা থেকে তাই মনে হয় যে, এই সময়ের ব্যবধানে মানুষের মত বানরের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়েই গিয়েছিল পৃথিবীর বুকে এবং তারা তাদের বৃহৎ আকারের বিশেষত্বটুকু অর্জন করেছিল সে সময়ের স্বাভাবিক চাপে। এই বিশেষত্ব আজও আমরা দেখতে পাই বৃহদাকারের বানরগোষ্ঠীর মধ্যে।

সমস্ত আদিম প্রাইমেট জীবই আকারে ছোট এবং বর্তমানের জীবগুলোও সে রকম খর্বাকৃতি বিশিষ্ট। আকৃতির খর্বতা এবং হালকা ওজন—এই দুটি বিশেষ গুণই যে গাছে গাছে যাতায়াত করার পক্ষে একান্ত সুবিধাজনক তা সহজেই বোঝা যায়। যাহোক অন্যদিকে কিন্তু মানুষ ও মানুষের মত বানরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বৃহদাকারের প্রতি পরিষ্কারভাবে এক ঝোঁক জন্মেছিল এই সময়ের ব্যবধানে। এই বিবর্তনমুখী ঝোঁকের স্বাভাবিক পরিণতি আমরা আধুনিক গরিলার মধ্যে লক্ষ্য করি। গরিলার বয়স্ক পুরুষদের বিরাট চেহারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং এই বিরাট চেহারা নিয়ে এই সমস্ত জীবের যে গাছে গাছে ঝুলে যাতায়াত করা অসুবিধার ব্যাপার ছিল তা বোঝা কঠিন নয়। বৃহদাকৃতি ও তার জন্যে শরীরের গুরুভার, এই দুই কারণে এই সমস্ত জীবের গাছের ডালে ডালে ঝুলে থাকাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এই ভীষণ অসুবিধার জন্যেই বৃহদাকারের জীবের পূর্বপুরুষদের বেশীর ভাগ সময় বাধ্য হয়ে মাটির ওপর হেঁটে চলাফেরা করার ফলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক পরিবর্তনও এসেছিল ভীষণভাবে। এই পরিবর্তনের ফলে তাদের পাগুলো হলো অধিকতর লম্বা। উরুর সন্ধি আরও কঠিনভাবে সংলগ্ন হলো শ্রোণীচক্র বা পেল্‌ভিসের গায়ে। পায়ের পাতা এখন কোনকিছু আঁকড়ে ধরার কাজে আর ব্যবহৃত না হয়ে শরীরের ভার ধারণ করার নতুন কাজে অভিযোজিত হলো। এই নতুন কাজের প্রয়োজনীয়তায় পায়ের পাতার হাড়গুলিতেও এলো পরিবর্তন; যার ফলে

সেগুলো পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হলো শরীরের ভার সুষ্ঠুভাবে বহন করার জন্যে। এই বিবর্তনমুখী পরিবর্তনের ঝোঁক আমরা গরিলার মধ্যেও দেখতে পাই। গরিলার পায়ের পাতা প্রায় মানুষের পায়ের পাতার মতই দেখতে। মাটির ওপর বিচরণকারী বৃহদাকৃতি গরিলা ছাড়া অন্য কোন মনুষ্যেতর প্রাইমেট জীবের মধ্যে এই রকমের মিল দেখা যায় না।

একথা খুব সম্ভব বলেই মনে হয় যে, আমাদের আদিম মানবসদৃশ পূর্বপুরুষেরা তাদের বিরাট চেহারা ও ভারী ওজনের জন্যে গাছের ওপর বসবাস করার অভ্যাস ছেড়ে দিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হয়েছিল। খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তনও এ অবস্থায় গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও প্রাইমেট জীবদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা ছিল পতঙ্গভুক্। বর্তমানের প্রাইমেট জীবেরা কিন্তু প্রধানতঃ উদ্ভিদভোজী। মানুষই একমাত্র প্রথম সত্যিকারের মাংসাশী প্রাইমেট জীব। গভীর অরণ্যে জীবজন্তু শিকারের কাজই আরও বেশী করে আমাদের পূর্বপুরুষদের মাটিতে বসবাস ও চলাফেরা করার জন্যে বাধ্য করেছিল। শিকারের জন্যে ভীষণভাবে অনুসন্ধানের কাজে স্বভাবতঃই তাদের দৈহিক আকৃতি পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী গড়ে উঠেছিল।

মাইওসিন যুগে মানব-সদৃশ বানরদের মধ্যে এক বিরাট বিবর্তনমুখী পরিবর্তন জীববিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। কারণ এই সময়ের যে অল্পসংখ্যক ফসিল পাওয়া গেছে সেগুলো পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে, সে সময়েই মানুষের বিশেষ দৈহিক আকৃতির দিকে বিবর্তনের গতি বেশ চালু হয়ে গেছে। এই সমস্ত ফসিলের মধ্যে যদিও কোনটাই আমাদের মূল পূর্বপুরুষের দেহাবশেষ নয়, তবুও তাদের মধ্যে অনেকগুলো শরীরের কোন কোন বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদ্ভুতভাবে মানুষের মত। এত মিল বর্তমানের মানব-সদৃশ বানরদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায় না। এই মাইওসিন যুগে জীবজগতে, বিশেষকরে প্রাইমেট জীবদের মধ্যে একটা গুণগত বিরাট পরিবর্তন এসেছিল বলেই বিভিন্ন ফসিল থেকে বিবর্তনের গতি যে মানুষের দিকেই চলেছে সে সময়ে—একথা বোঝা সম্ভব হয়েছে। মানবসদৃশ বিভিন্ন ফসিল এই সময়ে উপযুক্তভাবে পাওয়া গেলেও লাঙ্গুলবিহীন বানরসদৃশ ফসিলও কম পাওয়া যায়নি। সুতরাং এই সময়ে যে মানুষ ও বানরের বিবর্তনের ধারা দুই পথে পৃথকভাবে আরম্ভ হয়েছিল তা ভাবা অন্যায় হবে না। মাইওসিন যুগের ব্যবধানেই মানুষের বিবর্তনের ধারা বানরের ধারা থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র এক পথে আরম্ভ হয়েছিল বলেই আমরা এখন ভাবতে পারি যে, বোধহয় মানুষের মূল পূর্বপুরুষ ছিল এক বৃহদাকারের মাইওসিন অ্যানথ্রোপয়েড যাদের মধ্যে মাটিতে চলাফেরা ও বসবাস করার ও মাংসাদি খাদ্য গ্রহণের প্রবল ঝোঁক স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল। অবশ্য এ সিদ্ধান্ত অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবসদৃশ বানরের মধ্যে জীবিত সমস্ত জীবই এখন এক সীমাবদ্ধ ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাস করে এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরাও যে এককালে এই রকমের সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শিলীভূত দেহাবশেষের অনুসন্ধান আজও যথাযথভাবে করা হয়নি। উপযুক্ত ফসিল না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের মূল পূর্বপুরুষ কে বা কারা ছিল তা কিছুতেই জোর করে বলা যাবে না। প্রাক্-মানবের যে সমস্ত ফসিল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে তা থেকে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে, মানুষের বিবর্তন অনেকগুলো গুরুতর অবস্থা পার হয়ে তবে আধুনিক মানুষের পর্যায়ে পৌচেছে।

যে সমস্ত প্রাক্-মানবের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তার মধ্যে যাভায় প্রাপ্ত জীবাশ্ম পিথেক্যানথ্রোপাস্ ইরেক্টাস্ হচ্ছে বয়সে সকলের চেয়ে পুরোনো। এই জীবাশ্মের লক্ষণ থেকে অনুমান করা হয়েছে যে, যাভা মানুষ মাইওসিন যুগের এক অদ্ভুত

আবিষ্কার, যার মধ্যে আধুনিক মানুষ ও মানুষ-সদৃশ বানরের বিভিন্ন লক্ষণ মিশ্রিতভাবে রয়েছে। এই জীব আধুনিক মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাটির ওপর দুপায়ে ভর দিয়ে যাতায়াত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু পিথেক্যানথ্রোপাসের খুলির হাড় ইত্যাদি পরীক্ষা করে অনেকে বলেছেন যে, খুবসম্ভব এই খুলি কোন এক বৃহদাকার গিবনের হবে। যাহোক যাভা-মানুষ আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পথে যে এক বিশেষ ধাপ তা নিশ্চয়ই বলা যায়; তবে মূল পূর্বপুরুষ কিনা তা বলা যায় না। এখন এই যাভা-মানুষের পূর্বপুরুষ কে—তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়ে গেছে; কিন্তু কোন ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। অনেকে এক্ষেত্রে এক হারাণো সূত্র বা মিসিং লিঙ্কের উপর খুব জোর দিয়েছেন। যাহোক যাভা-মানুষ কিন্তু আধুনিক মানুষের মূল পূর্বপুরুষ বলে প্রাধান্য পায়নি। যাভা-মানুষ ছাড়াও পিল্টডাউন মানুষ বা ইওয়ানথ্রোপাস, পিকিঙ মানুষ বা সিনানথ্রোপাস, নিয়ানডারথ্যাল ও ক্রো-ম্যাগনন প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এই সমস্ত জীবাশ্মের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষ ও মানব-সদৃশ বানরের বিভিন্ন লক্ষণ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একমাত্র ক্রো-ম্যাগনন্ ছাড়া আর কোনটার মধ্যেই আধুনিক মানুষের বিবিধ লক্ষণ উপযুক্তভাবে পাওয়া যায়নি। অধিকাংশ জীবাশ্মের মধ্যে বানর ও মানুষের লক্ষণ অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে এই সমস্ত জীবাশ্ম যে আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পথে এক একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তা অবশ্যই মানতে হবে। ক্রো-ম্যাগননের মধ্যে সর্বপ্রথম আধুনিক মানুষের বিভিন্ন লক্ষণ পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়। এই ফসিল মানুষকেই জীববিজ্ঞানীরা প্রথম হোমো-স্যাপিয়েন্স বলে আখ্যা দিয়েছেন। এখন এই হোমোস্যাপিয়েন্স-এর সঙ্গে যাভা-মানুষ ও নিয়ানডারথ্যালের সম্পর্ক বিচার করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় করে বলেছেন যে, আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ কখনই নিয়ানডারথ্যাল নয় বরং হোমোস্যাপিয়েন্সই হচ্ছে আমাদের মূল পূর্বপুরুষ।

বিভিন্ন জীবাশ্মের পুরোপুরি ইতিহাস লেখা এজায়গায় সম্ভব নয় বলেই সংক্ষেপে দেখানো গেল যে, অধুনিক মানুষের বিবর্তনের ধারা যাভা-মানুষের ধাপ থেকে আরম্ভ হয়ে পিকিঙ মানুষ, নিয়ানডারথ্যাল মানুষের ধাপ পার হয়ে ক্রো-ম্যাগনন্ মানুষের পর্যায়ে এসেই আধুনিক মানুষের মূল পূর্বপুরুষটি নির্দেশ করছে। জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অন্তত ১০০,০০০ বছর আগে হোমো-স্যাপিয়েন্স আধুনিক মানুষের বিভিন্ন লক্ষণ পুরোপুরি ভাবেই পেয়েছিল। এই সময়েই বোধহয় আধুনিক বিভিন্ন জাতির পূর্বপুরুষেরা প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাহোক, নিয়ানডারথ্যালের বংশধররা অনেক আগেই পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং হোমো-স্যাপিয়েন্সের বংশধররা তখন সমস্ত ভূ-খণ্ডের একমাত্র মনুষ্যজাতি হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে। প্লাইওসিন যুগেরই শেষের দিকে বিবর্তনের গতি আধুনিক মানুষের পর্যায়ে এসে পৌচেছিল বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন।

"মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারের সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে।

অপবিজ্ঞান—রাজশেখর

লুই পাস্তুর

শ্রীদিলীপকুমার দাশ

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষকে নতুন জিনিসের সন্ধান দিয়েছে। বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ও তাঁদের অনুসৃত পথ আবার মানুষকে দিয়েছে নতুন নতুন জীবন পথের সন্ধান। আজ এমন একজন বিজ্ঞানীর জীবনী আলোচনা করব যাঁর অপূর্ব আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানকে শুধু নতুন পথেই চালিত হতে দেখি না, মানুষের চিন্তাধারারও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা—১৮৩১ সাল, ফ্রান্সের এক গ্রামে পাগলা নেকড়ে কামড়ানো এক রোগীর চিকিৎসা হচ্ছিল। চিকিৎসা আর কিছুই নয়, লোহার ডাণ্ডা টকটকে লাল করে পুড়িয়ে ঐ কামড়ানো জায়গায় চেপে ধরা। ভীড় করে লোকে এই চিকিৎসা দেখছিল। রোগীর কাতরোক্তি ছাড়াও চামড়া পোড়বার শব্দ ও পোড়া চামড়ার গন্ধে সেই জায়গাটা ভরে উঠেছিল। একটি ন' বছরের ছেলেও ঐ জায়গায় উপস্থিত ছিল। সে এই দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, ছুটে পালিয়ে গেল। এই বালকই পরে জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কার করে বিখ্যাত হন। এঁর নামই লুই পাস্তুর।

বালক পাস্তুরের মন থেকে কিন্তু এ-দৃশ্য মুছে গেল না। তিনি তাঁর পিতাকে জিগ্যেস করলেন—কুকুর, নেকড়ে বাঘ এরা পাগল হয় কেন, আর পাগলা কুকুর, নেকড়ে বাঘে কামড়ালে মানুষই বা পাগল হয়ে যায় কেন? পাস্তুরের পিতা ছিলেন একজন সাধারণ চর্মকার (ট্যানার)। তখনকার দিনে জনসাধারণের এসব বিষয়ে জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। পাস্তুরের পিতা তাই প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে কৌতূহলী পুত্রের প্রশ্নের জবাবে বললেন—খুব সম্ভব নেকড়ের শরীরে কোনও শয়তান প্রবেশ করে, যার জন্যে এসব ব্যাপার ঘটে। আর ভগবান যদি কারও মৃত্যু ইচ্ছা করেন, তাহলে সে মরবেই—মৃত্যুর হাত থেকে তার কোনও প্রকারে নিস্তার নেই।

যখন পাস্তুর জন্মেছিলেন তখন মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর ছিল পাস্তুরের পিতার পূর্বোক্ত জবাবেই সেটা বোঝা যায়। পাস্তুরের পিতাও যে ঐ অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে একজন আলোক-প্রাপ্ত ছিলেন না সেটাও আমরা জানতে পারি তাঁর নিজের উক্তি থেকেই। এমনই এক অবস্থার মধ্যে পাস্তুরের বাল্যকাল গড়ে ওঠে।

বাল্যকালে পাস্তুরের মধ্যে প্রতিভার কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। ছাত্রাবস্থায় তিনি আরবয়ের বিদ্যায়তনের সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁর আশা ছিল বয়সের তুলনায় অনেক বেশী। ছাত্রদের অধিনায়ক হবার ও তাদের শিক্ষকতা করবার উচ্চাশা তিনি পোষণ করতেন। তিনি অধিনায়ক হয়েছিলেন এবং বেজানকল কলেজে কতকটা সহকারী শিক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে অসম্ভব খাটতেন ও অন্যকেও তাঁর মত খাটবার জন্যে উপদেশ দিতেন। এই সময় তিনি তাঁর বোনেদের কাছে এক উপদেশপূর্ণ চিঠিতে লিখেছিলেন 'কর্ম, স্পৃহা ও সাফল্য এই তিনটি জিনিসই মানবজীবন পরিপূর্ণ করে।' ছবি আঁকার দিকে পাস্তুরের ঝোঁক প্রবল ছিল এবং তিনি অবসর সময়ে বসে বসে ছবি আঁকতেন।

পাস্তুরের পিতা পাস্তুরকে প্যারিসে নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং পাস্তুরও সেখানে গিয়ে

বড় কিছু একটা করবার সংকল্প করেন। কিন্তু বড় কিছু করবার আগেই ঘরমুখো মন তাঁকে স্বগৃহে ফিরিয়ে আনে। এরপর পাস্তুরের পিতা পাস্তুরকে আবার ঐ নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই সময়ে তিনি রসায়নশাস্ত্রের প্রতি অসম্ভব রকম অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং একজন খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগে।

ছাব্বিশ বছর বয়সেই তাঁর আশা পূর্ণ হয়। টারটারিক অ্যাসিড যে চার রকমের হতে পারে সেটা তিনি প্রমাণ করেন। এই আবিষ্কারের ফলে তিনি অভিনন্দিত হন বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌দের দ্বারা। এরপর ষ্ট্রাসবার্গে পাস্তুর অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন।

ষ্ট্রাসবার্গে পাস্তুর যে বিদ্যায়তনে অধ্যাপনা করতেন ঐ বিদ্যায়তনের ডীনের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর বিয়ে এক মজার ব্যাপার। একদিন কোনও রকম ভাবনা চিন্তা না করেই পাস্তুর ডীনের কন্যাকে এক চিঠিতে জানান, একজন যুবতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই। তবে আমার মনে হয়, যারা আমাকে ভালভাবে জানে তারা আমাকে খুব ভালবাসে। অতএব ডীনের কন্যাকেও যে তাঁকে ভালবাসতে হবে একথাও তিনি উক্ত পত্রে জানান। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিবাহ হয় এবং মাদাম পাস্তুর নানারকম দুর্ভোগের মধ্যেও একজন আদর্শ সঙ্গিনী ও সহধর্মিনীর জীবন যাপন করেন।

গবেষণারত পাস্তুরের খেয়ালী মনে হয়ত অনেক সময় মাদাম পাস্তুরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। তাহলেও পাস্তুর আশা পোষণ করতেন যে, নিজের সংগে সংগে তাঁর স্ত্রীকেও তিনি বিখ্যাত করে তোলবেন। স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করে বহু বিনিদ্র রাত্রি মাদাম পাস্তুরকে কাটাতে হয়েছে। পাস্তুরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মত মাদাম পাস্তুর তাঁর স্বামীর সকলপ্রকার গবেষণাতেই একটা কিছু আশা করতেন এবং তিনি একবার পাস্তুরের কোনও গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর (মাদাম পাস্তুরের) পিতাকে জানিয়েছিলেন—যদি এই গবেষণায় পাস্তুর সফলকাম হন তাহলে একজন নিউটন অথবা গ্যালিলিওর আবির্ভাব ঘটবে।

পাস্তুর লিলের ফ্যাকালটি অফ্ সায়েনসেস্-এর ডীন ও অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সহরে বহু সুরাসার ব্যবসায়ী বাস করতেন। তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে শিল্প ও বাণিজ্যে বিজ্ঞানের সহযোগিতা কামনা করে পাস্তুরের কাছে আবেদন জানান। এই প্রস্তাবের উপযোগিতা উপলব্ধি করে পাস্তুর সহরবাসীদের কাছে বিজ্ঞান প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

ইতিমধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাতে পাস্তুরের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হয় এবং সেই দিকটা নিয়েই গবেষণা করে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ঐ সহরের একজন সুরাসার ব্যবসায়ী একদিন পাস্তুরকে জানান যে, সুরাসার ফারমেণ্টেসনে বিপত্তি ঘটেছে এবং এজন্যে ব্যবসায়ীদের দৈনিক সহস্রাধিক ফ্রাংক ক্ষতি হচ্ছে। উক্ত ব্যবসায়ী এ বিষয়ে পাস্তুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

পাস্তুর যে কিভাবে ব্যবসায়ীর উক্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অন্যান্য রসায়নবিদ্‌দের মত তাঁরও জানা ছিল না—কিভাবে চিনি থেকে সুরাসার প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহলে কি হবে? পাস্তুর সুরাসারের কারখানায় গিয়ে কিছু খারাপ ও কিছু ভাল সুরাসার তাঁর গবেষণাগারে নিয়ে আসেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আড়াইশো বছর পূর্বে হল্যাণ্ডের লিউয়েনহুয়েক সর্বপ্রথম জীবাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। লিউয়েন-হুয়েক পরে ইটালীর ল্যাজ্জারো স্প্যালানজানী

জীবাণু যে অন্য জীবাণু থেকে উদ্ভূত হয়—এই তথ্য অবগত হন। এঁদের পরে ১৮৩৭ সালে পাস্তুর যখন রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কীয় গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন তখন কাগনিয়ার্ড দ্য লাটুর নামীয় একজন ফরাসী ঈষ্ট-জীবাণুর দ্বারা বার্লি যে সুরাসারে পরিবর্তিত হতে পারে—সেটা আবিষ্কার করেন। কিন্তু যথাযথ প্রচারের অভাবে তাঁর ঐ আবিষ্কার চাপা পড়ে যায়। আবার ঠিক ঐ বছরই ডাঃ সোয়ান নামে একজন জার্মান অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা যে মাংস নষ্ট হয়ে যায় সেটা প্রমাণ করেন।

পাস্তুর যখন কারখানা থেকে সংগৃহীত সুরাসার পরীক্ষা করে দেখছিলেন তখন তিনি কাগিনার্ড-এর প্রচারিত তথ্য সত্য বলে জানতে পারেন। পাস্তুর পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, নষ্ট সুরাসার অম্ল হয়ে গিয়েছে। আরও একটা জিনিস তিনি লক্ষ্য করেন যে, নষ্ট সুরাসারে কোনও ঈষ্ট-জীবাণু নেই, বরং তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অন্য এক জীবাণু। বারংবার পরীক্ষা করে তিনি নষ্ট সুরাসারের মধ্যে ঈষ্টের অনুপস্থিতি ও নতুন ধরনের জীবাণুর উপস্থিতি দেখতে পেলেন। আর প্রত্যেকবারই দেখলেন যে, নষ্ট সুরাসার অম্লে পরিণত হয়েছে। পাস্তুর চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন। তিনি ভাবেন—নষ্ট সুরাসারে অবস্থিত জীবাণুগুলো জীবিত। এই জীবাণুগুলোই সুরাসারে অম্ল তৈয়ারী করে থাকে। এরাই বোধ হয় ঈষ্টের সংগে যুদ্ধে ঈষ্টকে পরাভূত করে। ঈষ্ট যেমন সুরাসারের খমির, তেমনি ঐ জীবাণুগুলোও বোধ হয় অম্লের খমির বা ফার্মেণ্ট। এই নবলব্ধ সিদ্ধান্তের কথা পাস্তুর ছুটে গিয়ে জানান মাদাম পাস্তুরকে। মাদাম পাস্তুর সমস্ত তথ্যাদি সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করে তাঁর স্বামীকে জোগান উৎসাহ ও প্রেরণা।

কেবল সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই তো চলবে না, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে হবে তাঁর তথ্যাদি। পাস্তুর ঐ নতুন ধরনের জীবাণুগুলোকে পৃথক করে নিয়ে একটি বোতলের মধ্যে রক্ষিত বিশেষ খাদ্যের মধ্যে রেখে দিলেন। একদিন বাদে তিনি দেখতে পেলেন যে, জীবাণুগুলো সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছে। জীবাণুগুলোর প্রজনন ক্ষমতা দেখে তাঁর প্রতীতি হলো—এদের নিশ্চয়ই প্রাণ আছে। এই নতুন আবিষ্কারে পাস্তুর অধীর হয়ে উঠলেন, সবাইকে জানিয়ে দিলেন এই আবিষ্কারের কথা। লিলেস্থিত সায়েন্টিফিক সোসাইটিতে তিনি তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করে শোনান ও আর একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দেন প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স্-এ।

এই সময়ে পাস্তুর নর্মাল স্কুলের সায়েন্টিফিক স্টাডিজ-এর পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে প্যারিসে চলে যান। তথায় গিয়ে তিনি তাঁর মনের মত গবেষণাগার পেলেন না এবং এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করা সম্বন্ধে সরকার পক্ষের অসামর্থ্যের কথা তিনি অবগত হলেন। এতে পাস্তুর কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। নিজেই একটা ছোটখাট ঘর খুঁজে নিয়ে সেটাকে একটা গবেষণাগারে দাঁড় করিয়ে নিলেন।

লিলেতে অবস্থানকালে অম্লে পরিণত সুরাসারে পর্যবেক্ষিত জীবাণুর কথা পাস্তুর ভোলেননি। পাস্তুরের মনে হলো ঐ জীবাণুগুলো নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু করবার ক্ষমতা রাখে। তাঁর আরও মনে হলো, ঐ ঈষ্টগুলোই চিনি থেকে সুরাসার, বার্লি থেকে বিয়ার এবং আঙ্গুর থেকে মদ তৈরী করে। পাস্তুর শুধু কল্পনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, ঠিক করলেন—পরীক্ষা দ্বারা এ কথাগুলো প্রমাণ করতে হবে।

বিখ্যাত জার্মান রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ লাইবিগ পাস্তুরের মতবাদের প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর মতে অ্যালবুমেনের সাহায্যেই চিনি থেকে সুরাসার প্রস্তুত হয়, ঈষ্টের সাহায্যে নয়। পাস্তুর ছিলেন একরোখা মানুষ, তিনি লাইবিগের কথায় ক্ষেপে গেলেন। ঠিক করলেন, যেমন করেই হোক তাঁর (পাস্তুরের) মতবাদ সত্য

বলে প্রমাণ করতেই হবে। লাইবিগকে তিনি দেখে নেবেন, এই তাঁর ভাব।

পাস্তুর তাঁর মতবাদ সত্য প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন। অ্যালবুমেন-শূন্য পদার্থের মধ্যে চিনি ও ঈষ্ট দিয়ে সুরাসার পেলেন। এই পরীক্ষা একবার করেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, বহুবার এই একই পরীক্ষা তিনি করে গেলেন, যাতে তাঁর পরীক্ষায় কোনও প্রকার ভুলভ্রান্তি না থেকে যায়। অ্যালবুমেনের সাহায্যে নয়, ঈষ্টের সাহায্যেই যে চিনি থেকে সুরাসার প্রস্তুত হয় এটাই পাস্তুর প্রমাণ করলেন।

পাস্তুর এর পর উঠেপড়ে লাগলেন তাঁর মতবাদ প্রচার করতে। প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। চারদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। প্যারিসের অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্স্ কিছুদিন পূর্বে তাঁকে অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত করতে অস্বীকার করেছিল। সেই প্রতিষ্ঠানও এবার তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলো। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকদের কাছ থেকেও পাস্তুর প্রশংসা ও সম্মানসূচক বাণী পেলেন।

এইভাবে যখন চারদিক থেকে পাস্তুরকে সম্মানিত করা হচ্ছিল, সেই সময়ে তাঁর এক বিরোধী দলও গড়ে উঠেছিল। পাস্তুরের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে পাস্তুর তাঁকে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তেন না। তাঁর এই অপ্রিয় ভাষণের জন্যেও একদল লোক তাঁর বিরোধী হয়েছিল। আর এক দল বিরোধী ছিল যারা পাস্তুরের গবেষণার সামান্য ভুলত্রুটি নিয়ে তাঁকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতো।

যে জীবাণুর দ্বারা সুরাসার খারাপ হয়ে যায় ও অম্লে পরিণত হয় সেই জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় পাস্তুর মাঝেমাঝে সুরাসারের মধ্যে কোনও অম্ল পেতেন না। তিনি দেখতে পেতেন যে, সুরাসার অম্লে পরিবর্তিত না হয়ে একপ্রকার পচা মাখমের গন্ধযুক্ত পদার্থে পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপার পাস্তুরকে বিব্রত করে তুললো এবং এজন্যেই তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বিরোধী পক্ষের লক্ষ্যস্থল।

পাস্তুরের ছিল অদম্য উৎসাহ। আবার তিনি গবেষণা শুরু করে দিলেন। এবার তিনি দেখলেন, যে-সুরাসার থেকে পচা মাখমের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল তার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের নতুন জীবাণু। অনাহূত এই জীবাণুগুলো পাস্তুরকে বিশেষ সুখী করতে পারলো না। পাস্তুরও অবশ্য এদের অবজ্ঞা করলেন না। পরীক্ষা করার সময় প্রত্যেকবারই তিনি দেখতে পেলেন—যেসব সুরাসার থেকে পচা মাখমের গন্ধ পাওয়া গেছে সেইসব সুরাসারের মধ্যে রয়েছে পূর্বোক্ত জীবাণুগুলো। তিনি বুঝতে পারলেন, ঐ জীবাণুগুলোও আর এক ধরনের খমির। পাস্তুর এই সময়ে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেন। তিনি দেখলেন, ঐ জীবাণুগুলো বায়ু ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে এবং এরা বায়ুর সংস্পর্শে এলে মরেও যায়। পাস্তুর জানতেন না যে, তাঁর পূর্বে লিউয়েনহুয়েক ও স্প্যালানজানি এ বিষয়ে জানতে পেরেছিলেন।

জীবাণু নিয়ে গবেষণা করবার সময় পাস্তুরের মনে হয় যে, জীবাণুগুলো যখন মাংস নষ্ট করে ফেলতে পারে তখন বোধহয় এরা খারাপ রোগেরও সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি গবেষণা চালাবার সংকল্প করেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি জগৎবাসীকে জীবাণু সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। নানারকম পরীক্ষা করতে করতে তখনকার দিনে প্রচলিত একটা মতবাদের কথা তাঁর মনে হলো। সে সময়ে অনেকেরই ধারণা ছিল—জীবাণুগুলো আপনা থেকেই আবির্ভূত হয়। স্প্যালানজানির মত পাস্তুরও একথা বিশ্বাস করতেন না। অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের মত জীবাণুগুলোও যে অন্য

জীবাণু থেকে জন্মগ্রহণ করে, এই কথাই পাস্তর বিশ্বাস করতেন। কিভাবে এটা প্রমাণ করা যায়? এইটেই তাঁর কাছে মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ২১১টি পরীক্ষাদ্বারা তিনি তাঁর তথ্য প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করতে পারেন না। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি ছোট বাড়ী গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্যে দিয়েছিলেন। একদিন ব্রোমিন-আবিষ্কারক এ, জে, ব্যালার্ড এই গবেষণাগারে বেড়াতে এসে পাস্তরকে তাঁর সমস্যা সমাধানের জন্যে পরীক্ষা চালাবার কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে যান। পাস্তর ব্যালার্ডের কথামত কতকগুলো ফ্লাস্কের মধ্যে ঈষ্ট-সুপ রেখে ঐ ফ্লাস্কগুলোর মুখ গরম করে টেনে হাঁসের গলার মতন বাঁকিয়ে দেন। তারপর ঈষ্ট-সুপ ভাল করে ফুটিয়ে নেবার সময়ই ফ্লাস্কের ভেতরকার বাতাস বের করে দিতে সমর্থ হন। এরপর ফ্লাস্কগুলো যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন এঁদের বাঁকানো নল দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করতে থাকে। ফ্লাস্কগুলোকে একদিন এইভাবে রেখে পরদিন ফ্লাস্কের ভেতরকার ঈষ্ট-সুপের মধ্যে পাস্তর কোনও নতুন জীবাণু দেখতে পেলেন না। পাস্তর একথা ব্যালার্ডকে জানালেন।

পাস্তর ব্যালার্ডের কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আরও একটা নির্দেশ পেলেন। তিনি পাস্তরকে বললেন—যে ফ্লাস্কগুলোর মধ্যে জীবাণু দেখতে পাওয়া যায়নি তারই একটা নিয়ে এমন করে ঝাঁকাতে হবে যাতে ভেতরকার সুপ বাঁকানো নলের মুখ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। ব্যালার্ডের নির্দেশমত একটা ফ্লাস্ক ভাল করে ঝেঁকে নিয়ে পাস্তর সেই ফ্লাস্কটা রেখে দেন ও তারপরের দিন ফ্লাস্কটা পরীক্ষা করে তার মধ্যে অসংখ্য জীবাণু দেখতে পান। ফ্লাস্কের ভেতরকার সুপ ফুটিয়ে নেবার সময় ফ্লাস্কটা বায়ুশূন্য হয়েছিল। ফ্লাস্কটা ঠাণ্ডা হবার সময় ওর বাঁকানো নল দিয়ে যে বায়ু ভেতরে প্রবেশ করেছিল সেই বায়ুতে অবস্থিত জীবাণুগুলো ফ্লাস্কের বাঁকানো মুখের প্রথম দিকেই লেগেছিল, ফ্লাস্কের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। সেইজন্যে ফুটিয়ে নেওয়া ঈষ্ট-সুপের মধ্যে প্রথমে কোনও ঈষ্ট-জীবাণু দেখতে পাওয়া যায়নি। এরপর ফ্লাস্কটা ঝাঁকিয়ে নেবার সময় বাঁকানো নলের গাত্রসংলগ্ন জীবাণুগুলো সুপের সংগে মিশে যায় এবং তা থেকেই পরে আরও জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে।

এইভাবে জীবাণুর স্বতঃজননক্ষমতার কথা পাস্তর সম্পূর্ণভাবে অপ্রমাণিত করলেন। এরপর তিনি পূর্বোক্ত আকৃতির মুখ বন্ধ করা বায়ুশূন্য কতগুলো ফ্লাস্কের মধ্যে ঈষ্ট-সুপ নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পর্বতমালায় ঘুরে বেড়ান। তিনি ঐ সমস্ত জায়গায় পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যতই উপরে যাওয়া যায় ততই বায়ু পরিষ্কার হয়ে আসে, আর ধূলাবালি কম থাকার দরুণ তাদের সংগে সাধারণতঃ যে-জীবাণু লেগে থাকে তাদের সংখ্যাও কমে আসে। এই বৈজ্ঞানিক অভিযান শেষ করে প্যারিসে ফিরে এসে অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সের সুধীমণ্ডলীকে তিনি জানান তাঁর আবিষ্কারের কথা। পাস্তরের তথ্যাদি ও আবিষ্কারসমূহের বিরোধিতা করেছিলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁরা সেগুলো মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারেননি।

জীবাণুগুলো যে রোগ সৃষ্টি করতে পারে এ সম্পর্কে পাস্তর নিজে ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু কোনরকম পরীক্ষার দ্বারা সুনিশ্চিত না হয়েও তিনি তাঁর এই মত প্রচার করেন। এই প্রচারের সংগে সংগে ফরাসী জনসাধারণকে বিজ্ঞান অনুরাগী করে তোলবার চেষ্টাও তিনি করতে থাকেন। জনসাধারণের নিকট গবেষণাগারগুলোর প্রতি দৃষ্টি ফেরাবার জন্যেও আবেদন জানান। তিনি বলেন, ঐ গবেষণাগারগুলোই হলো ভবিষ্যতের সুখ ও সমৃদ্ধির মন্দির।

শিল্প ও বাণিজ্যে বিজ্ঞানের সহায়তা যে

প্রয়োজনীয় সেটাও পাস্তুর প্রমাণ করলেন আরবয় নামক স্থানে গিয়ে। ঈষ্ট ছাড়া অন্য ধরনের জীবাণু যে মদ নষ্ট করে ফেলতে পারে সেটা তিনি নানা-ধরনের মদ পরীক্ষা করে জানতে পারেন। মদটা সঞ্চিত হবার পর সেটাকে সামান্য উত্তাপ দেবার এক প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন। এই তাপে যে সমস্ত জীবাণু মদটাকে নষ্ট করে ফেলতে পারত তারা সহজেই মরে যায় ও মদটাও ভাল থাকে। এই প্রথাই পরে 'পাস্তুরাইজেশন' নামে খ্যাত ও প্রচলিত হয়।

১৮৬৫ সালে পাস্তুর এক চিঠি পান তাঁর পূর্বতন অধ্যাপক ডুমার কাছ থেকে। অধ্যাপক জানিয়েছেন, তাঁর গ্রামের রেশম-ব্যবসায়ীদের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে গুটিপোকার কোনও দোষে। তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন যে, পাস্তুর কোনও প্রকারে উক্ত ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে পারেন কিনা।

পাস্তুর তাঁর অধ্যাপকের কথা অগ্রাহ্য করলেন না। তিনি তাঁর অধ্যাপকের গ্রামে গেলেন। তখন দক্ষিণ ফ্রান্সের রেশম ব্যবসায়ীদের গুটিপোকার একপ্রকার রোগের দরুণ ভীষণ ক্ষতি হচ্ছিল। পাস্তুর যখন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে যান তখন তাঁর রেশমের গুটিপোকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। যাহোক, জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যাদি জেনে নিয়ে পাস্তুর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, গুটিপোকার গায়ে একরকম কালো দাগের আবির্ভাবই হচ্ছে ওদের রোগের লক্ষণ। পাস্তুর প্রথমে ডিম বাছাই করার এক প্রথা প্রবর্তন করেন ও সেই প্রথা অনুসরণ করবার জন্যে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেন। পাস্তুরের ধারণা ছিল যে, তাঁর নির্দেশমত ডিম বাছাই করলে নবপ্রসূত গুটিপোকাগুলোর ঐ রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকবে না।

পরের বছর পাস্তুরের সমস্ত আশাই হতাশায় পরিণত হলো। বাছাইকরা ডিম থেকে যে সব গুটিপোকা জন্মালো সেগুলোর মধ্যে দেখা দিল নতুন একরকম রোগ। এই রোগে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যেত গুটিপোকা-গুলো। পাস্তুর আশ্চর্যান্বিত হলেন; নতুন রোগে আক্রান্ত গুটিপোকাগুলোর গায়ে কোনও-রকম কালো দাগ ছিল না—এরা বদহজমের দরুণই মারা যেত বেশী। পাস্তুর দিশেহারা হয়ে পড়লেন। শুধু তার নিজের অসাফল্যেই নয়, রেশম ব্যবসায়ীদের কঠোর বিদ্রূপেও তিনি বিব্রত বোধ করলেন।

পাস্তুর কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। তিনি আবার পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। রোগগ্রস্ত গুটিপোকার মল তুঁত পাতার সংগে মিশিয়ে সেই পাতা খেতে দিলেন কয়েকটি সুস্থ গুটি-পোকাকে। সুস্থ গুটিপোকাগুলো রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল; কিন্তু তাদের গায়ে কোনও রকম কালো দাগ দেখা গেল না। কালো দাগ না পাওয়ার জন্যে পাস্তুর হতাশ হয়ে পড়লেন। গারনেজ নামে পাস্তুরের একজন সহকারী পুনর্বার পাস্তুরের পরীক্ষা করেন। তিনি একটা রোগগ্রস্ত গুটিপোকার দেহ গুঁড়ো করে সেটা তুঁত পাতায় মাখিয়ে সুস্থ গুটিপোকাকে খাওয়ালেন। দেখা গেল, ঐ সুস্থ গুটিপোকা রোগাক্রান্ত হয়েছে ও তার গায়ে কালো দাগ দেখা দিয়েছে। এভাবে গারনেজ জানতে পারেন যে, ঐ কালো দাগগুলো হলো কতকগুলো জীবাণু। গারনেজ তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে পাস্তুরকে জানালেন যে, ঐ পরজীবীগুলোর জন্যেই গুটিপোকা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

পাস্তুর আবার তাঁর পূর্বোক্ত ডিম বাছাই করবার প্রথা পরিবর্তিত করে চালু করেন। এবারের যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেল। পাস্তুর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ব্যবসায়ীদের বুঝিয়ে দিলেন—গুটিপোকাগুলোকে সুস্থভাবে পালন করবার উপায় ও তাদের রোগের কারণ। এই সময়ে হঠাৎ মস্তিষ্কে রক্তপাতের দরুণ পাস্তুরের শরীরের একাংশ অবশ হয়ে যায়।

উদ্ভিদ বনাম উদ্ভিদবিদ্

শ্রীতন্ময় বাগচী

আমেরিকার মিসিসিপি নদীর পশ্চিম প্রান্তের উর্বরতার কথা বিখ্যাত। পাঁচবার চাষ করেও উর্বরা শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। কিন্তু পূর্বপ্রান্ত ঠিক এর বিপরীত। বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে পড়ে আছে ক্লান্ত, শক্ত নির্জীবের মত মরা মাটি। আব্রাহাম লিংকনের সময় যে ফসল পাওয়া যেত আজ তার এককণাও পাওয়া দুষ্কর। বিশেষজ্ঞরা শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন—'এ অঞ্চল নিশ্চয়ই মরুভূমি হয়ে যাবে।' কিন্তু তাঁদের সেই ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত করলেন জর্জ হফার।

ইণ্ডিয়ানার লাফায়েতে টিপাকানো জায়গার এক কলেজের অধ্যাপক হচ্ছেন জর্জ হফার। একদিন বক্তৃতা শেষ করে ক্লাসের বাইরে আসছেন—এমন সময় একটি ছাত্র প্রশ্ন করে বসল—আমাদের এ অঞ্চলে তেমন ফসল হচ্ছে না কেন স্যার? তাদের কি কোন রোগে ধরেছে?

ছাত্রটি হলো ইলিনয়েসের ম্যাকলীন কাউণ্টীর ফ্রাংক্স্ প্রতিষ্ঠানের কর্মী জিমি হোলবার্ট। তার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না জর্জের। তিনি বিপদে পড়লেন। কারণ এবিষয়ে তিনি কোনদিনই কিছু চিন্তা করেননি। কিন্তু দমে যাবার পাত্র নন জর্জ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় অধ্যাপক কার্লটন কার্টিসের কাছ থেকে অমূল্য উপদেশ পেয়েছিলেন 'গবেষণা কর জানতে পারবে।' হঠাৎ সেই উপদেশের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি শুধু বললেন—চল দেখি আসল কারণটা আমরা খুঁজে পাই কিনা!

অপ্রত্যাশিতভাবে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এল জর্জের জীবনে। অধ্যাপনার আড়ালে সুরু হলো গবেষণার সাধনা। সাথী হয়ে রইল শুধু জিমি হোলবার্ট।

মাটিতে কাজ করার দরুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল জিমির। সে বলে দিতে পারে—কোন্ মাটিতে কি জন্মায়, গাছের শীষের প্রভেদ, বিভিন্ন জিনিসের নাম আর পরিচয়। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জর্জের মনে হলো তিনি যেন এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন। মাঠে মাঠে ঘোরবার সময় দেখলেন—তাজা ভুট্টার অকাল মৃত্যু, রুগ্ন আর নেতিয়ে-পড়া চারাগাছ। এথেকে কিছু কিছু অংশ তুলে আনলেন গবেষণাগারের জন্যে। দীর্ঘদিন ধরে চলল তাজা আর বিবর্ণ ভুট্টা, শক্ত ও ভাঙ্গা ডাঁটা নিয়ে গবেষণা। ইলিনয়েসের ব্লুমিংটনের বিস্তীর্ণ জমিতে সুরু হলো পরীক্ষা। ফ্রাংকরা সমস্ত চাহিদা জোগাতে লাগল। খুব শিগ্‌গীর শেষ হয়ে গেল এই অভিযান।

গবেষণার বিবরণ বের হবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনের সরকারী খাদ্য-শস্য বিভাগ জর্জ-হোলবার্টকে এক বৃত্তি দিলেন। চাষীরা তাঁদের বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নিল এবং সমস্ত ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে সুরু হলো বিজয়োল্লাস।

এই অবস্থায় হোলবার্ট জর্জের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ফ্রাংকসের বীজ বিভাগে কাজ করবার জন্যে। সেখানে নতুন নতুন প্যারাসাইট বা পরজীবী নিয়ে চালালেন গবেষণা।

কিন্তু জর্জের পথ ছিল ভিন্ন। যেদিন থেকে তিনি নতুন পৃথিবীকে জেনেছেন সেদিন থেকে তাঁর সুরু হয়েছে তাকে এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করবার এক অদ্ভুত পরিকল্পনা কাজে লাগাবার সাধনা।

জমিতে জমিতে ঘুরে বেড়ান জর্জ। ভাল আর খারাপ শস্য দেখেন। লম্বা লম্বা ডাঁটাগুলো দু-ফলা করে চিরে ফেলে তার ব্যাধি নিয়ে গবেষণা করেন। ডাঁটার গাঁটগুলো পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলেন, খারাপ ডাঁটার নীচের দিকে একটু বাদামী রঙের আভা থাকে; ভালর বেলায় থাকে নীলাভ সাদার আভা। হাজার হাজার ডাঁটা নিয়ে পরীক্ষা করে' এই পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। মনের মাঝে ভাবনা ঢুকলো—কেন এরকম বাদামী রঙ হয়? তবে কি কোন পরজীবী বাসা বেঁধে আছে?

জর্জ ইণ্ডিয়ানাপোলিসের সেলবিভিল থেকে দু-বস্তা সুস্থ আর অসুস্থ চারা নিয়ে এসে মাটিতে পুঁতে দিলেন। কিছু পোতলেন অ্যাসিড মেশানো আর চুন মেশানো মাটিতে। দিন কয়েক পরে দেখা গেল, ভাল আর খারাপ বীজ অ্যাসিড মেশানো মাটিতে কম জন্মেছে। জর্জ হোলবার্ট গবেষণার আগের সিদ্ধান্ত ছিল—বীজের সুস্থতা, অসুস্থতার ওপর ফসলের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এখন দেখা গেল—খারাপ বীজও চুন মেশানো মাটিতে ভাল ফসল দিতে পারে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আবার পরীক্ষা করলেন; কিন্তু ফলাফলের কোন পরিবর্তন হলো না। পরজীবী-মুক্ত শস্য থেকে যেমন প্রচুর ফসল পাওয়া যায়, ভাল জমি থেকেও তেমনি ফসল মেলে।

কিন্তু এর পরেও সমস্যা থেকে গেল। বাদামী রং কোথা থেকে আসে তার কোন উত্তর মিললো না। জর্জের মাথায় ঘুরছে কেবল শিকড়-পচা চারা গাছগুলোর কথা। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। পেনসিলভেনিয়ার পথ ধরে চলতে চলতে এক ব্যবসায়ীর দেখা পেলেন জর্জ। ব্যবসায়ী জানালো, কড়ার দোষে ভুট্টাতে তিলের মত কালো কালো ছোট ছোট দাগ পড়বার ফলে ব্যবসায়ের ভয়ানক ক্ষতি হচ্ছে। জর্জ শুধু বললেন চারা সমেত ভুট্টা গাছগুলো গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিতে। ভুট্টা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, তাতে লোহার অংশ থাকার জন্যেই কালো চিহ্ন আছে। কিন্তু তিলের মত এ কড়া দাগ কোথা থেকে পড়ল? কয়েকটা চারা গাছের ডাঁটা লম্বালম্বি চিরে ফেলে দেখতে পেলেন—গাঁটের নীচে বাদামী রঙের আভা! এ-ও কি লোহার দাগ? জর্জ সিদ্ধান্ত করলেন—মাটিতে অতিরিক্ত লোহা থাকলে ফসলের মূলে লোহা জমে যায়। ফলে 'জিবেরেলা' আক্রমণের পথ সহজ হয়ে ওঠে।

জর্জ আবার চিন্তায় পড়লেন, এই লোহার হাত থেকে ফসল কিভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারে। ইতিমধ্যে খবর এসে পড়ল যে, হুসিয়ার ষ্টেটের অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা এলাকায় ফসল ভাল হয়নি। জর্জ দিনরাত গবেষণা করে চলেছেন এই দুই মারাত্মক শত্রুর অত্যাচার থেকে দেশ-বাসীকে বাঁচানোর উপায় নির্ণয়ের জন্যে। হঠাৎ এক সূত্র পেলেন—রোড্স্ দ্বীপের অধিবাসীরা মাটিতে চুন মিশিয়ে অ্যালুমিনিয়াম দূর করে চাষের উপযোগী করে তোলে। সমস্ত ষ্টেটের মাটি নিয়ে গবেষণা সুরু হলো। অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত মাটিতে দেখা গেল—ফুসারিয়াম পরজীবী প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তারপরেই তাঁর মনে হলো অ্যালুমিনিয়ামের হাত থেকে ফস্‌ফেট রেহাই পেলে লোহার হাত থেকেও পাবে। তখনি ফসফেট মিশ্রিত মাটিতে বীজ পোতবার ব্যবস্থা হলো। ফসল ভালই হলো, তবে সমস্ত জমিতে নয়। ফসফেট পদ্ধতি কয়েক জায়গায় হতে দেখা গেল। তবে উপায়? জর্জ আবার চিন্তায় পড়লেন!

সেই সময় উত্তর ক্যারোলীনার টেরসিয়াতে ওয়াশিংটনের খাদ্যশস্য বিভাগ এক চিঠি পাঠালো জর্জের কাছে। পত্র প্রেরক জানালেন যে, সেখানকার ফসলের অবস্থা খুব খারাপ। ফুসারিয়াম পরজীবীদের এই কীর্তি বলে সবার ধারণা। জর্জ উত্তরে লিখলেন—সেখানকার কিছু মাটি আর কিছু ডাঁটা পাঠিয়ে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে

এ উপদেশও দিলেন যে, বোধহয় জমিতে সারের অভাব হচ্ছে। তাই কোথাও ফস্‌ফেট, কোথাও পটাশ ছড়িয়ে দিন। ফস্‌ফেট পদ্ধতি মনে গাঁথা ছিল; কিন্তু 'পটাশ' কথাটা অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে এলো। পত্রপ্রেরক পটাশকে কাজে লাগালেন। এদিকে মাটি পরীক্ষা করে জর্জ পেলেন লোহার প্রাচুর্য। পত্রপ্রেরককে আবার জানিয়ে দিলেন চুনের অভাবের কথা। তাঁর কথামত পত্রপ্রেরক প্রথমে ফস্‌ফেট ও চুন মাটিতে মিশিয়ে তাতে দিলেন পটাশ। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দেখতে দেখতে চারদিক ফসলে ভরে উঠল।

জর্জের এতদিনের পরিশ্রম, গবেষণা, অধ্যবসায় সফল হলো। তিনি জানালেন—লোহা আর ফুসারিয়ামকে জব্দ করতে পারে পটাশ।

জর্জের গবেষণা আর পরিশ্রম আজ হুসিয়ার স্টেটকে আনন্দে মুখরিত করে তুলেছে। সেই সঙ্গে জমি হয়ে উঠেছে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। পোকা নেই, পরজীবী নেই; নেই লোহা আর অ্যালুমিনিয়ামের প্রাচুর্য। ফসল যেন নিজের মুখেই বলতে শিখেছে—তার অসুখ ও অসুবিধার কথা। চাইতে শিখেছে লোহা আক্রমণের প্রতিষেধক। তার 'চাওয়া' আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করারও পথ নেই। প্রকৃতির দানের বিরুদ্ধে সেদিনের অভিযানের পালা-ও শেষ হয়েছে।

কিন্তু জর্জের মুখে শোনা যায়, তাঁর গবেষণা আজও শেষ হয়নি···।

"একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফল লাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ সম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখাপ্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘণ্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সেসব দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে। তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞানসমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীঅধীরকুমার রাহা

(ইতিহাস-পূর্ব যুগ)

বিজ্ঞান কি ? ইংরাজী সায়েন্স কথাটা ল্যাটিন Scire শব্দ থেকে উৎপন্ন। শব্দটির অর্থ হলো শেখা, বা জানা। কাজেই জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত সকল বিষয়কেই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ বিজ্ঞান কথাটা খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান বলতে এখন মানুষের ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কিত সুশৃঙ্খল জ্ঞান বুঝায়।

দুটি উৎস থেকে বিজ্ঞানের দুটি ধারার উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমটি হলো—ধীরে ধীরে হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি। এর ফলে মানুষের সহজ ও নিরাপদ জীবনযাত্রা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়টি হলো—সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যায় মানুষের চিন্তাধারা। প্রথম ধারাকে যন্ত্রবিদ্যা (Technology) বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের আদিযুগে এই ধারায় মানুষের সমস্যাগুলো বেশ জটিলই ছিল। বহুকাল পরে বিজ্ঞানের এই ধারাই ফলিত বিজ্ঞানের রূপ নেয়। এই দ্বিতীয় ধারা ঐতিহাসিক যুগ থেকেই বিশুদ্ধ জ্ঞানান্বেষণের পথে বেড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই ধারাটিই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণ যথাক্রমে পৃথিবীর গঠনসৌকর্য ও মৃত্তিকাস্তরের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং মানুষের শারীরিক ও সামাজিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সন্ধান দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষ ও বিজ্ঞানের আদি উৎপত্তির অনুসন্ধান পাওয়া যাবে ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদগণের প্রদত্ত আদি মানবের বিবরণীতে।

পৃথিবীর উপরিভাগ ১৬০ কোটি বছর পূর্বে কঠিন হয়ে জীবজন্তুর বাসযোগ্য হয়—এই হিসেবই আজকাল অনেকে যথার্থ বলে মনে করেন। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, ভূত্বক কঠিন হবার পর পৃথিবীতে ছয়টি অধ্যায় দেখা দেয়। (১) আগ্নেয় শিলা যুগ (Archaean) অর্থাৎ প্রস্তরীভূত তরল ধাতু গঠিত আগ্নেয় শিলার যুগ। (২) প্রথম পর্যায় প্রাথমিক প্রাণ আবির্ভাবিক যুগ (Palaeozoic), (৩) মাধ্যমিক বা মেসোজোয়িক (Mesozoic), (৪) তৃতীয় পর্যায় (Tertiary), (৫) চতুর্থ পর্যায় (Quaternary), (৬) ঐতিহাসিক যুগ। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে একটি যুগের সঙ্গে আর একটি যুগের সম্পর্ক স্থির করা যায়, ভূত্বকে প্রতি যুগের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করে। অবশ্য বছরের অঙ্কে কোন যুগেরই সঠিক দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

একদল নৃতত্ত্ববিদের মত এই যে, মানুষের হাতের কাজের নিদর্শন পাওয়া যায় তৃতীয় পর্যায়ে। এপর্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এই মতই সমর্থিত হয়। ভূত্বকে মানুষের সর্বপ্রথম চিহ্ন পাওয়া যায়, দশ লক্ষ থেকে এক কোটি বছর পূর্বে—পৃথিবীর বয়সের এটা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই সময়ে মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায় অস্ত্র বা যন্ত্রের আকারে কাটা কাচ-পাথর থেকে। ভূপৃষ্ঠে, নদীগর্ভে, মৃত্তিকা খননকালে দৈবক্রমে, প্রোথিত নগরীর খননকার্যে বা মানুষের অন্যতম আদিম বাসগৃহ—গিরিগুহায় আদিম যুগের মানুষের এই চিহ্নগুলো পাওয়া গেছে। আদিম মানবের প্রথম যুগে ব্যবহৃত

এই পাথরের হাতিয়ারগুলোর সঙ্গে প্রকৃতি-জাত পাথরের পার্থক্য খুবই কম। কোন কাচ-পাথর হয়ত দৈবক্রমে, জলের আঘাতে, বা ভূসঞ্চালনে ধারালো হয়ে অস্ত্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। আদিম মানুষ প্রথম যুগে সেইগুলোই অস্ত্র ও হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এর পরের স্তরে অর্থাৎ পেলিওলিথিক যুগে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অস্ত্র তৈরী করা সুরু করেছিল তা নিঃসন্দেহ।

অবশ্য আদিম মানবের ব্যবহৃত পাথরের অনেক অস্ত্র আদপেই মানুষের তৈরী কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই সন্দেহজনক অস্ত্র ও হাতিয়ারের কথা ছেড়ে দিলেও প্রস্তর যুগকে দুভাগে ভাগ করা যায়। পেলিওলিথিক মানুষ তার অস্ত্র শাণিত করে পশু শিকার করত; কিন্তু পশুপালন বা কৃষিকর্ম করত না। নিওলিথিক মানুষ এদের চেয়ে উন্নত ধরনের। অন্যস্থান থেকে এরা এসে পশ্চিম ইউরোপে বসতি স্থাপন করে বলে মনে হয়। এরা সঙ্গে আনে কৃষিবিদ্যা, মৃৎশিল্প, ধারালো পালিশ করা কাচ-পাথর, আগ্নেয়শিলা, হাড়, পশুর শিং ও হাতীর দাঁতের তৈরী যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার। পৃথিবীর কোন কোন অংশে নিওলিথিক মানুষ তখন ধাতুজ শিলা থেকে তাম্র নিষ্কাশন এবং টিনের সহযোগে সেই তাম্রকে কঠিন করবার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে; অর্থাৎ মানুষ তখন প্রস্তর যুগ থেকে ব্রোঞ্জ যুগে প্রবেশ করছে এবং ধাতুবিদ্যা আবিষ্কার করতে সুরু করেছে। ব্রোঞ্জ যুগের স্থান কালক্রমে গ্রহণ করে লৌহ যুগ। কারণ তখন মানুষ যুদ্ধাস্ত্র তৈরীতে লৌহের উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিল।

লৌহ যুগের প্রস্তর পরীক্ষাকালে দেখা যায়—এ স্তরের যতই উপরের দিকে যাওয়া যায়, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের সংখ্যা ও আকার-প্রকার ততই বৃদ্ধি পায়। এই সব অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধকালে বা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন কালে যোদ্ধাদের হাত থেকে খসে পড়েছিল হয়তো! সেই থেকে সেখানেই সঞ্চিত থেকে মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে। আবার প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বাসগুহাতেও এই সব অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব গুহায় কাচ-পাথর জ্বালানো আগুনের চিহ্নে মানুষের আর একটি হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে বৃক্ষলতা ও পশুপক্ষীর ধ্বংসাবশেষ থেকে ঐ স্তরে ভূপৃষ্ঠের তৎকালীন আবহাওয়া উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ বা হিমাধিক্যপূর্ণ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের পুরাকাহিনীর আদিযুগে শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার সহজ পন্থা হিসেবে মানুষ গিরিগুহায় আশ্রয় নেয়। এর ফলে তাদের পরিত্যক্ত হাতিয়ার ও তৈজসপত্র থেকে তৎকালীন মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের যাদুঘর হস্তগত হয়েছে আধুনিক মানুষের! তাছাড়া পেলিওলিথিক যুগের সূত্রপাত থেকে এই গিরিগুহা সমূহের দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রাবলী হাজার হাজার বছর পূর্বের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ও তাদের ধরন-ধারণ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করছে।

চতুর্থ পর্যায়ের সুরু থেকে শেষ হিমযুগের আগমন পর্যন্ত নিম্ন পেলিওলিথিক সভ্যতা বহু সহস্র বর্ষব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। বর্তমানের ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড নামধেয় ভূখণ্ডের মাঝে এই সময় ধীরে ধীরে মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নতি অগ্রসর হতে থাকে।

মধ্য পেলিওলিথিক যুগ সাধারণতঃ মাউস-টেরিয়ান সভ্যতা নামে অভিহিত হয়। কারণ Les Eyzies নামক স্থানের নিকটস্থ মাউসষ্টিয়ার নামক স্থানে প্রথমে এর সন্ধান পাওয়া যায়। মাউসটেরিয়ান সভ্যতার জন্মস্থানেই এই সভ্যতার বাহক নিয়েণ্ডারথাল মানুষগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মানুষগুলো নিম্নস্তরের এবং মানুষের বিবর্তনের প্রত্যক্ষ ধারা থেকে উৎপন্ন নয় বলে মনে

হয়। মাউসটেরিয়ান যুগের শীতাধিক্য মানুষকে গিরিগুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। ফলে এই গুহাসমূহে মানুষের অনেক হাতিয়ার ও অস্ত্রের সন্ধান মেলে। এগুলো থেকে বোঝা যায়, মানুষ পাথর কেটে অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছে, নিম্ন পেলিওলিথিক যুগের মানুষের মত প্রকৃতিজাত পাথরকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে না!

উচ্চ পেলিওলিথিক বা নিও অ্যানথ্রোপিক মানুষ শেষ ভয়াবহ হিম-যুগের শেষে ফ্রান্সে দেখা দেয়। যদিও এ সময়ের গিরিগুহার প্রাচীর গাত্রে বল্গা হরিণের ছবি এবং পশুর হাড় থেকে বোঝা যায় যে, আবহাওয়ার শৈত্যাধিক্য তখনও কমেনি। মানুষ হিসেবে উচ্চ পেলিওলিথিক জাতি পূর্ব-গামীদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। তারা তখন গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে শিখেছে। পশু-পাখীর হাড় শিল্পকাজে লাগাতে শিখেছে, কাচ-পাথর কাটার পদ্ধতি উন্নত করেছে। ম্যাডালে-নিয়ান ও উচ্চ পেলিওলিথিক স্তরের ভূস্তকে ছিদ্রযুক্ত সুচ, হাড়ের তৈরী দু-মুখো হার্পুন প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এইগুলো এবং অন্যান্য হাতিয়ার পূর্বগামী মানুষদের হাতিয়ারের চেয়ে অনেক উন্নত।

আদি মানবের অঙ্কিত প্রাচীনতম গুহাচিত্র-সমূহ অনেকটা এই সময়েরই। ঘোড়া, মহিষ, অধুনালুপ্ত অতিকায় ম্যামথ ও জীবজন্তুর ছবিগুলো এই স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় তৎকালীন মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের নমুনাস্বরূপ ভূত-প্রেত ও ওঝার চিত্র।

মানুষের এই বিশ্বাস সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথম ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসসমূহের সঙ্গে এগুলোর তুলনা করা চলে। আধুনিক জগতের বিভিন্ন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনও এসব ধারণা ও বিশ্বাস প্রচলিত আছে। মানুষের আদিম ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের প্রচুর নমুনা সংগ্রহ করেছেন স্যার জেম্স্ ফ্রেজার তাঁর The Golden Bough নামক পুস্তকে। রোমের সন্নিকটে আলপাইন পাহাড়ের নেমি-কাননে আদিম অধিবাসীদের ডিয়ানা নেমারে-নিসিস ও ডিয়ানা অব দি উড নামক কতকগুলো প্রথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই পুস্তকে। পৌরাণিক যুগের বহু আগে বর্বর যুগ থেকে পুরুষ পরম্পরাক্রমে এই প্রথাগুলো সেখানে পালিত হয়ে আসছে। নেমিকাননে একজন পুরোহিত-রাজা ততদিন পর্যন্তই রাজত্ব করতেন যতদিন পর্যন্ত না তার চেয়েও শক্তিশালী বা ধূর্ততর আর একজন তাকে হত্যা করে তার হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নিত।

নেমিকাননের এই অদ্ভুত প্রথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রেজারকে আদিম যুগের পৃথিবীর দীর্ঘকালীন বর্ণনা দিতে হয়েছে। যাদুবিদ্যার দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতি, ভূত, প্রেত, দেবতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, দেবতারূপে মানুষ, শস্যের উর্বরতাশক্তিদায়িনী দেবতা, শস্যমাতা, শস্যের হিতার্থে নরবলি, রাজারূপে যাদুকরের রূপান্তর, শস্যহানি নিরোধে অক্ষমতাবশতঃ বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে এসব যাদুকর রাজাদের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা উক্ত পুস্তকে স্থান পেয়েছে। এই স্তরে শিল্পই আদিম বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত হয়েছে। অনেক নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন—যাদুবিদ্যা থেকে একদিকে হয়েছে ধর্মের সৃষ্টি, আর একদিকে হয়েছে বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কিন্তু ফ্রেজার মনে করেন—যাদুবিদ্যা, ধর্ম ও বিজ্ঞান একই ধারার বিকাশের ফলাফল। নৃতত্ত্ববিদ রিভার্সের মতে, যে ভীতি ও রহস্যজড়িত চোখে আদিম বর্বর মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, তা থেকেই যাদুবিদ্যা ও ধর্মের উৎপত্তি।

এই বিশ্বপ্রকৃতির পিছনে কতকগুলো সূত্র বা মন্ত্র আছে। সঠিক কার্যপদ্ধতির দ্বারা সেই মন্ত্রকে আয়ত্ত করতে পারলে প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ

করে কাজে লাগানো যায়। যাদুবিদ্যার উৎপত্তির পশ্চাতে এই ভাবধারাই কাজ করেছে। অর্থাৎ যাদুবিদ্যা হলো প্রাকৃতিক সূত্রের ভেজাল প্রয়োগ প্রচেষ্টা। অনুকৃতি যাদুর ভিত্তি হলো—একইরূপ জিনিস সমরূপ ফলদানে সক্ষম হবে। ব্যাং ডাকলে বৃষ্টি হয়—আদিম বর্বর মানুষ তাই ব্যাঙের সাজে সজ্জিত হয়ে ব্যাং ডাকতে থাকে, অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি নামানোর জন্যে। এইরূপ আরও অসংখ্য অনুকৃতি যাদুর উল্লেখ করা যেতে পারে। স্পর্শ-যোগ যাদুর ভিত্তি হলো এই যে, কোন জিনিসের ধারণশক্তির বলে সেই জিনিসের অনুরূপ শক্তিলাভ করা যায়। কোন অদ্ভুতকর্মা মানুষের পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড ধারণের সঙ্গে ধারণকারী তার সমান শক্তি-লাভ করবে। তার দেহাংশ, কেশ বা নখ ধারণ করলে লোকে তার শক্তির অধিকারী হবে। ঐ দেহাংশের হানি ঘটালে মূল ব্যক্তিরও অমঙ্গল ঘটবে।

কিন্তু যাদুবিদ্যার প্রভাব দ্বারা যাদুকর শ্রেণীর পক্ষে মানুষের উপর আধিপত্য বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে না। কারণ শুধুমাত্র দৈবক্রমে যোগা-যোগ ঘটে' যাদুকরের তুকতাক কখনও বা ফলপ্রদ হয়, কখনও বা ব্যর্থ হয়। মনে করা গেল, এভাবে যাদুকর সত্যিকারের কোন কার্যকারণ সংগটিত করে বসল; দুখানা নুড়ি ঠুকতেই আগুন জ্বলে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল তার হাতে। এখন সে প্রকৃতই একটা সত্য আবিষ্কার করে বসেছে; কারণ নুড়ি ঠুকলেই যে আগুন জ্বলবে এই সত্যটি সে জেনে ফেলেছে। এই দিক দিয়ে যাদুকর তখন বিজ্ঞানীর পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছেন। কিন্তু যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে মন্ত্রতন্ত্র ও তুকতাক সব সময় ফলপ্রদ হয় না। না হলে অনুগামীরা তার উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে তাকে পরিত্যাগ করতে পারে, এমন কি—হত্যাও করতে পারে। এবং তা হয়তো তারা করেছেও। এভাবে হয়তো মানুষের মনে অস্পষ্ট ধারণা জন্মে—প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাই তারা তখন তাকিয়েছিল কল্পিত অজ্ঞাত প্রেতাত্মা, দৈত্য ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের ইচ্ছা পূরণের আশায়। এই ভাবেই তারা হয়তো আদিম ধর্মের সৃষ্টি করে। এই সময়ই আবার অন্যদিকে অগ্নি আবিষ্কার, পশুপালন, শস্যোৎপাদন, হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির ক্রমোন্নতি, নিঃশব্দে বিজ্ঞানের উৎসরূপে কাজ করে চলেছে। যাদুবিদ্যা, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক এক এক সময় এক একরূপ হয়েছে। এই সম্পর্ক যাই হোক না কেন, এরা যে পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত তাতে কোন সন্দেহ নেই! সুধু অজ্ঞতার প্রেইরী-ভূমিতে বিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম এবং বৃদ্ধি ঘটেনি। ঘটেছে কুসংস্কার ও যাদুবিদ্যার গহন অরণ্যে, যা বারংবার মানুষের জ্ঞানাঙ্কুর বৃদ্ধির পথরোধ করেছে।

নিওলিথিক মানুষ যে উন্নতধরনের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের পাথরের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ারে ক্রান্তিগত উদিত সূর্যমুখী প্রস্তরের ফলাকার চিহ্ন থেকে। মনে হয় এগুলো হয়তো শুধু ধর্মকর্মেই ব্যবহৃত হতো না, জ্যোতি-র্বিদ্যার চর্চায়ও লাগত।

প্রাগৈতিহাসিক কবর থেকেও অনেক মূল্যবান ও চমকপ্রদ তথ্য আহরণ করা যায়। নিওলিথিক যুগের শেষ পর্যন্ত সমাধির সন্ধান পাওয়া যায়। শবদাহ প্রথা বোধ হয় ব্রোঞ্জ যুগ থেকে প্রচলিত হয়। তাও বিশেষকরে মধ্য ইউরোপে। এখানে বনভূমি থেকে শবদাহ কার্যে কাষ্ঠ আহরণের সুযোগ ছিল। কবরের মধ্যে নিপুণ হাতে তৈরী পাথরের হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। এগুলো শুধু সমসাময়িক শিল্প নিদর্শক নয়। এথেকে বোঝা যায় যে, মৃতের কবরে অস্ত্রশস্ত্র রেখে দেওয়া হতো এই বিশ্বাসের বশে যে, এগুলো পরলোকে আত্মার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। এই বিশ্বাস তখনকার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কি প্রাগৈতিহাসিক, কি পৌরানিক, কি আধুনিক, কোন যুগের মানুষের সম্বন্ধেই খুব একটা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আরোপ করতে পারা যায় না। আদিম মানুষ যখন তার মৃত পিতাকে স্বপ্নে দেখে তখন সে কোন তর্কই তোলে না। স্বপ্নকে সে সত্য বলেই মেনে নেয় এবং তার পরলোকগত পিতাকে জীবিত বলেই মনে করে। যদিও তার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক, কিন্তু তা হলেও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার পিতার জীবনের বিনাশ ঘটেনি, হয়তো রয়েছে সে প্রেতরূপে বা সুক্ষ্ম জীবনে—এমনিভাবেই সে গ্রহণ করে স্বপ্নের ব্যাপারটিকে। প্রাকৃতিক ও আধিভৌতিকের মধ্যে পার্থক্য তার কাছে ক্ষীণ—অস্পষ্ট!

ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জ যুগের পতন হলো। সেই সঙ্গে মানব ইতিহাসের এক উন্নততর সাংস্কৃতিক অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করি। এখানে আমরা দেখতে পাই—ধাতু নির্মিত কুঠার, ছুরিকা এবং তাদৃশ অন্যবিধ অস্ত্র—বর্শা ও তরবারি এবং প্রদীপ প্রভৃতি গৃহস্থালির দ্রব্যাদি। জীবনযাত্রায় উপকরণ হিসেবে প্রস্তরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া পরিত্যাগ করেছে মানুষ তখন। লৌহ, ব্রোঞ্জের স্থান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সত্যিকারের ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করি। পাথর, মাটি, চামড়ার কাগজ ও ভূর্জপত্রে লিখিত নানাবিধ মালমসলা একত্র গ্রথিত করে ইতিহাস রচনা তখন হতে সম্ভবপর হয়।

ইতিহাসের উষা

আদিম কৃষিকর্ম, শ্রমশিল্প সহ মানুষের স্থিতিবান জীবন সুরু হয় নীল, ইউফ্রেটিস্, টাইগ্রিস, সিন্ধু প্রভৃতি বৃহৎ নদীগুলোর উপকূলে। চীনের প্রাচীন সভ্যতার উৎপত্তিও এই নদী-কূলে। নদী-কূলে এই সমাজবদ্ধ মানুষের সঙ্গে অল্প অল্প পরিচয় রেখে চলতো পশুচারক যাযাবর শ্রেণী। পশুপাল সহ তারা কূলভূমি ও মরুস্থানের মাঝে ঘুরে বেড়াত। যাযাবর সমাজ মূলত পিতৃ-রাজতান্ত্রিক। সমাজের ভিত্তি ছিল ক্রীতদাস সহ এক একটি গোটা পরিবার। সেখানে অবাধ কর্তৃত্ব ছিল পিতার। স্বাভাবিক সময়ে প্রতি যাযাবর গোষ্ঠী আহার্য ও পশুখাদ্য সন্ধানে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে আমরা যাযাবর জীবনের নিখুঁত বর্ণনা পাই:—

> এবং লটেরও ছিল পশুপাল ও তাঁবু। সেও লটের সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু সেখানে অত লোকের স্থান সঙ্কুলান হতো না। অতএব আব্রাহম লটকে বলল:—আমাদের সামনে সমগ্র পৃথিবী কি পড়ে নেই? আমি অনুনয় করছি তুমি আলাদা হয়ে যাও আমার কাছ থেকে। তুমি যদি ডানদিকে যাও আমি যাব বাঁ দিকে।

পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে বিচ্ছিন্ন থাকার মনোবৃত্তি থেকে সভ্যতা বা বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। বিচ্ছিন্ন যাযাবর শ্রেণীর পক্ষে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন হতো শুধু বন্যজন্তু শিকার বা নির্মূল সাধনে এবং অন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধকালে। কখনও হয়তো দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টিতে বা জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনে তৃণগুল্ম শুকিয়ে বনভূমি ও মরুস্থান যাযাবর শ্রেণীর বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। তখন এই যাযাবর শ্রেণীই বর্বর আক্রমণকারীরূপে দুর্বার স্রোতে ভেঙ্গে পড়ে মানুষের স্থায়ী বসতি-গুলোর উপর। আরব থেকে ইহুদীদের, পারস্যের সীমান্ত থেকে এসিরিয়ানদের, ইউরোপ ও এশিয়ার মুক্ত তৃণপ্রান্তরের অধিবাসীদের সমাজবদ্ধ মানুষের বসতির দিকে এমনি কতকগুলো গতিপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়!

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, যাযাবরদের জীবনের মধ্যে শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং ফলিত বিজ্ঞানের উৎসের সন্ধান করা বৃথা। বহুযুগ ধরে সংরক্ষিত ইহুদীদের ধর্মপুস্তক ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রথম অধ্যায়ে

যাযাবর জীবনের ছবি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী অধ্যায়ে মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, এসিরিয়া প্রভৃতি দেশসমূহে স্থিতিবান মানুষের সৃষ্ট রাজ্য সমূহের বিবরণীও পাওয়া যায়। অনেক পরে অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ, ভাস্কর্য্য, প্রস্তর ফলক এবং রাজারাজড়ার কবর খুঁড়ে ঐতিহাসিক এই অধ্যায় সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়েছে, ওল্ড টেষ্টামেন্টের এই অধ্যায় সেই জ্ঞানের মুখবন্ধরূপে কাজ করছে।

প্রস্তর যুগের শেষ অধ্যায়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরীয় জাতিদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এরা খর্বাকৃতি, লম্ব-মুণ্ড এবং কৃষ্ণকায়। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিল তা ওদেরই চেষ্টার ফল। ভূমধ্যসাগরের উপকূল ছাড়িয়ে মহাদেশের আরও অভ্যন্তরে মাঝারি দৈর্ঘ্যের কটা রঙের এবং বৃহৎ ও গোলাকার মাথার খুলিবিশিষ্ট তথাকথিত আলপাইন জাতির সন্ধান মেলে। এরা পূর্বদিক থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। তৃতীয়তঃ, বাল্টিক উপকূলে দীর্ঘকায়, সুশ্রী কেশযুক্ত, ভূমধ্যসাগরীয় জাতিসমূহের মত দীর্ঘ মুণ্ডের একটি জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরাই আর্য নামে পরিচিত।

"বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড় পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রেই মরে—ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে * * * হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা বলা যাইতে পারে। উত্তর দাতা জানাইতে চান যে, তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন * * *

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য।" অপবিজ্ঞান—রাজশেখর।

সমুদ্রের ধাতব সম্পদ

শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ

আমাদের এই পৃথিবী বহুবিধ অমূল্য সম্পদের আকর। বহুকাল থেকেই বুদ্ধিমান মানুষ এর সম্পদ সংগ্রহে ব্যগ্র ও সচেষ্ট। জৈব, অজৈব, মৌলিক ও যৌগিক নানাবিধ পদার্থের সন্ধান মানুষ পেয়েছে এবং এই সমস্ত পদার্থ আহরণ করে তার প্রয়োজন মিটিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বহু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা সমস্ত রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। পাহাড়-পর্বত, মালভূমি-সমতল, দুর্গম অরণ্য সমস্ত স্থানেই তাঁদের অভিযান চলছে অপ্রতিহত গতিতে।

কিন্তু পৃথিবীর তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। কেবল স্থলভাগের সম্পদেই মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। সেজন্যে বিজ্ঞানীরা সাগর-উপসাগর থেকে রত্নরাজি সংগ্রহের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন। সমুদ্রের জল বিশুদ্ধ নয়। পাহাড়-পর্বত বিধৌত নদী, উপনদীর জলে সমুদ্রের জলভাণ্ডার পুষ্ট। তাই বিশুদ্ধ জলের উপাদান উদজান ও অম্লজান ছাড়াও বহু মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ থাকে সমুদ্রের জলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রণালীতে দেখা গেছে যে, সমুদ্রের জলে বত্রিশ রকমের পদার্থ আছে। কিন্তু এর সবগুলোই সমপরিমাণে বিদ্যমান নেই। কোনটি বেশী, কোনটি খুব কম আছে। তাছাড়া বেশীর ভাগ পদার্থ একেবারে মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। যৌগিক পদার্থের পরিমাণই বেশী। আবার কোন জিনিস স্থল থেকে প্রস্তুত করতে হলে যে খরচ পড়ে, সমুদ্র থেকে পেতে হলে তার খরচ আরও বেশী। কাজেই যেসব জিনিসের পরিমাণ স্থলভাগে কম এবং যা প্রস্তুত করতে আর্থিক ক্ষতি হয় না, সেসব জিনিসই সমুদ্র থেকে প্রস্তুত করা হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ), ম্যাগনিসিয়াম, ব্রোমিন প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে সাফল্যলাভ হলেও আর্থিক কারণে সমুদ্র থেকে অন্য জিনিস প্রস্তুত করা এখনও সম্ভব হয়নি।

প্রথমেই ধরা যাক সাধারণ লবণের কথা। সাধারণ লবণ, যার রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড—বহু উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ছাড়া, কষ্টিক সোডা, কাঁচ, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে "লবণ পাহাড়" থাকলেও সমুদ্র থেকেই লবণ প্রস্তুত করা সহজসাধ্য। সোডিয়াম ক্লোরাইড একেবারে খাঁটি অবস্থায় সমুদ্রে থাকে না। অন্যান্য পদার্থ ছাড়া ক্যাল-সিয়াম ও ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইডই বেশী পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে মিশে থাকে। এই সব পদার্থ একেবারে আলাদা করা যায় না, তবে যতটা সম্ভব করা হয়, যাতে ঐ লবণ আমাদের খাদ্য হিসেবে কিংবা অন্যান্য শিল্পে সুবিধামত ব্যবহার করা যেতে পারে। গরম দেশে সূর্যের তাপেই সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করা হয়। বড় বড় জলাধার তৈরী করে সেগুলো সমুদ্রের জলে ভর্তি করা হয়। এরপর থাকে কেলাসন ক্ষেত্রে বা ক্রিষ্ট্যালাইজিং প্যান। জলে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ থাকে বাষ্পীভবনকালে একই সময়ে তারা দানা বাঁধে না। তাদের দ্রবণীয়তা অনুসারে দানা বাঁধে। সমুদ্রজলে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাদের মধ্যে প্রথমে দানা বাঁধে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, তারপর ক্রমে ক্যালসিয়াম সালফেট, সোডিয়াম

ক্লোরাইড, ম্যাগনিসিয়াম সালফেট প্রভৃতি। তাই বাষ্পীভবনের সময় যখন একটি কেলাসনক্ষেত্র থেকে আর একটি ক্ষেত্রে জল স্থানান্তরিত করা হয়, তখন প্রথম ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ৯৬% সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং এর সঙ্গে যেসব পদার্থ মিশে থাকে তাতে ক্যালসিয়াম সালফেটের পরিমাণই বেশী থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে থাকে ৯৪% সোডিয়াম ক্লোরাইড। এর সঙ্গে মিশে থাকে কিছু ক্যালসিয়াম সালফেট এবং বেশী পরিমাণ ম্যাগনিসিয়াম সালফেট ও ক্লোরাইড। তৃতীয় ক্ষেত্রে থাকে ৯০% সোডিয়াম ক্লোরাইড আর এর সঙ্গে থাকে বেশীর ভাগ ম্যাগনিসিয়াম লবণ ও কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম লবণ। কেলাসনের পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে লবণগুলো স্তূপীকৃত করে শুষ্ক করা হয় এবং পরে তাদের আরও বিশুদ্ধ করা হয়। এভাবে সমুদ্র থেকে সাধারণ লবণ প্রস্তুত করা হয়।

ব্রোমিন শিল্পেও বেশ সাফল্যলাভ হয়েছে। ১৪০০০ ভাগ সমুদ্রের জলে মাত্র ১ ভাগ ব্রোমিন-ঘটিত যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। ফটোগ্রাফি এবং ঔষধপত্রে এই ব্রোমিন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্র থেকেই সাধারণতঃ ব্রোমিন পাওয়া যায়। পূর্বে সমুদ্রের আগাছা পুড়িয়ে তার ছাই থেকে ব্রোমিন প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু ব্রোমিনের এক নতুন ব্যবহার উদ্ভাবিত হওয়ায় এর প্রয়োজন আরও বেড়ে যায় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ব্রোমিন প্রস্তুতের চেষ্টা চলতে থাকে। ১৯২০ সালে আবিষ্কৃত হয় যে, টেট্রা ইথাইল লেড্ $[(C_3H_5)_4P^b]$ ইথিলিন ডাইব্রোমাইডে ($C_2H_4Br_2$) দ্রবণীয়। এর পূর্বে মিজ্‌লে দেখিয়েছিলেন যে, এই টেট্রা ইথাইল লেড্ দ্বারা পেট্রোল ইঞ্জিনে 'নকিং' বা ধাক্কা নিবারণ করা যায়। প্রথমে এই বস্তুটিকে আয়োডিনে দ্রবীভূত করে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু প্রয়োজনানুসারে আয়োডিনের পরিমাণ নগণ্য। এরপর সমুদ্র থেকে বেশী পরিমাণে এবং সুবিধামত ব্রোমিন সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন রসায়নবিদ্ ও রাসায়নিক কারখানা সচেষ্ট হয়ে উঠল। সবচেয়ে অগ্রণী হয় Dow Chemical Company। তথ্যের দিক দিয়ে ব্রোমিন নিষ্কাশন খুব সহজ মনে হয়। বড় বড় জলাধারে সমুদ্রের জল জমা করে তাতে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করতে হবে। ক্লোরিন ব্রোমিনঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ থেকে ব্রোমিন নিষ্কাশিত করে। এই ব্রোমিন সমুদ্রের বাতাসে তাড়িত হয়ে কোন ক্ষারে জমা হবে। কিন্তু কার্যতঃ এই তথ্যানুযায়ী ব্রোমিন প্রস্তুত করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিডও ব্যবহার করতে হবে, যাতে সমুদ্র-জলের ক্ষারাংশ নষ্ট হয়ে যায়। নানারকম গবেষণার পর যখন দেখা গেল, তথ্যানুযায়ী ব্রোমিন প্রস্তুত করা সম্ভব তখন সমুদ্রের ধারে যেখানে সমুদ্রের জলে ব্রোমিনের পরিমাণ বেশী, সেখানে কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হলো। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলিনাতে Dow Chemical Company-র বিশেষজ্ঞেরা একটি কারখানা নির্মাণ করলেন। এখানে সমুদ্রের জল থেকে ব্রোমিন প্রস্তুতের পর সেই জল পুনরায় কারখানার মধ্যে না এসে সমুদ্রের স্রোতে অন্যদিকে চলে যায়। প্রতিদিন যাতে ৫০০ পাউণ্ড ব্রোমিন পাওয়া যায় প্রথমে সেরূপ কারখানা নির্মাণ করা হয়। ১৯৩৩ সালে প্রতিদিন ৬০,০০০,০০০ গ্যালন জল থেকে ব্রোমিন প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। এখন টেক্সাসের ভেলাস্‌কো নামক স্থানে Ethyl Dow Chemical Company প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন ডাইব্রোমাইড প্রস্তুত করছে। এটিই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কারখানা।

সমুদ্র থেকে ম্যাগনেসিয়াম উত্তোলনের কাহিনী অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিগত মহাযুদ্ধের ফলেই এই শিল্প সাফল্যলাভ করেছে। ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত হাল্কা ধাতু। যুদ্ধের নানারকম সাজ-সরঞ্জামে এর ব্যবহার অনেক জাতিই জানত; কিন্তু প্রথমে কেবল

জার্মানরাই এই হাল্কা ধাতু দিয়ে উড়োজাহাজের বিভিন্ন অংশ তৈরী করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কতকগুলো প্লেনকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সামরিক বিশেষজ্ঞেরা এর ভিতর প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ামের সন্ধান পান। এইভাবে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই বিশেষ হাল্কা ধাতুর দিকে আকৃষ্ট হয়। জার্মানরা কেবল বোমারু প্লেনেই যে ম্যাগনেশিয়াম ব্যবহার করেছিল তা নয়, পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, তারা ট্যাঙ্ক এবং বন্দুকেও এই ধাতু ব্যবহার করেছে। তখন আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড এই ধাতুকে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই ধাতুর জন্যে তারা আমদানীর উপর নির্ভর করতো। ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ায় সমুদ্র থেকে এই বস্তুটি সংগ্রহ করবার চেষ্টা চলতে লাগল, যার ফলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় কতকগুলো কারখানা নির্মিত হয়। ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলোতে এখন প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম তৈরী হচ্ছে, যার পরিমাণ নাকি—যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে যত ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যেত তার চেয়েও বেশী। আমেরিকায়ও মিচিগানের কারখানা ছাড়া Dow Chemical Company-র উদ্যোগে টেক্সাসের ফ্রিপোর্ট নামক স্থানে এক বিরাট কারখানা তৈরী হয়েছে এবং সেখানে ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুত হচ্ছে।

সমুদ্রে ম্যাগনেসিয়াম সাধারণতঃ মৌলিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এবং কিছু পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট প্রভৃতি যৌগিক পদার্থের আকারেই ইহা থাকে। ৮০০-১,০০০ ভাগ সমুদ্রের জলে এক ভাগ ম্যাগনিসিয়াম থাকে। ম্যাগনেসিয়ামঘটিত যৌগিক পদার্থগুলো সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়ামঘটিত যৌগিক পদার্থের সঙ্গে মিশে থাকে। সাধারণ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া দ্বারা এসব জিনিস পৃথক করা যায় না। সমুদ্রের জলে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইডকে ম্যাগনিসাম হাইড্রক্সাইড করা হয়। এই জিনিসটি জলে অদ্রবণীয় হওয়ায় নীচে জমা হয়। তারপর পরিস্রবণ প্রক্রিয়া দ্বারা ম্যাগনিসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে জল থেকে পৃথক করা হয়। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সমুদ্রের জলের সঙ্গে চলে যায়। ম্যাগনিসিয়াম হাইড্রক্সাইডকে শুষ্ক করে জালিয়ে দেওয়া হয় এবং ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। ম্যাগনিসিয়াম অক্সাইডকে আবার ক্লোরিন দিয়ে ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইড করা হয় এবং ইলেক্‌ট্রোলাইসিস বা বিদ্যুৎ-প্রকরণ দ্বারা ম্যাগনিসিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে বিদ্যুৎ-প্রকরণ দ্বারা ক্লোরিন তৈরী করে মজুত রাখা হয়, যাতে সহজেই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডকে ম্যাগনিসিয়াম ক্লোরাইডে রূপান্তরিত করা যায়। এইভাবে সমুদ্র থেকে ম্যাগনিসিয়াম তৈরী করা হয়। যেখানেই হাল্কা এবং মজবুত জিনিসের প্রয়োজন সেখানেই এই ধাতুকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে। তাই সমুদ্র থেকে ম্যাগনিসিয়াম পাওয়ার ফলে আধুনিক জগৎ অশেষ উপকৃত হয়েছে।

পূর্বে কেবল সমুদ্র থেকেই আয়োডিন পাওয়া যেত। সমুদ্রের আগাছা পুড়িয়ে তার ছাই থেকে আয়োডিন প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু আজকাল স্থলভাগে সহজেই আয়োডিন পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে এই জিনিস আর সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে না।

সোনার মত মূল্যবান ধাতুও সমুদ্রে আছে। সমুদ্র থেকে সোনা প্রস্তুতে ব্যবসায়িক সাফল্য এখনও হয়নি; কিন্তু ইতিমধ্যেই চেষ্টা হয়েছে এবং কিছু পরিমাণে সোনা পাওয়াও গেছে। তথ্যের দিক দিয়ে মনে হয় যে, সমুদ্রের জল যখন বিভিন্ন পদার্থের দ্রবণ ছাড়া আর কিছুই নয় তখন বিদ্যুৎ-প্রকরণের দ্বারা সহজেই ঋণাত্মক প্লেটে সোনা সঞ্চিত করা যেতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সোনা অত সহজে ঋণাত্মক প্লেটে সঞ্চিত হয় না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফিঙ্ক ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক প্লেটের ব্যবস্থা করেন। এর দ্বারা তিনি সোনা সঞ্চিত করতে সক্ষম হন। অনেকে অনেক রকম উপায় উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু স্বর্ণ সঞ্চয়ন শিল্পে এখনও তেমন সাফল্যলাভ হয়নি। এই বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং চলবেও। সোনার মত মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহে মানুষের চেষ্টার কি আর অন্ত থাকবে? এই সমস্ত সম্পদ সমুদ্র থেকে আহরণ করতে পারলে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সমুদ্রের "রত্নাকর" নামও সার্থকতা লাভ করবে।

বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

আবহাওয়া বলিতে আমরা বুঝি দৈনিক কোনস্থানের বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের শতকরা হার, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বায়ুর চাপ, গতি ও বেগ* প্রভৃতি নির্দেশক অবস্থা এবং সেই আবহাওয়ার ত্রিশ বৎসরের গড়কে আমরা সেইস্থানের জলবায়ু বলি। আবহাওয়ার অবিরত পরিবর্তন হইলেও, জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয় না।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গাছের গুঁড়ির কর্তিতাংশ, বিবিধ জীবাশ্ম প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্তমানে আমরা যে জলবায়ু উপভোগ করি তাহা চিরদিন এইরূপ ছিল না; বিভিন্ন যুগে ভূপৃষ্ঠের যে বিবিধ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, জলবায়ুর উপর তাহার প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এই পরিবর্তন অতি ধীরে অবিরত চলিয়াছে। এমন কি অনেকে আশঙ্কা করেন যে, বহুযুগ পরে পৃথিবীতে আবার হয়ত "তুষার যুগ" ফিরিয়া আসিতে পারে। অতীতে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে যে সকল কার্য-কারণ বিদ্যমান ছিল, বর্তমানেও সেই সকল কারণগুলির প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জলবায়ুনিয়ন্ত্রণকারী কারণগুলির সমবেত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ জলবায়ু নিরূপিত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধানতঃ কোনস্থানের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে—

অক্ষাংশ—পৃথিবীর মেরুরেখা সর্বদা একই মুখে অর্থাৎ ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া কক্ষ-তলের ৬৬½° কোণ করিয়া সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলিয়া দিনরাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয় ও সূর্যরশ্মি পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে পতিত হয় না; গ্রীষ্মমণ্ডলে কখনও সামান্য তির্যকভাবে, কখনও লম্বভাবে এবং অন্যান্য অংশে কম বা বেশী তির্যকভাবে পতিত হয়। ইহার জন্য সূর্যরশ্মির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সূর্যরশ্মি লম্বভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইলে তাহার

---

* বায়ুর বেগ নিরূপক এই মাপটি অ্যাডমিরাল বোফোর্ট ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করায়, তাঁহারই নামানুসারে ইহার বোফোর্ট স্কেল নামকরণ হইয়াছে।

বোফোর্ট সংখ্যা	ভূমি হইতে ত্রিশ ফুট উচ্চে বায়ুর বেগ প্রতি ঘণ্টায়
০	০ হইতে ১
১	১ — ৩
২	৪ — ৭
৩	৮ — ১২
৪	১৩ — ১৮
৫	১৯ — ২৪
৬	২৫ — ৩১
৭	০২ — ৩৮
৮	৩৯ — ৪৬
৯	৪৭ — ৫৪
১০	৫৫ — ৬৩
১১	৬৪ — ৭৫
১২	৭৫ — অধিক

বায়ুর প্রকৃতি

শান্ত. ধূম সোজা ঊর্ধ্বগামী হয়,	
সামান্য প্রবাহ,	
মৃদুমন্দ বায়ু	
মন্দ বায়ু	
সামান্য প্রবাহ,	ধূলাবালি ঊর্ধ্বে
মধ্যম প্রবাহ	উত্থিত হয়, গাছের
প্রবল বায়ু	ছোট শাখা সঞ্চালিত হয়
সামান্য ঝটিকা	
মধ্যম ঝটিকা	
প্রবল ঝটিকা	
অতি প্রবল ঝটিকা, বৃক্ষ উন্মুলিত হয়	
প্রবলতম ঝটিকা	
হারিকেন	

তীব্রতা যত অধিক হয়, তির্যকভাবে পতিত সূর্য-রশ্মির সে তীব্রতা থাকে না। কারণ লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি অপেক্ষা তির্যকভাবে পতিত সূর্য-রশ্মিকে অধিক বায়ু ভেদ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে আসিতে হয়। সেজন্য নিরক্ষরেখা হইতে যত উত্তর বা দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায়, তাপও ততই কম হয়। এক সমুদ্রতলে অবস্থিত হইলে নিরক্ষরেখা হইতে প্রতি ১° অক্ষাংশের দূরত্বে উষ্ণতা ০·৫° কমে। পৃথিবীর মেরুরেখা ও কক্ষতলের অন্তর্গত কোণ প্রতি ১৫৮৮ ও বৎসরে ৬৬$\frac{১}{২}$° হইতে কমিয়া ৫৫০ হওয়ায় এবং পরবর্তী ১৫০৮৩ বৎসরে ৫৫° হইতে বর্ধিত হইয়া ৬৬$\frac{১}{২}$° হওয়ায়, পৃথিবীর তাপমণ্ডলেরও অনুরূপ পরিবর্তন হয়। মাদ্রাজের (১৩০৪১ উ: অ:) গড় উষ্ণতা ৮১°, করাচীর (২৫° উ: অ:) গড় উষ্ণতা ৭৬°।

উচ্চতা—প্রাকৃতিক নানা কারণে ভূ-ত্বক্ অবিরত পরিবর্তিত হইতেছে। এক সময়ে যে স্থানে সমুদ্র গর্জন করিত, বর্তমানে সেখানে তুষার ধবল হিমালয় পর্বত উন্নত হইয়াছে; সেই জন্য ভূ-ত্বকের পরিবর্তনের সঙ্গে ঐ স্থানের জলবায়ুরও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্বে যেখানে ছিল সমুদ্রের প্রভাবে সমভাবাপন্ন জলবায়ু, এখন সেখানে পার্বত্যপ্রদেশের শীতল জলবায়ু। বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের তাপ সংরক্ষণ করে। যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, বায়ুর ঘনত্ব তত কম হয় এবং তাহার তাপ সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতাও কমে। ফলে উচ্চস্থান অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। দেখা গিয়াছে, গড়ে প্রত্যেক ৩০০ ফিট উচ্চতায় এক ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতা কমে। কোনস্থান নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত হইলেও যদি ইহার উচ্চতা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই স্থানের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম হইবে। দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়াডর প্রদেশের রাজধানী কুইটো নিরক্ষরেখার উপর আণ্ডিজ পর্বতের ৯৩৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বলিয়া এখানে চিরবসন্ত বিরাজিত। দার্জিলিং শিলিগুড়ির মাত্র এক ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ ব্যবধানে অবস্থিত; কিন্তু শিলিগুড়ি হিমালয়ের পাদদেশে এবং দার্জিলিং ৭০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত বলিয়া দার্জিলিং-এর উষ্ণতা শিলিগুড়ি অপেক্ষা গড়ে ২০ ডিগ্রী ফারেন-হাইট কম। নিরক্ষরেখার উপর অবস্থিত আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের শিখরদেশ তুষারাবৃত। এই যে উচ্চতার জন্য উষ্ণতার হ্রাস, ইহার জন্য বাষ্পীভবনও কম হয়। ফলে উষ্ণতা হ্রাস করিতে ইহা আরও সাহায্য করে বলিয়া মনে হয়।

সমুদ্র হইতে দূরত্ব—শীতগ্রীষ্মে সমুদ্রের উপকূল-বর্তীস্থান ও সমুদ্রের জলে তাপের বৈষম্য হেতু পূর্ব আলোচিত সমুদ্র ও স্থল বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের উপকূলবর্তী স্থানসমূহে ও দ্বীপে শীতগ্রীষ্মে তাপের বিশেষ বৈষম্য লক্ষিত হয় না। এইরূপ জলবায়ু সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ; ইহাকে সমভাবাপন্ন বা সামুদ্রিক জলবায়ু বলা হয়। নিম্ন অক্ষাংশে অর্থাৎ নিরক্ষরেখা হইতে অনতিদূরে অবস্থিত হইলেও সমুদ্র-সান্নিধ্যহেতু মাদ্রাজের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। সমুদ্র হইতে দূরবর্তী স্থানের অর্থাৎ মহাদেশীয় জলবায়ু সাধারণতঃ শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই চরম, কারণ এই সকল স্থান সমুদ্রের প্রভাবমুক্ত। করাচীর জলবায়ু সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত লক্ষ্মৌ বা আগ্রা হইতে শীতলতর। এশিয়ার অভ্যন্তরে অধিকাংশ স্থান সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া তাহারা সমুদ্রের প্রভাবমুক্ত; সেই জন্য সেখানে গ্রীষ্মে উষ্ণতা ও শীতে শৈত্য বেশী হয়। মধ্য কানাডার প্রেয়ারী অঞ্চল, রুশিয়া ও সাইবেরিয়ার দক্ষিণাংশের ষ্টেপভূমি প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ মহাদেশীয় জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

সমুদ্র-স্রোত—জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সমুদ্র-স্রোতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ সমুদ্রস্রোত যে সকল দেশের উপকূল বাহিয়া প্রবাহিত হয়, সেই সকল দেশের জলবায়ু অপেক্ষা-কৃত উষ্ণ হয় এবং উষ্ণস্রোতের উপর দিয়া প্রবাহিত

বায়ুও অধিক জলীয় বাষ্প গ্রহণে সক্ষম হয় ও উষ্ণ স্রোতের পার্শ্ববর্তী দেশে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। আবার সুমেরু বা কুমেরু হইতে প্রবাহিত শীতল স্রোত পার্শ্ববর্তী দেশের জলবায়ুকে অপেক্ষাকৃত শীতল করে। এই সমুদ্রস্রোতের জন্য একই মহাদেশের দুই পার্শ্বের উষ্ণতা বিভিন্ন। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের এক শাখা প্রবাহিত হওয়ায় বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম পার্শ্ব অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ঐ স্রোতই নরওয়ের ফিয়র্ডগুলিকে শীতকালেও বরফ-মুক্ত রাখে। ল্যাব্রাডরের উপকূল দিয়া শীতল সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় উপকূলে বরফ জমে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া শীতল হামবোল্ড স্রোত ও পূর্ব পার্শ্ব দিয়া উষ্ণ ব্রেজিল স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় ঐ মহাদেশের উভয় পার্শ্বে উষ্ণতার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের মিলনস্থলে উষ্ণতার তারতম্যের ফলে ল্যাব্রাডর উপকূলে হ্যারিকেন ও জাপান উপকূলে টাইফুন নামক ঝড় হয়।

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত—ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা গ্রীষ্মমণ্ডল সূর্যকিরণে অধিক উত্তপ্ত হয়। এই উত্তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে অসহ্য না হয় বা মেরু অঞ্চল তাপের অভাবে অধিকতর শীতল না হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাপ-সাম্য রক্ষার্থেই যেন এই বায়ুপ্রবাহ অবিরত নির্দিষ্ট নিয়মে চলিয়াছে। বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে উষ্ণ স্থানের উপর দিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইলে সেইস্থান শীতল হয় এবং শীতল স্থানের উপর দিয়া উষ্ণ বায়ু বহিয়া তাপ বৃদ্ধি করে। বায়ু প্রবাহ বৃষ্টিধারার নিয়ামক। সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত সজল বায়ুতে বৃষ্টিপাত হইয়া নানাস্থানের তাপ হ্রাস করে। একই অক্ষাংশে অবস্থিত হইলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধিতে দুইটি স্থানের তাপের তারতম্য দেখা যায়। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ দেশের বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাপ-সাম্য রক্ষা করে। সজল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতবর্ষে প্রচুর বৃষ্টিদান করায় গ্রীষ্মমণ্ডলের অন্তর্গত ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান খুব বেশী উত্তপ্ত হইতে পারে না। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু দেশের পূর্বাংশে বৃষ্টিপাত করায় পশ্চিমাংশ বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে প্রত্যায়ন বায়ু দেশের পশ্চিমাংশে বৃষ্টিপাত করায় পূর্বাংশে বৃষ্টিহীন মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

পর্বত সংস্থান—মহাদেশের মধ্যদিয়া পর্বত-শ্রেণী মেরুদণ্ডের ন্যায় বিস্তৃত; ইহার উভয় পার্শ্বে ভূমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত প্রসারিত। এই পার্বত্য মেরুদণ্ড দেশের বৃষ্টিপাত তথা জলবায়ু এবং প্রধান প্রধান নদীগুলির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবাহপথে এইরূপ পর্বতে বাধা পাইয়া বায়ুপ্রবাহ বৃষ্টিপাত করে। ইউরেশিয়ার এই মেরুদণ্ড এশিয়ার উত্তর-পূর্বে কামচাট্‌কা হইতে স্পেনের উত্তরে পীরেনীজ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় যথাক্রমে রকি ও অ্যাণ্ডিজ, আফ্রিকার মধ্যাংশে দক্ষিণ-পূর্বের বিস্তীর্ণ মালভূমি, অষ্ট্রেলিয়ায় গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ—এইরূপ মেরুদণ্ডের ন্যায় বিরাজিত। নদীগুলির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া এইরূপ পার্বত্য মেরুদণ্ডকে জলবিভাজিকা বলে। ইহা ব্যতীত উত্তর আমেরিকার অ্যাপেলিসিয়ান পর্বত, নরওয়ে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পর্বত প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গৌণ জলবিভাজিকা আছে।

এই জলবিভাজিকাগুলি কি ভাবে মহাদেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে তাহাই আলোচ্য। আটলাণ্টিক মহাসাগরের সজল পশ্চিমী বায়ু ইউরোপের পর্বতে প্রতিহত হইয়া সেখানে বৃষ্টি-পাত করে। শীতকালে বায়ুবলয়গুলি দক্ষিণে সরিয়া গেলে আল্পস পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে ঐ পশ্চিমী বায়ু প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয়ের দক্ষিণাংশে আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু

বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত করে। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয়ের অস্তিত্ব না থাকিলে উত্তরের শীতল বাতাস দেশের অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বৃষ্টির অভাবে ভারতবর্ষ হয়ত মরুসদৃশ অনুর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইত। উত্তরে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কোন পর্বত না থাকায় উত্তর আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর মোহনার জল জমিয়া বরফ হইলেও একই অক্ষাংশে অবস্থিত পাটনায় গঙ্গার জল কখনও জমিয়া যায় না। রকি পর্বতের পশ্চিমাংশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সজল পশ্চিমী বায়ু প্রচুর বৃষ্টিপাত করিলেও পূর্বাংশে মাত্র ২০" বৃষ্টিপাত হয়। এইরূপে সমস্ত মহাদেশেই পার্বত্য মেরুদণ্ড বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে।

ভূমির ঢাল—একই অক্ষাংশে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের ভূমির ঢাল অনুসারে সূর্যকিরণ পতিত হয় ও ভূমি উত্তপ্ত করে। নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত ভূ-ভাগের ঢাল যদি দক্ষিণে হয়, তাহা হইলে সূর্যকিরণ কতকটা লম্বভাবে পড়িয়া সেইস্থানকে যে পরিমাণে উত্তপ্ত করে ইহার বিপরীত পার্শ্বকে সেই পরিমাণ উত্তপ্ত করিতে পারে না। এই জন্য একই ভূমির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে তাপবৈষম্য দেখা যায়। এই কারণে হিমালয় ও আল্পস পর্বতের উত্তর পার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব অধিক সূর্যকিরণ পায় বলিয়া উহাদের দক্ষিণাংশে বৃক্ষাদি অধিক জন্মে। সাইবেরিয়ার ভূমি উত্তরে ঢালু বলিয়া কম সূর্যোত্তাপ পায়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত ভূমির ঢাল উত্তরে অর্থাৎ নিরক্ষরেখার দিকে হইলে সূর্যকিরণ অধিক পায়। কিন্তু ভূমির ঢাল দক্ষিণ দিকে হইলে সূর্যকিরণ অধিকতর তির্যকভাবে পতিত হওয়ায় সূর্যকিরণ কম পায়। রকি ও অ্যাণ্ডিজের ন্যায় উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতের ঢাল পূর্ব ও পশ্চিমে হওয়ায় যথাক্রমে প্রাতে ও বৈকালে সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হয়। ফলে দিবাভাগের একই সময়ে পর্বতের দুই পার্শ্বে তাপবৈষম্য লক্ষিত হয়।

ভূমির উপাদান ও অরণ্যের অবস্থান—ভূমির উপাদান ও অরণ্যের অবস্থানের উপরও দেশের জলবায়ু কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। পাললিক শিলাগঠিত ভূমি বৃষ্টির জল ধারণ করিয়া অধিক দিন আর্দ্র থাকে, সেইজন্য ঐরূপ ভূমি অধিক শীতল বা উষ্ণ হইতে পারে না; কিন্তু বালুকা বা প্রস্তরময় ভূমি জলধারণক্ষম নহে বলিয়া ইহারা সহজেই উষ্ণ বা শীতল হয়। এই কারণে পাললিক শিলাময় স্থানে দিন-রাত্রি বা শীত-গ্রীষ্মে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি খুব বেশী না হইলেও বালুকা বা প্রস্তরময় প্রদেশে তাপের এই প্রসারতা খুব বেশী। গঙ্গার অববাহিকা পাললিক শিলায় গঠিত বলিয়া এই অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মে তাপের বিশেষ পার্থক্য নাই। কিন্তু রাজপুতনার মরুভূমিতে কেবল শীত-গ্রীষ্মে নয়, এমন কি দিন-রাত্রির মধ্যেও তাপের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

গভীর অরণ্যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া সেইস্থানে ভূমি আর্দ্র থাকে এবং বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। অনেকে অনুমান করেন, বঙ্গদেশের দক্ষিণে সুন্দরবনের অবস্থিতি, এইস্থানে বৃষ্টিপাতের সহায়ক। ইহার কতক অংশ পরিষ্কৃত হওয়ায় বঙ্গদেশে না কি বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়াছে। পেশোয়ারের অরণ্যের অনেক অংশ নষ্ট করিয়া ফেলায় সেইস্থান এখন শুষ্ক অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

সৌর-কলঙ্ক ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত—উক্ত কারণগুলি ব্যতীত সৌরকলঙ্ক ও আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জন্যও বায়ুমণ্ডলীয় তাপের হ্রাসবৃদ্ধিতে পৃথিবীর জলবায়ু কিয়ৎ-পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। প্রতি এগার বৎসর অন্তর সৌরকলঙ্কগুলি বৃদ্ধি পায়। সেই সময় এই তাপের সর্বোচ্চ পরিবর্তন মাত্র এক ডিগ্রী হয়।

এই তাপমাত্রা অতি সামান্য হইলেও শস্যক্ষেত্র-গুলির সীমা উত্তর গোলার্ধে উত্তরে ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণে কিছু বর্ধিত হয়। এমন কি মরিসাস দ্বীপের ইক্ষুক্ষেত্রে ইহার প্রভাব বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ধূলিকণা, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন থাকায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে শৈত্য অধিক হয় ও বিভিন্ন স্থানে কয়েক-দিন ব্যাপী তুষারপাত হইতে দেখা যায়। নিয়মিত সময় অন্তে সৌরকলঙ্কগুলি বৃদ্ধি পায় বলিয়া জলবায়ুর যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব।

উপরোক্ত জলবায়ুনিয়ন্ত্রণকারী কারণগুলির সমাবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু দেখা যায় তদনুসারে পৃথিবীকে কয়েকটি জলবায়ু-মণ্ডলে বিভক্ত করা যায়। কোন স্থানের জলবায়ু প্রধানতঃ সেই স্থানের বৃক্ষাদি ও ইতর প্রাণীর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

পৃথিবীর জলবায়ু মণ্ডল

	নাম	সীমা	প্রকৃতি	উদ্ভিজ্জ	প্রাণী
১।	নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু	নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত—কঙ্গো, আমাজন নদীর অববাহিকা, আফ্রিকার গিনি উপকূল, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কেনিয়া, অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরভাগ এই অঞ্চলের অন্তর্গত।	গড় উষ্ণতা ৭৮°-৮০°, গড় বৃষ্টিপাত ৭৮" ৮০" বায়ু সর্বদাই উষ্ণ ও আর্দ্র।	চির হরিৎ অরণ্যে আবলুস, মেহগিনি, রবার প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।	অরণ্যে বানর, পক্ষী, সর্প, অরণ্যের পার্শ্ববর্তী প্রদেশে সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, গরিলা, বনমানুষ প্রভৃতি জন্তু দেখা যায়।
২।	গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বা সুদানীয় জলবায়ু	আমাজন অববাহিকার নিম্নভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা. ব্রেজিল, আফ্রিকার সুদান।	এই সকল স্থানে শুষ্ক অত্যুষ্ণ গ্রীষ্ম, আর্দ্র গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টিহীন শুষ্ক শীতকাল, এই তিনটি ঋতু।	অধিক বৃষ্টির স্থানে নিবিড় অরণ্য, আর্দ্র গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ তৃণ জন্মে এবং শুষ্ক গ্রীষ্মকালে তাহারা শুকাইয়া যায়। ভুট্টা, বাজরা, চীনাবাদাম, তুলা প্রভৃতির চাষ হয়।	শাভানা নামক তৃণ ভূমিতে জিরাফ, জেব্রা, অশ্ব, হরিণ প্রভৃতি বাস করে।
৩।	মৌসুমী জলবায়ু	২০°-৪০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত—ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান, দক্ষিণ	শীতকাল নাতিশীতল ও শুষ্ক আর্দ্র গ্রীষ্মকাল।	পতনশীল বৃক্ষের অরণ্য— শাল, সেগুণ, চন্দন,	নিরক্ষীয় ও গ্রীষ্ম-মণ্ডলের সকল প্রকার

	নাম	সীমা	প্রকৃতি	উদ্ভিজ্জ	প্রাণী
		চীন, ব্রহ্মদেশ, উত্তর পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া।		মেহগিনি এবং আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বাঁশ প্রভৃতি জন্মায়। ধান, গম, ভুট্টা, তুলা, চা, তৈল-বীজ, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়।	জীবজন্তুই দেখা যায়।
৪।	ক্রান্তীয় উষ্ণ মরুদেশীয় জলবায়ু	ক্রান্তীয় উচ্চচাপ মণ্ডলের ২০°-৩০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মরুভূমি —সাহারা, থর, আরবের মরুভূমি, মেক্সিকো ও অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, কালাহারী ও আটাকামা মরুভূমি প্রভৃতি।	বৃষ্টি বিরল ও উষ্ণ; চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু	ফণীমনসা জাতীয় শাঁসাল কাণ্ড ও পত্রযুক্ত গাছ, ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ; মরুদ্যানে খেজুর গাছ জন্মায় ও চাষ হয়।	মরুভূমিতে উট দেখা যায়, পার্শ্বের তৃণ-ভূমিতে অশ্ব, গর্দভ, মেষ প্রভৃতি পালিত হয়।
৫।	নাতিশীতোষ্ণ মরুদেশীয় জলবায়ু	কোলারডো ও পাটাগোনিয়ার মরুভূমি, পারস্য ও ইরাণের মরুভূমি, গোবী মরুভূমি।	শীতকাল অত্যন্ত শীতল, গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।		
৬।	ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু	৩০°-৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত—উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মধ্যাংশ, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলে এইরূপ জলবায়ু।	শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়; গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা ৭৫° এবং শীতকালে ৫০°।	আঙ্গুর, জলপাই, কমলালেবু প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল, গম, ভুট্টা, তুলা, ধান প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য।	নেকড়ে বাঘ ব্যতীত কোন হিংস্র জন্তু দেখা যায় না।
৭।	গ্রীষ্মপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু	গ্রীষ্মমণ্ডলের বাহিরে মহাদেশগুলির পূর্বে চীন, জাপান, পূর্ব অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ।	মৌসুমী দেশ অপেক্ষা বৃষ্টি কম। গ্রীষ্মে বৃষ্টি ও শীতকালে শুষ্ক।	দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের অরণ্য, ধান্য, তুলা ও গম কৃষিজ।	অনেকটা মৌসুমী অঞ্চলের ন্যায়।

	নাম	সীমা	প্রকৃতি	উদ্ভিজ্জ	প্রাণী
৮।	শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু	উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর ফ্রান্স, জার্মানী, পশ্চিম কানাডা, চিলির দক্ষিণাংশ, তাসমানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড।	পশ্চিমী বায়ু প্রবাহে সারা বৎসরই বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মে উষ্ণতা ও শীতে শৈত্য কম; জলবায়ু সমভাবাপন্ন।	পতনশীল পত্রযুক্ত ওক, এল্ম, বীচ প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য। বার্লি, ওট, গম, রাই প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য।	বন্য জন্তুদের মধ্যে নেকড়ে বাঘ ও হায়না, গৃহপালিত মেষ, গো-মহিষাদি দেখা যায়।
৯।	নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু	মধ্য আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল, ইউরেশিয়ার উত্তরে ষ্টেপভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার সম্পাস তৃণভূমি, অষ্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি।	শীত ও গ্রীষ্ম চরম। গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এইরূপ জলবায়ুকে "মহাদেশীয় জলবায়ু" বলে।	তৃণভূমিই প্রধান, আমেরিকায় স্থানে স্থানে গম চাষ হয়।	তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীর আবাস স্থল।
১০।	শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু	তুন্দ্রা অঞ্চল ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যবর্তী ইউরেশিয়া ও আমেরিকার উত্তরাংশ ব্যাপী এই জলবায়ু।	শীত প্রবল। বৃষ্টিপাত হয় না। তুষারপাত হয়।	সরলবর্গীয় পত্রযুক্ত চিরহরিৎ অরণ্য। কৃষিকার্য খুব সামান্য।	সেবল, আমিন, প্রভৃতি লোমশ পশু পাওয়া যায়। ইহাদের পুরুলোম পরিচ্ছদে ব্যবহৃত হয়।
১১।	মেরুদেশীয় জলবায়ু	তুন্দ্রা অঞ্চল	বৎসরে নয় মাস বরফাচ্ছন্ন শীতকাল। গ্রীষ্মকাল মাত্র তিনমাস, কিন্তু উষ্ণতা খুবই কম।	এই অঞ্চলে কৃষিকার্য হয় না; গ্রীষ্মকালে গুল্ম ও শৈবাল জন্মে।	তিমি, শীল মৎস্য, শ্বেত ভল্লুক ও বল্গা হরিণ।
১২।	পার্বত্য জলবায়ু	হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি উচ্চ পর্বতের জলবায়ুর এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।	পর্বতের যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, বায়ু তত লঘু হয়। সেইজন্য পর্বতের পাদদেশ হইতে শিখরে উঠিতে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা	পাদদেশে তরাই অঞ্চলে গভীর বন; ক্রমে যত উচ্চে উঠা যায়, ছোট ছোট গাছ, তৃণজাতীয় উদ্ভিদ ঝাউ ও পাইন জাতীয় বৃক্ষ ও	হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, হরিণ, সর্প, বন্য ছাগ প্রভৃতি।

নাম	সীমা	প্রকৃতি	উদ্ভিজ্জ	প্রাণী
		যায়; যেমন অনু-ভূত হয় নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে মেরু প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইলে। হিমরেখার * উত্তরে চিরতুষার বিরাজিত।	আরও উচ্চে শৈবাল দেখা যায়।	—

* হিমরেখা—উচ্চ পর্বতের গাত্রে যে নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে কোন সময়েই বরফ গলে না সেই সীমারেখাকে হিমরেখা বলে। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর বা দক্ষিণে তাপ ক্রমশঃ কম বলিয়া যত উত্তর বা দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায়, হিমরেখার উচ্চতাও ততই কমিয়া আসে। মেরুপ্রদেশে হিমরেখা প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠে আসিয়া মিলিয়াছে। নিরক্ষপ্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে হিমরেখার উচ্চতা ১৬ হাজার ফিট, আল্পস পর্বতে ৯ হাজার ফিট, ল্যাপল্যাণ্ডে মাত্র ৩ হাজার ফিট।

"অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল—ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোন বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মনে করার কোন হেতু নাই যে, ঐ সকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, বাঙালীর পরাভব তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।" ভদ্র জীবিকা—রাজশেখর

জানালা দরজার রং

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

আমাদের দেশে জানালা দরজার রঙের যথেষ্ট চাহিদা আছে; অথচ চাহিদার উপযোগী জিনিস এদেশে উৎপাদিত হয় না। অনেক সময় রঙের মধ্যে নানারকম ত্রুটি থেকে যায়—যেমন (১) রং শুকায় না, (২) লাগাবার পর শুকিয়ে ঝরে পড়ে (৩) ৬।৭ মাস পরেই রঙের লেপে ফাট ধরে, (৪) রৌদ্র লেগে রং বদল হয়ে যায়। এই প্রকার নানা রকম ত্রুটি যখন কোন কোন রঙে দেখতে পাওয়া যায় তখন ভাল করে রং তৈরীর জন্যে নিশ্চিত জ্ঞানের আবশ্যক হয়। সে জ্ঞান কি এতই দুর্লভ যার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকার রং ও রঙের উপাদান এদেশে জাহাজ বয়ে আসে? সেই উপাদান কি এদেশে জন্মে না? তথ্যের দ্বারা এই সকল প্রশ্নের আলোচনাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিদেশ থেকে আমদানী

রঙের উপাদান	১৯৩৯।৪০	৪০।৪১	৪১।৪২	৪২।৪৩	৪৩।৪৪
(ক) ব্যারিয়াম সালফেট	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
(ব্যারাইটা) ইংল্যাণ্ড হইতে	২৩৮৯ „	৭৩৬৪ „	১১৯৪৬ „	৪৬৩৬ „	৯৮২৫ „
(খ) ব্লু পেণ্ট	৪,৬৮,৭৭৭ „	৭,০৬০০৬ „	১০,৫০৯৫৮ „	৭,৩৭৯৪৯ „	৬৯৩১৮২ „
ঐ, অন্য দেশ হইতে	১,৫৮,০৬৯ „	৭৩,৬২৪ „	২৪,৩০২ „	...	১৭,২৬১ „
(গ) মেটে সিন্দুর; ব্রিটিশ	৭২,৮২১ „	৪৮,৫৯৫ „	২১৫৩৩ „	৬৭,৩৫১ „	৪৪১৬ „
ঐ অন্যদেশ হইতে	১,০৯,১৮৬ „	৪৫,৪৭৭ „	৫৬,৪৫৭ „	...	২৩২৩ „
(ঘ) হোয়াইট লেড, ব্রিটিশ	১,১১,৫৫৬ „	৮৮,১৮৮ „	১,৪৯,৯৮১ „	৪০,০৯১ „	...
ঐ, অন্যদেশ হইতে	৩৩,০৯০ „	৪৮১৬ „	৭৮৮৯ „	...	...
ঐ, ভিজা, ব্রিটিশ	৮৩,৭১১ „	৭,৯০৭ „	২০৮০৬ „	২৭,০৯৮ „	১০৭৫৬ „
ঐ, ঐ, ঐ,	২০,৮৭১ „	১৬,৪০৭ „	৯৯২১ „	১৭৯৯ „	৯৩১৩ „
(ঙ) লিথোফোন	৫,৩০,৩১১ „	৩,৭৬,২৫৫ „	৭,৮০,৬৩৫ „	৭,৫৬,১০৫ „	৭,১৭,৩০২ „
(চ) জিঙ্ক হোয়াইট	৫,২১,৯০৬ „	৩,৭২,৮৮৩ „	২৯,২৮৬ „	৯৪,৪৯৩ „	৮ „
ঐ, ভিজা	৪,২৬,১৮৩ „	১,৩৪,৪১৭ „	২,২৬,৪৯০ „	১১,৫৭১ „	১৪,১২৮ „
(ছ) রং, শুষ্ক	২৫,৭৭,১৫৮ „	২৯,৫৩,৯০৪ „	৩৪,৮৫,২৯৫ „	২৫,৯৪,৬৩১ „	২২,৫৬,৯৯৪ „
রং, ভিজা	২৬,১০,৫৬৬ „	২৭,০৯,৭৯৩ „	২৮,৬৪,৯৪৬ „	১৪,৯২,২৫৮ „	৬,৫৪,৯৮৭ „

[প্রবন্ধের বৈদেশিক আমদানি বিষয়ক সমস্ত অঙ্কই ১৯৪৬ খৃঃ অব্দে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত Annual Statement of the Labour Trade of British India থেকে গৃহীত]

উপরোক্ত রং ও রঙের উপাদানগুলোর বিষয় বিভিন্ন দিক থেকে নিয়ে আলোচিত হচ্ছে—

(ক) ব্যারাইট।—"দেখতে কতকটা সাদা মার্বেলের মত; কিন্তু ঈষৎ স্বচ্ছ এবং আরও ভারী। এর উপাদান ব্যারিয়াম সালফেট। মাদ্রাজে করনুল ও সালেম জেলায়, রাজপুতনায় আলোয়ার ও

আজমিঢ়ে, বেলুচিস্থানে, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরে, মধ্যভারতে, বিহারে রাঁচি অঞ্চলে এবং উড়িষ্যায় গাংপুরে উহা পাওয়া যায়। রং তৈরী করতে ব্যারাইটার সূক্ষ্মচূর্ণ লাগে। রং হিসেবে এর আবরকশক্তি কম, অর্থাৎ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে বিশেষ সাদা দেখায় না। কিন্তু কাঠ, লোহা ইত্যাদির উপর এর সূক্ষ্ম চূর্ণের যে স্তর বা লেপ পড়ে তা তাপ নিবারণ করে, সেজন্যে অন্য রঞ্জক দ্রব্য কম দিলেও চলে।"—(রাজশেখর) অনেক রং তৈরীর কাজে লিথোফোন ব্যবহৃত হয়। এই লিথোফোন তৈরী করতেও ব্যারাইটা লাগে। এদেশে নানা কাজে যত ব্যারাইটা লাগে তা এদেশের খনি থেকে পাওয়া যাবে বলে হিসেব করা হয়েছে। ২০০-৩০০ মেসের গুঁড়ো করে নিলেই এই খনিজ পদার্থ রঙে ব্যবহার করা যায়। ব্যারাইটার উপর দ্রাবকের কোন ক্রিয়া নাই। তাই রঙের কাজে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা হয়।

(খ) ব্লু-পেণ্ট—কতক তৈরী রং আসে। কতক আসে পাখীমার্কা ব্লু জাতীয় রং যা দেয়াল চুনকামের কাজে লাগে। তৈরী রঙের কতক লৌহঘটিত নীল (ব্রোঞ্জ ব্লু) যা দিয়ে অনেকে পিউড়ীর সঙ্গে মিশিয়ে সবুজ রং করেন। এই সবুজ রংগুলো রৌদ্রে টিকে না—সূর্যালোকে ও তাপে ইহার লৌহ অক্সাইড ঝরা পাতার মত ক্রমশ সবুজ রং থেকে বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(গ) মেটে সিন্দুর—সীসা পুড়িয়ে এই লাল রং তৈরী হয়। লোহার ফ্রেমে লাগাবার রঙে অনেকে এই মেটে সিন্দুর ব্যবহার করেন। মরচের বিরুদ্ধে এই রং নাকি বিশেষ কার্যকরী। এদেশে এই বস্তু কিছু কিছু তৈরী হচ্ছে। সীসা এদেশে খুব বেশী পাওয়া যায় না।

(ঘ) হোয়াইট লেড—উপাদান লেড কর্বোনেট। সীসা থেকেই ইহার উৎপত্তি। খনিজ পদার্থ থেকে সীসা তৈরী করে তাথেকে এসিটেড ও তারপর কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রয়োগে লেড কার্বোনেট বা হোয়াইট লেড তৈরী করাই বিধি। এই কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা দরকার। সীসা "সীসগন্ধকযুক্ত গ্যালিনা নামক খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া যায়। বিহারে হাজারিবাগ, সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িষ্যায় সম্বলপুরে, ময়ূরভঞ্জ বোনাই ও কিওঞ্জর রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতনায়, মাদ্রাজ প্রদেশে, নিজামরাজ্যে এবং মাইসোরে গ্যালিনা পাওয়া যায়"—(রাজশেখর)। সম্প্রতি মেবার অঞ্চলে জওয়ারে যে খনি পাওয়া গেছে তা থেকে Metal Corporation of India সীসা তৈরী আরম্ভ করেছেন। অনেক সময় এই সব খনিতে সীসার সঙ্গে দস্তা ও রূপা থাকে। এদেশে সীসার যা প্রয়োজন তা এদেশেরই খনি থেকে মিটবে বলে এখন মনে হচ্ছেনা।

(ঙ) লিথোফোন—এর উপাদান, জিঙ্ক সালফাইড শতকরা ৩০ ভাগ ও ব্যারিয়াম সালফেট শতকরা ৭০ ভাগ। ব্যারিয়াম সালফাইড ও জিঙ্ক সালফেট জলে মিশিয়ে নিয়ে দুই-ই একসঙ্গে ধীরে ধীরে মিশিয়ে ঘাট্‌লে জিঙ্ক সালফাইড ও ব্যারিয়াম সালফেটের মিশ্রিত সাদা গুঁড়া জন্মে। বারংবার এই সাদা গুঁড়া জলে ধুয়ে শুকিয়ে তারপর আগুনে পোড়ানো হয়। এভাবে সব আবর্জনা বাদ দিয়ে যা পাওয়া যায় তা আবার জলে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে অস্বচ্ছ সুন্দর সাদা রঙের উদ্ভব হয়। সেগুলোকে শুকিয়ে গুঁড়া করে রং তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। আবরক হিসেবে লিথোফোনের গুণ খুব বেশী। তাই রং তৈরীর কাজে এর এত আদর। লিথোফোনের সঙ্গে অল্প পরিমাণে রঞ্জক মেশালেই সুন্দর রং পাওয়া যায় এবং সে রঙের আবরকশক্তি ও বিস্তার খুব বেশী হয়।

লিথোফোনের উপাদান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যারাইটা ও জিঙ্ক থেকে ইহা তৈরী হয়।

(চ) জিঙ্ক হোয়াইট—উপাদান জিঙ্ক-অক্সাইড। জিঙ্ক হচ্ছে দস্তা। "দস্তা ও গন্ধকযুক্ত জিঙ্কব্লেণ্ড নামক খনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যায়। বিহারে

হাজারিবাগ ও সাঁওতালপরগণায়, যুক্ত প্রদেশে দেরাদুনের কাছে, পাঞ্জাবে কাংড়া জেলায়, কাশ্মীরে ও রাজপুতনায় মেবার ও যোধপুরে এবং মাদ্রাজ প্রদেশে করণুল জেলায়ও কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। সম্প্রতি রাজপুতনায় জয়পুর রাজ্যে একটি বড় আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে।"—(রাজশেখর)। এই খনিজ পদার্থ থেকে অগ্নিতাপে দস্তা এবং তা থেকে অক্সাইড তৈরী হয়। কোন্নগরে ডি, ওয়ালডী কোম্পানী প্রচুর ভাল জিঙ্ক অক্সাইড তৈরী করে থাকেন। কিন্তু এতেই দেশের প্রয়োজন মিটবে বলে এখনও মনে হচ্ছে না।

(ছ) শুষ্ক ও ভিজা রং। প্রধানতঃ যেসব রং জানালা, দরজায় ব্যবহৃত হয়:—

(১) রেড অক্সাইড।

(২) পিউরীর রং বা লেড ক্রোমেট।

(৩) সবুজ রং—লেড ক্রোমেটের সঙ্গে ব্রোঞ্জ-ব্লু।

(৪) বাদামী বা চকোলেট রং (পিউরী+ কালো ও লাল)।

(৫) তামাঘটিত সবুজ রং।

(১) কলকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি কয়েকটি কারখানায় লোহা থেকে রেড অক্সাইড তৈরী হচ্ছে। বাইরে আরও কারখানায় এই কাজ করা হয়।

(২) বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি ৫টি কারখানায় ক্রোমেট তৈরী হচ্ছে এবং এর খনিজ ক্রোমাইট এদেশে প্রচুর আছে। এই পদার্থের জন্যে বিদেশের শরণাপন্ন হতে হবে না। তৈরী করতে করতে ক্রমশঃ পিউড়ীর রঙের সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণ কিভাবে বৃদ্ধি পায় সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে।

(৩) কলকাতায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীতে উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জ-ব্লু তৈরী হতো গত যুদ্ধের সময়।

(৪) অধিকাংশ লাল রঙই বিদেশী। খনিজ তেল পুড়িয়ে অনেক ভুষাও এদেশে তৈরী হয়।

(৫) ভিনিগারে তামা ডুবিয়ে রাখলে উপরে সুন্দর সবুজ আস্তরণ হয়। এই আস্তরণ হচ্ছে তামার এসেটিক লবণ। এই রং রৌদ্রতাপে ক্রমশঃ গাঢ় হয়। এই রঙের বিদেশী নাম Verdigris। এই রং অল্প অল্প করে তেল, জিঙ্ক-হোয়াইট ইত্যাদির সঙ্গে বেটে রঙের গোলা তৈরী করে' জানালা দরজায় এদেশে খুব ব্যবহার করা হয়। এই রঙের দাম বেশী; কিন্তু স্থায়ী। তামা থাকার দরুণ কাঠে কোন পোকা ধরে না। এদেশে এখন বছরে প্রায় ৬০০০ টন তামা উৎপন্ন হয়। সুতরাং হয়তো Verdigris তৈরী সম্ভব হবে।

খনিজ রঞ্জক—

খনিতে অনেক রকম রঞ্জক-পদার্থ জন্মে। যেখানে মাটির রং লাল, বুঝতে হবে সেখানে মাটিতে লৌহযুক্ত ফেরিক অক্সাইড আছে। "যে মাটিতে এই উপাদান খুব বেশী তার নাম গেরিমাটি। এলামাটিও (yellow ochre, হিন্দী—রামরজ) এই জাতীয়; কিন্তু তাতে ফেরিক অক্সাইডের বদলে হাইড্রক্সাইড থাকে। সেজন্যে রং হলদে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাইসোর, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরে এই দুই রঙীনমাটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ভারতের সর্বত্র রঙের কাজে ব্যবহৃত হয়। এককালে বিলেতেও চালান যেত। Sienna এবং Umba রঙ-ও এই জাতীয়; ম্যাঙ্গানিজ থাকায় অল্পাধিক বাদামী। এই দুই মাটিও এদেশে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্যবহার বেশী নেই।"—(রাজশেখর)।

রং তৈরীর কাজে কেউ কেউ খড়িমাটির গুঁড়া ব্যবহার করেন; কিন্তু দেশীয় খড়িমাটির এরূপ ব্যবহার দেখা যায় না।

বিদেশ থেকে আনা রং ও রং তৈরীর উপাদান সম্বন্ধে উপরে কিছু বিবরণ দিয়েছি। এখন রং তৈরীর উপাদানের ভাগ ও উপায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিম্নে দেওয়া গেল।

রঙের প্রধান উপাদান তিসির তেল—সব রং তৈরী করতেই লাগে তিসিদ্ধ তেল। তিসির তেলের অদ্ভুত গুণ এই যে, তা হাওয়ায় শুকিয়ে

যায়। তিসির তেলকে যদি জ্বাল দিয়ে ঘন করা হয় এবং তার সঙ্গে শোষক কোন রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা যায় তবে তা আরও তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তিসি এদেশে প্রচুর জন্মে। এই তেলের বিদেশ থেকে আমদানী ও বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ :—

	১৯৩৯।৪০	৪০।৪১	৪১।৪২	৪২।৪৩	৪৩।৪৪
আমদানী	৬১০৮৪ গ্যাঃ	১৭,২৭৮	১৩৪৯	১৬৪৬৯	৮০১ গ্যাঃ
রপ্তানী	৮৫৬ গ্যাঃ	৮৭৪	১৫০৯	১৩৭২	৫৬ গ্যাঃ

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের পর এই আমদানী-রপ্তানীর অবস্থা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। এখন বিদেশে তিসির তেলের খুব চাহিদা। তাদের সব রঙের কারখানা তিসির তেলের অভাবে পূরা কাজ করতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে অভাবের কথা এখনও শোনা যায়নি। গৌরীপুর ও সোদপুরের তেলের কারখানায় তিসির তেল থেকে ঘনীভূত তেল তৈরী হয়ে নানা কারখানায় রং প্রভৃতির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপাদানের ভাগ—

ভারত গভর্ণমেন্টের দপ্তর থেকে রঙের উপদান ইত্যাদির নতুন মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। অনুমান করা যায় যে, পুরাতন মান থেকে তা বিশেষ পৃথক হবে না। সেই পুরাতন মান অনুযায়ী তৈরীর ভাগ হচ্ছে :—

উপাদান	লেমন ক্রোম অয়েল পেন্ট ISD/ WEP	রেড অক্সাইড অয়েল পেন্ট ISD/ WEP 82	জিঙ্ক অক্সাইড অয়েল পেন্ট G/P 307/116	গ্রাস গ্রিন অয়েল পেন্ট ISD/ WEP /17	ইনসাইড হোয়াইট অয়েল পেন্ট ISD/ WEP/76/1	রেড অক্সাইড পেন্ট রিডিউসড্ ISD/WEP 43
পিউড়ী	২৬			১৪		
বেরাইট	৬২	১২		৭০	৬৬	৪০
তিসির তেল	১২	১৬	১৫	৮	৮	১০
ফেরিক অক্সাইড		৭২				৫০
জিঙ্ক অক্সাইড			৮৫		১৪	
হোয়াইট লেড				৬	১২	
ব্রোঞ্জ-ব্লু	দরকার মত পরিমাণ					
	১০০ ভাগ	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

শোষক—উপরে যে রঙের উপাদান দেওয়া হলো তা জানালা-দরজায় লাগান যায় না। এই রঙকে তিসির তেলে পাতলা করে নিয়ে এবং কিছু পরিমাণ শোষক মিশিয়ে দিতে হয়। সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু থেকে এমন কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু তৈরী হয় যা

রঙকে অল্প সময়ে শুকিয়ে দেয়। যদি তেলের ভাগ কম হয়, অথবা শোষকের মাত্রা বেশী হয় তবে রঙের আস্তরণ অল্পদিনে ফেটে যেতে পারে। সাধারণতঃ শোষক এমনভাবে তৈরী করতে হয় যাতে শোষকে (ক) শতকরা ৫·৬ ভাগ কোবাল্ট (খ) শতকরা ৫·৬ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ (গ) শতকরা ১৮ ভাগ সীসা থাকে। এই তিন রকম শোষকই একসঙ্গে রঙে দেওয়া হয়। কারণ কোবাল্ট শুকায় উপরে, ম্যাঙ্গানিজ শুকায় ভিতরে এবং সীসা শুকায় সর্বত্র।

বাণিজ্য শুল্ক—

বিদেশাগত রং ও রঙের উপাদানের দামের উপর শতকরা ২৪ টাকা শুল্ক দিতে হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, চলতি বাজার দরে উপাদান কিনে রং তৈরী করে বেচতে পারলে বেশ লাভ হয়।

মন্তব্য—দেখা যাচ্ছে (১) রঙের অধিকাংশ উপাদান এ দেশেই জন্মায়; (২) সীসা আমাদের দেশে এখনও বেশী পাওয়া যায় না; কাজেই সীসা আমদানী করতে হবে। কিন্তু হোয়াইট লেড, রেড লেড ও লেড ক্রোমেট (পিউরী) এদেশেই তৈরী হবে। (৩) দস্তা সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। (৪) ব্যারাইটা বিদেশ থেকে আনার কোন কারণ দেখা যায় না। (৫) বিদেশ থেকে ভারতে নিম্নোক্ত পরিমাণ টাকা রং এবং তার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যয়িত হয়।

১৯৩৯।৪০—১,০২,৬৫০৭৯ টাকা
৪০।৪১—১,০৩,১৫৫০২ "
৪১।৪২—১,১৪,৫৭১৬৫ "
৪২।৪৩—৭৯,২৮২০৯ "
৪৩।৪৪—৫৭,৫৫০০০ "

আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই আমদানীর পরিমাণ আরও বহুলাংশে কমে যাবে।

"ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল—জীবনযাত্রার প্রণালী বিশেষ; ভদ্রতা লাভের উপায় হইল—বিশেষ প্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটি ভদ্রমাণ্ডুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মাঠের মাণ্ডুক হাটের মাণ্ডুক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কূপমাণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।

* * * *

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

—রাজশেখর।

চা-শিল্পের গোড়ার কথা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইদানীং চা-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। একজন লেখক বলিয়াছেন, ভারতের চা-শিল্প দেড় শত বৎসরের পুরানো। অর্থাৎ দেড় শত বৎসর আগে হইতেই এই শিল্প এখানে বলবৎ রহিয়াছে। এই উক্তির মধ্যে কতকটা অতিরঞ্জন আছে। চা-শিল্পের গোড়া-পত্তন সম্বন্ধে কিছু তথ্য এখানে নিবেদন করিতেছি।

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ভারতবর্ষে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবে চা-এর প্রবর্তন ও চাষ-আবাদ সম্ভব কিনা? বেণ্টিঙ্ক করিতকর্মা লোক ছিলেন। তিনি কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি ভারতে চা-শিল্পের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য ১৮৩৪ সালেই একটি কমিটি গঠন করিলেন। ইহাকে তখন "Tea Committee" বা চা-কমিটি বলা হইত। রাজা রাধাকান্ত দেব এই কমিটির অন্যতম সদস্য হইলেন। তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের (বর্তমানে হাইকোর্ট) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টকে বিলাতে ১৮৩৬ সনের ২২শে জুন তারিখে লিখিত পত্রে চা-শিল্পের অনুসন্ধান-কার্যের একটি বিশদ বিবরণ দেন। তাহা হইতে এখানে তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

কমিটি প্রথমেই জি. জে. গর্ডন নামক এক শ্বেতাঙ্গকে চা-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য চীনে পাঠাইলেন। তাঁহার উপর ভার দেওয়া হয় এদেশে চা-এর উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য চীনা চাষী আনিবার। কুমায়ুন অঞ্চলে উচ্চভূমিতে চা-চাষের কতকটা প্রারম্ভিক আয়োজনও করা হইল। কিন্তু এই সময় জানা গেল, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আসাম প্রদেশের সিংফো অধ্যুষিত অঞ্চলে চা স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এ তথ্যটি একেবারে নূতন আবিষ্কার নয়। কমিটি স্থাপনের দশ-বার বৎসর পূর্ব হইতেই ঐ প্রদেশের লোকেরা ইহা জানিতে পায়। কিন্তু এই সময়ই সাধারণ লোকে এ বিষয়ে বিশেষ অবগত হইল। কমিটিও এ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইবার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া চা-শিল্প সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য নির্ণয়ার্থ

ডক্টর নাথানিয়েল ওয়ালিচ্

এক বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল আসামের পূর্বোত্তর অঞ্চলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। ডক্টর নাথানিয়েল ওয়ালিচ্ ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। উদ্ভিদ-বিদ্যায় বুৎপত্তি হেতু তিনি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিয়োজিত হন। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেখানে

উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। এইরূপ একজন বৈজ্ঞানিকের নেতৃত্বে কমিটি তিনজন বিজ্ঞানী লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধি-দল আসামে প্রেরণ করিলেন।

সঙ্গীদ্বয় সহ ডক্টর ওয়ালিচ্ প্রায় নয় মাস আসাম পরিক্রমা করেন। তাঁহারা দেখিলেন, শুধু সিংফো অধ্যুষিত অঞ্চলেই চা জন্মে না, সদিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়িয়া চা স্বাভাবিক-ভাবেই উৎপন্ন হইতেছে। নবাব ডিহিং ও বড় ডিহিং—ব্রহ্মপুত্রের এই দুই শাখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, বেঙ্গমোইয়া ও নাগাহিলের পাদদেশে পর্যন্ত প্রচুর চা জন্মিতেছে। চা-এর কুঁড়ি, ফুল, ফল, গাছ, সর্বরকম অবস্থাই তাঁহারা দেখিতে পান। চা-গাছের প্রকারভেদ আছে। চীনে যত রকমের চা-গাছ আছে এ সকল অঞ্চলেও প্রায় সেই সবই তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিনিধিদল যতরকমের চা-এর সন্ধান পাইয়াছেন তৎসমুদয়ই পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। রাধাকান্ত দেব বলেন, ডক্টর ওয়ালিচ্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন তাহাতে শুধু চা নহে, সমগ্র উদ্ভিদ বিদ্যারই সম্যক্ উন্নতি হইবে।

ডক্টর ওয়ালিচ্ প্রস্তাব করেন, চাষ-আবাদের জন্য বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড বন্দোবস্ত লইলে এই চা-শিল্পের উন্নতি অবধারিত। ইহার পর চীন হইতে চা-গাছ আমদানীর কথা আর কাহারও মনে আসে নাই। আসামেই চা-এর চাষ-আবাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরম্ভ হইল।

"চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্র সন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল; বি. এস-সি, এম. এস-সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয় স্বজন ক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরাণী বা উকীল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞানও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমিষ্ট্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে ক্ষমতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে technical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?" —রাজশেখর

গাণিতিক আবিষ্কার পদ্ধতি

শ্রীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গাণিতিক আবিষ্কার কোন্ পদ্ধতিতে কি করে সম্ভব হয় এ নিয়ে পাশ্চাত্যে বহুদিন ধরে আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। বিষয়টি মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং সাধারণের কাছেও চিত্তাকর্ষক। কেননা গাণিতিক আবিষ্কার কি পদ্ধতিতে সম্ভব হয় তা জানতে গেলে গণিতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না।

বর্তমান প্রবন্ধে দুজন সেরা গাণিতিক তাঁদের আবিষ্কার পদ্ধতি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তা আলোচনা করা হবে। তাঁদের একজন এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন; এঁর বিশদ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় জন হলেন—ফরাসী গণিতকার আঁরি পঁয়েকার। ইনি মারা গেছেন ১৯১২ সালে। উনবিংশ শতাব্দীতেই গণিতশাস্ত্র যখন বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃতি লাভ করলো তখন অনেকেই বলেছিলেন—কোন একজনের পক্ষে সমস্ত গণিত আয়ত্ত করা একেবারেই অসম্ভব। একথা ভুল প্রতিপন্ন করেছিলেন পঁয়েকার। তিনি শুধু যে ঐ শাস্ত্র মন্থন করেছিলেন তা নয়, উনষাট বছরের জীবনের মধ্যেই তিনি দিয়ে গেছেন প্রায় পাঁচশ'টি মৌলিক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। আইনষ্টাইনীয় যুগের সূচনা পর্যন্ত তিনিই ছিলেন গণিতরাজ্যে একছত্র সম্রাট। সুধীসমাজে যখন আইনষ্টাইনের আবিষ্কার অনাদৃত তখন তিনিই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—কি অপূর্ব জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানে! পঁয়েকার লিখে গেছেন, কি করে গাণিতিক আবিষ্কার সম্ভব হয়। অন্য কারুর কথা শুনে বা বই পড়ে আরও জটিল বাক্যজাল তিনি সৃষ্টি করেননি। যা লিখে গেছেন তা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। পঁয়েকারের মূল বক্তব্য এই যে,—গণিত আবিষ্কারের জন্যে কেবলমাত্র যুক্তির উপরেই নির্ভর করা চলে না, এজন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে Intuition বা স্বজ্ঞা-র।

গাণিতিক আবিষ্কার সকলের দ্বারাই সম্ভব নয় কেন, এ প্রশ্ন তত গুরুতর নয়; কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে—সকলেই কেন গণিত ব্যাখ্যা করার সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে নিতে পারে না? গণিত যদি কেবলমাত্র যুক্তির একটি ধারার উপরেই নির্ভর করে এবং গণিতের মূল কথাগুলো (যেমন—যোগ, বিয়োগ) যদি আপামর সকলেই জানে তবে সেই যুক্তি অনুসরণ করে গণিত তো সহজেই বোঝা উচিত। তবে কেন এমন হয় যে, একজন শিক্ষক কোন অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান? অত্যন্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন গণিতের অধ্যাপক-কেও দেখা যায়—গণিতের একটা অতি সাধারণ স্থানেও তিনি ভুল করে বসেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া তেমন কিছু কঠিন নয়। কেননা গণিতজ্ঞ যখন কোন অঙ্ক কষে দেখান তখন তিনি সেখানে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলেন। ঐ নিয়মগুলো তাঁর স্মৃতিতে গাঁথা থাকে এবং সেখান থেকেই ওগুলোকে উদ্ধার করে যন্ত্রচালিতের মত কাজে লাগিয়ে চলেন। তাই কোন কারণে তাঁর একবার স্মৃতিবিভ্রম ঘটলে তিনি সেগুলোকে ভ্রান্তভাবেও লাগাতে পারেন। তাই গণিতে ভুলের সৃষ্টি হয়।

মনে হতে পারে গণিতে নিপুণতা বুঝি নিখুঁত স্মৃতি ও প্রচণ্ড একাগ্রতার উপরই নির্ভর করে; কিন্তু আসলে তা-ও নয়। কারণ তাহলে দাবা-খেলোয়াড়েরাও বড় বড় গণিতজ্ঞ

হতে পারতেন এবং সকল গণিতজ্ঞই হতেন নামকরা খেলোয়াড়। পঁয়েকার বলেছেন—কোন একটা সাধারণ যোগ তিনি নিজেও কদাচিৎ নির্ভুল-ভাবে করতে পারেন। শুধু তিনি কেন, বেশীর ভাগ গণিতজ্ঞের মধ্যেই এই দোষটি অল্পবিস্তর বিদ্যমান। গণিতজ্ঞদের মধ্যে প্রচুর একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি কেবল ফ্রীডরিখ গসেরই দেখা যায়। গণিতজ্ঞদের যে স্মৃতিশক্তির প্রাখর্য প্রয়োজন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাছাড়া তাদের আরও কিছু সম্পদের অধিকারী হওয়া দরকার।

পঁয়েকার বলেছেন—তাঁর স্মৃতিশক্তিটা তত ভাল নয় (অবশ্য কথাটা নিছক বিনয়)। তাই তিনি ভাল দাবা খেলতে পারেন না। কিন্তু এর জন্যে তো তাঁর গণিতবিচারে কোন অসুবিধা হয় না, যে ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ দাবা-খেলোয়াড়কেই চুপ করে থাকতে হয়! এর কারণ হচ্ছে গণিত প্রক্রিয়া কেবল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের যেমন তেমন একটা মিশ্রণ নয় যে, স্মৃতির সাহায্যে অনেক কথা মনে করে তাদের মিশিয়ে দিলেই চলবে। একটা সক্রিয় রেডিও যন্ত্র তৈরী করতে হলে বাজার থেকে বিভিন্ন অংশ কিনে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে পুরে দিলেই কোন কাজ হবে না। সেগুলোকে বসাতে হবে তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে। বিশুদ্ধ গাণিতিক প্রক্রিয়াও ঠিক তেমনি নানা প্রকার সিদ্ধান্তের এক বাছাই করা বিশিষ্ট ধারা এবং এই ধারাটিই গণিতে সবচেয়ে মূল্যবান। পঁয়েকারের মত হচ্ছে—এই ধারাটিকে ধরতে পারাই হলো সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। যদি এই ধারাটি সম্যক অনুভূত হয় এবং বিষয়টি সম্বন্ধে একটি পূর্ণ ধারণা জন্মে তাহলে আর স্মৃতি-বিভ্রমের আশঙ্কা থাকে না। কেননা তখন চেষ্টা করে স্মরণ করা ছাড়াও বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলো তাদের ধারা অনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে এসে পড়ে। এজন্যেই গণিতের কাজে যুক্তিই সব নয়, চাই অনুভূতির ক্ষমতা। যুক্তি অনুসরণ করার ক্ষমতা সকলেরই আছে অল্পবিস্তর, কিন্তু অনুভূতির-ক্ষমতা কম লোকেরই আছে। তাই অঙ্ক বোঝে খুব কম লোক।

আবার এমন লোকও আছেন যাঁদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, আবার অনুভূতিরশক্তিও আছে কিছু। তাঁরা একটার পর একটা করে গাণিতিক কথা গ্রহণ করেন, গণিত বোঝেনও কিছু কিছু; কিন্তু গাণিতিক সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই অপারগ। আর যাঁরা প্রবল স্বজ্ঞা বা অনুভূতিশক্তির অধিকারী তাঁদের স্মৃতিশক্তি কিছু কম হলেও ক্ষতি নেই। তাঁরাই হচ্ছেন গণিতক্ষেত্রে দাতা বা স্রষ্টা।

পঁয়েকার গাণিতিক আবিষ্কারের সময় তাঁর মনের অবস্থা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে আলোচনা করেছেন। গাণিতিক আবিষ্কার কি শুধু গণিতের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের সারভাগ নিয়ে সমবায় সৃষ্টি করা? কিন্তু তেমন সমবায় তো অনেক রকমেরই করা যায় এবং তার বেশীর ভাগই তো মূল্যহীন! তা নয়। আবিষ্কার হচ্ছে কার্যকরী একটি বেশ মনোমত সমবায় গড়ে তোলা।

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে যেমন পদার্থবিজ্ঞানে নিয়ম আবিষ্কার করা যায় ঠিক তেমনি গাণিতিক তত্ত্বের চর্চার ফলে আমরা গাণিতিক নিয়ম আবিষ্কার করতে পারি। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে অজ্ঞাত পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে তাকেই প্রকাশ করে গাণিতিক তত্ত্ব।

সুতরাং আবিষ্কারের জন্যে গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তত্ত্ব আহরণ করে তার সমবায় ঘটাতে হবে। এজন্যে যত বিভিন্ন ক্ষেত্র পাওয়া যায় ততই ভাল। কিন্তু এটুকুই সব নয়। কারণ ওরকম সমবায়ের বেশীর ভাগই নিষ্ফল হবে। কাজেই আবিষ্কারককে করতে হবে মনোনয়নের কাজ। কিন্তু এমনিভাবে সমবায় ও মনোনয়ন করে অগ্রসর হতে হলে সারাজীবনেও

একটি আবিষ্কার সম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। কারণ বিভিন্ন গাণিতিক তত্ত্বের পরিমাণ অসংখ্য।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে আবিষ্কারকের চেতন মনে কখনই নিষ্ফল সমবায় স্থান পায় না। সমবায়গুলোর ক্ষেত্র হচ্ছে মনের গভীরতর একটা অংশ। প্রবেশের অধিকার পায় কেবল সুন্দর সমবায়গুলো এবং তাই হচ্ছে আবিষ্কার।

পঁয়েকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়েছেন। এখানে কতকগুলো গাণিতিক কথা প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটি বোঝবার জন্যে তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

প্রথম উদাহরণ হচ্ছে—প্রায় পনেরোদিন ধরে পঁয়েকার প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত ফুশিয়ান ফাংশানের মত আর কোন ফাংশান নেই। প্রত্যহ তিনি বিভিন্ন সমবায় নিয়ে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়। পরে একদিন স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে এক কাপ কফি খেলেন। সেদিন রাত্রে তাঁর ঘুম হলো না। রাশি রাশি চিন্তা মস্তিষ্কে জট পাকাতে লাগল। পরিশেষে দুটো মিলে গিয়ে হঠাৎ একটা চমৎকার সমবায় হলো। ভোরের মধ্যেই তিনি নতুন এক শ্রেণীর ফুশিয়ান ফাংশানের প্রবর্তন করলেন যা প্রধানতঃ হাইপার জিওমেট্রিক সিরিজ থেকে উদ্ভূত। এরপর তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল প্রয়োগ করে নিলেন তার সত্যতা যাচাই করে।

এরপরে তিনি ঐ ফুশিয়ান ফাংশানগুলোকে দুটো সিরিজের ভাগফল করে প্রকাশ করবার কথা চিন্তা করছিলেন। জিওলজিক্যাল কনফারেন্সের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর বাঞ্ছিত সিরিজ দুটোর কথা একেবারে ভুলে যান। কাজের ভিড়ে সকলের সঙ্গে একদিন তিনি গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছেন। গাড়ীর পাদানিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঈপ্সিত সিরিজ দুটোর গুণাগুণের বিষয় মনে এসে গেল, যদিও তখনি সেগুলো তিনি যাচাই করে নিতে পারেনি তবুও তাঁর মনে নিশ্চিন্ত তৃপ্তি এসেছিল এই জন্যে যে, তিনি আসল জিনিসটি পেয়ে গেছেন।

এরপর তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে সুরু করলেন এরিথমেটিকের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে। কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হলো না। এসময়ে তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর পূর্ববর্তী আবিষ্কারগুলোর সঙ্গে তাঁর বর্তমান সমস্যার কোন যোগ থাকতে পারে। যাহোক, শীঘ্র কোন ফলোদয় হলো না দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি বিষয়টি ত্যাগ করলেন। এরপর তিনি ভ্রমণের জন্যে সমুদ্রের ধারে কোথাও চলে যান এবং সম্পূর্ণ অন্য কথা ভাবতে থাকেন। একদিন যখন তিনি একটা উঁচু ঢিপির ওপর বেড়াচ্ছিলেন তখন সেই রকম সহসা আলোকপাত হলো তাঁর সেই পরিত্যক্ত সমস্যাটির ওপর। ঠিক তেমনি হঠাৎ, তেমনি সমগ্রভাবে উপলব্ধি করলেন—টার্ণারি কোয়াড্রাটিক ফর্মকে (Ternary Quadratic Forms) এরিথমেটিকে রূপান্তরিত করলে তা হয়ে দাঁড়ায় অনিউক্লীডিয় জ্যামিতি।

ত্বরিত আলোকপাতের এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। শুধু পঁয়েকার নয়, প্রায় সব গণিতজ্ঞই স্বীকার করেন যে, এমনিভাবেই সম্ভব হয় গাণিতিক আবিষ্ক্রিয়া—এমনকি, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী রাসেল পর্যন্ত।

পঁয়েকারের মতে এই সহসা আলোকপাতের ব্যাপারটি আমাদের মনের গভীরতর অংশে দীর্ঘকাল ধরে যে কাজ করছে তারই সাক্ষ্য দেয়। তাই আবিষ্ক্রিয়ার জন্যে গভীর মনের এই কাজের অতিশয় প্রয়োজন আছে। আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এই গভীর মনে কাজ সুরু হওয়ার আগে এবং পরেও কিছুক্ষণ চেতন মনে কাজ চালাতে হয়। সেই অনুপ্রেরণা সহজে পাওয়া যায় না, মন যদি সচেতনভাবে কয়েকদিন ধরে সমস্যা উত্তীর্ণ হবার প্রবল চেষ্টা না করে।

আপাতদৃষ্টিতে ঐ প্রাথমিক চেষ্টা একেবারেই বিফল হয়েছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু আসলে তা নয়। প্রাথমিক ঐ চেষ্টাগুলো তার গভীর চেতনার যন্ত্রে গতি সঞ্চার করেছে এবং চেতনার এই গভীর অংশটিকে যদি গতিশীল করে না তোলা যায় তবে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ।

আবিষ্কার সম্পূর্ণ করার জন্যে গভীর মন থেকে আলোকপাতের পরও চেতনমনে আরও কিছুক্ষণ কাজ চালাতে হয়। কারণ লব্ধ অনুপ্রেরণা বা জ্ঞানকে সাধারণের বোধগম্য করে তুলতে হবে। তাই সেই আবিষ্কারকে যৌক্তিক আকার (Logical form) দেওয়া চাই। সর্বোপরি প্রয়োজন হচ্ছে—আবিষ্কারকে যাচাই করে নেওয়া এবং তা করা যায় না যদি না আর একটা যৌক্তিক আকার থাকে। অবশ্য যাচাই করা মানে শুধু নিজেকে তৃপ্ত করা। কেননা, আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মন থেকে সকল সন্দেহরই নিরসন হলো। কিন্তু তবু একবার পরীক্ষা করে দেখতে হয়। কারণ শয়নকালে বা নিদ্রালু অবস্থায় যদি অনুপ্রেরণাগুলো মনে আসে তবে তা সন্দেহজনক।

যাহোক, পঁয়েকারের মত হচ্ছে—আমরা চিন্তা বা যুক্তিবিচার যার সাহায্যে করি তা হচ্ছে আমাদের চেতন মন। কিন্তু আমাদের মনের গভীরতর অংশটি ঐ চেতন মন থেকে কিছু কম মূল্যবান নয়। কেননা, আবিষ্কার আলোকপাতের উৎস হচ্ছে ঐটি। এরই সাহায্যে সুন্দর সমবায়গুলো এক মুহূর্তে বাছাই হয়ে যায়। তাই, বলা যেতে পারে, আমাদের সচেতন মন থেকেও এর স্থান অনেক উচ্চে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শুধুমাত্র ঐসব সুন্দর সমবায়ই (যাদের আমরা সহসা আলোক-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি) কি আমাদের চেতনার ঐ গভীরতর অংশে উৎপন্ন হয়, অথবা সেখানে মূল্যহীন আরও অনেক সমবায়ই স্থান পায়? এর উত্তর হচ্ছে—দুটি একটি নয়, সেখানে রাশি রাশি সমবায় তৈরী হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট দু-একটি সমবায় গভীর মন থেকে আমাদের চেতন মনে আসতে পায়। আবার প্রশ্ন করা যায়—এ কি করে সম্ভব যে, অতগুলো সমবায়ের মাত্র দু-একটি গভীর মনের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসতে পায়, আর সব হয়ে যায় নাকচ? পঁয়েকার বলেছেন, এর একমাত্র কারণ ঐ দু-একটি সমবায়ের সৌন্দর্যই গণিতজ্ঞের অনুভূতিপ্রবণতায় সাড়া জাগায় বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—গণিতজ্ঞের আবিষ্কার ক্ষমতা নির্ভর করে তাঁর স্বকীয় বিশেষ এক সৌন্দর্যবোধের (aesthetic feelings) উপর। সৌন্দর্যের এই প্রচণ্ড পিপাসা তাঁদের সব সময়েই বড় ব্যস্ত করে রাখে। বিশ্বের যা কিছু অস্পষ্ট, যা কিছু গভীর রহস্যময় এবং দুর্বোধ্য—সে সবই ব্যাকুল করে তোলে গণিতজ্ঞের মন। তাই প্রবল চেষ্টা ও অনুরাগ সে সবের মধ্যে এনে দেয় জ্ঞানালোক, আপাত-দুর্বোধ্য জিনিসের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে সুষমা। ঐ সৌন্দর্যবোধের জন্যেই তাঁরা খুঁজে বেড়ান জ্যামিতি অথবা নানা সংখ্যা ও আকারের সুষ্ঠুতা, সার্থকতা এবং যৌক্তিকতা।

এবার দেখা যাক, বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানে আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে আইনষ্টাইন কি বলেন। বাস্তবিক আইনষ্টাইনের আবিষ্কারগুলো প্রায় সবই ল্যাবরেটরীর সংস্পর্শ বর্জিত হয়েও কি করে তখনকার সমস্ত বড় বড় সমস্যাগুলো (যেমন—ইথরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্পর্কে মাইকেলসন পরীক্ষার চরম ব্যর্থতা, বুধ গ্রহটির বিচিত্র ব্যবহার ইত্যাদি) অবলীলাক্রমে সমাধান করে দিল! এ নিয়ে সাধারণের মধ্যে এবং পণ্ডিতমহলেও মহা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে একবার কথা ওঠে বিশুদ্ধ গণিতজ্ঞেরা তো অনেক কিছুই করেন, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে ছেড়ে দিলে তাঁরা অত অকেজো

বনে' যান কেন? এই সব গোলযোগপূর্ণ কথা ওঠায় ১৯১৪ সালে প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সে আইনষ্টাইন ব্যাখ্যা করেন বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর কার্যপদ্ধতি। তিনি বলেন যে, বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীর কাজে দুটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে কতকগুলো মূলতত্ত্ব। পরে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, সেগুলো থেকে কতকগুলো অনুসিদ্ধান্তে পৌছুতে হবে। গবেষণাগারের প্রয়োজন তিনি বোধ করতে পারেন কেবল দ্বিতীয় কাজটির জন্যে। কিন্তু তাঁর কাজের প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে—মূলতত্ত্বের আবিষ্কার এবং সেটি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তার কাছে ল্যাবরেটরী নিষ্ফল। আরও বলেছেন, ঐ মূলতত্ত্বগুলো আবিষ্কারের জন্যে ল্যাবরেটরীর অভিজ্ঞতার সমধিক প্রয়োজন নেই। এই প্রাথমিক আবিষ্কার সম্ভব হয় সাধারণতঃ স্বজ্ঞা ও কল্পনাশক্তির সাহায্যে। সেইজন্য বলেছেন—"To the discoverer in this field the products of his imagination appear so necessary and natural that he regards them and would have them regarded by others, not as creations of thought but as given realities." আইনষ্টাইনের আরও মত হচ্ছে যে, শুধু যুক্তি-বিচারের সাহায্যে এই প্রাথমিক নিয়মে পৌছনো যায় না। বেদনা, ব্যাকুলতা ও সহানুভূতি নিয়ে এগুলো জানার চেষ্টা করতে হয়। 'There is no logical path to these laws; only intuition resting on sympathetic understanding of experience can reach them." এইসব কারণেই বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথমেই ল্যাবরেটরীতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—যেসব পদার্থবিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনার অনুশীলন করেন এবং ল্যাবরেটরীর সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করেন এবং যাঁরা উপরোক্ত বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী—তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টিতে লাভ বেশী। পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসরণ করলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে। নিউটন তার নিয়মগুলো প্রধানতঃ প্রকৃতিকে অনুশীলন করেই আবিষ্কার করেছিলেন, কল্পনা এবং Intuition-কে যথেষ্ট প্রাধান্য দেননি বলেই মনে হয়। তাই তার গতি সম্পর্কিত নিয়মাবলীতে চরম গতি বা চরম স্থিতির (absolute motion or rest) কথা স্থান পেয়েছে। অথচ স্বজ্ঞায় বলে ও দুটো জিনিসের অস্তিত্ব নেই। আইনষ্টাইন বলেন, নিউটন নিজেই তাঁর ঐ খুঁতটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেজন্যে তাঁর মনে যথেষ্ট অস্বস্তিও ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তাঁর নিয়ম যথেষ্ট সাফল্য পাওয়ায় ঐ খুঁতটি সম্পর্কে তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকেই যদি নিখুঁতভাবে জানতে হয় তবে প্রকৃতি-চর্চাই যথেষ্ট নয়। তাকে ছাড়িয়ে উঠে কল্পনাশক্তিকেও প্রাধান্য দিতে হবে। আইনষ্টাইনের মতে, পদার্থবিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদের আবির্ভাবের পর একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্লাঙ্ক তাঁর যুগান্তকারী কোয়াণ্টাম মতবাদ আবিষ্কার করতে বহু বছর ধরে গবেষণা করেছিলেন। তাই সাধারণের ধারণা—ঐ সব বড় বড় কিছু আবিষ্কার করতে গেলে বুঝি বা প্রয়োজন হয় ভীষণ ইচ্ছাশক্তি অথবা নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতার। আইনষ্টাইন কিন্তু এরূপ ধারণার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। বলেন—যে মন নিয়ে এতদিন ধরে কাজ করার ধৈর্য পাওয়া যায় তা-তো কঠিন নিয়মে বাঁধা নয়ই, বরং তাকে বলা যেতে পারে প্রেমিক বা ধার্মিক পূজারীর মন। প্রতিদিনের উদ্যমটা কোন বাঁধাধরা নিয়ম বা সঙ্কল্প থেকে আসে না—আসে সোজা হৃদয় থেকে।

গাণিতিক বা পদার্থবিজ্ঞানীদের এসব কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁরা কত ভালবাসেন তাঁদের নিজ নিজ বিষয়কে।

সঙ্গীতকার যেমন আনন্দ পান সুরসৃষ্টিতে, কবি যেমন পান কাব্য সৃষ্টিতে, চিত্রশিল্পী যেমন পান শিল্প সৃষ্টিতে—গাণিতিক সৃষ্টিতেও তেমনি আনন্দ পান গণিতজ্ঞেরা এবং সৃষ্টির এ আনন্দ প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক।

"বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের একদল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর একদল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপ নেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফূট করিতে পারিতেছে না। এই সকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, economies বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রাণালীতে আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্য লক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয় কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কতক অজ্ঞতার জন্য এই সকল পরদেশীর কার্য-প্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতি পরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটা কম্বল সম্বল করিয়া এ দেশে আসে; যা-তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থ সঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

* * * *

বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠব-জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই সকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয়ই জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুকাইবে না।"

—রাজশেখর বসু।
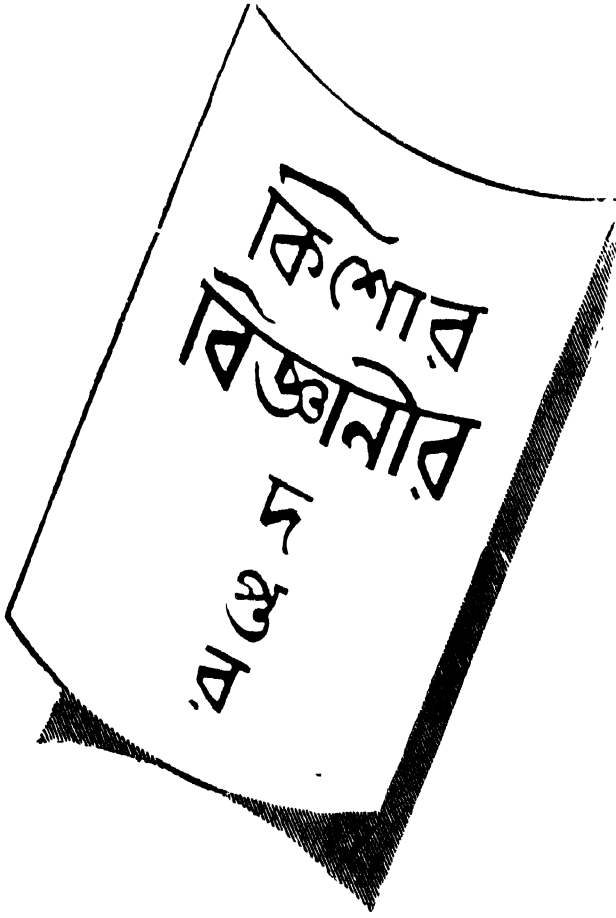
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ,—৩য় সংখ্যা

প্রকৃতি পরিচয় পর্যায়ে নিম্নোক্ত যে কোন বিষয়ে তোমাদের কাছে ছোট্ট প্রবন্ধ লেখবার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিষয় :—তোমাদের পরিচিত গাছপালার বিশেষত্ব। পরাশ্রয়ী বা পরজীবী উদ্ভিদ। বিভিন্ন উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের বিশেষত্ব।

তোমাদের পরিচিত গৃহপালিত বা বন্য জীবজন্তু সম্পর্কে যেসব অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছ।

টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ, ব্যাং এবং বিভিন্ন রকমের জলপোকার যেসব ব্যাপার তোমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে।

ছোট্ট প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে সরল ভাষায় লিখবে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না।

হুতুম-প্যাঁচা

ফটো—গা. চ. ভ.

১৮১ পাতা দ্রষ্টব্য
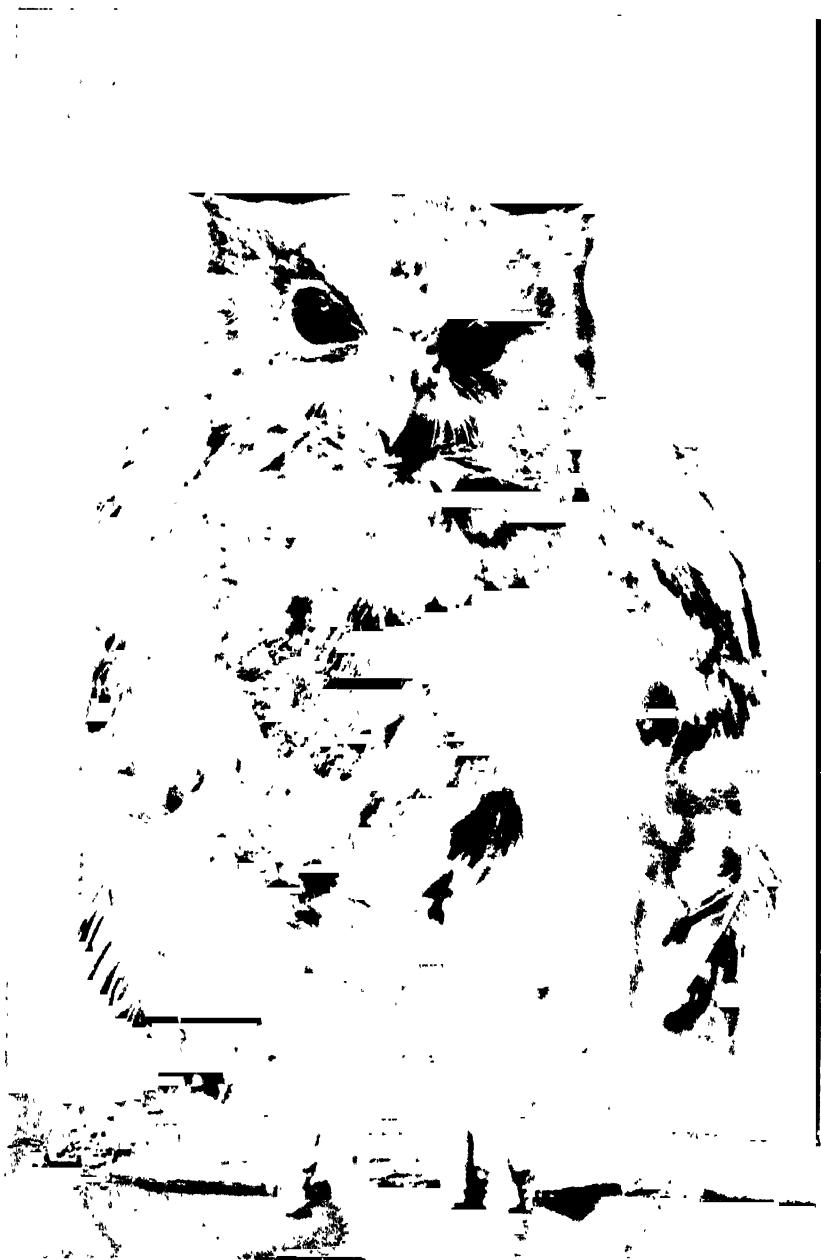
করে দেখ

মজার অঙ্ক

'অঙ্ক' কথাটা পড়েই যেন পিছিয়ে যেও না। ভয় পাবার কিছু নেই! সাধারণ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ তো সকলেই প্রায় জান। অঙ্ক যে সবক্ষেত্রেই একটা নীরস কঠিন বস্তু নয় তা নীচের অঙ্কগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। অঙ্ক করেও অনেক সময় আনন্দ পাওয়া যায়—তার মধ্যেও অনেক মজার জিনিস আছে।

নীচের অঙ্কগুলো সবই কষে দেওয়া আছে, কেবল একটু মিলিয়ে নাও।

১ নং

১০,২০,৩০,…৮০ কে ৯ দিয়ে একে একে ভাগ কর। দেখ ভাগফলগুলোর মধ্যে কেমন সুন্দর সম্বন্ধ রয়েছে।

১০ ÷ ৯ = ১˙১১১১১ … অসীম
২০ ÷ ৯ = ২˙২২২২২ … „
৩০ ÷ ৯ = ৩˙৩৩৩৩৩ … „
৪০ ÷ ৯ = ৪˙৪৪৪৪৪ … „
৫০ ÷ ৯ = ৫˙৫৫৫৫৫ … „
৬০ ÷ ৯ = ৬˙৬৬৬৬৬ … „
৭০ ÷ ৯ = ৭˙৭৭৭৭৭ … „
৮০ ÷ ৯ = ৮˙৮৮৮৮৮ … „

২ নং

৯ কে ১ দিয়ে গুণ কর; গুণফল হলো ৯। এখন ৯-এর সঙ্গে ০ যোগ দাও; যোগফল হলো ৯। আবার ৯ কে ২ দিয়ে গুণ কর; গুণফল হলো ১৮; এখন (১+৮) হলো ৯। এমনি ৯ কে ৩,৪,৫ প্রভৃতি দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলের সংখ্যাগুলো যোগ কর। দেখ প্রতিক্ষেত্রেই যোগফল ৯ হচ্ছে।

৯ × ১ = ৯   ০ + ৯ = ৯
৯ × ২ = ১৮   ১ + ৮ = ৯
৯ × ৩ = ২৭   ২ + ৭ = ৯
৯ × ৪ = ৩৬   ৩ + ৬ = ৯
৯ × ৫ = ৪৫   ৪ + ৫ = ৯
৯ × ১১ = ৯৯   ৯ + ৯ = ১৮   ১ + ৮ = ৯

৯×১২=১০৮	১+০+৮=৯	
৯×১৩=১১৭	১+১+৭=৯	
৯×২৪=২১৬	২+১+৬=৯	
*৯×৯৯=৮৯১	৮+৯+১=১৮	১+৮=৯

আমি মাঝে মাঝে করে দিয়েছি। তোমরা বাকিগুলো করে দেখ। * চিহ্নিত অঙ্কটির মতও অনেক স্থলে হতে পারে মনে রেখ।

৩ নং

১৯ কে ১,২,৩...৯ দিয়ে একে একে গুণ কর এবং গুণফলের সংখ্যাগুলো ঠিক আগের অঙ্কের ন্যায় যোগ করে দেখ। যোগফল কেমন ১,২,৩...৯ হচ্ছে!

১৯×১=১৯	১+৯=১০	১+০=১
১৯×২=৩৮	৩+৮=১১	১+১=২
১৯×৩=৫৭	৫+৭=১২	১+২=৩
১৯×৪=৭৬	৭+৬=১৩	১+৩=৪
১৯×৫=৯৫	৯+৫=১৪	১+৪=৫
১৯×৬=১১৪	১+১+৪=৬	০+৬=৬
১৯×৭=১৩৩	১+৩+৩=৭	০+৭=৭
১৯×৮=১৫২	১+৫+২=৮	০+৮=৮
১৯×৯=১৭১	১+৭+১=৯	০+৯=৯

১৯ কে ১০,১১...১৯ দিয়ে গুণ করে যদি দেখ তো একই উত্তর পাবে।

৪ নং

নীচের যোগটির চারটি লাইন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজান আছে। কেবল পঞ্চম লাইনে একটি ২ বসিয়ে যোগ করলে যোগফল ২২২২২২২২২২ হয়।

```
  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
  ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
  ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
                ২
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
```

৫ নং

৯১ কে ১,২,৩...৯ দিয়ে গুণ কর। এবার গুণফলের (১ম সার) সংখ্যাগুলোকে যোগ কর। যোগফলগুলো ২য় সারে দেওয়া হয়েছে। এখন ১ম সারটি লক্ষ্য কর—এর

বাম পাশের সারটি ০,১…৮ পর্যন্ত এক এক করে বেড়ে গেছে। মধ্যের সারে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত কমে গেছে এবং শেষ সারে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত আবার বেড়ে গেছে। বেশ মজার নয়? এরপর ২য় সারটি দেখ—কেমন ১০ থেকে এক এক করে ১৮ পর্যন্ত বেড়ে গেছে!

১ম সার	২য় সার
১ × ৯১ = ০৯১	০ + ৯ + ১ = ১০
২ × ৯১ = ১৮২	১ + ৮ + ২ = ১১
৩ × ৯১ = ২৭৩	২ + ৭ + ৩ = ১২
৪ × ৯১ = ৩৬৪	৩ + ৬ + ৪ = ১৩
৫ × ৯১ = ৪৫৫	৪ + ৫ + ৫ = ১৪
৬ × ৯১ = ৫৪৬	৫ + ৪ + ৬ = ১৫
৭ × ৯১ = ৬৩৭	৬ + ৩ + ৭ = ১৬
৮ × ৯১ = ৭২৮	৭ + ২ + ৮ = ১৭
৯ × ৯১ = ৮১৯	৮ + ১ + ৯ = ১৮

৬ নং

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ কে ন'টা ৯ দিয়ে গুণ কর। গুণফলটি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত বেড়েছে, আবার ১ পর্যন্ত কমে গেছে।

```
                    ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ ×
                  ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯ ৯
                  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
                ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
              ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
            ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
          ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
        ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
      ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
    ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
  ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
-----------------------------------
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
```

৭ নং

৩৩ কে ৩, ৬ (৩×২), ৯ (৩×৩), ১২ প্রভৃতি দিয়ে গুণ কর। গুণফলের

(১ম সার) সংখ্যাগুলো যোগ কর। যোগফল প্রতি ক্ষেত্রেই ১৮ হবে। ৫নং অঙ্কের মত এখানেও ১ম সারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে।

১ম সার	সংখ্যাগুলোর যোগফল
৩ × ৩৩ = ০৯৯	১৮
৬ × ৩৩ = ১৯৮	১৮
৯ × ৩৩ = ২৯৭	১৮
১২ × ৩৩ = ৩৯৬	১৮
১৫ × ৩৩ = ৪৯৫	১৮
১৮ × ৩৩ = ৫৯৪	১৮
২১ × ৩৩ = ৬৯৩	১৮
২৪ × ৩৩ = ৭৯২	১৮
২৭ × ৩৩ = ৮৯১	১৮
৩০ × ৩৩ = ৯৯০	১৮
৩৩ × ৩৩ = ১০৮৯	১৮
৩৯ × ৩৩ = ৩২৬৭	১৮
৪৮ × ৩৩ = ৬৫৩৪	১৮
৫৭ × ৩৩ = ৯৮০১	১৮
৯৯ × ৩৩ = ৩২৬৭	১৮

৮ নং

৯৮৭৬৫৪৩২১ কে ৯, ১৮ (৯ × ২), ২৭ (৯ × ৩), ৮১ (৯ × ৯) দিয়ে একে একে গুণ কর। গুণফলগুলোর মধ্যে কেমন সুন্দর সাদৃশ্য রয়েছে! নয় কি?

৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ = ০৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯
" × ১৮ = ১৭৭৭৭৭৭৭৭৭৮
" × ২৭ = ২৬৬৬৬৬৬৬৬৬৭
" × ৩৬ = ৩৫৫৫৫৫৫৫৫৫৬
" × ৪৫ = ৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৫
" × ৫৪ = ৫৩৩৩৩৩৩৩৩৩৪
" × ৬৩ = ৬২২২২২২২২২৩
" × ৭২ = ৭১১১১১১১১১২
" × ৮১ = ৮০০০০০০০০০১

উপরের অঙ্কগুলো কি খুব শক্ত লাগলো? নিশ্চয়ই নয়! তাহলেই বুঝতে পারছ অঙ্কের মধ্যে কি চমৎকার মজার জিনিস রয়েছে!

শ্রীসরোজকুমার দে

জেনে রাখ

পশুপক্ষীর আত্মগোপন কৌশল

পাড়াগেঁয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছি। পথের ধারেই প্রকাণ্ড একটা পুরনো আমগাছ। গাছের বেড়টা ৮।৯ হাতের কম হবে না। ৯।১০ হাত উপরে খুব মোটা একটা হেলানো ডাল থেকে রাস্না ফুলের ছড়া ঝুলছে। ফুলগুলো এতই সুদৃশ্য যে, পাড়বার লোভ সংবরণ করা দুষ্কর। খানিকটা উঠতে পারলেই ফুলগুলো ছিঁড়ে আনা যায়। বেশ কিছুটা মেহনৎ করে গাছটার উপরে উঠে গেলাম। একছড়া ফুল ছিঁড়েছি, আর একটা ছিঁড়তে যাব--হঠাৎ যেন কানে গেল—হিস্ হিস্, ফোঁস ফোঁস শব্দ। তবে কি সাপ—রাস্নার ঝোপের ভেতর আত্মগোপন করে আছে! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। থম্‌কে দাঁড়ালাম। কই—কোথাও তো কিছু দেখছি না! শোনা গেছে—পুরনো গাছের কোটরে বা ফাটলে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ আস্তানা গেড়ে থাকে, পাখীর ডিম খাবার লোভে। কিন্তু আর তো শব্দ শোনা যায় না! অহেতুক মানসিক ভীতি—মনকে প্রবোধ দিয়েও গাছ থেকে নেমে পড়বার উদ্যোগ করছি। আবার সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। পাশ ফিরতেই দেখি—ডালটার সন্ধিস্থলে গাছটার গা ঘেঁসে বসে আছে—মস্ত বড় একটা হুতুম প্যাচা। মস্ত বড় হলেও সেটা যে বাচ্চা, দেখেই বোঝা গেল। অন্ধকারে বিড়ালের চোখ দুটো যেমন করে জ্বলে সেরকম ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। বাঘনখের মত বাঁকানো ঠোঁটটা যেন পিতল দিয়ে মোড়া। হাঁড়ি-পানা মুখখানার দু-পাশে বিড়ালের কানের মত খাড়া খাড়া দুটো ঝুঁটি। অদ্ভুত চেহারা। দেখলে হাসিও পায় ভয়ও লাগে। এতবড় পাখীটা গাছের গায়ের সঙ্গে যেন বেমালুম মিশে আছে—এমনই রঙের মিল! একটু দূর থেকে মনে হয় যেন ওটা গাছেরই একটা বর্ধিত অংশ। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখে ফোঁস ফোঁস করে ভয় দেখাচ্ছিল। ধরবার উপক্রম করতেই নীচের দিকে উড়ে গেল। ভাল উড়তে শেখেনি। কতকগুলো শুকনো ডালপালা গাছটার কিছু দূরে স্তূপাকারে পড়েছিল। উড়ে গিয়ে প্যাঁচাটা সেই ডালপালার মধ্যেই পড়লো। গাছ থেকে নেমে পাখীটাকে ধরবার জন্যে ডালপালার স্তূপটার কাছে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার—প্যাঁচাটার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। তবে কি অলক্ষ্যে অন্য কোথাও উড়ে গেল? ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসে গন্তব্য স্থানে চলেছি। কাকের কলরবে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—সেই 'ডালপালার স্তূপটার আশেপাশে গোটা চার পাঁচেক কাক উড়ে এসে সমস্বরে মহা চেঁচামেচি সুরু করে দিয়েছে। ব্যাপার কি? আবার ফিরে গিয়ে

দেখি—ডালপালার একপাশে প্যাঁচাটা সেই ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চুপটি করে বসে আছে। ডালপালার সঙ্গে এমন আশ্চর্য মিল যে, সহজে নজরেই পড়ে না। ছবিখানা দেখে ব্যাপারটার খানিকটা আঁচ করতে পারবে।

প্যাঁচাটা ডালপালার মধ্যে বসে আছে।

কেন এমন হয়, বলতে পার? মানুষকেই মানুষ ধোঁকা দেবার জন্যে কত রকম লুকোচুরি, প্রতারণা, আত্মগোপন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার জন্যে মানুষ যে কতরকম লুকোচুরি এবং আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করেছিল সেকথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নেই। অবশ্য মানুষের কথা আলাদা, কারণ তারা বুদ্ধিবলে অনেক কিছু করতে পারে এবং অবস্থানুযায়ী বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। পশু-পক্ষীরা কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই বিশেষ বিশেষ আত্মগোপন ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য তাদের বংশানুক্রমিক। জীবজগতের সর্বক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি, রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই আছে। উদ্ভিদ জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পরস্পরের মধ্যে খাদ্যখাদক সম্বন্ধটাই প্রবল। প্রত্যেকেরই পদে পদে শত্রু। কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে প্রত্যেককেই সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। প্রবলের সঙ্গে দুর্বলের সামনাসামনি লড়াই দুর্বলের পক্ষে মারাত্মক। কাজেই আত্মরক্ষার তাগিদে শত্রুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে দুর্বলের পক্ষে লুকোচুরি, প্রতারণা বা

আত্মগোপনের কৌশল অবলম্বন করাই সহজ এবং স্বাভাবিক। এর ফলেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'যোগ্যতমের উদ্বর্তনে' বিশেষ বিশেষ প্রাণী আত্মরক্ষামূলক বিশেষ বিশেষ কৌশলের অধিকারী হয়েছে। হুতুম প্যাঁচার ব্যাপারটাও এরকম একটা আত্মরক্ষামূলক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেবল হুতুম প্যাঁচাই নয়, বিভিন্ন জাতের পশুপক্ষী আরও অদ্ভুত রকমের আত্মরক্ষামূলক কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। অষ্ট্রেলিয়ায় টনি ফ্রগমাউথ নামে একরকম পাখী দেখা যায়। এরা গাছের মোটা ডালের উপর পরিষ্কার জায়গায় বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। ডিমে তা' দেবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই উন্মুক্ত বাসাতেই বসে থাকতে হয়। কোন রকম ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেই গলাটাকে সামনের দিকে প্রসারিত করে' একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। পালকের রঙ এবং অবস্থান কৌশলে সেটাকে তখন গাছেরই একটা অংশ, মৃত কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। দক্ষিণ আমেরিকার নাইটজার নামে একরকম পাখীও ভয় পেলে অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে। তবে তাদের বসবার কায়দা ভিন্ন রকমের। আমাদের দেশের ফিঙে, টুনটুনি, তালচোঁচ, ডাহুক প্রভৃতি পাখীরাও আত্মগোপনের জন্যে নানা রকমের কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করে থাকে। ভয় পেলে এক জাতের বক গলাটাকে উচুদিকে প্রসারিত করে আশে-পাশে নল-খাগড়ার সঙ্গে বেমালুম মিশে যাবার চেষ্টা করে। ছবিখানা দেখলেই অবস্থাটা বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের কোঁচবক, কালীবকেরাও অনেক সময় শিকার ধরবার আশায় আশেপাশের ঘাসপাতার সঙ্গে গায়ের রঙের সামঞ্জস্যে আত্ম-গোপন করে অসীম ধৈর্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে অবস্থান করে।

নলখাগড়ার মধ্যে বকটা আত্মগোপন করে আছে।

কতকটা গোসাপের মত দেখতে গায়ে আঁশওয়ালা ম্যানিস্ নামে বাদামী রঙের একরকম রাত্রিচর জানোয়ার অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করে থাকে। দিনের বেলায় এরা গাছের উপর বিশ্রাম করে। পেছনের পায়ের ধারালো নখ দিয়ে গাছের কাণ্ডটাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সামনের পা-দুটো মুড়ে শরীরটাকে সোজা রেখে গাছের ডালের মত পাশের দিকে প্রসারিত করে দেয়। লম্বা লেজটাকে গাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে

শরীরের ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। এ অবস্থায় সেই ঘুমন্ত প্রাণীটাকে গাছের একটা শুকনো ভাঙা ডাল বলেই মনে হয়।

আর্মাডিলো নামে একরকম জানোয়ারের কথা তোমরা শুনে থাকবে। জানোয়ারটা কতকটা ম্যানিসের মতই দেখতে; কিন্তু গায়ে আঁশ নেই। পিঠের উপর ঢালের মত একটা শক্ত আবরণী আছে। আবরণীটাকে ভাঁজ করা যায়। কোন কারণে ভয় পেলে আর্মাডিলো শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে এবং ঢালের মত আবরণীটাকে মুড়ে একটা

আর্মাডিলোর আত্মগোপন কৌশল।

পুটুলির মত হয়ে যায়। ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এ অবস্থায় সেটাকে কোন জানোয়ার বলে চেনাই যায় না। কচ্ছপের দৈহিক গঠন ভিন্ন রকমের হলেও তাদের আত্মরক্ষার কৌশলও অনেকটা এ-ধরনের। বিশেষ করে আমাদের দেশের সুঁধি-কচ্ছপের আত্মগোপন কৌশলকে এদের চেয়ে অনেক নিখুঁত বলা যেতে পারে। কারণ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভিতরে নিয়ে সুঁধি-কচ্ছপ যখন খোলাটার মুখ বন্ধ করে দেয় তখন তাকে কোন জীবন্ত প্রাণী বলেই মনে হয় না।

আমাদের দেশে সজারু নামে একপ্রকার অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। এদের সর্বশরীর কাঁটায় আবৃত। শত্রুর আক্রমণে পালাবার পথ না পেলে শরীরটাকে গুটিয়ে বলের আকার ধারণ করে। কাঁটাগুলো তখন কদম ফুলের মত সেই

পিণ্ডাকার দেহটার চারদিকে খাড়া খাড়া হয়ে বেরিয়ে থাকে। এই অদ্ভুত আকৃতি যেমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় তেমনই আবার শত্রুর মনে ভীতির উদ্রেক করে।

শরীরটাকে বলের মত গুটিয়ে সজারু আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করেছে।

আত্মগোপনকারী গেছো-টিকটিকি, গিরগিটি, গোসাপ হয়তো তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। অবস্থান ক্ষেত্রের সঙ্গে এদের গায়ের রঙের এমন অদ্ভুত মিল যে, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকলে সহজে কারুর নজরেই পড়ে না।

কীটপতঙ্গের লুকোচুরির কথা তোমাদের পূর্বেই বলেছি। তাছাড়া সাপ, ব্যাং, মাছ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের প্রাণীদের মধ্যে যে কত রকমের আত্মগোপনের কৌশল প্রচলিত আছে তা বলে শেষ করা যায় না। তোমরা এগুলো নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করো। দেখবে আরও কত অদ্ভুত ব্যাপার তোমাদের নজরে পড়বে।

গ. চ. ভ.

ছোটদের জানবার কথা

একটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি? বল তো তোমার মা কি করে জল গরম করেন? জান না? এই যে কতবার কারণে অকারণে মায়ের পেছনে পেছনে রান্না ঘরে ঘুরঘুর কর এটা লক্ষ্য করনি বুঝি? এবার লক্ষ্য করে দেখো। দেখবে তিনি প্রথমে একটি পাত্র ভরে জল নেন, পরে সেই পাত্রটি আগুনের ওপর বসিয়ে দেন। হাঁ, আগুনের ওপরেই বসিয়ে দেন, তার ধারেও নয়, পাশেও নয়, ঠিক

ওপরে। এটাই যথোচিত ব্যবস্থা। কারণ আগুনের ওপরে বসিয়ে তিনি তাপটাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগান। কি করে? বলি শোন। যে কোন জিনিস গরম হলে হাল্‌কা হয় এবং ওপরের দিকে ওঠে। উনুনের আগুনে হাওয়া গরম
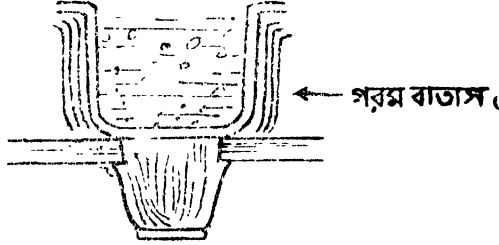
১নং চিত্র

হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং জলের পাত্রটিকে গরম কোটের মত চার পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। এদিকে পাত্রের তলাটা গরম হওয়ার দরুণ পাত্রের নীচেকার জল প্রথমে গরম হয় এবং ওপর দিকে ওঠে। তখন আবার ওপরের ঠাণ্ডা জলটা নিম্নগামী হয়ে পাত্রের তলার দিকে ছোটে। সেখানে জলটা তপ্ত হয়। এমনি করে প্রথমে গরম ও ঠাণ্ডা জলের, পরে গরম ও অপেক্ষাকৃত কম গরম জলের ওপরে নীচে অবিরাম আনাগোনা চলে, যে পর্যন্ত না পাত্রস্থিত সমস্ত জলটা টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকে। ১নং চিত্র দেখ।

তাহলে এ ব্যাপারটা থেকে বুঝতে হবে যে, আমরা যদি কোন তরল বস্তু গরম করতে চাই তবে আগুন অথবা তাপটা আমাদের সর্বদা নীচে স্থাপন করতে হবে। এই কারণেই বৈদ্যুতিক কটাহে গরম করার ব্যবস্থাটা কটাহের তলায় থাকে। এরূপ যে-সকল কটাহে গরম করার ব্যবস্থা পার্শ্বদেশে থাকে সেগুলো ভাল নয়, কারণ এগুলোর ব্যবহারে অযথা বহু তাপ ব্যয় হয়ে যায়।

ইমারসন্ হিটারও তরল পদার্থের ভেতরে যত বেশী ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তত বেশী কাজ করে। কেন করে বুঝলে তো? কারণ ঐ এক—গরম জিনিস ঊর্ধ্বগামী হয়ে থাকে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছো তরল পদার্থ গরম করার নিয়মটা জলের মত পরিষ্কার। তাই লোকেরা যখন তরল পদার্থ গরম করতে, নয় ঠাণ্ডা করতে এই অতি সাধারণ নিয়মটার প্রতি দৃকপাত মাত্র করে না তখন বড় আশ্চর্য ঠেকে। তোমার কথাই ধর না, তোমাকে যখন একপাত্র লেমোনেড ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হলো—তুমি পাত্রটিকে এনে বরফের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিলে। কারণ তুমি দেখেছো যে, গরম করতে পাত্রটি ঠিক তাপের মুখের ওপর বসাতে হয়, তাই ভেবেছো ঠাণ্ডা করতে হলেও ঠিক তেমনটি করেই বসাতে হবে। কিন্তু খোকনবাবু,

এটা প্রকাণ্ড ভুল। কারণ ঠাণ্ডা হওয়ার সময় জল অথবা তদনুরূপ পদার্থের প্রবাহ উল্টোদিকে বয়; ঠাণ্ডা জিনিস নিম্নগামী, সে ওপরের দিকে যায় না। লেমোনেডের পাত্রও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। তাই যখন লেমোনেডের পাত্র বরফের ওপর বসানো হয় তখন পাত্রস্থিত একেবারে নীচু স্তরের জলীয় অংশ বেশ ঠাণ্ডা হয় বটে, কিন্তু এই শীতলতা ওপরের স্তরে পৌঁছুতে বহু সময় নেয়। কারণ যে বায়ুটা বরফে শীতল হয় তা নীচের দিকে বইতে আরম্ভ করে তখন চারপাশ থেকে গরম বায়ুর আমদানি হয়। এই বায়ু, পাত্রটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখে। ফলে পাত্রের বৃহত্তর অংশটাই ঠাণ্ডা হতে পায় না। তাই বলি, তুমি যদি খুব কম বরফে বেশী ঠাণ্ডা করতে চাও তবে বরফ খণ্ড পাত্রের একেবারে মুখের ওপরে রাখ। যদি তোমার পাত্রের ঢাকনি না থাকে তবে মুখে একটি থালা চাপা দিয়ে তাতে বরফ রাখবে। এই উপায়ে লেমোনেড যে কত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে দেখে তুমি অবাক না হয়ে পারবে না। এভাবে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণ কি জান? কারণ—প্রথমে পাত্রস্থিত জলীয় পদার্থের উপরকার স্তরটা ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হতেই সেটা অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে নীচে নেবে যায়। ব্যস্, এর সংস্পর্শে এসে তৎক্ষণাৎ জলীয় পদার্থের পরের স্তরটি ঠাণ্ডা হয়ে নিম্নগামী হয়। এমনি করে পাত্রস্থিত সমস্ত তরল পদার্থ অবিলম্বে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে রাখবে, এর ওপরে, চারদিকের হাওয়াও বরফে ঠাণ্ডা হয়ে নিম্নগামী হয়ে পাত্রটিকে ছেঁকে ধরে।

এগুলো যখন রান্নাঘরের ব্যাপার আর পদার্থ বিজ্ঞারও বটে তখন কেনই বা পদার্থবিজ্ঞানী রান্নাঘরের সমস্যার সমাধান করতে এগোবে না, বল? এখন রান্নাঘরের আর একটি সমস্যার উল্লেখ করছি।

ধর, আমাদের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসতে বিলম্ব করছেন। তাদের জন্যে কফি গরম রাখা দরকার। কি করে রাখা যায়? চা-দানি অবশ্য আছে; কিন্তু চা-দানি বেশীক্ষণ গরম রাখতে পারবে না, এটা ঠিক। আর এটাও ঠিক যে, আমরা কফিটা ষ্টোভের ওপরেও বসিয়ে রাখতে পারি না; কারণ কফিটা তবে ফুটতে আরম্ভ করবে। তাহলেই যজ্ঞ নষ্ট আর কি! কফির স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। এ অবস্থায় অভিজ্ঞ কর্ত্রীঠাকরুণ কি করেন জান? তিনি একটা গামলায় জল ভরে সেটা উনুনে অথবা ষ্টোভে চড়িয়ে দেন আর সেই জলের মধ্যে কফির পাত্র বসিয়ে রাখেন। তিনি যদি একটু যত্ন নিয়ে ও কষ্ট স্বীকার করে এমনভাবে পাত্রটি জলে রাখতে পারেন যাতে পাত্রটি গামলার তলা না ছোঁয়—তবে তাঁর ভাবনার কিছুই থাকে না। তিনি যথেচ্ছভাবে এবং যতক্ষণ খুসী কফি ফেলে রাখতে পারেন। এভাবে কফি অত্যন্ত গরম থাকে। মজার ব্যাপার হলো এই যে, গামলার জল যতই কেন ফুটতে থাকুক না—কফি কক্ষনো ফোটে না।

কেন ফোটে না? কোন জলীয় পদার্থ ফুটাতে গেলে তাপ দিয়ে তাকে ফুটন্ত ডিগ্রিতে পৌঁছে দিলেই যথেষ্ট হয় না। আরো অনেক বাড়তি তাপ দিতে হয়। এই বাড়তি তাপ কিন্তু জলীয় পদার্থের তাপ বৃদ্ধি করে না। বাষ্প উৎপাদন করতে এর প্রয়োজন হয়। গামলার জল উনুন অথবা ষ্টোভ থেকে তাপ পায়। যখন জলটা ফোটে তখন সেটা ফুটন্ত ডিগ্রিতে থাকে এবং ১০০ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড-এর বেশী হতে পারে না। গামলার জল থেকে তাপটা ধীরে ধীরে কফির পাত্রে যেতে থাকে, যে পর্যন্ত না কফি ও গামলাস্থিত জলের তাপ সম ডিগ্রিতে পৌঁছে। এমনি করে কফি ও গামলার জল সমান গরম হলো। এর পরে ঐ জল থেকে তাপ আর কফি পাত্রে যাবে না; কারণ কেবলমাত্র তাপের অসমতা থাকলেই বেশী গরম থেকে অপেক্ষাকৃত কম গরম বস্তুতে তাপ গমন করে। কফি ফোটে না, ফুটতে পারে না। কারণ ফোটবার জন্যে যে বাড়তি তাপের দরকার সেটা সে পায় না। এই উপায়ে কফি খুব গরম থাকে অথচ ফোটে না।

এখন দেখা যাক্, কেন আমরা কফির পাত্র গামলার তলা বাঁচিয়ে বসাবো। কফি গরম রাখবার জন্যে যে তাপ আমাদের দিতে হবে সেটা কফির চতুর্দিকস্থ ঐ গামলার জলটা থেকে আমাদের দিতে হবে। কেননা জলের তাপ ফুটন্ত ডিগ্রি অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেডের ওপরে ওঠে না। অথচ গামলার তলাটা এর অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হয়ে যেতে পারে এবং যায়-ও। তাহলে গামলার তলা থেকে তাপটা সোজা কফি পাত্রে ঢুকে পড়বে, কফি তখন সানন্দে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে আরম্ভ করে দেবে। কিন্তু গিন্নীঠাকরুণ কফির পাত্র গামলার তলা বাঁচিয়ে বসালেও আমরা কিন্তু একটা কৌশল করে কফি ফুটিয়ে দিয়ে তাঁকে বিব্রত করতে পারি। কৌশলটা কিছুই কঠিন নয়। শুধু একমুঠো নুন ঐ গামলার জলে ছিটিয়ে দিতে হবে; তাহলেই চাকা ঘুরে যাবে। কারণ সাদা জলের চেয়ে লবণাক্ত জলের স্ফুটনাঙ্ক অনেক বেশী। অতএব এই জলের তাপ ১০০ ডিগ্রির ওপরে উঠে যাবে। তখন পাত্রস্থিত কফির তাপ এই জলের তাপ হতে কম হবে। সুতরাং জল থেকে তাপ আবার কফির পাত্রে ঢুকতে আরম্ভ করবে। তখন কফি এমনভাবে ফুটতে আরম্ভ করবে যেন পাত্রটাকে গামলার তলা ছুঁইয়েই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কি!

যাহোক, আমি তোমাদিগকে এ কৌশলটি পরিবেশন করলাম বলে যেন তুমি আবার তোমার মাকে এ করে বিরক্ত করো না! কৌশলটি বলার উদ্দেশ্য তা নয়। আমি বলেছি এজন্যে যে, ফুটন্ত লবণাক্ত জল দিয়ে আমরা একটা কৌতুক পূর্ণ ও অদ্ভুত রকমের পরীক্ষা করতে পারি। আমরা বরফ দিয়েও জল ফুটিয়ে দিতে পারি। বিশ্বাসই হচ্ছেনা, না? কিন্তু এটা একটুও মিথ্যে নয়। এসো, যে গামলাটায়

আমরা কফির পাত্র রেখেছিলাম সেটা থেকে পাত্রটা উঠিয়ে নিয়ে সেখানে ছবির মত একটা বোতল রাখি। বোতলটাতে আগে জল ভরে নিতে হবে কিন্তু। আমরা তো জানি বোতলের জলটা গরম হবে, কিন্তু ফুটবে না। এসো, আমরা জলটা ফুটিয়ে দিই। কি করে? কেন? এসো বোতলটা গামলার তলায় দাঁড় করিয়ে দিই। আর গামলার জলে একমুঠো নুন ফেলে দিই, তাহলেই কাজ হাঁসিল, কি বল? একটু পরেই দেখবে গামলার জল আর বোতলের জল দুই-ই সমানে ফুটছে।

তারপর এসো, আমরা গামলা থেকে বোতলটা তুলে নিই, আর বোতলের অর্ধেকটা জলে ফেলে দিয়ে খুব জোরে ওর মুখে ছিপি এঁটে দিই। এখন বোতলটাকে যদি ২নং ছবির মত উল্টো করে একটা ষ্ট্যাণ্ডের রিং-এর ওপর বসিয়ে দেওয়া যায় তবে জলটা একেবারে স্থির হয়ে থাকবে। কারণ অনেক আগেই তো জল তার ফোটার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে!

এবার আমরা খানিকটা বরফ বোতলটার ওপর রাখবো। বরফ রাখার পরে বোতলের ভেতর কি কাণ্ড ঘটবে বলতে পার? পারলে না তো? আমি বলি শোন—বোতলের জলটা ফুটতে আরম্ভ করে দেবে এবং তা ফুটেই চলবে।

ভারী অদ্ভুত—না? যে কাণ্ড গরম জলের (জলটা লবণাক্ত নয়) পাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তপ্ত হয়েও সংঘটিত হতো না, তা খানিকটা ঠাণ্ডা বরফ এক নিমেষে সম্পন্ন করে দিলে! বাস্তবিকই এটা একেবারে ধাঁধাঁর মত লাগছে। আরও বেশী গুলিয়ে দিচ্ছে এজন্যে যে, বোতলটা তেমন গরমও নয়, সেটা ঈষৎ উষ্ণ। কিন্তু যতই অদ্ভুত ঠেকুক নিজের চোখে যে দেখতে পাচ্ছি, বোতলের জল ফুটছে!
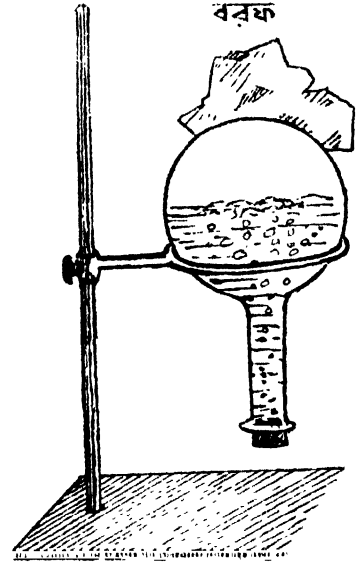
২নং চিত্র

কি করে এ অঘটন ঘটলো, বলছি। যখন আমরা বোতলের ছিপি এঁটে দিয়েছিলাম তখন তার ভেতরে কেবলমাত্র খানিকটা খুব গরম জল ও কিছু বাষ্প ছিল। এই বাষ্প বোতলের ভেতরের বায়ু প্রায় সব ঠেলে বার করে দিয়েছে। আমরা যে বরফ রেখেছি সেই বরফে বোতলের ধারগুলো খুব ঠাণ্ডা হলো। বাষ্প এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করতে পারলে না। সে প্রতিবাদ স্বরূপ সঙ্কুচিত হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে গেল। এমনি করে বোতলের বাষ্পটা উধাও হয়ে গেল। অতএব বোতলের অভ্যন্তরস্থ জলের ওপরকার বায়ু ও বাষ্পের জায়গাটা শূন্য হয়ে গেল। তাই জলের ওপরে সাধারণ বায়ুর চাপ আর রইলো না। তবে বাষ্পের যৎসামান্য চাপ তখনও একটু রয়ে গেল।

এজন্যেই জলটা পুনরায় ফুটতে আরম্ভ করে দিল। কারণ জলের ওপরে চাপ যত কম পড়ে তত কম তাপে জল ফোটে। বোতলের জলটা ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অবশ্য, তবুও কম চাপে ফুটে ওঠবার মত যথেষ্ট গরম আছে।

বোতল যদি খুব পাতলা হয় তবে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে দিলে বোতলটা ভেঙ্গে যেতে পারে। বাষ্পবিন্দুতে পরিণত হওয়ার দরুণ বোতলের ভেতরের চাপটা যখন অত্যন্ত কমে যায় তখন বোতলের ওপরে বাইরের বায়ুর চাপটা বেশ বেশী হয়ে পড়ে তাতে বোতলটা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যেতে পারে। সেজন্যেই ছবির মত বোতল অর্থাৎ ফ্লাস্ক ব্যবহার করা উচিত।

আমরা যদি বোতলের পরিবর্তে একটা পেট্রোল টিন ব্যবহার করি তবে বায়ুর চাপের ফলটা বেশ ভালভাবে দেখতে পাব। এমনি একটা টিনের ভেতর খানিকটা জল ফুটাও দেখি। যখন বাষ্প বেশ জোরে বেরোতে থাকবে তখন টিনটা আগুনের ওপর থেকে নাবিয়ে নিয়েই খুব ভালকরে ঢাকুনি লাগিয়ে মুখ বন্ধ করে দাও। তারপর টিনটার ওপরে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও। দেখবে—টিনটা বায়ুর চাপে তৎক্ষণাৎ এবড়োথেবড়ো হয়ে যাবে। এমনভাবে থেৎলাবে যে দেখে মনে হবে, ওটাকে যেন মস্ত একটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।
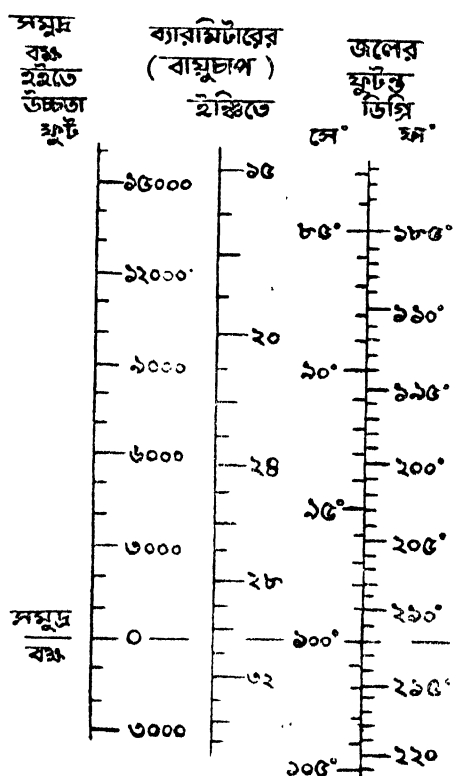
৩নং চিত্র

এই যে নিয়মটা দেখলে—যে নিয়মে বরফ দিয়ে জল ফুটানো গেল, সে নিয়মের আদত কথাটি ভুলোনা কিন্তু। সেটি হলো এই যে, বায়ুর চাপ যত কম তত কম তাপে জল ফোটে। হিসেবটা কিন্তু আরও একটা মস্ত কাজে লাগানো হয়। এই হিসেবেই সাধারণ একটা তাপ পরিমাপক যন্ত্র নিয়ে সমুদ্র বক্ষ থেকে সব জায়গার উচ্চতা মেপে নেওয়া হয়। তুমি যত উচুঁতে উঠবে তত বায়ুর চাপ কমে যাবে। এখানে ব্যারোমিটার অর্থাৎ বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্রের উচ্চতা আর জলের ফুটন্ত ডিগ্রি পাশাপাশি এঁকে দেওয়া হলো। (৩নং চিত্র) একটু লক্ষ্য কর, দেখবে যে, উল্লিখিত উচ্চতা ও ডিগ্রি সমুদ্র বক্ষ হতে ভূমির উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বদলে যায়। তাহলে দেখতে পাচ্ছো, সমুদ্র বক্ষ হতে কত উঁচুতে আছ তা বের করতে তোমাকে শুধু খানিকটা জল ফুটাতে হবে, আর

কত তাপে জলটা ফুটলো সেটা মেপে দেখতে হবে। তারপর, মাপের যে ছবি এঁকে দিয়েছি তাতে চোখ ফেলে একবার দেখে নেবে যে, তাপের অনুরূপ সমুদ্রবক্ষ হতে উচ্চতাটা কত। "ব্যস্, হয়ে গেল।

আরও একটা জিনিস আমরা দেখতে পেলাম। সেটা এই, আমরা যে ভেবে রেখেছি ফুটন্ত জল সব সময় অত্যন্ত গরম হবে তা একটা প্রকাণ্ড ভুল। তাই নাকি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে Mont Balnc-এর শীর্ষে জল মাত্র ৮৪ ডিগ্রিতে ফোটে। সেখানকার জলবায়ুর পর্যবেক্ষক কখনো ভাল চা অথবা কফি পান করতে পারেন না। কারণ উদ্দেশ্যের পক্ষে জল যথেষ্ট গরম হয় না। আরও দৃষ্টান্ত আছে—মঙ্গল গ্রহের বায়ুর ক্ষীণ আবরণীর চাপ মোটে পারদের আড়াই ইঞ্চির মত। সেখানে জল ঈষৎ উষ্ণ হলেই ফুটতে আরম্ভ করে। যদি একটা বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র দিয়ে জল থেকে বায়ু বার করে নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুহীন শূণ্য স্থানের সৃষ্টি করা যায় তবে সাধারণ তাপেই জল ফুটবে। পক্ষান্তরে, গভীর খনিতে বায়ুর চাপ ভূ-পৃষ্ঠের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশী, সুতরাং ফুটন্ত জল সেখানে বেশী গরম। নীচের দিকে নামতে থাকলে প্রতি হাজার ফুট নীচে ফুটন্ত ডিগ্রি এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে বেড়ে যায়। সেখানে ডিম সিদ্ধ করতে গেলে তটস্থ থাকতে হয়; পাছে ডিমটা সিদ্ধ হয়ে ভীষণ শক্ত হয়ে ওঠে! কারণ বাড়াতে ডিম সিদ্ধ করতে যা সময় লাগে ওখানে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে।

লতিকা দত্ত

বনচাঁড়াল গাছ

[গেল মাসে তোমাদিগকে বনচাঁড়াল গাছ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। দু একটি প্রবন্ধ পাওয়া গেলেও প্রকাশযোগ্য হয়নি। বনচাঁড়ালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার পাতার স্বতঃস্পন্দন। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই স্বতঃস্পন্দনশীল বনচাঁড়াল এবং স্পর্শকাতর লজ্জাবতী লতা সম্পর্কে বহুবিধ মৌলিক গবেষণা করে গেছেন। প্রকৃতপ্রশ্চাতে এই স্বতঃস্পন্দনশীল ও স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সমূহকে কেন্দ্র করেই উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী পরীক্ষাসমূহ পরিচালিত হয়েছিল। বনচাঁড়াল সম্বন্ধে তাঁরই নিজের লেখা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—স]

বনচাঁড়ালের নৃত্য

"জীবদেহের অংশবিশেষে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোন ঘটনাই বিনাকারণে ঘটে না। কিন্তু জীবনস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধান ফলে সম্ভবত জীবনস্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

*   *   *   *

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে, হাতের তুড়ি দিলেই, নৃত্য আরম্ভ হয়; গাছের সঙ্গীতবোধ আছে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমতঃ পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নলদ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তারপর দেখা যায় যে, উত্তাপে স্পন্দন সংখ্যা বর্দ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্যভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোন কোন উদ্ভিদ পেশীতে আঘাত করিলে সেই মুহূর্ত্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয় তখন শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। ক্ষনিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙ্গা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেককাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতা আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহাহইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কোন পথ—কামরঙ্গা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।" —আচার্য জগদীশচন্দ্র

গত বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কর্মসচিবের নিবেদন সহ আজীবন ও সাধারণ সদস্যগণের নামের প্রকাশিত তালিকায় মুদ্রাকর ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ যে সমস্ত সদস্যের নাম বাদ পড়েছে নিম্নে তাদের নাম দাওয়া গেল। এ ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত—

—কর্মসচিব

আ 17.
Sri Paresh chandra Bhattacharjee.
11. Toglac Road,
New Delhi.

আ 18.
Sri K. K. Sen.
4. Sonehri Bagh Road,
New Delhi.

আ 20.
শ্রীসতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
13/1. বণ্ডেল রোড।
বালিগঞ্জ। কলিকাতা।

আ 21.
শ্রীকানাইলাল সাহা
128/44. কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—4

আ 22.
শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ
18/28. ডোভার লেন।
বালিগঞ্জ। কলিকাতা।

আ 23.
Sri Makhamlal Some.
Superintendent of Colieries,
P. O. Bakaro. Hazaribagh.

আ 31.
শ্রীপ্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়
74. চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ।
কলিকাতা 20

আ 33.
শ্রীভগবানদাস আগরওয়ালা
পোঃ পাণ্ডবেশ্বর
জিং—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

সা 26.
শ্রীমোহিতকুমার রায় চৌধুরী
22/1. ফার্ণ রোড। বালিগঞ্জ।
কলিকাতা।

সা 88.
শ্রীবীরেন্দ্রলাল সেন
চারু ভীলা। পামার রোড।
কাশিয়াং। দার্জিলিং।

সা 169.
শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্তী
22 বি, ঝামাপুকুর লেন।
কলিকাতা 9

সা 300.
শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
পি 65 কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট।
শ্যামবাজার, কলিকাতা—4

সা 314.
শ্রীনির্মলচন্দ্র সিংহ
ইঞ্জিনিয়ার, কাশীপুর কোং লিঃ
পোঃ আলমবাজার, কলিকাতা—2

সা 349.
শ্রীসুকুমার পাল
24 বি, নলিন সরকার ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

সা 488.
শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়
77. আশুতোষ মুখার্জী রোড।
কলিকাতা—25

সা 551.
শ্রীসুশীলকুমার আচার্য
৮, নীলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট।
শ্যামবাজার, কলিকাতা—4

সা 556.
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন
45. রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
কলিকাতা 3

সা 562
Sri Subrata Dutta
D20, Agricultural Research Institute
New Delhi.

সা 580
Sri Sasibhusan Dutta.
Chemistry Dept.
Delhi University, Delhi.

সা 582
Sri Samarendra Banerjee
C/o Jharia Firebricks and
Pottery Works
P. O.. Dhansar, Dt. Manbhum

সা 588
শ্রীশ্যামলেন্দু দত্ত
74/1. তালপুকুর রোড
বেলেঘাটা। কলিকাতা—10

সা 598
শ্রীসুধাংশু বরণ মিত্র
18, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা—6

সা 595
শ্রীশান্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায়
গর্জ্জমান চা বাগান
পোঃ বানারহাট। জলপাইগুড়ি।

সা 596
শ্রীশান্তি কুমার নিয়োগী
9, নিয়োগী পাড়া। আতপুর
পোঃ শ্যামনগর। 24 পরগণা

সা 653
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর বাংলা। 25, বলরাম দে ষ্ট্রীট।
কলিকাতা—6

সা 656
Sri Surapati Chakraborty
P. O. Rambha
Dt. Gamjum. B. N. Ry.

সা 662
শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র দত্ত
5, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা 29.

সা 664
শ্রীশিবদাস ঘোষ
64, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

সা 665
Sri Sisir Kumar Gupta
Deputy Commissioner,
The Andamans
Port Blair, Andaman.

সা 683
শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়
5/এ, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা।

সা 684
শ্রীবিনয় ভূষণ সিংহ
6/1/এ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সা 685.
শ্রীশিবেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
68 সি, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড
তালতলা। কলিকাতা।

সা 703.
শ্রীনিতাইলাল দত্ত
33/2 বিডন ষ্ট্রীট। কলিকাতা—6

সা 745.
শ্রীহীরেন্দ্রমোহন মিত্র
60/1, হাজরা রোড।
বালিগঞ্জ। কলিকাতা।

সা 748.
শ্রীশান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী রিসার্চ অফিসার,
ইনল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ ষ্টেশন
পোঃ বারাকপুর। 24 পরগণা।

সা 755.
শ্রীশান্তিদাশঙ্কর দাশগুপ্ত
21, যতীন দাশ রোড।
(দোতলা) কলিকাতা—29

সা 764.
শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ
90 পার্ক ষ্ট্রীট।
পার্ক সার্কাস। কলিকাতা।

সা 772
Sri Subodh Kumar Mazumder
Principal,
Darjeeling Govt. College
Darjeeling

সা 781.
শ্রীসুবলচন্দ্র রায়
20/ডি, হাজরা রোড।
কালিঘাট। কলিকাতা।

সা 791.
শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত
13/1 রিচি রোড।
কলিকাতা 19.

সা 800.
Sri Bimalananda Roy
Soil Survey Supervisor,
Conservation and Land Management Division
Anderson House, Alipore
Calcutta.

সা 811.
শ্রীলোছু পোছালী
যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
পোঃ যাদবপুর কলেজ।
কলিকাতা 32

সা 812.
শ্রীশ্যামাদাশ নাগ
225 বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা 6.

সা 829
Sm. Santisukh Chandra
C/o Sri S. K. Chadra,
Under Secretary, Revenue Dept.
Govt. of Behar, Patna.

সা 852
Sri Sivanath Ghosal
Executive Engineer's Office
Cossye Division., Midnapore.

সা 856
শ্রীশিবপ্রসাদ সামন্ত
5/এ, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা 9.

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ | এপ্রিল—১৯৫০ | চতুর্থ সংখ্যা

কালের স্বরূপ

শ্রীনলিনীগোপাল রায়

অতি দূর অতীতে লক্ষ লক্ষ যুগান্তের পরপারে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে ছিল পরমাণুর মহাসমুদ্র। আর সেই সমুদ্রের চারদিকে ছিল নিবিড় নিস্পন্দ অন্ধকার, পরমাণুপুঞ্জের আশার বেদনায় কণ্টকিত। তাদের সমগ্রতার পিপাসায় মিলনের আকুল আগ্রহে সেই নিস্পন্দ অন্ধকার পারাবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই চঞ্চলতাই গতির প্রথম প্রকাশ। তাকেই কেন্দ্র করে ব্রহ্মাণ্ডের পরমাণু সমুদ্রে যে অপরূপ ছন্দ ফুটে উঠেছিল—কে জানতো যে, আজ তাই সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টির সঙ্গীতে ভরে উঠবে ?

গতির এই প্রথম ইতিহাসই কালের আদি ইতিহাস। কারণ গতির মারফতেই আমরা কালের চঞ্চলতা উপলব্ধি করি। কৈশোরের বৃন্তে যখন যৌবনের মঞ্জরি ফুটে উঠে, নিবিড় যৌবনের পথ ধরে যখন অসহায় বার্ধক্য দেখা দেয় তখনই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় সময়ের অস্থিরতা। তার নিজের কাছে এই চলার বিশেষ কোন অর্থ নেই; কিন্তু তার চলারও বিরাম নেই, তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

তার পথের দুপাশে কত সাম্রাজ্য উঠলো, পড়লো। কত বিচিত্র ইতিহাস তৈরী হলো কত অতীত ভবিষ্যতের সৌন্দর্যে ফুটে উঠলো। কত ভবিষ্যৎ অতীতে বিলীন হলো। তাদের স্মৃতি রেখে গেল কেবল ঘটনার বুকে। এই ঘটনার ভাষাতেই প্রথম সময়ের ইতিহাস লেখা হলো। কিন্তু বিজ্ঞানী তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি চান অঙ্কের রেখায় একটা হিসেব। এই আঙ্কিক হিসেব এলো Law of Entropy বা মাত্রাবাদের আবিষ্কারের পর।

কাল সচল ও প্রগতিশীল (Forward moving)। তার গতির পরিমাণ হচ্ছে Entropy-র বৃদ্ধি বা হ্রাসে। Sir Eddington দেখিয়েছেন, বিশ্বের মূলে ছিল Organization বা সংগঠন শক্তি। সেখানে দৈব-উপাদান বা Random-element ছিল খুব কম। কাল যতই এগিয়ে চলেছে, Entropy-র সংখ্যা ততই বেড়ে চলেছে। Entropy-র এই সংখ্যা বৃদ্ধি থেকেই আমরা জানতে পাই, সময় চলেছে এগিয়ে। যদি পিছন দিকে অর্থাৎ আদি সূচনার দিকে তার গতি হতো তাহলে তার Entropy র সংখ্যা হতো দিন দিন কম। সুতরাং অঙ্কের রেখায় বিজ্ঞানী ঠিক করে নিলেন—সময় চলেছে কোন্

দিকে, আর কোথায়ই বা তার নির্বাণ। তারা আরও ঠিক করলেন—সময়ের নির্বাণই বিশ্বের নির্বাণ, ব্রহ্মাণ্ডের শাসন থেকে তার মহামুক্তি। কারণ সময় যখন চলেছে একটানা ভবিষ্যতের দিকে তখন বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে Organization বা সংগঠনশক্তির কথা বলা হয়েছে, Entropy র আইন অনুসারে তার ধ্বংস হতে থাকবে। বিনিময়ে সৃষ্টির অন্তর্দেশে Random-element-এর সংখ্যা যাবে বেড়ে। বহুদিন পর এমন একদিন আসবে যখন সমস্ত সংগঠন-শক্তির ধ্বংস হয়ে বিশ্ব কেবল দৈব-উপাদানে অর্থাৎ Random-element বা Entropyতে পূর্ণ হয়ে যাবে। সেখানেই হবে বিশ্বের যবনিকা।

কাল, স্থান থেকে অবিচ্ছিন্ন। তাদের পারস্পরিক বন্ধন শাশ্বত। স্থানের বাইরে কালের ধারণা আমাদের নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীর খাতায় তার আভাসও মিললো। তারা এমন একটা কালের সন্ধান পেয়েছেন যা স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন; স্থানের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে অসীমের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে। এই কালের ধারণা একটু অসাধারণ। অনুভূত কাল বা Time perceived আর অত্যয়িত কাল বা Time lived, দুটো পৃথক সত্তা।

সকাল ৮ টার সময় কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আবার সন্ধ্যা ৮ টায় তার সঙ্গে দেখা হলে আমাদের উভয়েরই বয়সের মাপ যে ১২ ঘণ্টা বেড়ে যাবে, তা নয়। কারণ বয়স নির্ভর করে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া বা Bodily process-এর উপরে। যার শারীরিক ক্রিয়া যত কম তার বয়স বাড়বে তত কম। এই শারীরিক ক্রিয়া স্বাধীন নয়, তার নির্ভর—গতি বা Speed এর উপর। যার গতির পরিমাণ যত বেশী তার শারীরিক প্রক্রিয়াও তত ধীর, তার বয়স বাড়বে তত আস্তে। কেউ যদি অতি বিপুল কোন বেগবান যানে কিছুকাল ভ্রমণ করে ফিরে আসেন তাহলে তার অবস্থা হবে অনেকটা Rip Van Winkle-এর মত। ফিরে এসে তিনি দেখবেন, তার বন্ধুবান্ধব তখন সব আশীর কোঠায়। আর তিনি তখনও বিশ বছরের অশান্ত যুবক।

"It is well known from both theory and experiment that the mass or the inertia of the matter increases when velocity increases. Retardation is a natural consequence of the greater inertia. Thus so far as the bodily processes are concerned, the fast moving traveller lives more slowly than the man at rest. His cycle of digestion and fatigue, the rates of muscular response to stimulus, the development of his body from youth to age, the material process of his brain which must keep pace with the passage of thought and emotions-- all these must be slowed down in the same ratio."

—Nature of the Physical World

-- Eddington p. 48

মহাকবি Goethe-র বোধ হয় এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটা অজানা ছিল না। তাই তিনি তার Faust-কে Mephistopheles এর সঙ্গে ছেড়ে দিলেন বিপুল বেগের অধিকার দিয়ে। সেই গতির বেগে যৌবনের কাছে জরার হলো পরাজয়।

কিন্তু এই গতির সঙ্গে প্রতিগতি বা Retardation এর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। সেটা কিন্তু জ্ঞান বিবর্তন বা Evolution of intellect-এর অনুকূল বলে মনে হয় না। কারণ গতির উদ্দামতায় শারীরিক ক্রিয়া যখন মন্থর, মস্তিষ্কের কাজও তখন অলস—প্রগতি সেখানে নির্গতি। ফলে মানুষ তার মৌলিকতা হারিয়ে, সংস্কৃতি হারিয়ে নোঙ্গর ছেঁড়া নৌকার মত দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। মানবতার সেদিন হবে চরম পরাজয়।

বিশ্বের সূচনায় যে Organization বা সংগঠন রয়েছে তার উপমা দেওয়া চলে বিলে বাঁধা সুতার সঙ্গে। কাল তাকে নিপুণ শিল্পীর মত সুশৃঙ্খলিত-ভাবে মুক্ত করে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য নেই, খামখেয়ালী নেই। চারদিকে সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার অপূর্ব এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোন এক স্থানে আঘাত দিলে গোটা বিশ্বে হবে তার অনুরণন।

"Thou can'st not stir a flower without troubling of a star."

ভবিষ্যতে যা হবে অতীতে তার বীজ উপ্ত হয়ে আছে। তাকে কেউ রদ করতে পারবে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গাঁথা। আগামী কালের ভবিষ্যৎ গতকালের অতীতের তৈরী। বর্তমান ও ভবিষ্যতের যা কিছু সম্বল তা অতীতেরই দান। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, আশা-আকাঙ্খা, সাধনা ও ত্যাগের উপরেই ভবিষ্যতের সৃষ্টি।

অতীতের এই অভিজ্ঞতার পথ ধরেই ইতিহাস এগিয়ে চলে ও আপন সার্থকতায় ধন্য হয়। নূতন থেকে নূতনতর হয় তার দান। তার পুনরাবৃত্তির দৈন্য তার অপবাদ মাত্র। সমস্ত বস্তুজগৎ যখন এগিয়ে চলেছে, ইতিহাস তখন নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। কারণ ইতিহাস বস্তুরই চালচলনের হিসেব মাত্র। বিশ্বের প্রতিটি মুহূর্ত সচল। এই মুহূর্তে যে "মুহূর্ত" চলে গেল আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। ঘটনা বা Happenings, স্থান কালের সঙ্গে যা অবিচ্ছিন্ন -সে-ও তেমনি চলমান অতীতের সঙ্গেই বিলীন হলো অতীতের কোলে—মহানির্বাণে। অন্য যে মুহূর্ত তার স্থান নিল, সে নিয়ে এল তার নিজের ঘটনা- যে তারই সঙ্গে স্থান-কালের সম্বন্ধে বাঁধা। তাদের বাহ্যিক আকৃতি বা ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যে যতই সাদৃশ্য থাক না কেন, তারা সম্পূর্ণ পৃথক সত্বা। যেমন যমজ সন্তানের আকৃতি বা চরিত্রগত সাদৃশ্য যতই থাক না কেন, তারা পৃথক সত্তা। ঘটনার বেলাতেও ঠিক তাই। কাজেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি একটা বৈজ্ঞানিক অসত্য। মানব সমাজে তার সার্থকতা নেই। যে ইতিহাস পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে যায়, নূতন কিছু দিতে পারে না, তার প্রয়োজনই বা কোথায়?

এই যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র বর্তমান বিজ্ঞানে তার চিরাচরিত প্রতিবাদও সুরু হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠারই সূচনা। যে কোন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠার উপক্রমণিকা গড়ে উঠেছে অবিশ্বাস ও প্রতিবাদের উপরে। Quantum theory বা মাত্রাবাদের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তারা লক্ষ্য করলেন, Light-quanta বা আলোক মাত্রার অসাধারণ ব্যবহার। "স্থান-কালের আইনে" তারা এই Quanta র গতি নিরূপণ করতে পারলেন না। Corpuscular theory বা Wave theory—কোন শাসনেই তারা বাঁধা পড়লো না। কাজেই তারা হলো বৈজ্ঞানিক মতে মূর্তিমান Free-will। সুতরাং Determinism-এর একাধিপত্যে আঘাত পড়লো। বিশ্বের অন্তরের পারম্পরিক অবিচ্ছিন্নতার বিশ্বাসও মলিন হয়ে এল।

--Quantum process is discontinuous.

কিন্তু কাল সত্যের সারথি। বিশ্ববস্তুর মধ্যে পারম্পরিক সম্বন্ধের অবর্তমানে বিশ্বের বিবর্তন অসম্ভব। পূর্ব অনুভূতির অভিজ্ঞতায় যদি বর্তমান অনুভূতি লাভবান না হতো—তাহলে সভ্যতা বা ক্রমবিকাশ হয়ে থাকতো গতিহীন। তার এই বিপুল সম্ভাবনা আজ অসম্ভবের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকতো।

বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের ইতিহাসে এমনি এক একটি সংশয়ের সঙ্কট উপস্থিত হয়। Light theory বা আলোক রশ্মির গতিবিধি নিরূপনের বেলাতেও এমনি এক সঙ্কট এসেছিল। আলোকের Corpuscular বা কণিকা-ধর্মের ধারণা যখন স্থানে স্থানে অচল বলে' আবিষ্কৃত হলো—(After

discovery of the laws of interference of light after which the wave theory was overthrown by Huyghens and Maxwell)—তখনও একদল বিজ্ঞানী প্রতিবাদ-মুখর হয়ে উঠে ছিলেন; কিন্তু অন্য সম্প্রদায় রইলেন শান্ত, অচঞ্চল। ধীর অধ্যবসায়ে চললেন তাঁরা সত্যের সন্ধানে। অবশেষে অসামঞ্জস্য মিললো Wave theory বা তরঙ্গ-ধর্মের আবিষ্কারে। তখন কার্য-কারণের (Cause and Effect বা Causality) আইনে তাকে বাঁধা সম্ভব হলো। সমস্ত সংশয়ের প্রতিবাদও নির্বাক হলো। তেমনি এই বর্তমান সংশয়েরও আবছায়া কেটে যাবে। বিজ্ঞানই হবে তার সারথি।

এ বিষয়ে আমরা অধুনাতম বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের মতবাদের একটু উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন—

"It is not the laws of causation itself that is broken down in modern Physics but the traditional formulation of it. The traditional formulation hither-to followed, is not perfect and requires re-adjustments.—Where is Science going.—Max Planck.

অর্থাৎ কার্যকারণ বিধির পরিবর্তন হয়নি। পতন হয়েছে তার পূর্বাচরিত গাণিতিক সূত্রের। সেই সূত্রকে আমরা এতদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে জেনে এসেছি। সেটা ভুল। এখন তাকে নূতন-ভাবে সাজাতে হবে।

কালের ধর্ম, বিশ্ববস্তুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—সত্যের দিকে, আত্মপরিণতির দিকে, বিশ্ববস্তুর পারস্পরিক যোগ বা মিলনের দিকে। এই মহা-যোগেই যেমন বিশ্বের প্রথম সূচনা—এই মহা-মিলনেই তেমনি যুগে যুগে কত বিচিত্র চিন্তা ধারার আবির্ভাব হয়েছে। তারা সব মিলেছে কালের মহাসমুদ্রে, সূচনা করেছে ভবিষ্যৎ সভ্যতার। যাঁরা সভ্যতার নৈষ্ঠিক পুরোহিত "তাঁদের ইচ্ছার গতি, কর্মের গতি ছিল আগামী কালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যৎ আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু আবদ্ধ হয়নি।" সমস্ত সাধনা, সমস্ত গতি নিয়ে চলেছে নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে পূর্ণ বিকাশের আকাঙ্ক্ষায়।

জীবরাজ্যে আমরা দেখি—মানবদেহের বিকাশ বাল্য-কৈশোর, যৌবন-বার্ধক্যের ধাপে ধাপে চলেছে মৃত্যুর দিকে। উদ্ভিদ দেহের বিকাশ—পল্লবে, ফুলে ও ফলে। পরিণতি তার ঝরে পড়ায়। সেইটেই তার মৃত্যু। সুতরাং বিকাশের চরম পরিণতি যদি মৃত্যু হয়—জানি না এই মহাসভ্যতার চরম বিকাশ হবে কোথায়!—হয়তো সুদূর ভবিষ্যৎ কালের খাতায় তার হিসেব মিলবে।

"ফলে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা—নেচারে ইউনিফরমিটি—একটা সত্য এবং অতি প্রাকৃতের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি মাঝে মাঝে যে আক্রমণ হয়, তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না। যাহা কিছু জ্ঞানগোচর তাহাই প্রকৃতির অঙ্গ, তাহা যতই অদ্ভুত হউক না, তাহা প্রাকৃত, তাহা অতিপ্রাকৃত কিরূপে হইবে? অভিনব অদ্ভুত ঘটনা, যাহাতে মানুষ বিশ্বাস করিতে চায় না, যাহা পূর্ব্বে কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই তাহা অলীক ও অমূলক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে প্রাকৃত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হয় না। কোন্ নিয়মের অনুযায়ী তাহা শীঘ্র বাহির হইতে না পারে; কিন্তু কালে বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—ভূয়োদর্শন এরূপ বলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিপত্রে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে।"—রামেন্দ্রসুন্দর

দ্বিতীয় রিপু

শ্রীঅনীতা মুখোপাধ্যায়

কানু খেলা দেখতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। রাত ৯টা বেজে গেছে। কানুর বাবা ডাঃ মিত্র রেগে গেছেন। ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কানুর ছোট বোন আজ কয়েকদিন কঠিন রোগে ভুগছে। ডাঃ মিত্র কানুকে বারবার বলে দিয়েছিলেন যে, সকাল সকাল বাড়ী ফিরলে তিনি রোগী দেখতে বেরোবেন। কিন্তু হতভাগা এখনও এলোনা। থেকে থেকে ফোনে ভেসে আসছে রোগীদের বাড়ী থেকে ব্যগ্র প্রশ্ন—ডাক্তারবাবু এখনও আসছেন না কেন?

দরজাটা খুলে কানু এসে ঘরে ঢোকে। তাকে ধমকাতে গিয়ে ডাঃ মিত্রের মনে পড়ে যায় বাড়ীতে একজনের অসুখ, গণ্ডগোল করা উচিত নয়। অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে নেন তিনি।

পরের দিন, হাসপাতাল যাওয়া হলো না ডাঃ মিত্রের। অফিসে ফোন করে জানালেন তিনি—অত্যন্ত মাথা ধরেছে তাঁর—আর তার সঙ্গে আছে অসম্ভব সর্দি ও হাঁচি। ডাঃ মিত্রের কিন্তু এটা নতুন নয়—রাগ চাপলেই তার হয় সর্দি, কাশি ও হাঁচি।

শুধু ডাঃ মিত্রই নয়, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কখনও না কখনও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় শারীরিক অসুস্থতারূপে। কারুর বেলায় দেখা যায়, চেপে যাওয়া রাগ প্রকাশ পাচ্ছে—বদহজমের রূপ নিয়ে—কারুর বা পৃষ্ঠ-বেদনা রাগ চেপে যাওয়ারই ফল। বিজ্ঞানীরা বলেন রাগের ফলে উচ্চ রক্তচাপ বা মাথাধরাও কিছু বিচিত্র নয়।

রাগের কুফল কারুরই অজানা নয়। কত না বন্ধুত্বে এসেছে ভাঙ্গন—কত সুখের সংসার তছনছ হয়ে গেছে এই রাগের ফলে! কিন্তু তবু—আমরা রাগি কেন?

মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—মোটামুটিভাবে বলতে গেলে রাগ হচ্ছে জীবনধারণের (Survival) একটা উপায়; বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার বা শান্তিভঙ্গকারীর সঙ্গে লড়বার একটা জৈব-প্রবৃত্তি মাত্র।

শারীরতত্ত্বজ্ঞের মতে রাগ আর কিছুই নয়—দেহে হঠাৎ এক ঝলক অ্যাড্রিনালিন নিঃসরণ, যার ফলে আমাদের দেহে এবং মনে আসে জয়লাভ করার নতুন উদ্যম, ইচ্ছা ও শক্তি।

কাজেই যখন ডাঃ মিত্র দেখলেন কানু তার নির্দেশ অমান্য করেছে—অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে—তখনই তিনি রেগে উঠলেন। কিন্তু মানুষ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে ততই দেখছে, কোন কাজ করার আগে যুক্তির সাহায্যে বিচার করা অনেক সুবিধা এবং সুরুচির পরিচায়ক। সেই জন্যেই ডাঃ মিত্র রেগে উঠেও রাগটাকে চেপে গেলেন মেয়ের অসুখের কথা ভেবে। অথচ দেহে একবার অ্যাড্রিনালিন নিঃসৃত হলে তার বহিঃপ্রকাশ হবেই, তা সে স্বাভাবিকভাবেই হোক আর অস্বাভাবিকভাবেই হোক। সেই কারণেই ডাঃ মিত্রের রাগটা প্রকাশ পেল সর্দি, কাশির রূপ নিয়ে।

অনেক সময় রাগ আবার শারীরিক অসুস্থতার রূপ না নিয়ে রাগ হিসেবেই প্রকাশ পায়—কেবল রাগের পাত্র যায় বদলে। বাবার কাছে বকুনি খাবার পরে অনেক দাদাই তো ছোট ভায়ের উপর ঝাল ঝেড়ে নেয়। খানিক বাদে কিন্তু দাদা নিজেই ভেবে পায় না, কেন এমন হলো? এটা

হলো শুদ্ধ এইজন্যে যে, বাবার ওপর যে রাগটা হয়েছিল সেটা প্রকাশ করা যায়নি।

কিন্তু তাহলে উপায় কি? রাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তি। বেঁচে থাকতে গেলে কখনও না কখনও অপমানিত হতে হবে—রাগ হবে। এমনও হতে পারে যে, সে রাগ আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না ভদ্রতার খাতিরে বা নিজেদেরই স্বার্থে। সে ক্ষেত্রে কি শারীরিক অসুস্থতা বা ঐ রকম একটা কিছু বিসদৃশ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে বাধ্য হয়ে?

না, তা নয়। রাগকে ধুয়ে মুছে মন থেকে পরিষ্কার করে ফেলার অনেক নিরাপদ উপায় আছে। আমরা রাগকে তখন চেপে গিয়ে পরে কোনও সুবিধাজনক পাত্রের ওপর প্রকাশ করে দিতে পারি। নদীতে ঢিল ছুঁড়ে, কাঠ কেটে, রাগ, অপমান এসবের বহিঃপ্রকাশ করে দিতে পারি। অবশ্য এসব উপায় যেন ব্যক্তিগতভাবেই পছন্দসই হয়—এবং সুরুচিসঙ্গত হয়। দুমদাম করে দরজা, জানলা বন্ধ করা বা বেড়াল, কুকুর ধরে মারা—এসবও সাময়িকভাবে রাগের বহিঃপ্রকাশে সাহায্য করে বটে—কিন্তু পরে এসবের কথা মনে পড়লেই লজ্জা হয়—তারপরেই আবার রাগ হয়।

উত্তেজনামূলক খেলাধূলা, যেমন ফুটবল বা কুস্তি দেখলেও অনেক সময় কাজ হয়। অনেকে বলেন, হাল্কা ধরনের সিনেমা (লরেল-হার্ডির বইএর মত) রাগের নিরাপদ বহিঃপ্রকাশে অব্যর্থ।

আর একটা উপায় হচ্ছে নিজেকে নীচের প্রশ্নগুলি করা ও তার জবাব দেবার চেষ্টা করা। যেমন:—

১। আমার রাগ হলো কেন?

২। রাগের কারণটা কি দূর করা যায় না? যদি যায় তো চেষ্টা করা যাক না। যদি না যায় তো আমার দেহের অ্যাড্রিনালিনটা অন্য কোন উপায়ে খরচ করি না কেন?

এই প্রশ্নোত্তরেই বোঝা যাবে, আমার রাগ করাটা এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কিনা। যদি রাগ করা উচিতও হয় তাহলেও সেটাকে সুষ্ঠু এবং নিরাপদ বহিঃপ্রকাশের পথ করে দিতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে—রাগ তখনই ক্ষতিকারক যখন এর প্রকাশের কোন পথ নেই। সুতরাং আমাদের সকলেরই উচিত খেলাধূলা বা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের একান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—রাগের প্রকাশের পথ করে দিয়ে অস্বচ্ছন্দ এবং অপ্রীতিকর অবস্থার হাত এড়ান।

"* * * আমাদের ভূয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? কে বলিল জগৎ-যন্ত্র গত শত বৎসর যাবৎ যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? সূর্য্য এতকাল যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সে নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? সকলে মরিয়াছে বলিয়া আমাকে মরিতে হইবে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সূর্য্য সম্ভবতঃ কাল উঠিবে, সম্ভবতঃ আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় আছে। নিয়মের শিকল পরমুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আজ যাহা নিয়ম, কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে।"

—রামেন্দ্রসুন্দর

.চরম শৈত্য ও উষ্ণতার পরম শূন্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

এই অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই আছে যে, তাপ প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা বাড়ে ও তাপের অপসারণ বা শৈত্য প্রয়োগে উষ্ণতার হ্রাস হয়। জল গরম করিলে তাহার উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে যখন ১০০° সেন্টিগ্রেডে আসে তখন জলের ফুটন আরম্ভ হয়। আরও তাপ প্রয়োগে সমস্ত জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় ও পরে বাষ্পের উষ্ণতা ১০০°র উপরে উঠে। অপর দিকে, জল শীতল করিতে থাকিলে উহার উষ্ণতা ০° সেন্টিগ্রেডে নামে। তখনই জল বরফে পরিণত হইতে থাকে। এই বরফ আরও শীতল করিলে উহার উষ্ণতা শূন্যের নিম্নে নেগেটিভ অংকে নামিতে থাকে। তাপের এই গুণ জড় পদার্থের তিন অবস্থাতেই দেখা যায়। কোন কোন পদার্থ সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন—যেমন লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি ধাতু। তাপ দিলে ইহারা গলে ও তরল অবস্থা হইতে অধিকতর তাপে গ্যাসীয় অবস্থায় নীত হয়। আবার কঠিন ধাতুটিকে আরও শীতল করিলে উহার অবস্থা পরিবর্তন হয় না বটে, তবে উষ্ণতা কমিতে কমিতে শূন্য অংকের নীচে চলিয়া আসে।

এখন প্রশ্ন এই যে, উষ্ণতার নেগেটিভ দিকে কতদূর যাওয়া চলে? শৈত্য প্রয়োগে বা তাপ অপসারণের ফলে পদার্থটি কি শীতলতার শেষ সীমায় পৌঁছাইবে না? এ অবস্থায় উহা হইতে আর তাপ অপসারণ করা চলিবে না। পদার্থের এই চরম শৈত্যের স্বরূপ কি? উষ্ণতার এই পরম শূন্য অবস্থার লক্ষণই বা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর বিগত শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রদান করিয়াছে। শূন্য সেন্টিগ্রেড ডিগ্রির নিম্ন-দিকে এক নেগেটিভ অংক আছে; তাহার নাম উষ্ণতার পরম শূন্য (Absolute zero of temperature)। উহার অবস্থান -২৭৩° সেন্টিগ্রেডে। এখানে উপস্থিত হইলে কোন পদার্থ হইতেই আর তাপ অপসারণ করা যায় না; অর্থাৎ কোন পদার্থকেই ইহা অপেক্ষা শীতল করা যায় না।

এই তথ্য সম্যক বুঝিতে গেলে পদার্থমাত্রেরই উষ্ণতার কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অভিমত বিবেচনা করা প্রয়োজন। জড় পদার্থের অভ্যন্তরস্থ অণু-সমূহ সতত সঞ্চরণশীল। স্থির ইহারা কখনই নহে। পদার্থের অবস্থাত্রয়ে আণবিক চাঞ্চল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় মাত্র; ইহার বিরতি কখনও ঘটে না। এই চাঞ্চল্য কঠিন অবস্থায় স্বল্প; তরলাবস্থায় ইহা বর্ধিত হয় এবং গ্যাসীয় অবস্থায় ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক। কোন পাত্রে আবদ্ধ গ্যাসের অণুসকল নানাদিকে প্রধাবিত হয়। এই ধাবন-বেগ অতি প্রচণ্ড। সাধারণ উষ্ণতায় বায়ুর অণুর গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১৩০০ ফুট। অনবরত চলার ফলে অণুগুলি পরস্পরের গায়ে কিংবা আধারের গায়ে প্রহৃত হয়। প্রহৃত হওয়ার পরই আবার অভিযান চলে নব নব দিকে, নবতর গতিবেগে। তবে সকল অণুর গতিবেগ সমান নহে। এই গতিবেগের এক উচ্চতম ও এক নিম্নতম সীমা আছে। হিসাবের সুবিধার জন্য এক গড় গতিবেগ ধরা হয়। প্রত্যেক অণুর সেই গড় গতিবেগ ধরিলে কোন পদার্থের উষ্ণতা উহার অণুসকলের গতিবেগের হিসাবে প্রকাশ করা যায়। আবার অণুর গতিবেগ গ্যাসের উষ্ণতায় নিয়ন্ত্রিত। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে অণুর গতিবেগ বর্ধিত হয়। আবার শীতলতা বৃদ্ধির সঙ্গে আণবিক গতি মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে থাকে। কোন প্রক্রিয়ায় এই আণবিক গতি স্তব্ধ হইলেই পদার্থের যে উষ্ণতা প্রাপ্তি ঘটিবে তাহাই পরম শূন্য অবস্থা।

এই অবস্থার ধারণা হওয়ামাত্রই বিজ্ঞানীর সকল প্রচেষ্টা উহার সান্নিধ্যলাভে ব্যাপৃত হইল। তাহাতেই আরম্ভ হয় শীতলতা সম্পাদনের সর্বপ্রকার সাধনা। ইহারই ফলে এখন অনেক দেশেই শৈত্য উৎপাদনের জন্য গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। কি প্রকারে পরম শূন্যে উপনীত হওয়া যায় ও উহার সন্নিকটে পদার্থের কি অবস্থা ঘটে, তাহার সম্বন্ধেই নানা পরীক্ষা ঐ সকল গবেষণাগারে সাধিত হইতেছে। কিন্তু এই সাধনার পথে এক বিরাট বাধা বর্তমান। এই বাধার স্বরূপ একটি উপমার সাহায্যে সহজ-বোধ্য হইবে। আমি যেন এক নদীর তীরে পৌঁছাইবার জন্য সেইদিকে অগ্রসর হইতেছি। তবে যে রাজ্যে আমার এই কল্পনার নদীটি ও আমি রহিয়াছি, সেই রাজ্যের এক উদ্ভট নিয়ম আছে। সেই নিয়মানুসারে আমি নদীতীরের যতই সমীপবর্তী হই, আমার গতিবেগ ততই হ্রাস পাইতে থাকে; আর সেই হ্রাসের হিসাব এইরূপ যে, নদীতীর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমার গতিবেগ লোপ পাইবে। সুতরাং দূর হইতে যে নদীতীর সহজগম্য মনে হইয়াছিল, অগ্রসর হইতে হইতে তাহা অনধিগম্য মনে হইবে। উষ্ণতার পরম শূন্যে পৌঁছাইতে বিজ্ঞানীও সেই অবস্থায় পড়িয়াছেন। বর্তমান সময়ে নানা প্রচেষ্টার ফলে পরম শূন্য হইতে ১/১০০০ ডিগ্রির ব্যবধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবধান যতই হ্রাস করার উদ্যোগ হইতেছে, দূরতিক্রম্য বাধা বিপত্তিতে উদ্যমের গতিবেগও ততই মন্দীভূত হইতেছে। পথের যেটুকু বাকি আছে তাহার ১/১০০০ অংশ অতিক্রম করিতেও যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহার সাহায্যে পরম শূন্য হইতে দূরে অবস্থান কালে ২০/৩০ অতিক্রম করা চলিত। এই হিসাবে এই প্রচেষ্টার অবসান কবে ঘটিবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

এই শৈত্যানুসন্ধানের কাজ কি ভাবে চলিয়াছে তাহার আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের আবহাওয়ার সাধারণ উষ্ণতায় বহু পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান দেখা যায়। যে বায়ু আমাদের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তাহা এই জাতীয়। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক যে দুইটি গ্যাসের রাসায়নিক সংশ্লেষণে জল উৎপন্ন হয়, তাহারাও আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থায় ও উষ্ণতায়, গ্যাসীয়। যে উষ্ণতায় এই সকল গ্যাস তরলাবস্থা হইতে গ্যাসে পরিণত হয়, তাহা শূন্যাংকের (বরফের উষ্ণতা) অনেক নিম্নে। যে প্রকার শৈত্যে ইহারা তরল বা কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা ধারণা করাও দুঃসাধ্য। এই জন্যই উষ্ণতার পরম শূন্যের সন্ধান করিতে করিতে নানা প্রকার গ্যাস তরলিত ও কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এ কার্যে গ্যাস ও তরলের ধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষিত সত্যের উপর নির্ভর করা হইয়া থাকে এবং তদনুযায়ী শৈত্য-উৎপাদনক্ষম যন্ত্রাদিও নির্মিত হইয়াছে।

১। প্রভূত চাপে আবদ্ধ কোন গ্যাসকে এক সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অকস্মাৎ নির্গত হইতে দিলে বহির্গত গ্যাসের উষ্ণতা পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায়। এই গ্যাসীয় ধর্মে কোন কোন গ্যাসকে তরল ও কখন কখন কঠিন করাও সম্ভব হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় শৈত্য উৎপাদনের নাম 'জুল-টমসন কুলিং'।

২। চাপে আবদ্ধ গ্যাসের চাপ হ্রাস করিলে উহার আয়তন বর্ধিত হয়। এই অবস্থায় ঐ গ্যাস দ্বারা কোন নলের ভিতরে পিষ্টন ঠেলিয়া বাহিক ক্রিয়া সাধন করা যায়। এই কার্যসাধনে প্রয়োজনীয় শক্তি, গ্যাস নিজ দেহের তাপশক্তি

হইতে প্রদান করিয়া দেহের উষ্ণতা হারাইবে। এ ভাবেও শৈত্য উৎপাদন সম্ভব।

৩। যে উষ্ণতায় তরল পদার্থ ফুটিয়া থাকে তাহাও নিয়ন্ত্রিত হয় উহার উপর প্রযুক্ত চাপে। সমুদ্রতীরে জল ১০০° সেন্টীগ্রেডে ফুটিলেও পাহাড়ের উপর কিংবা উচ্চ ভূমিতে আরও অল্পতর উষ্ণতায় জল ফুটিয়া থাকে। কারণ, নিম্নভূমিতে জলের উপর প্রদত্ত বায়ুমণ্ডলের চাপ, উচ্চ ভূমিতে উক্ত প্রকার চাপ অপেক্ষা অধিকতর। সুতরাং কোন তরল পদার্থ আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া বাত-পাম্পের সাহায্যে বায়ু-নিষ্কাশন দ্বারা অভ্যন্তরের বায়ুর চাপ কমাইয়া উহাকে যে কোন উষ্ণতায় ফুটান সম্ভবপর। যদি ঐ চাপ এরূপ হয় যে, তরল যে উষ্ণতায় রহিয়াছে তাহা স্ফুটনাংকের সন্নিকটে, তাহা হইলে চাপহ্রাস হেতু দ্রুত বাষ্পীভবন চলিবে ও সেইজন্য প্রয়োজনীয় তাপ তরলের অংশবিশেষ প্রদান করিয়া নিজ উষ্ণতার হ্রাস ঘটাইবে। ক্রমে শৈত্যের সংক্রমণে সমস্ত তরল হিমাংকে পৌঁছিবে এবং উহা কঠিনে পরিণত হইবে।

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় বহু গ্যাস শীতল হইতে হইতে তরল ও কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। তরল কিংবা কঠিন বায়ু বর্তমান সময়ে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। তরল বায়ুর সহায়তায় হাইড্রোজেন গ্যাস তরলিত হইয়াছে ও তরল হাইড্রোজেন সহায়ে হিলিয়াম গ্যাসকেও তরল করা সম্ভব হইয়াছে। এই শেষোক্ত তরলের উষ্ণতা পরম শূন্যের প্রায় ৫° উপরে। তরল হিলিয়াম চাপহ্রাসে স্ফুটনোন্মুখ হইলে পরম শূন্যের ০.৮° ডিগ্রি সন্নিকটে চলিয়া যায়। এই অবস্থায়ও হিলিয়াম তরলই থাকে।

১৯২১ খৃঃঅব্দে ক্যামারলিং ওনস্ ০.৮° উষ্ণতার তরল হিলিয়াম প্রাপ্ত হন। উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থের ধর্ম সম্বন্ধে আহৃত নানা তথ্যের ব্যবহার হইতে শৈত্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া এইখানেই শেষ হয়। কিন্তু সেইজন্য বিজ্ঞানী নিশ্চেষ্ট হন নাই। তাঁহার সাধনা হইল উষ্ণতার পরম শূন্যে পৌঁছান। তাহার ফলেই বর্তমান শতাব্দীতে নানা অভিনব প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছে—যাহাদের সহায়তা বিজ্ঞানীকে পরম শূন্যের আরও সন্নিকটে নিয়াছে।

মনে করা যাক, একখণ্ড স্ফটিক, তরল হিলিয়ামে অবস্থিত আছে। অত্যধিক শৈত্য প্রভাবে ঐ স্ফটিকের আণবিক চাঞ্চল্য অতিশয় হ্রাস পাইবে। অণুগুলি প্রায় স্তব্ধ হইয়া আসিবে। এখন যদি কোন কৌশলে উষ্ণতা বর্ধিত না করিয়া আণবিক গতিশীলতা বর্ধিত করা যায় তবে তাহাতে প্রয়োজনীয় শক্তি তরল হিলিয়ামকে দিতে হইবে। সুতরাং তাপশক্তি ব্যয়িত হওয়ায় হিলিয়ামের উষ্ণতা হ্রাস পাইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। সৈন্যাবাসে সৈন্যগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং স্ব স্ব কার্যে রত হয়। যুদ্ধের সময়ে যে একতা দেখা যায় তাহা তখন থাকে না। কিন্তু অকস্মাৎ সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে তাহারা যখন সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় তখন পূর্বের বিশৃঙ্খলা অপনীত হইয়া তাহার স্থানে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অবস্থায় তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আর থাকে না। তাহারা যেন প্রাণহীন স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু পুনরায় বিরামের আদেশ পাওয়ামাত্রই সৈন্যগণ অবাধ স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া পদার্থের আর এক ধর্মের আলোচনা করিতেছি। চৌম্বক ধর্মপ্রবণ পদার্থরাজির মধ্যে এক শ্রেণীর নাম প্যারাম্যাগ-নেটিক। আমাদের পরিচিত লৌহ স্বভাবতঃ ফেরোম্যাগনেটিক হইলেও সাতিশয় উত্তাপ যোগে প্যারাম্যাগনেটিক ধর্ম প্রদর্শন করে। তবে প্ল্যাটি-নাম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু স্বভাবতঃই এই ধর্মাক্রান্ত। ইহাদের অণুগুলি এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক। ইহারা উষ্ণতা ধর্মে নানা দিকে

অতি বিশৃঙ্খলায় অবস্থিত থাকে বলিয়াই স্থূল পদার্থটিতে চুম্বক ধর্ম লোহার ন্যায় সহজে পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু এই সকল ধাতুর একখণ্ড প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিলে আণবিক চুম্বক-গুলি এক বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় সজ্জিত হয়। চৌম্বক ক্ষেত্র যত শক্তিশালী হইবে শৃঙ্খলবন্ধনও তত সুদৃঢ় হইবে। প্রবলের অনুসরণ জীবধর্ম, জড়-ধর্মও বটে। এই অবস্থায় ক্ষেত্রটি অপসৃত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই আণবিক শৃঙ্খলা অপনীত হয় এবং প্রত্যেক অণুর স্বাধীনতাও বর্ধিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায়—অণু-গুলির কর্মকুশলতার সাময়িক বৃদ্ধি হয়।

শৈত্য উৎপাদনের নবতম প্রক্রিয়া এখন বোধগম্য হইবে। একখণ্ড প্যারাম্যাগনেটিক পদার্থ তরল হিলিয়ামে নিমজ্জিত রাখিয়া তাহার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগ ও হঠাৎ অপসারণে আণবিক বিশৃঙ্খলা, কার্যক্ষমতা ও শক্তি বর্ধিত হইবে। এই শক্তির যোগান দিবে তরল হিলিয়াম নিজ তাপের ব্যয়ে। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় উষ্ণতা হ্রাসে উৎপন্ন কঠিন হিলিয়ামের উষ্ণতা পরম শূন্যের আরও সন্নিকটে আসিবে।

পরম শূন্যের সন্নিকটে পদার্থের গুণ ধর্মে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায়। কোন ধাতব তারে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ ঐ তার তড়িৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে। এই বাধার পরিমাণ ধাতু ভেদে ভিন্ন। যাহা হউক, কোন তারের আংটিতে ব্যাটারী সহযোগে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া ব্যাটারী বন্ধ করিয়া দিলেই প্রবাহও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। তাহার কারণ, ঐ বাধা, তজ্জনিত তাপজনন ও তড়িৎ শক্তির অপচয়ে তাপ শক্তির উৎপাদন। কিন্তু কোন সীসার তারের আংটি তরল হিলিয়ামে নিমজ্জিত রাখিয়া ও তাহাতে তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া অকস্মাৎ ব্যাটারী বন্ধ করিয়া দিলেও আংটিতে প্রবাহ অনেকক্ষণ চলিতে থাকে। সীসার ন্যায় আরও অনেক ধাতুর এই গুণ দেখা যায়। দারুণ শৈত্যে ইহাদের তড়িৎ প্রবাহে বাধাদান শক্তি অন্তর্হিত হয়। কি প্রকারে ধাতব পদার্থের এই গুণ পরিবর্তন ঘটে তাহা এক সমস্যা।

"কূটতার্কিক বলিবেন—প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন—তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত এই ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্যপ্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।"

—রাজশেখর

গুড় ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমাণিকলাল বটব্যাল

কোন বস্তুর বাহ্যরূপ দেখিয়া তাহার সঠিক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে অত্যন্ত ত্রুটিবহুল হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি পরিচিত ও ততোধিক অবহেলিত একটি উপাদান, গুড়ের আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। অতীতের সহিত বর্তমানের একটি তুলনা-মূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সাদা চিনির আবির্ভাবে গুড়ের ব্যবহার ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের আধুনিক সাধারণ দৃষ্টি এমনই একস্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা তথাকথিত চিনিভোজীর দল, গুড় ব্যবহারকারীদের একটু কৃপার চক্ষেই দেখিয়া থাকি। লুচির টেবিলে শুভ্র চিনির পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত বর্ণ-মলিন গুড়ের স্থান হওয়া কেবল অবাঞ্ছিতই নহে, অনেকের মতে তাহা একেবারেই সভ্যরুচির পরিপন্থী। অনেকে এমনও বলেন যে, চিনির পিছনে বর্তমান যান্ত্রিক শিল্প থাকায় প্রাচীনপন্থী গুড়ের পক্ষে অর্থনৈতিক চাপ সহ্যকরা সহজ নয় বলিয়াই তাহার ব্যবহার লুপ্তপ্রায়। এই যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য থাকিলেও আসল কথাটি কিন্তু ঠিক তা নয়—ইহার প্রধান কারণ বর্ণ-বৈষম্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমরা এমনি একস্তরে আসিয়া পৌছিয়াছি যে, খাদ্যের ব্যাপারেও আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই বর্ণ-রুচির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই সাদা ধবধবে চিনির পাশে গুড় থাকিলে মনটা স্বতঃই চিনির উপরে লোলুপ হইয়া উঠে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসে কিন্তু এই উৎকট চিনি-প্রীতির বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না; বরং চিনি প্রচলনের প্রারম্ভিক যুগে দেশীয় প্রাচীনেরা ইহার ব্যবহারে ঘোরতর প্রতিকূলতাই করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের এই আচরণের মধ্যে সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অনুপাত কিরূপ ছিল সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও, গুড় প্রচলনের পরিবর্তে চিনির প্রচলনের ফল যে মারাত্মক ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল তাহা আজ অনস্বীকার্য। চিনির সবটাই কার্বোহাইড্রেট্—ইহাকে একটি 'কন্‌সেন্‌ট্রেটেড ফুয়েল' বলা যাইতে পারে। কাজেই চিনি খাদ্য হিসাবে একমাত্র 'ক্যালরি' ছাড়া আর বিশেষ কিছু আমাদিগকে দেয় না। পুষ্টি-বিজ্ঞান অনুসারে ন্যূনাধিক এক সের পরিমাণ জলের তাপ এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চড়াতে হলে যতটুকু উত্তাপ দরকার একটি ক্যালরি ঠিক তার সমান। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ডাঃ ওয়াইল্ডার প্রচার করিয়াছেন যে, অনুমোদিত খাদ্য তালিকায় চিনির স্থান মোটেই হইতে পারে না। ইহার প্রথম কারণ—চিনি আমাদিগকে একমাত্র ক্যালরি ছাড়া আর কিছু প্রদান করে না। দ্বিতীয় কারণ, সেই ক্যালরি প্রদানকালে দেহস্থ অন্যান্য খাদ্য-বস্তুজাত খাদ্য-প্রাণের বিনাশ সাধন করে।

গুড়ের ক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। আখের রস হইতে আবশ্যকমত জলীয় অংশের কিছুটা অপসারণের পর সাধারণতঃ যাহা থাকে তাহাকেই মোটামুটি গুড় বলা হয়। প্রধান কথা এই যে, উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহার খাদ্যমূল্যের কোন হ্রাস হয় না; বরং ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকারের দৈহিক উপাদান—ধাতব লবণ ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। নিম্ন-লিখিত তালিকাটি হইতে ইহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে :—

	চিনি	গুড়
সুক্রোজ···	৯৯·৭	৫৯·৭১
গ্লুকোজ···	×	২১·২৮
ধাতব পদার্থ···	০·০২	৩·৩৬
জলীয় পদার্থ···	০·০৪	৮·৮৬

ডাঃ কালিদাস মিত্র বলেন যে, এই খনিজ উপাদানের অবস্থিতির জন্যই খাদ্য হিসাবে গুড়, চিনি অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর ও মূল্যবান। বর্তমানে পুষ্টিগবেষণার ছাত্রগণ খাদ্যের মধ্যে 'ট্রেস এলিমেণ্টস্'-এর প্রতি বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের কুন্নুরে পুষ্টিগবেষণার ডিরেক্টর গুড় বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নোক্ত উপাদানগুলির অবস্থিতি ও পরিমাণ জনিতে পারিয়াছেন :—

খনিজ উপাদান	প্রতি ১০০ গ্রাঃ গুড়ে মি. গ্র্যাঃ হিসাবে
ক্যালসিয়াম···	৭৫ মি. গ্র্যাঃ
ফসফরাস···	৩৮ „
লৌহ···	১১ „
তাম্র···	৫৬ „

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে বর্ণ-মলিনতার জন্য গুড়ের এত অনাদর তাহাই গুড়ের উচ্চ খাদ্যমূল্য-দানের প্রধানতম কারণ। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, দূষিত পদার্থের আধিক্যবশতঃই গুড়ের রং মলিন হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণের ফলে আমাদের ধারণার অসত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। শরীর গঠনের সহায়ক অতীব প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধাতব লবণের অবস্থিতিই গুড়ের বর্ণ-মলিনতার প্রধান কারণ। তবে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে নিরক্ষর, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জ্ঞানশূন্য কৃষকদের হাতে গুড় প্রস্তুত প্রণালী সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়ায় খাদ্য দূষিত হয় কি না—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু সেজন্য গুড়কে দায়ী করা যায় না।

বর্তমানে বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। দেখা গিয়াছে যে, ইহার কতক-গুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইতেছে, গুড়ের পরিবর্তে সাদা চিনির ক্রমাগত ব্যবহার। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সাদা চিনি দন্তক্ষয় রোগেরও একটি প্রধান কারণ।

ইহা ব্যতীত ১৯৩৩ সালে হাওয়াই হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, ভিটামিন বি$_1$ এবং বি$_2$-এর একটি প্রধান উৎস গুড়। চেকোশ্লোভাকিয়া ও জাপানের অভিজ্ঞতাও উক্ত মতের পরিপোষক বলিয়া জানা গিয়াছে।

উপসংহারে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ও গ্রাম্য অধিবাসী-দের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে সাদা চিনি অপেক্ষা মলিন গুড়ের স্থান খাদ্য হিসাবে অনেক উচ্চে। বহুমূত্র, দন্তক্ষয়, রক্তাল্পতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষয়ের মূলীভূত কারণ চিনির সামঞ্জস্যহীন ব্যবহার। ঠিক একই সময়ে গুড়কে পাশাপাশি তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান—ভিটামিন এ, বি$_1$, বি$_2$, ধাতব উপাদান—ক্যাল-সিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, (গন্ধক) এবং পুষ্টিকর উপাদান—ক্যারোটিন, গ্লুকোজ, প্রোটিন, ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় পদার্থ অল্পাধিক মাত্রায় সরবরাহ করে। আমাদের চিনিপ্রীতি কতটা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত তাহা যদি একবার ভাবিয়া দেখি এবং লুচির টেবিলে চিনির পরিবর্তে গুড়ের একটু স্থান করিয়া দেই তবে সভ্যতাভিমানী সমাজ যাহাই বলুন, আমাদের জীবনীশক্তির ভয়াবহ অপচয় যে বহুলাংশে নিবারিত হইবে এবং জীবন-যাত্রার প্রণালীও যে অনেকাংশে সহজ ও সরল হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারতবর্ষ ও রাশিয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্রমোন্নতির কথা

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর বৃটিশ সরকার এ দেশ শাসন করিয়াছিল। এ সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষা, ব্যবসায় বাণিজ্য, বড় কল কারখানা তেমন কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ বৃটিশ সরকারের বরাবর ইচ্ছা ছিল, এই দেশের অধিবাসীদের কৃষিজীবী করিয়া রাখা। অতএব ১৯৪৭ সালে যখন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল তখন আমাদের দেশের অবস্থা প্রায় ১৯১৩ সালের সোভিয়েট রাশিয়ার অনুরূপ। নিছক রাশি-তথ্যের সাহায্যে রাশিয়ায় শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে বর্তমানে উহা কি অবস্থায় রহিয়াছে—তাহাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। দুইটি দেশের আয়তন, লোক সংখ্যা ইত্যাদি নিম্নলিখিতি তালিকাতে দেওয়া হইল।

১নং তালিকা

ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার আয়তন ও লোক সংখ্যা

	আয়তন বর্গমাইল হিসাবে	আদমসুমারীর সন	লোক সংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে অধিবাসীর সংখ্যা
ভারতবর্ষ	১২২৭০০০	১৯৪১	৩১৯১২৪০০০	২৬০'২
সোভিয়েট রাশিয়া	৮১৭৬০০০	১৯৩৯	১৭০৪৬৭০০০	২০'৮

১নং তালিকাতে দেখা যায়, রাশিয়ার আয়তন আমাদের ৬ গুণের বেশী; আর লোক সংখ্যা আমাদের অর্ধেকের কিছু বেশী। অতএব রাশিয়াতে শিল্পোন্নতির প্রসার যেরূপ দ্রুত সম্ভব হইয়াছে আমাদের সেরূপ সম্ভব নহে।

রাশিয়ায় শিল্পের অবস্থা

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। শতকরা ১৭'৭ জন অধিবাসী সহরে বাস করিত। বিদেশে রপ্তানী সামগ্রীর মধ্যে শতকরা ৭০'৬ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য এবং ২৯'৪ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য ছিল। বিদেশ হইতে আমদানী হইত শতকরা ৮১'৪ ভাগ শিল্পজাত দ্রব্য। উপরের মন্তব্য হইতে বোঝা যায় যে, ১৯১৩ সাল পযন্ত রাশিয়াতে শিল্পের প্রসার তেমন ছিল না। এই ব্যাপারটি এইভাবে দেখিলে আর একটু পরিষ্কার হইবে। ১৯১৩ সালে রাশিয়াতে বড় বড় কারখানা হইতে যে সমস্ত মাল প্রস্তুত হইয়াছে তাহার পরিমাণ যদি ১০০ ধরা হয় তাহা হইলে ঐ সালে ফ্রান্সে হইয়াছিল ২৫০, বৃটেনে ৪৬০ জার্মেণীতে ৬০০ এবং আমেরিকাতে ১৪৩০। বৃটেন, জার্মেণী বা ফ্রান্স, রাশিয়ার তুলনায় অনেক ছোট দেশ হইলেও তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণ রাশিয়া অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এই অবস্থার পরিবর্তন সুরু হয়। কারণ দেশে শাসনের ধারা বদল হইয়া যায়। নূতন ধারার ভিত্তি এইরূপ ছিল—"Socialism can not be built without a highly developed industry for it is held that only on the basis of a speedy growth of industrial production

can constant improvements of the standard be achieved." ১৯২৮ সাল হইতে কাজের ব্যাপক সূচনা হয়। পর পর তিনটি পঞ্চ বার্ষিকী কার্যপন্থা ঠিক করা হয়। প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য—দেশে শিল্পের বহুল প্রসার। প্রথমটি হয় ১৯২৮—১৯৩২, দ্বিতীয়টি ১৯৩৩—১৯৩৭ এবং তৃতীয়টি ১৯৩৮—১৯৪২ সালে। নিম্নলিখিত উক্তি হইতে উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হইবে।

"Development of the most modern and comprehensive engineering industries was the foremost aim of all three 5-year plans, while the task of developing cousumer goods industries was subordinated to the development of the capital goods industries."

১৯৩৮—১৯৪২ সাল পর্যন্ত যে কাজ হইবার কথা ছিল তাহা শেষ হইতে পারে নাই। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্বরু হইয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের মাপকাঠি নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

২নং তালিকা

শিল্পোন্নতির হিসাব

	প্রথম পর্যায় ১৯৩২ (১৯২৮=১০০)	দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৩৭ (১৯৩২=১০০)
মোট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ	২৩৬	২১৪
কয়লা	২১২	২৩৭
তেল	১৮৫	২১০
লোহা	২০৩	২৬০
ইস্পাত	২৬২	২৮৯
ইলেকট্রিক পাওয়ার	৪৩৬	২৭৩

দ্বিতীয় তালিকা হইতে দেখা যায়, রাশিয়াতে ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩২ সালে এবং ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৭ সালে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে। ব্যাপারটি নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আরও পরিষ্কার হইবে।

৩নং তালিকা

কয়লা এবং লোহার মাথাপিছু হিসাব

দেশের নাম	১৯১৩ কয়লা	১৯১৩ লোহা	১৯৩৭* কয়লা	১৯৩৭* লোহা
রাশিয়া	২০৯ কিলোগ্র্যাম	৩০.৩ কিলোগ্র্যাম	৭৫৭ কিলোগ্র্যাম	৮৬ কিলোগ্র্যাম
জার্মেণী	২৮৭২ "	২৫০ "	৩৩১৩ "	২৩৪ "
গ্রেট ব্রিটেন	৬৩৯৬ "	২০৬ "	৫১৬৫ "	১৮৩ "
আমেরিকা	৫৩৫৮ "	৩২৬.৫ "	৩৪২.৯ "	২৯২ "

* রাশিয়ায় ১৯৩৭, অন্যান্য দেশের সর্বশেষ অঙ্ক দুইটি শিল্পজাত দ্রব্যের সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে, যদিও ১৯১৩ সাল হইতে ১৯৩৭ সালে রাশিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে তথাপি ইউরোপের অগ্রসর দেশসমূহ এবং আমেরিকা হইতে অনেক পিছনে রহিয়াছে।

১৯৩৮ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত যে কাজ হইবার কথা ছিল তাহা ১৯৪০-এর পর বন্ধ হইয়া যায় এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাশিয়াতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলিতে থাকে; কাজেই শিল্পপ্রসারের ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৯৪৬-৫০ পর্যন্ত চতুর্থ পঞ্চম-বাৎসরিক কার্যপদ্ধতি ঠিক হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর শিল্পপ্রসারের কাজ বেশ ভাল ভাবে অগ্রসর হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে রাশিয়াতে যুদ্ধোত্তর সময়ে বিভিন্ন শিল্প এবং শিল্পজাত দ্রব্যের কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

৪নং তালিকা

বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্রমোন্নতির পরিমাণ (রাশিয়া)

	১৯৪৬ (১৯৪৫ = ১০০)	১৯৪৭ (১৯৪৫ = ১০০)	১৯৪৮ (১৯৪৫ = ১০০)
কয়লা	১১০	১২৩	১৫০
ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার	১১০	১২৭	১৪৫
তেল	১১২	১৩৩	১৫০
লোহা	১১২	১২৮	১৫৬
ইস্পাত	১০৯	১১৯	১৫২
তামা	১০৬	১১৫	১৩৯
দস্তা	১০৮	১২৫	১৭০
অটোমোবাইলস্	১২৬	১৬৪	৩৪৪
ট্র্যাক্টর	১৭২	৩৫৯	৭৩৩
সার	১৫২	২০৫	২৯২
সিমেণ্ট	১৮৫	২৫৯	৩৫৫
তূলার সামগ্রী	১১৭	১৫৬	১৯৩
মাখন	১৬৯	১৮৯	২৫৯
চিনি	১০০	২১০	৩৫৭

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কেমন ধাপে ধাপে রাশিয়াতে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে।

১৯৪৯ সালের শেষে রাশিয়ায় শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের অবস্থা নিম্নোক্ত অংশ হইতে পরিস্ফুট হইবে। "Gross industrial output in the U.S S.R. in 1949 was 20 per cent above 1948 and 41 per cent above the pre war year 1940. Towards the end of 1949 gross industrial output surpassed the level envisaged in the five year plan for 1949. The five year plan provided for a 48 per cent increase of total industrial output in the U.S.S.R. in 1950. Compare with the pre-war year 1940,

খুব অল্প দিন পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা আমাদের অনুরূপ ছিল; কিন্তু আজ তাহারা বিশ্বের দরবারে তাহাদের আসন দখল করিয়াছে।

ভারতবর্ষে শিল্পের অবস্থা

আমাদের দেশের শিল্পের অবস্থা কিরূপ তাহার আলোচনা করিব। ১৯০০ সালে আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্পের নমুনা কিরূপ ছিল তাহা নিম্নলিখিত অংশ হইতে কিছুটা পরিষ্কার হইবে।

"The total paid-up capital of joint-stock Companies in India was only 36 crores against 554 crores to day.... There was indeed 192 Cotton Mills and 34 Jute Mills but over the whole of British India there was only 1366

Companies in the year 1900 01. And in terms of employment figures less than a fifth of what they are now. The Cotton Mills mainly in Bombay and Ahmedabad employed in 1901 only 174,000 hands, the Jute Mills 111,000 and there was no other industry which employed more than 20,000 if we expect gold in Mysore which accounted for 21,000. The great steel plant at Jamshedpur was still in the future although Jamshedji Nusserwanji Tata, a great visionary could see it as clearly as when it came to pass. For the rest Indian industry was a petty thing, Iron and Brass foundries employed 18,000, the Factories 10,000, Printing Presses 13,000, Silk Mills etc. 14,000, nine Paper Mills only 5,000, Coal output was less than 7 million tons."

উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যায়, মাত্র ৫০ বৎসর পূর্বে আমাদের নিজস্ব শিল্প বলিয়া প্রায় কিছুই ছিল না। বৃটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল, নিজেদের দেশের যাবতীয় শিল্পসামগ্রী আমাদের দেশে চালু করা।

১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস "National Planning Committee" সৃষ্টি করেন। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, শিল্পবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্দের লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। তাঁহারা ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যা লইয়া চিন্তা করেন এবং তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু কাজ তেমন অগ্রসর হয় নাই।

ভারতবর্ষে শিল্পের কিছুটা দ্রুত উন্নতি হয় গত যুদ্ধের সময় হইতে। নিম্নলিখিত অংশ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"Forced by war to attend to planned production Government set up new departments and required these to organise the provision of supplies of all kinds both for the Military and Civil production. These supplies however not being all available in the country in the required measure and not being obtainable from abroad becaus of the lack of shipping, had to be produced on the spot in India.......... Stimulated by these new industries were started and old expanded regardless of economic considerations which were overriding the normal times."

গত পঞ্চাশ বৎসর বিভিন্ন শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তুলার দ্রব্য সামগ্রী, দেশলাই ও চিনি বর্তমানে আমাদের দেশে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমাদের চাহিদা কিয়ৎপরিমাণে মিটাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইস্পাত, কাগজ ও সিমেন্টের উৎপাদন যদিও কিছুটা বাড়িয়াছে তথাপি আমাদের চাহিদার তুলনায় অনেক কম।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমাদের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কেমন উন্নতি হইয়াছে তাহা বোঝা যাইবে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণকে যদি ১০০ ধরা হয়, তাহাহইলে পরবর্তী সময়ে কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জানা যাইবে।

৫নং তালিকা

বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের হিসাব (ভারতবর্ষ)

আগষ্ট ১৯৩৯ = ১০০

সাল	তূলাজাত দ্রব্য	পাটজাত দ্রব্য	ইস্পাত	লোহা	কাগজ	দেশলাই	সিমেণ্ট	চিনি	সাধারণ
১৯৩৯-৪০	৯৬·৮	১১৫·৩	১০৮·০	১০৯·৫	১১৮·৩	৯৯·৫	১০৩·০	১৯১·১	১১০·৩
১৯৪০-৪১	১০৬·৭	১০০·০	১২৯·৭	১১৬·৭	১৪৫·৮	১০৪·৫	১০৩·০	১৭১·১	১১৪·২
১৯৪১-৪২	১২৫·৯	১১৫·৩	১৩৭·৫	১২০·২	১৫৫·৮	৭৪·৭	১৩২·১	১১৭·১	১২৩·২
১৯৪২-৪৩	১২৮·৮	১১২·৬	১৩১·১	১০৭·১	১৫১·৭	৬৭·০	১২৯·৮	১৬০·৭	১২৫·৫
১৯৪৩-৪৪	১৩৮·৭	৯৬·৪	১৩৭·৮	১০০·৬	১৬১·৭	৮১·৪	১২৫·৬	১৬৫·৯	১২৬·৮
১৯৪৯									
জা	১০৭·৮	৯৬·৭	১০১·৬	৬৮·৬	১৪৫·১	৯৬·১	১০৭·১	১৪৬·০	১০৮·২
ফে	১১৮·৬	১০০·৮	১০৫·৭	৭৩·২	১৪২·২	৯৫·৪	১১১·৪	১৪৬·০	১১৫·২
মা	১০৪·৫	৭৩·৫	১২৩·৬	৮৯·৬	১৫০·০	৯৬·১	১১১·৪	১৪৬·০	১০৬·৩
এ	১০৬·০	১০১·৬	১২৫·০	৯৩·০	১৫৪·৩	৮৮·৯	১১৫·০	১৪১·০	১১৩·৪
মে	১০৭·৮	৯৭·৩	১২৬·৩	৯৮·৮	১৫৫·২	৯৯·৬	১২১·৪	১৪১·০	১১৬·৫
জু	১০৪·২	৯৯·৫	১১০·১	৯১·০	১৫৫·২	৮১·৮	১১৭·৯	১৪১·০	১১০·১
জু	১০০·৩	৭১·৩	১২১·২	৯৯·৬	১৫৪·৬	৭৪·৭	১২২·৯	১৪১·০	১০৩·৮
আ	৯৬·৪	৭৮·৯	১২৭·৫	১০০·৫	১৫০·৯	৭৪·৭	১২৫·৭	১৪১·০	১০৫·৩

উপরোক্ত তালিকাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে ভারতবর্ষে শিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছিল—কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। আমরা পুনরায় ১৯৩৯ সালের কাছাকাছি যাইতেছি।

৪নং এবং ৫নং তালিকা তুলনা করিলে দেখা যাইবে, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন রাশিয়াতে আমাদের অপেক্ষা কত দ্রুততর হইয়াছে। মাত্র ৩০ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা আমাদের অপেক্ষা বিশেষ কিছুই ভাল ছিল না, তাহারা এই অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আমাদেরও আশা হয়—যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তখন আমরাও শীঘ্রই দেশকে আরও অনেক উন্নত করিয়া বিশ্বের দরবারে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিব। তবুও দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে প্রশ্ন জাগে—কতদিনে

"ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

"মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষা সংকলন পণ্ড হবে। পরিভাষায় একমাত্র উদ্দেশ্য—বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশশক্তি বর্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এ নিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না।"

—রাজশেখর

পারমাণবিক তেজ ও তার ব্যবহার

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানী বোর ও রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য বস্তুকণা নয়। ধন ও ঋণ বিদ্যুৎকণার সমন্বয়ে পরমাণু গঠিত। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন বা ধন বিদ্যুৎকণিকা, আর তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সমসংখ্যক ইলেকট্রন বা ঋণ বিদ্যুৎকণা। ইলেকট্রনগুলোর আবর্তন সৌরজগতের গ্রহগুলোর আবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটিমাত্র ইলেকট্রন ও কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন রয়েছে। প্রোটনের ওজন ইলেকট্রনের প্রায় ১৮৫০ গুণ বেশী, অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটনের তুলনায় এত হাল্কা যে, ইলেকট্রনকে উপেক্ষা করে প্রোটনের ওজনকেই আমরা পরমাণুর ওজন ধরে থাকি। এরকম বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন ও ইলেকট্রন নিয়ে বিভিন্ন পরমাণু গঠিত। কোনও পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু-সংখ্যা বলা হয়। তারপর কতকগুলো পরমাণুর কেন্দ্রে বিজ্ঞানীরা নিউট্রন নামক বিদ্যুৎনিরপেক্ষ বস্তুকণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের ওজন প্রোটনের সমান অথচ বিদ্যুৎহীন। তাই কোনও পরমাণু-কেন্দ্রীনে নিউট্রন থাকলে তার ওজন বাড়ে, অথচ বিদ্যুৎ পরিমাণ একই থাকে; অর্থাৎ তার পরমাণু-সংখ্যা বাড়ে না। হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্রীনে একটি নিউট্রন যোগ করে আমরা ডয়েটরন বা ভারী হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থ পাই। একই পরমাণু-সংখ্যার মূল পরমাণুতে নিউট্রন কমবেশী থাকার ফলে পরমাণুর ওজনের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। সেই পরমাণুগুলোকে মূল পরমাণুর সমপদ বা আইসোটোপ বলা হয়। ডয়েটরনকে তাই হাইড্রোজেনের সমপদ বলা যায়।

মাদাম কুরী রেডিয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর আনয়ন করেন। পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক যৌগিক পদার্থ থেকে তিনি অল্প পরিমাণ রেডিয়াম নিষ্কাশন করেন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, রেডিয়াম থেকে স্বভাবতঃ তিনপ্রকার রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি তিনটির নাম দেওয়া হয়েছে—আলফা, বীটা ও গামা। আলফারশ্মিতে ধন বিদ্যুৎকণা ও বীটাতে ঋণ বিদ্যুৎকণা থাকে। আর গামারশ্মি হলো বিদ্যুৎ ও ভরহীন তেজসমষ্টি। তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম থেকে এই সব রশ্মি বেরিয়ে যাওয়ার ফলে রেডিয়ামের কেন্দ্রীনে যে পরিবর্তন হয় তাতে উচ্চ পরমাণু-সংখ্যার রেডিয়াম বিভিন্ন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়ে অবশেষে সীসকে পরিণত হয়। এ থেকে দেখা যায় যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনে প্রোটন ও নিউট্রনগুলোকে নিবদ্ধ রাখতে যে তেজের প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীনকে কোনও রকমে ভাঙতে পারলে আমরা সেই তেজ আহরণ করতে পারি। রেডিয়াম কেন্দ্রীনে প্রাকৃতিক উপায়ে যে ভাঙাগড়া চলে তাতে আমরা যে গামারশ্মি পাই—তা এরূপ পারমাণবিক তেজ ছাড়া আর কিছুই নয়। রেডিয়াম ছাড়া ইউরেনিয়াম প্রভৃতি আরও কতকগুলো স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এসব পদার্থে স্বাভাবিকভাবে তেজ নির্গমের হার এত কম যে, তাকে সোজাসুজি কোনও প্রয়োজনীয় কাজে লাগান সম্ভব নয়। রেডিয়ামের অর্ধমানকাল হলো—১৭৫০ বছর; অর্থাৎ 'নির্দিষ্ট পরিমাণ

রেডিয়ামের অর্ধাংশ সীসকে পরিণত হতে প্রায় ১৭৫০ বছরের প্রয়োজন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যদি অধিক পরিমাণ তেজ আহরণ করতে সক্ষম না হই তবে তা' কাযকরী হয় না। তাই পরমাণুর কেন্দ্রীনকে কৃত্রিম উপায়ে চূর্ণ করে অধিক তেজ আহরণ করবার গবেষণা সুরু হয়। বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজষ্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রীন অন্যান্য মৌলের চেয়ে অনিকতর অস্থির। তাই এই সব মৌলের কেন্দ্রীন ভেঙে ফেলা সহজ সাধ্য হতে পারে। কিন্তু সমস্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনই এক বিদ্যুৎ-আবেষ্টনীর দ্বারা আবদ্ধ। তীব্র ভেদক কোনও বস্তুকণা না হলে এই আবেষ্টনী ভেদ করে কেন্দ্রীনে প্রবেশ করতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎহীন নিউট্রনকে সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রীন-ভেদকরূপে বেছে নিলেন। ফলে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীন ভেঙে তেজ আহরণ করা সহজতর বলে পরিগণিত হলো।

ইউরেনিয়াম ধাতু সাধারণতঃ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে কারনোটাইট নামে ভ্যানাডিয়াম-আকরিক প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, এক পাউণ্ড বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম আহরণ করতে তদানীন্তন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৭৫০০০ বৎসরের প্রয়োজন। সাধারণ ইউরেনিয়াম পরমাণুর ওজন ২৩৮ ও পরমাণু-সংখ্যা ৯২। তাছাড়া ২৩৫ ও ২৩৪ ওজনের দুটি সমপদ সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মিশে থাকে। ১৪০ ভাগ ইউরেনিয়াম ২৩৮ পরমাণুতে সমপদ ইউ ২৩৫ থাকে এক ভাগমাত্র এবং প্রায় ১৪০০ ভাগ ইউ ২৩৮-এ সমপদ ইউ ২৩৪ থাকে মাত্র একভাগ।

যাহোক, বেরিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীনকে আলফাকণা দিয়ে চূর্ণ করে যে নিউট্রন পাওয়া যায় বিজ্ঞানী ফেমি ইউ ২৩৮ পরমাণুতে সেই নিউট্রন প্রবেশ করিয়ে ইউ ২৩৯ নামে অন্য একটি সমপদ আহরণ করেন। কিন্তু ইউরেনিয়ামের এই কৃত্রিম সমপদ খুবই অস্থির এবং স্বতঃই বেরিয়াম ও ক্রিপটন নামে দুটি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী অটো হ্যান ও মাইটনার দেখালেন যে, ইউ ২৩৮ একটি নিউট্রনের আঘাতে বেরিয়াম ১৪০ ও ক্রিপটন ৯০ মৌলে রূপান্তরিত হলে সাবেক ওজন ২৩৮ থেকে বিভক্ত মৌলগুলোর মোট ওজন কিছু কম হয়। ফেমি এই থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই কমতি ভর কতকগুলো নিউট্রনরূপে বেরিয়ে আসে। বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গেল যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুতে একটি নিউট্রন আঘাত করলে উক্ত পরমাণু বিভিন্ন পরমাণুতে বিভক্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি নিউট্রন মুক্তিলাভ করে। এই নবজাত নিউট্রনগুলো আবার অবিভক্ত ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলোতে স্বতঃপ্রবিষ্ট হয়ে নতুন নতুন নিউট্রনের জন্ম দেয় এবং ইউরেনিয়াম পরমাণুগুলো আপনা আপনি ভাঙতে থাকে। আবার প্রত্যেক পরমাণু বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তেজ আমরা পেয়ে থাকি। একটি নিউট্রনের সাহায্যে স্বতঃই পরমাণু ভাঙার শৃঙ্খল প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং তাথেকে বিপুল তেজ পাওয়া যায়। এই আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

ইতিমধ্যে এই সত্যটি স্বীকৃত হয়েছিল যে, বিশ্বজগতের অসংখ্য নক্ষত্র এই পারমাণবিক তেজের দ্বারাই আলো বিকিরণ করে। নক্ষত্রদেহে অত্যধিক তাপমাত্রার জন্যে সেখানকার মৌলিক পরমাণু-গুলোতে স্বাভাবিক ভাঙাগড়া চলে; ফলে তেজ বিকীর্ণ হয়। সেরূপ বিপুল তাপমাত্রা সৃষ্টি করা পার্থিব জগতে অসম্ভব বলেই পারমাণবিক তেজের ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু নিউট্রনের সাহায্যে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম পরমাণু ভেঙে যে পারমাণবিক তেজ পাওয়া গেল তাতে আমরা নবযুগের প্রথম সূর্যোদয়

দেখতে পেলাম। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে এই তেজকে নিয়োজিত করতে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তৎপর হয়ে উঠলেন। দেখা গেল—ধ্বংসাত্মক কাজে যদি এইরূপ শৃঙ্খল প্রক্রিয়া লাগান যায় তবে ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে যে সব বিভিন্ন বিভক্ত পরমাণু পাওয়া যাবে তাদের গতীয়শক্তি এত অধিক হবে যে, অল্পায়াসে বহুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্ফোরণের দ্বারা ধ্বংস ঘটান সম্ভব হবে।

কিন্তু কার্যতঃ এই প্রক্রিয়া কাজে লাগানোর পথে বহু অসুবিধা দেখা গেল। প্রথম অসুবিধা এই যে, ইউরেনিয়াম ধাতুতে সাধারণতঃ ইউ ২৩৮ ও তার সমপদ ইউ ২৩৫ মিশ্রিত থাকে। আর এই ধাতুপিণ্ড নিউট্রন দ্বারা আহত হলে ইউ ২৩৮ অধিকাংশ নিউট্রন গ্রাস করে। ইউ ২৩৮-এর প্রধান অসুবিধা এই যে, অধিকাংশ নিউট্রন এতদ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মাত্র কয়েকটি নিউট্রন, পরমাণু বিভক্ত করার কাজে লাগে। অথচ ইউ ২৩৫-এর নিউট্রন আবদ্ধ করার ক্ষমতা খুব কম। কাজেই অধিকাংশ নিউট্রন পরমাণু বিভক্ত করার কাজে লাগে ও নতুন নিউট্রনের মুক্তি দিতে সমর্থ হয়। ফলে শৃঙ্খল প্রক্রিয়া সহজতর হয়। এজন্যে যে সাধারণ দ্রুতগতিবিশিষ্ট নিউট্রন নিয়োজিত করা হয় স্বভাবতঃ ইউ ২৩৮ ও ২৩৫ মিশ্রিত ইউরেনিয়াম ধাতুপিণ্ডে ইউ ২৩৮-ই তাদের অধিকাংশকে আবদ্ধ করে নেয়। কারণ দ্রুততর নিউট্রনকে আবদ্ধ করবার সামর্থ্য ইউ ২৩৮-এর বেশী। ইউ ২৩৫-এ যাতে অধিকাংশ নিউট্রন আঘাত করতে পারে সেজন্যে নিউট্রনের গতিবেগ হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া অধিক পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করাও বিপজ্জনক। তাহলে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের তাপমাত্রা শোষণ করবার মত বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন। পরীক্ষা শেষ হলে নানারূপ বিপজ্জনক পদার্থ-মিশ্রিত এই জল নিয়েই বা কি করা যাবে? জল, সিমেণ্ট বা সীসকের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা না থাকলে এই পারমাণবিক তেজের কারখানা মানুষের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, সন্দেহ নেই।

ইউরেনিয়ামে ইউ ২৩৮, ইউ ২৩৫ থেকে প্রায় ১৪০ গুণ বেশী থাকে। তাছাড়া আরও নানারকম পদার্থও মিশে থাকে। এই ইউরেনিয়ামে নিউট্রন আঘাত করলে, কয়েকটি কোনও পরমাণুকে আঘাত না করেই বেরিয়ে আসে। আরও কয়েকটি, ইউরেনিয়াম মিশ্রিত অবিশুদ্ধ পরমাণুগুলোতে আহত হয়ে তাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবদ্ধ করে রাখবার বিশেষ ক্ষমতাবলে আরও কতকগুলো ইউ ২৩৮-এর মধ্যে আটকা পড়ে যায়। অবশিষ্ট কয়েকটি নিউট্রন ইউ ২৩৮ বা ২৩৫ পরমাণুকে ভেঙে বেরিয়াম, ক্রিপটন প্রভৃতি পরমাণু সৃষ্টি করে এবং তেজ মুক্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে যে উপজাত নিউট্রনগুলো বেরিয়ে আসে তাদেরও অনেকগুলোই ইউ ২৩৮-এ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন কোনটি বা নতুন পরমাণু ভাঙতে সমর্থ হয়। কিন্তু অধিকাংশ নিউট্রন এভাবে ইউ ২৩৮-এ আবদ্ধ হয়ে পড়ায় শৃঙ্খল প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তাই ইউ ২৩৮কে ভাঙতে হলে বাইরে থেকে সর্বদাই নতুন নিউট্রন যোগান দিতে হয়। পরমাণু-বিভাজন দ্বারা মুক্ত নিউট্রন সংখ্যা আবদ্ধ নিউট্রন সংখ্যার চাইতে বেশী না হলে শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় আপনা আপনি তেজ মুক্ত হয় না। কাজেই মানুষের প্রয়োজনে এর ব্যবহার সম্ভব হতে পারে না।

নিউট্রনের সাধারণ গতিবেগ কমিয়ে দেখা গেল যে, ভারী ইউ ২৩৮-এ নিউট্রনগুলো আবদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য অবিশুদ্ধ পদার্থে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার কতকগুলো অল্প গতীয় শক্তির জন্যে কেন্দ্রীনকে আঘাত করবার ক্ষমতা হারায়। তবু দেখা যায়, গ্র্যাফাইট-নির্মিত মডা-রেটর ব্যবহার করলে প্রক্ষিপ্ত নিউট্রনের গতিবেগ

হ্রাস পায় এবং পরমাণু-বিভাজনে প্রাপ্ত নতুন নিউট্রনেরও গতিবেগ কমে যায়। ফলে বহু-সংখ্যক নিউট্রনই বিভাজন ব্যতিরেকে পরমাণুতে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ক্ষমতা হারায়। তাতে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া কিছুটা অব্যাহত থাকে।

তবু এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হলে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ও গ্র্যাফাইটের প্রয়োজন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এগুলো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর আমেরিকার ওয়েষ্টিং হাউস্ ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ম্যানুফাক্‌চারিং কোং বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ও ন্যাশন্যাল কার্বন কোং বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট প্রস্তুত করার কৃতিত্ব অর্জন করে।

এখন আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। গ্র্যাফাইট মডারেটর দিয়ে নিউট্রনের গতিবেগ হ্রাস হলে ইউ ২৩৮-এর নিউট্রন আবদ্ধ করবার ক্ষমতা এড়ান যায় বটে, কিন্তু ইউ ২৩৫ পরমাণু-বিভাজনের দ্বারা যে তেজ নির্গত হয় তার হারও যায় কমে। এই রকম অল্প হারের তেজ দিয়েও আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব হয় না। তাই দরকার হলো, ইউ ২৩৮কে অপসারিত করে ইউ ২৩৫কে বিশুদ্ধ অবস্থায় নিয়ে আসা। তখন আর হ্রস্ব গতিবেগবিশিষ্ট নিউট্রনের প্রয়োজন হয় না এবং সুষ্ঠুভাবে সাধারণ গতি-বেগের নিউট্রন দ্বারা শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় তেজ আহরণ করা যায়।

অন্যদিকে আবার দেখা গেল, ইউ ২৩৮-এ একটি নিউট্রন প্রবেশ করলে ইউ ২৩৯ সমপদ পাওয়া যায়। এই সমপদ প্রায় ২৩ মিনিটের মধ্যে নেপচুনিয়াম নামক ৯৩ পরমাণু-সংখ্যার মৌলে রূপান্তরিত হয়। পরমুহূর্তেই নেপচুনিয়াম ৯৪ পরমাণু-সংখ্যার প্লুটোনিয়াম মৌলে পরিণত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, ইউ ২৩৫ থেকে প্লুটোনিয়াম, শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় অধিকতর কার্যকরী। রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ প্লুটোনিয়াম পাওয়া সম্ভব হলো। অবশ্য এদিকে ইউ ২৩৮ ও ইউ ২৩৫ পৃথক করাতে যে সব প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়েছিল তাতে বিশুদ্ধ ইউ ২৩৫-ও পাওয়া গেল।

ফের্মি শিকাগোতে পারমাণবিক তেজ উৎপাদনের প্রথম পরীক্ষামূলক শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার পাইল তৈরী করেন। এই পাইলের কেন্দ্রস্থলে গ্র্যাফাইট খণ্ডের উপর বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রাখা হয়। এই ইউ-রেনিয়ামের গুণনমাত্রা থাকে ১.০৭। ইউরেনিয়াম পরমাণু-বিভাজনে উপজাত নিউট্রন সংখ্যা ও নিয়োজিত নিউট্রন সংখ্যার অনুপাতকে গুণনমাত্রা বলা হয়। এই মাত্রা ১-এর বেশী হলেই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চলতে পারে। কেন্দ্রস্থলের এই ইউরে-নিয়ামের বাইরে পর পর গ্র্যাফাইটের দুটি জাফরিতে ইউরেনিয়াম অক্সাইড এমনভাবে রাখা হয় যেন এদের গুণনমাত্রা হয় যথাক্রমে ১.০৩ ও ১.০৪। এই পাইলে নিউট্রনের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং কতকগুলো সরু ক্যাডমিয়াম পাত দিয়ে এই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যাডমিয়াম পাত দিয়ে এই পাইলের গুণনমাত্রা ১-এর কম রাখা হয়। তখন শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চলতে পারে না। তারপর এই পাতের সংখ্যা ও স্থানের অল্পবিস্তর পরিবর্তনের দ্বারা গুণনমাত্রা বাড়িয়ে ও কমিয়ে তেজ নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা এই পাইলের শক্তি ২০০ ওয়াট থেকে ½ ওয়াট পর্যন্ত বাড়ান বা কমান যায়। এই ইউরেনিয়াম-গ্র্যাফাইট জাফরি থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্বতঃস্ফূর্ত পারমাণবিক তেজ নির্গমের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে। এই পাইলে কোন বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। তার কারণ—এতে পরমাণু-বিভাজন প্রক্রিয়ার হার অল্প থাকে এবং তাপ ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থরূপে তেজ নির্গত হয়। তাপ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা এগুলো শোষিত হয় বলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। ২০০ ওয়াট পাইলে তেজ নির্গমের হার অল্প বলে পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায় না।

এদিকে আবার পরমাণু বোমার জন্যে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম প্রয়োজন তা অন্ততঃ ১০০০ কিলো-ওয়াট শক্তিসম্পন্ন পাইল ছাড়া পাওয়া যায় না। তাই ক্লিন্টন ও হ্যান্‌ফোর্ডে যথাক্রমে ১০০০ ও ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন পাইল তৈরী করা হয়। এই পাইলগুলোকে নিরাপদ করবার জন্যে বহু উপায় অবলম্বিত হয়েছিল। ক্লিন্টন ও হ্যান্‌ফোর্ডের কারখানাগুলোতে প্রচুর প্লুটোনিয়াম প্রস্তুত করা হলো। কিন্তু প্লুটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫কে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করতে হলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে যদি পরমাণু বোমা সক্রিয় হয় তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিস্ফোরণ হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে; আবার পরে হলে শত্রু পক্ষের হাতে এই অস্ত্রটি পড়ে গোপনতথ্য প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে।

প্লুটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫-এ শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হলে উক্ত ধাতুগুলোর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজন। এই পরিমাণকে সন্ধি-পরিমাণ বা ক্রিটিক্যাল সাইজ বলা হয়। সন্ধি-পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণ প্লুটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫-এ গুণনমাত্রা এক থেকে কম হলে শৃঙ্খল-ক্রিয়া চলে না। সাধারণতঃ পাঁচ পাউণ্ড প্লুটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫ এ শৃঙ্খল-ক্রিয়া চলতে পারে বলে এই পরিমাণকে সন্ধি-পরিমাণ বলা হয়। পরমাণু বোমা গঠনের বেলায় বোমার মধ্যে কতকগুলো ৫ পাউণ্ডের প্লুটোনিয়াম বা ইউ ২৩৫ পৃথক পৃথক রাখা হয়। তারপর যথাসময়ে এই বিচ্ছিন্ন ধাতু পিণ্ডগুলোকে একত্র করা হয়। মহাজাগতিক রশ্মি থেকে উদ্ভূত বায়ুমণ্ডলের নিউট্রন অথবা বিস্ফোরক ধাতুর স্বতঃবিভাজন দ্বারা এদের গুণনমাত্রা বহুগুণ বেড়ে গিয়ে বিস্ফারণ ঘটে। শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউ ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ও তেজের সৃষ্টি করে। সেই পদার্থ হতে উদ্ভূত তেজের দ্বারা বিরাট ভরবেগ পেয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বোমার উপযোগিতা বাড়াবার জন্যে সীসককে 'ট্যেম্পার' রূপে ব্যবহার করা হয়। এই সীসকের আবরণে নিউট্রনগুলো প্রতিহত হয়ে বোমার মধ্যে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়—সহজে বাইরে ছুটে যেতে পারে না। তাতে বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়।

তারপর সময়ের কথা ধরা যাক। অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী পরিমাণ তেজ নির্গত হয় ততই তার কার্যকারিতা বাড়ে। যেমন একটা মোটর গাড়ী কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ডের মধ্যে থেমে যেতে পারে—কিন্তু ব্রেকের সাহায্যে সেই গাড়ীকে থামাতে হলে প্রায় ৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। উভয় ক্ষেত্রে সমান পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হলেও প্রথম ক্ষেত্রে সময়ের অল্পতাহেতু ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আরও দেখা যায়, কোনও বিস্ফোরক পদার্থের মৃদু দহন তার দ্রুত বিস্ফোরণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। পরমাণু বোমার দ্রুত বিস্ফোরণ, সময় সংক্রান্ত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সময়ে খুব দ্রুতগতিতে বিচ্ছিন্ন ইউরেনিয়াম পিণ্ডগুলো যাতে একত্র হতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অল্প সময়ের মধ্যে এই একত্রীকরণ সম্ভব না হলে বিস্ফোরণের উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এই একত্রীকরণ ও বোমা বিস্ফোরণের অন্তর্বর্তী সময়টুকু যতদূর সম্ভব দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। ইউরেনিয়াম পিণ্ডগুলো একত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হলে বোমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ তেজ কেন্দ্রীভূত হতে পারে না—তাতে বিস্ফোরণের হার কমে যায়। এই সময়টুকু দীর্ঘতর হলে বিস্ফোরণের পূর্বে সর্বোচ্চ পরিমাণ তেজ বোমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উচ্চ মাত্রায় ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। লস্ এ্যালামস্ পরীক্ষাগারের কর্মীরা বহু গবেষণার ফলে বোমা বিস্ফোরণের সময় সংক্রান্ত সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন। এভাবে বিশ্বজগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ

পারমাণবিক তেজ মানুষের হাতে চরম মারণাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ণাঙ্গ প্রথম পরমাণু বোমা তৈরীর কাজে আমেরিকাই কৃতিত্ব অর্জন করে। নিউ মেক্সিকোতে এরূপ একটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তারপর হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে শত্রুপক্ষের উপর এই বোমা ব্যবহৃত হয়।

এই বোমা শত্রুপক্ষের উপর কিভাবে ফেলা হয় ও কি প্রতিক্রিয়া ঘটে সে সম্বন্ধে এখন কিছু তথ্য জানা গেছে। প্রথমতঃ লোকালয়ের এক হাজার ফুট উর্ধ্বে পরমাণু বোমাকে সক্রিয় করে প্যারাসুটযোগে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরকম করার প্রধান কারণ হচ্ছে—মাটিতে পড়ার পূর্বেই বোমার মধ্যে সর্বোচ্চ তেজ কেন্দ্রীভূত হতে পারে। মাটিতে পড়ার পর এই বোমা সক্রিয় হলে তার অধিকাংশ তেজ বৃহদাকার গর্ত সৃষ্টি দ্বারা মাটিতেই নষ্ট হয়ে যেত; ফলে উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হতো। দ্বিতীয়তঃ এই বোমা উর্ধ্বদেশে সক্রিয় হলে সেখানে ইউরেনিয়ামের বিভক্ত কেন্দ্রীনরূপে যে সব তেজষ্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয় সেগুলো সংশ্লিষ্ট তেজের দ্বারা আরও উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে লোকালয়ে সেই তেজষ্ক্রিয় পদার্থগুলো সঞ্চিত হয়ে মারাত্মক তেজষ্ক্রিয় অঞ্চল সৃষ্টি করতে পারে না। তবু দেখা গেছে যে, এই সতর্কতা সত্ত্বেও মাসাধিককাল পরে বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলে তেজষ্ক্রিয়তায় এভাবে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট তাপ ও আলোকের উদ্ভব ঘটে। বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা সৌর-পৃষ্ঠের তাপমাত্রারও উর্ধ্বে পৌঁছে। এই তাপমাত্রায় ইস্পাত বাষ্পীভূত হয়ে যায়, বাতাস দ্রুত প্রসারিত হয়ে ধ্বংসশক্তি বাড়িয়ে তোলে। বিস্ফোরণের আলোকের তীব্রতা সূর্যকে ছাড়িয়ে যায়। এই তীব্রতায় লোকে সাময়িক অন্ধতা প্রাপ্ত হয়। ইউ ২৩৫ বা প্লুটোনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভক্ত হয়ে যে তেজষ্ক্রিয় ধাতু উদ্ভূত হয় সেগুলো সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০০০ মাইল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিরাট গতীয়শক্তি দ্বারা লোকালয়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

পারমাণবিক তেজের এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখে সারা বিশ্ব আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা আবার ভবিষ্যৎ সংগ্রামের যে প্রলয়ঙ্কর রূপ অঙ্কিত করেছেন তা বর্ণনাতীত। বিজ্ঞানীদের মতে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে রেডিও নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতিশীল ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার-রকেটে প্লুটোনিয়াম বোঝাই করে ছেড়ে দিলে আটলান্টিক সাগর পেরিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারবে। আবার সমুদ্রে যদি এই বোমা স্থলের মত সমান কার্যকরী হয় তবে নৌ-যুদ্ধ একমুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও জলভাগে এই কার্যকারিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়নি। ভবিষ্যৎ সংগ্রামে পারমাণবিক তেজের প্রয়োগের পথে কতকগুলো বিশেষ বাধাও রয়েছে। প্রথমতঃ ইউরেনিয়াম সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং পরমাণু বোমা প্রস্তুত করতে প্রচুর অর্থ ও জনবলের প্রয়োজন। তাই যে সব দেশে এই সুবিধা রয়েছে তারাই পারমাণবিক তেজ কাজে লাগাতে পারবে। ইউরেনিয়াম সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না গেলেও বিজ্ঞানীরা অন্য কোনও সাধারণ মৌলিক পদার্থ থেকে তেজ আহরণের কথা চিন্তা করেছেন। এজন্যে সাধারণ বালুকায় অবস্থিত সিলিকনের নাম করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে সিলিকনের প্রতিটি পরমাণু-কেন্দ্রীন দ্বিখণ্ডিত হলে ১৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তেজ পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতে যদি কোনও বিশালতর সাইক্লোট্রন যন্ত্রদ্বারা দ্রুততর ত্বরনসম্পন্ন ডয়েটরন, সিলিকন-কেন্দ্রীন দ্বিখণ্ডিত করতে পারা যায় তবে বালুকা থেকে পরমাণু বোমা তৈরী হতে পারবে। বর্তমানে আবার হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের কথা জানা গেছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, নক্ষত্রজগৎ পারমাণবিক তেজের

দ্বারা আলো বা তাপ বিকিরণ করে। মহাকাশের নক্ষত্রগুলোকে বয়সের অনুপাতে লালদানব, সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র ও শ্বেতবামন এই তিন-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নক্ষত্র-জগতের শিশু লালদানব নক্ষত্রগুলোর তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প। তাপের মাত্রাভেদে এই নক্ষত্রগুলো তাদের ভেতরকার পরমাণু-বিভাজনের দ্বারা তেজ বিকিরণ করে। এক মিলিয়ন ডিগ্রির চেয়েও অল্প তাপমাত্রা বিশিষ্ট লালদানব নক্ষত্রে ডয়েটরন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ায় তেজ বিকীর্ণ হয়। যে সব নক্ষত্রে তাপমাত্রা আরও বেশী সেখানে লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন প্রভৃতি পরমাণু, হাইড্রোজেন পরমাণুর সহায়তায় তেজ বিকিরণ করে। আর সাধারণ পর্যায়ের নক্ষত্র আমাদের সূর্য ২ কোটি ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রায় কার্বন বা নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর স্বতঃবিভাজন দ্বারা আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এত অধিক তাপমাত্রা পার্থিবজগতে দুর্লভ বলে এরূপ সাধারণ পরমাণুর তাপকেন্দ্রীন-ক্রিয়ায় তেজ আহরণ করা সম্ভব হয়নি। ইউরেনিয়াম বোমা থেকে যে বিরাট তাপমাত্রা পাওয়া যায় তাতে ডয়েটরন বা লিথিয়াম ও হাইড্রোজেন পরমাণুর তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া ঘটান যায়। ইউরেনিয়াম বোমাকে কেন্দ্রে রেখে যদি লিথিয়াম বা ডয়েটরন ও হাইড্রোজেন দিয়ে বোমা প্রস্তুত করা হয়, সেটা সক্রিয় হলে ইউরেনিয়াম বোমা যে তাপ যোগান দিবে তাতে লিথিয়াম বা ডয়েটরন ও হাইড্রোজেনের তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়া চলবে এবং বিপুলতর তেজের উদ্ভব হবে। প্রতি পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ২৩৫ যেখানে ঘণ্টায় প্রায় ১১ মিলিয়ন কিলোওয়াট তেজ বিকিরণ করবে সেখানে ডয়েটরন-হাইড্রোজেন এবং লিথিয়াম-হাইড্রোজেন বোমা যথাক্রমে প্রায় ২২ ও ২৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট তেজ বিকিরণ করতে পারে। ইউরেনিয়াম দুষ্প্রাপ্য বলে ইউরেনিয়াম বোমায় এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা যায় না; কিন্তু সহজলভ্য ডয়েটরন, লিথিয়াম ও হাইড্রোজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে হাইড্রোজেন বোমার শক্তি বহুগুণ বাড়াতে পারা যায়। এই বোমার বাস্তবরূপ কিরকম হবে তার প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়। এসব বোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ারও কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। কেবলমাত্র পরমাণু বোমার বিভীষিকাই মানুষকে এই মারণাস্ত্র ব্যবহার থেকে নিরস্ত করতে পারে, অথবা মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণ হলে পারমাণবিক তেজের বিশাল সম্পদ মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত হতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় ব্যথিত মানব সমাজ আজ সেই কামনাই করে।

সমস্ত দেশের বিজ্ঞানী সমাজ আজ পারমাণবিক তেজকে আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করবার চিন্তায় ব্যাপৃত। আমরা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ, বাষ্প এবং পেট্রোলিয়াম শক্তি দ্বারা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকি। এদের মধ্যে জল বা কয়লা থেকে বিদ্যুৎশক্তি আহরণ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হয় ও তারের সাহায্যে বিভিন্ন কার-খানায় ও বাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে পাঠান যায়। কিন্তু বাষ্প বা পেট্রোলিয়ামের বেলায় এঞ্জিনের মধ্যেই কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের দহন ক্রিয়ার সাহায্যে তেজ আহরণ করতে হয়। শেষোক্ত উভয় তেজকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কাজে লাগান যায় না।

এখন কয়লা ও জলের পরিবর্তে পারমাণবিক তেজ দিয়ে বিদ্যুতের কাজ চালান যাবে বলে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হ্যানফোর্ডে প্রায় ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি-সম্পন্ন যে পারমাণবিক তেজের প্ল্যাণ্ট তৈরী হয়েছিল সেরূপ ন্যূনাধিক ছয়টি প্ল্যাণ্ট হলে বিদ্যুতের জন্যে আমাদের কয়লার কোন প্রয়োজনই হবে না। অবশ্য এই প্ল্যাণ্টগুলোর জন্যে প্রচুর পরিমাণ

ইউরেনিয়াম প্রয়োজন। তাছাড়া এগুলো প্রস্তুত করতে যথেষ্ট অর্থেরও দরকার। একবার এগুলো তৈরী করতে পারলে বিদ্যুৎ খুব সস্তায় পাওয়া সম্ভব হবে। কারণ এই স্বয়ংক্রিয় প্ল্যান্টগুলোতে বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হবে না এবং দীর্ঘকালের জন্যে তেজ উদ্ভূত হবে। মানুষের কল্যাণকামী বিজ্ঞানীদের এই চিন্তা ও ভবিষ্যদ্বাণী অদূর ভবিষ্যতে সার্থক হবে নিশ্চয়ই। বাষ্পীয় যানে কয়লার পরিবর্তে পারমাণবিক তেজকে কিভাবে কাজে লাগান যায় বিজ্ঞানীরা তা-ও চিন্তা করেছেন। ফের্মি কর্তৃক নির্মিত চিকাগো পাইলের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পাইলের উচ্চতা ৮ ফুট ও ব্যাস ১০ ফুটের বেশী বলে মনে হয় না। এই পাইলে ½ থেকে ২০০ বা ততোধিক কিলোওয়াট তেজ আহরণ করা যেতে পারে। এই রকম একটি পাইলের সাহায্যে বাষ্পচালিত এঞ্জিন চালান অসম্ভব নয়। এই পাইলের তেজ কয়লার পরিবর্তে ব্যবহৃত হলে জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পনির্গত হবে এবং এঞ্জিনকে সক্রিয় করা যাবে। তাছাড়া এরকম পাইল থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তার হার এত বেশী নয় যে, সহজে কোনও বিপদ ঘটতে পারে। জলাধারের পশ্চাতে এই পাইল রক্ষিত হলে আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এভাবে পারমাণবিক তেজ প্রয়োগের বিশেষ অসুবিধা আছে। সেটা হলো ইউরেনিয়ামের দুর্লভতা। একটি চিকাগো পাইল প্রস্তুতিতে ছয় টন বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজেই ১০০০ এঞ্জিন তৈরী করতে প্রায় ৬০০০ টন ইউরেনিয়ামের প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ ধাতুপিণ্ড ছাড়া শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় ঈপ্সিত তেজ-নির্গম হয় না। ভবিষ্যতে যদি অন্য কোনও সুলভ ধাতুতে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ায় তেজ-নির্গম সম্ভব হয় তবে এ কল্পনা সার্থক হবে।

অ্যারোপ্লেন বা অটোমোবাইলে গ্যাসোলিনের পরিবর্তে পারমাণবিক তেজের ব্যবহার বর্তমানে দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়। কারণ এরকম ছোট এঞ্জিনের মধ্যে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার কোনও পাইল রাখা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ সন্ধি-পরিমাণ ইউরেনিয়াম দ্বারা যেকোনও সময়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং পারমাণবিক তেজ চালিত এই রকম মোটর থেকে যে গামারশ্মি বা নিউট্রন বিচ্ছুরিত হবে তা যাত্রী বা চালকদের পক্ষে ভয়ানক বিপজ্জনক হবে। এই বিপদ এড়াতে হলে বহু টন ওজনের সীসকের দেয়াল দিয়ে এঞ্জিনকে ঢেকে রাখতে হবে। ক্ষুদ্রাকার অ্যারোপ্লেন বা মোটরে এরূপ করা কখনও সম্ভব নয়।

কোনও কোনও বিজ্ঞানী এসব অসুবিধা এড়ানোর জন্যে পারমাণবিক তেজকোষ অর্থাৎ অ্যাটমিক ষ্টোরেজ ব্যাটারী তৈরীর কথা বলেছেন। যে কোনও স্থানে ব্যবহারের জন্যে এই রকম তড়িৎকোষে পারমাণবিক তেজ সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব হবে। প্রথমতঃ সাধারণ স্থিরবস্থ মৌলিক পদার্থগুলো ইউরেনিয়াম পাইল থেকে নির্গত নিউট্রন দ্বারা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। এই পদার্থগুলো থেকে এমন কতক বেছে নেওয়া যায় যারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ গামারশ্মি-বিকিরণ করে। এরাই তাপের উৎসরূপে ব্যবহারের জন্যে তেজকোষ তৈরীর উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন পরিমাণ তেজ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ তেজকোষের অসুবিধা এই যে, একবার প্রস্তুত হলেই এর ক্রিয়া চলতে থাকে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। পারমাণবিক তেজকে কাজে লাগাবার অন্য কোনও বিকল্প উপায় নেই। তবে তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়াদ্বারা নক্ষত্রগজতে যেরূপ তেজ বিকিরণ হয় অথবা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা সম্ভব হতে পারে—সেরূপ তাপকেন্দ্রীন ক্রিয়ায় সাধারণ পরমাণু-বিভাজন দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে পারমাণবিক তেজকে কাজে লাগানো কি সম্ভব? যতদূর জানা গেছে এরকম কোনও সম্ভাবনাই নেই, এমন কি সুদূর ভবিষ্যতেও নয়।

বিজ্ঞানী গ্যামো পারমাণবিক তেজের সাহায্যে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহে অভিযানের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সাধারণ কোনও যানে রাসায়নিক তেজের কেন্দ্রীভবন অল্প বলে এই সব যান পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এই মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করতে হলে সেকেণ্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার বা ততোধিক গতিবেগ প্রয়োজন। সাধারণ রাসায়নিক দহন-ক্রিয়া দ্বারা এইরূপ গতিবেগ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এই উদ্দেশ্যে পারমাণবিক তেজ চালিত রকেট-যানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে রকেট-যান সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ বন্দুক ছোড়বার সময় গুলি সম্মুখদিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দিকে একটা প্রতিঘাত হয়। সেই রকম, রকেট থেকে যে গ্যাসীয় পদার্থ দ্রুত গতিতে উন্মুক্ত হয় তার প্রতিঘাতই রকেটকে সম্মুখে চালিত করে। বন্দুকের প্রতিঘাত গতিবেগ ও গুলির গতিবেগ তাদের ভরের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে হয়। সেজন্যে গুলির গতিবেগের অনুপাতে বন্দুকের প্রতিঘাত বেগ অল্পতর হয়। কারণ বন্দুকের ভর তার গুলির চেয়ে অনেক বেশী। তাই মহাশূন্যে রকেটের গতিবেগ জেট্ গ্যাসের গতিবেগ থেকে অল্প হয়। কারণ সমগ্র গ্যাসের ভর থেকে রকেটের ভর অনেক বেশী। এখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করতে হলে সেকেণ্ডে ১১ কিলোমিটার গতিবেগের প্রয়োজন। তা পেতে হলে রকেট থেকে নির্গত গ্যাসের ভর রকেটের চেয়ে অন্ততঃ ১০ গুণ বেশী হওয়া প্রয়োজন। অথচ রকেটে রাসায়নিক তেজের জন্যে জ্বালানী নিতে হলে রকেটের ভর বহু পরিমাণ বেড়ে যায়। রাসায়নিক তেজের পরিবর্তে পারমাণবিক তেজ ব্যবহার করলে ১০ টনের রকেটে ১০০ পাউণ্ড জ্বালানীই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ রকম রকেট তৈরী করা এখনও সমস্যা সঙ্কুল হয়ে আছে। এর পরিবর্তে কেন্দ্রীন-বিভাজনে উদ্ঘাত তেজের প্রতিঘাত দ্বারা রকেট চালান যায় কিনা, সে কথা চিন্তা করা হয়েছে। কোন ধাতব প্লেটের ওপর যদি আলফাকণা বিকিরণশীল তেজস্ক্রিয় পদার্থের পাতলা আবরণ দেওয়া হয় তবে আলফাকণা একদিকে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্লেটটি প্রতিঘাত দ্বারা বিপরীত দিকে পরিচালিত হয়। ধাতব প্লেটের ওপর তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবরণ খুবই পাতলা হওয়া প্রয়োজন, নতুবা আলফাকণাগুলো পৃষ্ঠদেশে বিকিরিত হওয়ার পূর্বেই আবরণের মধ্যে লেগে থেকে যায়। মহাশূন্যে কোনও রকেট চালাতে হলে বিপুল পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রয়োজন এবং সেই পদার্থ পাতলা আবরণরূপে রাখতে বিরাট আয়তনের ধাতব প্লেটের ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে আমাদের রকেট বহু বর্গ-ফুট আয়তনবিশিষ্ট বিশাল জাহাজের মত দেখাবে। এই রকম রকেটের সম্ভাবনা কতদূর জানি না; কিন্তু বিজ্ঞানীর কল্পনায় আমাদের মহাশূন্যের অভিযানে রকেটের পশ্চাদ্দেশে বিশাল ছত্রাকৃতি ধাতব আবরণে আস্তীর্ণ তেজস্ক্রিয় পদার্থই রকেটকে চালিত করবে। পার্থিব বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার সময় এই ছাতাটি গুটানো থাকবে ও রকেটটি সাধারণ রাসায়নিক তেজের দ্বারাই চালিত হবে। পৃথিবী অতিক্রমকালে মহাশূন্যে এই রকেট তার ছত্রাকার পাল উন্মোচন করে নক্ষত্র-জগতের ভেতর দিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেবে পেখম-তোলা ময়ূরের মত। সেদিন সফল হবে মানুষের গ্রহ-নক্ষত্রে অভিযান।

বিজ্ঞানীর এই সব দূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছাড়া, যতদূর জানা গেছে, বর্তমান পারমাণবিক তেজ হতে উপজাত প্রায় শতাধিক সম্পদ দিয়ে মানব সমাজের বহু উপকার করা যাবে। বিগত পুণা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে মহিলা বিজ্ঞানী আইরিন কুরী চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সব

সমপদের বহুল প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাছাড়া পারমাণবিক তেজের গবেষণার দ্বারা শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য প্রায় পাঁচ হাজার বা ততোধিক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম বিশুদ্ধিকরণ, পাম্প নির্মাণ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় কাজে এই সমস্ত উপায় প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

পারমাণবিক তেজের গবেষণায় মানুষের সভ্যতার আশাতীত উন্নতি হবে সন্দেহ নেই—যদি না মানুষের অশুভ বুদ্ধি তাকে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করে। আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের জন্যে দায়ী হব আমরাই, পারমাণবিক তেজ উপলক্ষ্য মাত্র।

হাঁস-মুরগী ও ডিমের চাষ

শ্রীভবানীচরণ রায়

হাঁস-মুরগী আর ডিমের চাষ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কিছু বলিতে যাওয়ার বিপদ আছে। বিজ্ঞান বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নিউটনের অভিকর্ষ, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তত্ত্ব সমূহের আলোচনা বা অনুশীলন। আর নিতান্তই গবেষণাগারের বাহিরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৃষ্টি পড়িলে বিজ্ঞান বলিতে বুঝি—রেলগাড়ী, অ্যারোপ্লেন, রেডিও, বিজলী বাতি প্রভৃতির মত হরেকরকম জিনিসপত্রের কথা। তার বেশী দৃষ্টি আমাদের বড় একটা চলে না। কেন না, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও কেবল পাঠ্য পুস্তকে, দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয় স্তম্ভে আর 'ড্রইং রুমের' স্বল্প পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাঁস-মুরগী ও ডিমের পরিপুষ্টির ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অজ্ঞতা অসাধারণ। তাই সুদূর পল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পালিত হাঁস-মুরগী ও তাহাদের ডিমের চালান প্রত্যহ যখন সহরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য আমদানী করা হয়, ক্রেতারা তখন কেবল পালকের নীচে ও ডিমের খোসার ভিতরে সযত্নে রক্ষিত অস্থিচর্মসার দেহে কোন রোগ আছে কিনা, পরিপুষ্টির মাপকাঠিতেই বা উহাদের মূল্য কতখানি, এসব বিষয়ে একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না। অথচ এইসব রোগজীর্ণ পাখী এবং অখাদ্যে পরিণত ডিমের ভিতর দিয়া যে নানা-প্রকারের ব্যাধি প্রত্যহ সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে সেকথা ভাবিয়া দেখিবার মত চেষ্টা ও অবসর কাহারও নাই। অথচ এ কথাও সকলে জানেন যে, কেবল সিদ্ধ করিলেই সকল রকমের বীজাণু ও বিষের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না।

দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান ও স্বাস্থ্য উন্নতির ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, একমাত্র তাঁহাদের প্রচেষ্টাই খাদ্যের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করিয়া তুলিতে পারে। প্রত্যেক স্বাধীন দেশই ইহা করিয়া থাকে।

অবশ্য আমাদের এই অনশন, অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট দেশে, যেখানে দুইবেলা দুইমুঠা ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করাটাই জনসাধারণের জীবনের প্রায় একমাত্র সমস্যা, সেখানে পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে হয়ত আপাততঃ উপহাসের সামিল বলিয়াই গণ্য হইতে পারে; তবুও এই যে আজ পুরিপুষ্টির একান্ত অভাব দেশময় একটা যাপ্য ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে, সে বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে স্বাস্থ্যের পরিপূরক হিসাবে খাদ্যের পরিপুষ্টির কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এইরূপ সহজাত পুষ্টিকর খাদ্য হইল দুধ ও ডিম। কিন্তু, বেশী

লাভের আশায় দুধে ভেজাল দেওয়া যায়, তাই এক গো-বৎস হইয়া জন্মিতে না পারিলে খাঁটি দুগ্ধ পান করিবার আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু বাহির হইতে ডিমে ভেজাল দেওয়া চলে না, তা-ছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডিমের চাষ শতগুণে বৃদ্ধি করা বৎসর খানেকের কাজ মাত্র। তাই আমেরিকায় আজ বৎসরের পর বৎসর ডিমের চাষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই ঘটিতেছে। আর আমাদের দেশে যে কয়েকটি ডিম পাওয়া যাইত, বাংলা বিভাগের ফলে তাহাতেও ঘাটতি দেখা দিয়াছে—মূল্য বৃদ্ধির উল্লেখ না হয় না-ই করিলাম। অথচ গভর্ণমেণ্ট যদি আজ এই কাজে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে ডিমের সংখ্যা যেমন অন্ততঃ শতগুণ বাড়ানো যায়, ডিমের দাম সেই অনুপাতে না হইলেও অনেকটা নামাইয়া আনা চলে। আমাদের দেশে পুঁজিপতিরা টাকার জোরে বিজ্ঞানকে শুধু খাদ্যবস্তুতে ভেজাল দিবার কাজেই নিয়োগ করিতেছেন, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় কিন্তু সেই বিজ্ঞানকেই হাঁস-মুরগীর চাষের ও সহরে পরিবেশনের কাজে অনায়াসেই নিয়োগ করিয়া নিজেদের ও কৃষকদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারেন।

যাবতীয় কৃষি ও পশুপালন অপেক্ষা হাঁস-মুরগীর চাষে দ্রুততর গতিতে দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার হাঁস-মুরগী পালনের ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্যই দিয়া থাকে।

কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি নানারূপ প্রাথমিক উৎপাদনের আয়ের সঙ্গে হাঁস-মুরগী চাষের তুলনাও দেখিতে পাই। ইহা সর্বাধিক লাভজনক ব্যবসায়। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল অবধি নানারূপ প্রাথমিক উৎপাদনের মধ্যে আয়ের দিক দিয়া হাঁস-মুরগীর চাষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। নীচের তালিকা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

প্রাথমিক উৎপাদন

(যুক্তরাষ্ট্র)

শতকরা লভ্যাংশ

	১৮৮০ সাল	১৯৩৭ সাল
গো-পালন	৯.৫	৯.৭
দুগ্ধজাত খাদ্য	১০.২	১৯.৫
ছাগ ও মেষ	০.৫	১.২
কার্পাস ও কার্পাস বীজ	১২.৬	১০.৪
তামাক	১.৪	৩.৩
অন্যান্য খাদ্যবস্তু	৪.৮	৪.৩
হাঁস-মুরগী	৪.৮	১১.৭

এতদুদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগী পালকসংঘ-আন্দোলন প্রবর্তিত হইলে আশু ফললাভে আমাদের সহায়তা করিতে পারে। সংঘ প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হইল—হাঁস-মুরগী পালনে বর্তমানে অনুসৃত অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবসান ঘটাইয়া তৎপরিবর্তে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন করা। তবে প্রথমেই গ্রাম্য উৎপাদন-কারীদের বিজ্ঞানানুমোদিত উপায়ে আহার্য প্রদান, প্রজনন, ডিম ফোটানো প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রতি সর্বশক্তি প্রয়োগ না করিয়া উৎপাদিত মুরগী ও তাজা ডিম সত্বর কলিকাতায় চালান দেওয়া এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থায় বিক্রয়কেন্দ্র হইতে জনসাধারণকে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফলে উৎপাদনকারীর আশু আয়ের অঙ্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং জনসাধারণও কম মূল্যে ভাল মুরগী ও তাজা ডিম পাইতে পারে। ইহার সাফল্যের উপর সংঘের অন্যান্য কার্যাবলী অনুসরণও নির্ভর করিবে। কালক্রমে ইহা দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির সহায়ক হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রসঙ্গতঃ যুক্তরাষ্ট্রের হাঁস-মুরগীর ব্যবসায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে হাঁস-মুরগীর কারবারেই কয়েক সহস্র কোটি টাকা খাটিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত লোকের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। তৎসত্ত্বেও সেখানে কিন্তু তাজা ডিম আমাদের দেশের

আমদানীকৃত পচা ডিমের চেয়ে সস্তায় বিক্রয় করা সম্ভব হইতেছে।

বর্তমান ব্যবস্থাধীনে আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে উৎপন্ন ডিম, অযত্নে ও অসংরক্ষিত অবস্থায় কয়েকটি দালালের (ফরিয়া ও মজুতদার) মাধ্যমে বহু বিলম্বে কলিকাতার ক্রেতাদের নিকট হাজির হয়। তখন স্বভাবতঃই সেই ডিমগুলি গুণাগুণ বিচারের বাহিরে চলিয়া যায় এবং উৎপাদনকারীদের পাওনায় ঘাটতি পড়ে। এই সংঘ প্রবর্তনের ফলে উভয় (দফে দফে দালালি ও খাদ্য হিসাবে ডিমের গুণ হ্রাসের) কারণেরই পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এই কথা কাহারও অজানা নাই যে, যাবতীয় খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে দুধ ও ডিমই সহজ-পচনশীল; এমন কি শীত প্রধান দেশেও সামান্য উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। তবে সমস্ত জিনিসটাই এককালীন হয় বলিয়া আমাদের নজর এড়াইতে পারে না। কিন্তু ডিমও সেই একই কারণে ধীরে ধীরে খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত হইতে থাকে, তবে এই পচনক্রিয়া আমাদের স্থূল-দৃষ্টিতে ধরা না পড়িলেও বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আমাদের মত গ্রীষ্ম প্রধান দেশের আবহাওয়ার উত্তাপই ১০০° ফা.—১১০° ফা. থাকে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার প্রয়োজনীয় তাপের মাত্রা ১০৩° ফা-এর উপরে। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ বাড়িতে আরম্ভ করে ৬৮° ফা. তাপেই; অর্থাৎ এই তাপের আওতায় আনার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য হিসাবে ডিমের গুণের অবনতি সুরু হয়। তাই আজ পাশ্চাত্য দেশে খাদ্যাখাদ্যের বিচারে অভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট তাজা ডিমের এত চাহিদা। কিন্তু সে দেশের ক্রেতারা তো তাই বলিয়া তাজা ডিমের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা মুরগীর খাঁচায় আবদ্ধ থাকে না! ঐ দেশের মুরগী-পালকেরা সেইজন্য খাঁচা হইতে ডিম বাহির করিবার সময়েই আলপিন দিয়া ডিমের খোসাটা ফুটাইয়া দিয়া থাকে, যাহাতে ডিমের মধ্যে ভ্রূণ মরিতে বাধ্য হয়। তার পরে ডিমটি যথানিয়মে ঠাণ্ডা ঘরে রক্ষিত হয়। তবে বড় বড় ডিম উৎপাদনকারীরা মোরগবিহীন মুরগীর পাল প্রতিপালন করিয়া ভ্রূণহীন ডিম (অর্থাৎ যাহাকে 'বাওয়া ডিম' বলা হয়) সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই প্রকার ডিমেরও ঠাণ্ডা ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পাশ্চাত্য দেশে কেবল ডিম নয়; পরন্তু সমস্ত খাদ্যদ্রব্যেরই পুষ্টি সংরক্ষণার্থে ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবহার যথেষ্ট প্রসার লাভ করিতেছে। অন্যান্য জিনিসের মতই মুরগী ও ডিমের ব্যবসায়ে লাভ অথবা ক্ষতি নির্ভর করে তাহাদের বিক্রয়-দরের উপর। আবার বিক্রয়-দর নির্ভর করে মুরগী ও ডিমের বিক্রয়কালীন গুণাগুণের উপর। কেবল সংরক্ষণ ব্যবস্থাই নয়, পাশ্চাত্য দেশে সমস্ত মুরগীপালন পদ্ধতিটাই আজ বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিতেছে। তাহার ফলে সেখানকার একটি মুরগীর ওজন গড়ে প্রায় চার সের ও ডিম পাড়ে বৎসরে আড়াই শত হইতে তিন শত পর্যন্ত। সেই তুলনায় আমাদের দেশের একটি মুরগীর ওজন গড়ে প্রায় দেড় সের। এই মুরগী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ডিম পাড়ে বৎসরে প্রায় ষাট হইতে এক শতটি।

পাশ্চাত্য দেশে মুরগীপালনের এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা; কারণ অন্যান্য কৃষি ও শিল্পের তুলনায় এই ব্যবসায়ে অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম ও অগাধ মূলধনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের শিক্ষাভিমানী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি যত সত্বর এই ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয় ততই মঙ্গল। বৃথা পঞ্চাশ ষাট টাকার কেরাণীগিরি চাকরীর দুরাশায় না ঘুরিয়া বরং স্বল্প মূলধনে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁস ও মুরগী পালনে প্রবৃত্ত হইতে আবেদন জানাই, আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাই বলিয়া যেন

তাঁহাদের আর্থিক সমস্যার সমাধানকল্পে রাতারাতি হাঁস-মুরগীর চাষের কাজে লাগিয়া না যান। কারণ ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, পশুপক্ষীর চাষে অভিজ্ঞতার একটা বড় রকমের মূল্য আছে—যাহাকে অবহেলা করা কিছুতেই উচিত নয় এবং পুস্তক হইতেও ইহা অর্জন করা যায় না। এই জন্যই প্রাথমিক উৎপাদনের দায়িত্বটা আপাততঃ অশিক্ষিত অথচ অভিজ্ঞ গ্রাম্য চাষীদের হাতে ন্যস্ত থাকুক যতদিন পর্যন্ত না আমাদের শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে নিজেরাই কয়েকটি হাঁস-মুরগী পালন করিয়া সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তবে গ্রাম্য চাষীদের উৎপন্ন তাজা ডিম সংরক্ষিত অবস্থায় সহরে দ্রুত চালান দিয়া বিক্রয় করার ব্যাপারে তাঁহারা এখনই নিজেদের নিয়োগ করিতে পারেন। তাজা ডিম সরবরাহের ব্যাপারটাও কিন্তু দস্তুরমত একটা সমস্যা, যাহার আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। ইহার দুইটি কারণ আছে। একটি হইল, খাদ্য হিসাবে তাজা ডিমের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা; দ্বিতীয়টি হইল, আজও চালানী কাজটা কেবল অশিক্ষিত দালালদের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত সমাজের প্রয়োজন অধিকতর। তাঁহারাই তাজা ডিমের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করাইবেন ও উহা গ্রাম হইতে আনিয়া সহরে পরিবেশন করিবেন। ইহার সাফল্যের উপরই দরিদ্র কৃষকদের ও আমাদের বেকার শিক্ষিত সমাজের আর্থিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করিবে।

খাদ্য ও অখাদ্যের তুলনামূলক বিচারে তাজা ডিমের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য স্বীকার্য এবং ইহার প্রচারকার্য ব্যয়বহুলও হইবে না। তথাপি আমাদের জাতীয় সরকারেরই এই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত, নতুবা জনসাধারণ ইহাকে ব্যবসাদারী ফন্দী বলিয়া মনে করিতেও পারে। আমাদের জাতীয় সরকার খাদ্য বিষয়ক গবেষণায় "অধিক খাদ্য ফলাও" ও "অপচয় বন্ধ কর" ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু অল্প আয়াসেই যে তাজা ডিম পাওয়া যাইতে পারে জনসাধারণকে সেই বিষয়ে অবহিত হইবার কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না।

জনসাধারণকে এবিষয়ে অবহিত করাইবার জন্য 'পোল্ট্রি ক্লাব' প্রবর্তিত হইলে তাহার কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১। শিক্ষিত যুবকদের পরিচালনাধীনে কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিত ও পরিচালিত একটি আদর্শ হাঁস-মুরগী পালনের খোঁয়াড় ও ডিম সংরক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

২। হাঁস-মুরগী পালনে শিক্ষাপ্রাপ্ত উক্ত যুবকবৃন্দ কর্তৃক গ্রামে গ্রামে গিয়া গ্রাম্য হাঁস-মুরগী পালকদের দ্বারা প্রতি গ্রামে একটি করিয়া সংঘ গঠন ও অন্যদেশের নজির দেখাইয়া তাহাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। উৎপাদিত দ্রব্যের (সংরক্ষিত অবস্থায়) দ্রুত চালানের ব্যবস্থা করা।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় গ্রাম্য হাটে হাটে হাঁস-মুরগীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা ও অধিক উৎপাদনকারীকে কেন্দ্রীয় সংঘ হইতে পুরস্কৃত করা।

৫। ডিমের পচন নিবারণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁস-মুরগীর মেদ বর্ধন, মোরগকে খাসিকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া।

৬। কলিকাতার আদর্শ খোঁয়াড়ে উৎপন্ন ভাল জাতের দিনবয়সী হাঁস ও মুরগীর শাবক সংঘের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা।

৭। কেন্দ্রের সহিত গ্রাম্য সংঘের নিত্য সংযোগের ব্যবস্থা করা।

৮। কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সংঘ কর্তৃক ভাল মুরগী ও তাজা ডিমের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রচারের ব্যবস্থা ও তাহাদের পরিবেশন।

৯। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ কর্তৃক উপযুক্ত অবস্থায় উৎপন্ন হাঁস-মুরগী ও তাজা ডিম সংগ্রহ এবং চালানীর ব্যবস্থাকরা।

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন ও অরিওমাইসিন

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

১৯৩২ সালে সালফানোমাইড (প্রোণ্টোসিল), ১৯৩৫ সালে সালফানিলামাইড, ১৯৩৮ সালে এম, বি ৬৯৩ এবং ১৯৪১ সালে পেনিসিলিনের আবিষ্কার বীজাণুসম্ভূত নানা ব্যাধির চিকিৎসায় অপূর্ব সাফল্যলাভ করলো। কিন্তু কলেরা, যক্ষ্মা, প্লেগ এবং গ্রাম-নেগেটিভ বীজাণুজাত কোনও রোগে কাজে লাগলো না।

ছত্রাক থেকে পেনিসিলিনের আবিষ্কার, আরও ওই জাতীয় নানা প্রকার ওষুধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা বিজ্ঞানী মনকে সচেতন করে তুললো। পৃথিবীর সর্বত্র ওই সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা চললো; কিন্তু ফলাফল বড় নৈরাশ্যজনক বলে মনে হলো। অবশেষে আমেরিকার অন্তর্গত রাজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সেলম্যান ওয়াক্‌স্‌ম্যান ১৯৪৪ সালে ষ্ট্রেপ্টোমাইসেস গ্রেসেয়াস নামক ছত্রাক থেকে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন নামক ওষুধটি আবিষ্কার করেন।

১৮৮৮ সালে রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের পিরলুকা নামক এক পল্লীতে ওয়াক্‌স্‌ম্যান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে ডাক্তার হবার আশায় ওয়াক্‌স্‌ম্যান আমেরিকায় এসে হাজির হন। প্রথমে ফিলাডেলফিয়া পরে নিউজার্সিতে তাঁর এক ভগ্নীপতির আশ্রয়ে এসে ওঠেন। এই ভগ্নিপতির ইচ্ছানুসারেই তিনি নিউজার্সি এগ্রিকালচার এক্সপেরিমেণ্ট ষ্টেশনের অধ্যক্ষ ডাঃ জেকব লিপ্‌ম্যানের সঙ্গে দেখা করেন। এইখানেই তাঁর জীবনের পথ ও মত দুই-ই গেল বদলে। লিপ্‌ম্যান তাঁকে ডাক্তারী পড়তে না পাঠিয়ে রাজার্স বিদ্যালয়ের কলেজ অব্‌ এগ্রিকালচারে ভর্তি করে দিলেন। এখানকার পড়া শেষ করার পর ওয়াক্‌স্‌ম্যানের বৈজ্ঞানিক জীবনের আরম্ভ।

১৯১৫ সালে ওয়াক্‌স্‌ম্যান মাটি থেকে ষ্ট্রেপ্টোমাইসেস গ্রিসেয়াস নামে এক জাতীয় ছত্রাক আবিষ্কার করেন। তারপর দীর্ঘ ২৯ বছর সাধনায় তিনি ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

গবেষণাগারে কোনও বস্তু আবিষ্কৃত হলেই তা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয় না। তাই ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারের পর কি করে তা সস্তায় বেশী পরিমাণে উৎপাদন করা যায়, সেবিষয়ে নানা গবেষণা চলে। গবেষণাগারে যেসব বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা হয় তা হলো :—

(১) গবেষণাগারে উৎপাদিত বস্তু বেশী পরিমাণে সস্তায় উৎপাদন এবং এই ভাবে উৎপাদিত বস্তুর শক্তি এবং স্থায়িত্ব রক্ষা।

(২) সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বিশুদ্ধিকরণ। বিশুদ্ধ করার পর মানুষ, পশুপক্ষী ইত্যাদি সকল প্রকার জীবজন্তুর দেহে প্রয়োগ করলে যাতে কোনও বিষক্রিয়া না ঘটে।

(৩) ওষুধটির বীজাণুধ্বংসী গুণাগুণ শরীরের টিস্যু অথবা জলীয় বস্তু দ্বারা নষ্ট না হয়।

এ ছাড়া ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ওষুধটির আরও একটি বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। পেনিসিলিন যে সব ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, সেই সব রোগে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগ করে তার ফলাফল বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন সবগুলো পরীক্ষাতেই সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো।

ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন তৈরী করা পেনিসিলিনের চেয়ে সহজ, কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ কালচার মিডিয়াম বা মাধ্যমে গ্লুকোজ এবং লবণ জাতীয় পদার্থ ছাড়াও আমিষ জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয়—যেমন মাংসের নির্যাস ও পেপটোন। মাংসের

নির্যাস খুব দামী এবং খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনকে সর্বসাধারণের এবং দরিদ্রতম ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য করতে হলে মাংসের নির্যাস কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরী করার পদ্ধতিও পেনিসিলিনের মত। পেনিসিলিনের ন্যায় ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ছত্রাকও বড় বড় আধারে উৎপন্ন করা হয়। ছত্রাক জন্মের ৬০ থেকে ৯০ ঘণ্টার মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, মাধ্যমের ভিতরে পাওয়া যায়। ছত্রাক চাষ খুব ভাল হলে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার স্থানে জাত ছত্রাক থেকে প্রায় ২০০ থেকে ৪০০ ইউনিট ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন পাওয়া যায়। এক মিলিগ্র্যাম মাধ্যম থেকে ১০০০ ইউনিট পেলে বুঝতে হবে ছত্রাক খুব ভাল হয়েছে।

এখন দেখা যাক, কেমন করে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরী হয়। ছত্রাক পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে জলীয় মাধ্যম ছেঁকে লওয়া হয়। তারপর—

১। মাধ্যমকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে অম্লাত্মক করা হয়। পরে কাঠকয়লা মিশিয়ে বেশ ভাল করে নেড়ে আবার কাঠকয়লা থেকে মাধ্যম পৃথক করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাঠকয়লার সঙ্গে কিছুটা ময়লা চলে যায়।

২। এইবার মাধ্যমকে নিউট্র্যাল করার জন্যে আবার নতুন কাঠকয়লা মিশানো হয়। এবারে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন মাধ্যম ছেড়ে কাঠকয়লায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

৩। তৃতীয় পর্যায়ে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন সমন্বিত কাঠকয়লা অ্যালকোহল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়। তারপরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশ্রিত মিথাইল অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এই ডুবিয়ে রাখার কাজ পর পর দুবার করা হয়। এই পদ্ধতিতে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন কাঠকয়লা ছেড়ে, মিথাইল অ্যালকোহলে মিশে যায় এবং ইহার সংযোগে অধঃক্ষেপিত করে শুকিয়ে গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়।

৪। আরও বিশুদ্ধিকরণের জন্যে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনকে অ্যালুমিনা স্তম্ভের মধ্য দিয়ে চুইয়ে লওয়া হয়। পরে মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন পৃথক করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছত্রাক বীজ ছড়ানোর পর ৮ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত ২৭° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রাখা হয়। বড় বড় আধারে সর্বত্র সমান ভাবে ছত্রাক জন্মানোর জন্যে বাতাস দেওয়া হয়ে থাকে। উপরোক্ত উপায়ে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নিষ্কাশন করলে শতকরা ৩০।৪০ ভাগ নিষ্কাশন করা যায় এবং বিশুদ্ধতায় তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হয় (তৃতীয় প্রক্রিয়া পর্যন্ত)। উল্লিখিত চতুর্থ প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা যায়।

চিকিৎসাকার্যে ব্যবহারের জন্যে বিশুদ্ধতার মাত্রা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন। প্রথম প্রথম ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে হিষ্টামিন জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকায় নানা রকমের বিষক্রিয়া দেখা যেত। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করলে (যেমন যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায়) শ্রবণযন্ত্রের স্নায়ুগুলোকে জখম করে এবং এজন্যে মানুষ বধির হয়ে যায়; এমন কি কখনও কখনও মস্তিষ্ক-বিকৃতিও দেখা যায়। একটি যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসায় ৩১০ গ্র্যাম ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন লাগে এবং প্রতিদিন ১ থেকে ৩ গ্র্যাম পর্যন্ত দেওয়া হয়।

গত ১০ই নভেম্বর '৪৯ বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের এই বিষক্রিয়া সম্বন্ধে চিকিৎসকদের হুঁসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আজকাল ওষুধটিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিশোধিত করে, দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু যোগ করে দেওয়ায় বিষক্রিয়া কিছুটা কমে গেছে। শুধু তাই নয়, এতে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের শক্তি গেল বেড়ে এবং মাত্রাও এলো কমে। এই নতুন ওষুধটি আজকাল বাজারে ডাই-হাইড্রো-ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নামে কিনতে পাওয়া যায়।

রাসায়নিক বিচারে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন একটি জৈব-

ক্ষারক বা অর্গ্যানিক বেস্। এর অণুর গঠন খুব জটিল এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; তাই কৃত্রিম উপায়ে তা প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৬ সালে দ্যু ভিনয় কৃত্রিম পেনিসিলিন তৈরী করেন।

ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন যক্ষ্মারোগে বিশেষ ফলপ্রদ। যক্ষ্মা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সমস্যা। টুলারেমিয়া এবং মেনিনজাইটিস রোগে ইহা খুবই কার্যকরী। গ্র্যাম-নেগেটিভ বীজাণুজাত রোগে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন সবিশেষ ফলপ্রদ। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন বহুদিন ব্যবহার করলে রোগবীজাণু প্রতিরোধশক্তি অর্জন করে। তবে সম্প্রতি পি, এ, এস নামক একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আসল নাম প্যারা অ্যামিনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড। ষ্ট্রেপ্টো-মাইসিনের সঙ্গে এটি ব্যবহার করে আরও বেশী সুফল পাওয়া যায়—যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে। এই ওষুধটি ব্যবহার করলে রোগবীজাণু, ষ্ট্রেপ্টো-মাইসিন প্রতিরোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। সম্প্রতি যক্ষ্মার আরও একটি ওষুধ বেরিয়েছে যার নাম টিবিওন্—এটি টি, বি, প্রতিষেধক। সালফা জাতীয় ওষুধগুলোর বীজাণু প্রতিষেধক শক্তির আবিষ্কর্তা এবং ১৯৩৯ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গারহার্ড ডোমাক টিবিওনের প্রতিষেধক শক্তি আবিষ্কার করেছেন। হয়ত এমনি করেই মানুষ একদিন যক্ষ্মারোগকে জয় করতে সক্ষম হবে।

ক্লোরোমাইসেটিন

'ভাইরাস' কথাটি আজকাল অনেকের কাছেই পরিচিত। কথাটি ল্যাটিন—অর্থ হলো 'বিষ'। এতকাল আমরা 'জার্ম' বা বীজাণু কথাটি সাধারণতঃ সব ক্ষেত্রেই যেমন ব্যবহার করে আসছিলাম—ভাইরাস কথাটিও সেই সংজ্ঞাতেই ব্যবহৃত হতো; কিন্তু পরে দেখা গেল সাধারণ বীজাণুর সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য এবং এরা এত সূক্ষ্ম যে এদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না।

টাইফাস নামক এক প্রকার রোগ আছে যাকে উকুন জাতীয় কীট বহন করে এবং ভাইরাস বীজাণু থেকে উদ্ভূত। সাধারণতঃ নোংরা বস্তী ও দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে যারা বাস করে, তাদেরই এই রোগ হয়। এই রোগে ক্লোরোমাইসেটিন বিশেষ ফলপ্রদ।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ পল বার্কহোল্ডার ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় ভেনেজুয়েলা নামক স্থানের মাটিতে একজাতীয় বীজাণু আবিষ্কার করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে ষ্ট্রেপ্টোমাইসেস ভেনেজুয়েলা। এ থেকে তিনি একটি ওষুধ তৈরী করেন যার নাম হলো ক্লোর্যামফিনিকল। এরই আর এক নাম ক্লোরোমাইসেটিন। এতে টাইফাস ছাড়া টাইফয়েড, আমাশয়, নিউমোনিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি রোগও সারে। এটি এখন বিশুদ্ধ এবং দানাদার অবস্থায় তৈরী করে বাজারে বিক্রী হচ্ছে। এই ওষুধটির সুবিধা অনেক। সাধারণ ওষুধের মত এটি খাওয়া যায়—ইন্‌জেকসনের প্রয়োজন হয় না। শুধু তাই নয়, সেবন করার আধঘণ্টার মধ্যে ওষুধটি রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

টাইফাস রোগে প্রথম দিকে রোগীকে দুঘণ্টা অন্তর এই ওষুধ সেবন করানো হয়। রোগের কিছুটা উপশম হলে অন্তর্বর্তী সময় আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ১৪ দিন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। দৈনিক ৬ গ্র্যামের বেশী ক্লোরো-মাইসেটিন রোগীকে দেওয়া হয় না। ১৯৪৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ডাঃ জে, ই স্মাডেল এবং কুয়ালা-লামপুরের ডাঃ সাবুর কুয়ালালামপুরে এর সাহায্যে যে পরীক্ষামূলক চিকিৎসা করেন, তা অতিশয় সাফল্যজনক। ২৫টি রোগীর একটিরও মৃত্যু হয়নি। জ্বর ৭½ দিন স্থায়ী হয় এবং ৩১ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ রোগ-লক্ষণগুলো অন্তর্হিত হয়।

ক্লোরোমাইসেটিনও কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এই কৃত্রিম ক্লোরোমাইসেটিনের নাম দেওয়া হয়েছে ক্লোর‍্যামফিনিকল। পেনিসিলিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত সম্ভব হয়নি; কিন্তু ক্লোরোমাইসেটিন প্রচুর পরিমাণে সস্তায় প্রস্তুত সম্ভব হয়েছে এবং বাজারে ক্লোর‍্যামফিনিকল নামে ইহা পাওয়া যায়। এই কৃত্রিম ওষুধটি প্রস্তুত করার কৃতিত্ব—পার্ক ডেভিস কোং'র রসায়নবিদ্‌দের প্রাপ্য।

অরিওমাইসিন

মাদ্রাজের ডাঃ জেল্লপ্রগাঢ় সুব্বারাও ষ্ট্রেপ্টো-মাইসেস্ গোষ্ঠীর আরও একটি বীজাণু সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করেন এবং সমগ্র গবেষণাটি পরিচালনা করেন। এই সময়ে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বীজাণু গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গবেষণার সূত্রপাত ও পরিচালনা করেও বিজ্ঞানী মহলে আবিষ্কারকের সম্মান পাননি। আবিষ্কর্তার সম্মান পেয়েছেন ডক্টর বেঞ্জামিন ডুগার। তিনিই নাকি অরিওমাইসিন আবিষ্কার করেন। অরিওমাইসিনের বাণিজ্যিক নাম ডুয়োমাইসিন। এটিও একটি ক্লোরিন ঘটিত অ্যান্টিবায়োটিক। যে ছত্রাক থেকে অরিওমাইসিন আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম হলো—ষ্ট্রেপটোমাইসেস্ অরিওফেসিয়েন্‌স্। টাইফাস, ভাইরাস নিউমোনিয়া ইত্যাদিতে অরিওমাইসিন বিশেষ ফলপ্রদ। আমেরিকার মেডিকেল এসোসিয়েসন জার্নালে বলা হয়েছে যে, ২২টী ভাইরাস নিউমোনিয়ার রোগীকে অরিওমাইসিন দিয়ে দেখা যায়, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ১২ জনের জ্বর ছেড়ে গেছে। পরীক্ষার এই সাফল্য, অরিওমাইসিনের ব্যাপক ব্যবহার ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

সম্প্রতি ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসেস গোষ্ঠীর ষ্ট্রেপ্‌টো-মাইসেস রিমোসাস নামক ছত্রাক থেকে আরও একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে টেরামাইসিন। এই ওষুধটি টাইফাস, ভাইরাস নিউমোনিয়া, হুপিং কাফ, কালাজ্বর ইত্যাদি সারাতে পারে।

মাটি থেকে এমনি প্রায় ৯০টি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির সন্তান মানুষ—হয়ত মাটির মধ্য থেকেই সে তার রক্ষা কবচ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।

"আমি চার বার বিলাত ফেরতা—৮ বৎসর বিলাতে বাস করেছি বটে, কিন্তু কালা পাহাড়ের মত আমি বিলাত ফেরতার ভয়ানক বিদ্বেষী—ওরা Stiff collar পরে, ঘাড় সোজা করে' দাঁড়িয়ে মনে করে—এই বুঝি আদব-কায়দা—Culture। Foremost jurist of India স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ, the foremost Physician স্যার নীলরতন সরকার, কেদার দাস, বামনদাস এঁরা সব Calcntta University-র শিক্ষাপ্রাপ্ত—বিলাত ফেরত ডাক্তার এখন আর বড় কলিকাতায় নাই। ইউরোপে গেলেই শিক্ষালাভ হয় না। Madras-এ Advocate General পর্য্যন্ত সব L.L.B., সেখানে ব্যারিষ্টার নাই। কেবল কলিকাতায় Original side-এ ব্যারিষ্টার; tr.velling in fools' paradise (Emerson)। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিম, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ—এঁদের শিক্ষাও তো এই দেশের—বিলাত গেলেই যে হল-মার্কা হবে তার কি মানে আছে? ব্রজেন্দ্রশীল—a man of encyclopaedic learning। সব বিলাত ফেরতাদের কেটে decoction করলেও এত বিদ্যা হয় না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাত যান নি—'প্রাচ্যের কি আছে প্রতীচ্যকে দেবার', তাই বলতে গিয়েছিলেন। এখন কথায় কথায় বিলেত যাওয়া—১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বিচী—এসব ভাববার কথা। বিলাত যাবার মোহ আছে, এ মোহ দূর করতে হবে।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শিশু-পক্ষাঘাত বা পলিওমায়েলাইটিস্

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন ব্যাধির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই ব্যাধির নাম শিশু-পক্ষাঘাত বা পলিওমায়েলাইটিস্। ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ৫০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ এই রোগের অস্তিত্ব অবগত থাকিলেও সুযোগের অভাবে এতদিন এদেশে এই রোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা সম্ভব হয় নাই।

সম্প্রতি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হইতে ডাঃ কাজাবিনের নেতৃত্বে শিশু-পক্ষাঘাত রোগ-বিশেষজ্ঞ একদল বিজ্ঞানী এই রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কায চালাইবার জন্য ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। ফলে সমগ্র ভারতে এই ব্যাধি সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও চিকিৎসকমহলে ব্যাপক আলোচনা চলিতেছে এবং রোগনিবারণ ও ব্যাধিগ্রস্তের চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে।

রোগের বিবরণ

মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বৃদ্ধির ফলে সময় সময় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অসাড় হইয়া গেলে তাহাকে পক্ষাঘাত বা বাতব্যাধি বলে। শিশু-পক্ষাঘাত এই শ্রেণীর রোগ নহে। এই রোগের আক্রমণের সহিত রক্তের চাপের কোন সম্পর্ক নাই, যদিও ফল একই—পক্ষাঘাত বা অসাড়তা। কি ভাবে এই রোগের উৎপত্তি হয় তাহা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দেখা যায়, সুস্থ শিশু—হাসিতেছে, খেলিতেছে, খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যতিক্রম নাই—চমৎকার স্বাস্থ্য; কিন্তু হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ক্রন্দনের কোন কারণ দেখা যায় না, অথচ শিশুর কান্নার সুর এবং মুখ, চোখের ভাব দেখিয়া বুঝা যায় যে, সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শরীরের কোথায় কি যন্ত্রণা—প্রকাশ করিতে পারে না। হাত-পা ছোড়া-ছুড়িও নাই—সুধুই কান্না। ক্রমে জ্বর দেখা দিল। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি শিথিল, অসাড় হইয়া গেল। দেখা গেল, শিশু চলচ্ছক্তিরহিত—পক্ষাঘাতগ্রস্ত। জ্বর এবং যন্ত্রণার অবসানে দেখা গেল, শিশুর এক বা একাধিক অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

রোগের উৎপত্তি ও তাহার ক্রিয়া

এই রোগের উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই। বিজ্ঞানী বলিতে পারেন না—এই ব্যাধি জীবাণুঘটিত কিম্বা কোনরূপ বিষক্রিয়ার ফল।

এই রোগ বিষদুষ্ট বায়ু, খাদ্য বা পানীয় কিংবা মশা, মাছি অথবা অন্য কোন প্রকারে বাহিত হইয়া শিশুর শরীরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুতন্ত্রের ঐচ্ছিক গতিসঞ্চারক মোটর নার্ভস্ অর্থাৎ কার্যকরী কোষকে আক্রমণ করে। এই স্নায়ুকোষগুলি স্নায়ু-রজ্জুর সম্মুখের দিকে (Anterior Horn or Cornual Cells) থাকে। এইজন্য এই ব্যাধির বৈজ্ঞানিক নাম Acute Anterior Poliomyelitis বা শিশুর তরুণ পক্ষাঘাত।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা

এই ব্যাধি সংক্রামক। পরিচ্ছন্নতা এই রোগের প্রতিষেধক। বায়ুবাহিত ব্যাধি বসন্ত, মেনিনজাইটিস, হাম, যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ সংক্রমণের সংবাদে যেমন পল্লীর সকলে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন তদ্রূপ এই

রোগের আক্রমণের সংবাদ পাইলেও অবিলম্বে পল্লীর প্রত্যেক ব্যক্তি লবণ-জল দিয়া নাক, মুখ এবং গলা পরিষ্কার করিবেন। মাঝে মাঝে লবণ-জল দিয়া ডুসের সাহায্যে অন্ত্রধৌত করিবেন। পরে পর্যায়ক্রমে লবণ-জল এবং থাইমলের জল দিয়া নাক, মুখ এবং গলা পরিষ্কার করিবেন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে—সর্দি, কাশি এবং কোন রকম পেটের পীড়া যেন কাহারও না হয়। আহারাদি সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এই রোগের আক্রমণ হয়। এই সময়ে স্নিগ্ধ এবং লঘুপাক আহার গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য খুব পরিষ্কারভাবে সুসিদ্ধ করিয়া পাক করিতে হইবে (ডাঃ কাজারিনের মতে)। যদিও শিশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে তবুও প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং আহারাদির নিয়ম পালন করা উচিত। বিশেষতঃ এই রোগের কারণ নির্ণীত না হওয়ায় বলা চলে না যে, বয়স্কেরা এই রোগের ক্যারিয়ার অর্থাৎ বাহকের কাজ করেন কিনা?

চিকিৎসা

শিশু-পক্ষাঘাত রোগের কোন ঔষধ আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই রোগে কোনপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যতদিন পর্যন্ত কোন ঔষধ আবিষ্কৃত না হয় ততদিন আন্দাজে কোন ঔষধ না দিয়া লক্ষ্য করা উচিত—শিশুরোগী কিসে একটু আরাম বোধ করে। রোগীকে আলাদা রাখিতে হইবে। তাহার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীর ঘর বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিশোধন করিতে হইবে। তাহার বিছানা, কাপড়-চোপড় সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। শুশ্রূষাকারী বিশেষ পরিচ্ছন্ন থাকিবেন। তাহার হাতের নখ কাটিয়া ফেলিবেন—কাপড়-চোপড় সর্বদা বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিবেন। বাড়ীতে ধূপ-ধূনা দিবেন। তারপর যতশীঘ্র সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবেন।

ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট বাল্যকালে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ও রোগগ্রস্ত মার্কিন শিশুগণের চিকিৎসার্থ হাসপাতাল স্থাপন করিবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। বিলাতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী লর্ড নিউফিল্ড "লৌহ ফুসফুস" (Iron Lungs) তৈয়ার করিয়া পৃথিবীর সকল বড় হাসপাতালে দান করিতেছেন।

গত বৎসর বোম্বাই নগরীতে এই রোগ অতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ডাঃ কাজারিনের নেতৃত্বে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি-নিধিদল ভারত ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক বড় সহরেই এই রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাঁহারা বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী এবং কলিকাতায় এই রোগের জন্য গবেষণাগার এবং হাসপাতাল স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন।

বড় বড় সহরে যে সকল বিকলাঙ্গ মানুষ দেখা যায়, অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহার শতকরা ২০ জন বিকলাঙ্গ হইয়াছেন—কোন প্রকার আঘাতের ফলে, শতকরা ২০ জন—স্নায়বিক কুষ্ঠ-রোগের, ফলে, ২০ জন খেসারি ব্যাধির (Lathyriasis) ফলে ২০ জন গর্মির ফলে এবং বাকী ২০ জন শিশু-পক্ষাঘাত বা পলিওমায়েলাইটিসের ফলে।

বিকলাঙ্গ মানুষ নিজের এবং জাতির বোঝা স্বরূপ। স্বাধীন জাতি চিরকাল এই বোঝা বহিতে পারে না; সুতরাং অবিলম্বে সকল বিকলাঙ্গের সংখ্যা এবং কারণ নির্ণয় করিয়া উহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে। তৎপরে চিকিৎসা করিয়া হতভাগ্যদের মানুষের মত বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আর ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে ভবিষ্যতে এদেশে ' রোগের জন্য কেহ বিকলাঙ্গ না হয়। সুস্থ এবং সবল ভিন্ন কাহারও বাঁচিবার অধিকার নাই; সুতরাং জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিতে হইলে সুস্থ এবং সবল হইয়াই বাঁচিতে হইবে—রুগ্ন বিকলাঙ্গ হইয়া নহে।

ভারী-জলের কথা

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ভারী-জল আবিষ্কারের ইতিহাস চমকপ্রদ। ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী টমসনের 'পজিটিভ রশ্মি' পর্যালোচনার ফলে সাধারণ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ১৯১৯ সালে অ্যাসটন্ 'ভরলিপিযন্ত্র' আবিষ্কার করায় আইসোটোপস্ সম্বন্ধে গবেষণা অতি বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই ধরনের বহু গবেষণার ফলে প্রায় সব মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু যখন ১৯৩২ সালে ইউরে, ব্রিকওয়েড এবং মারফী সবচাইতে সরল মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের আইসোটোপের সন্ধান পেলেন তখন বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। হাইড্রোজেনের এই আইসোটোপের নাম ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়েটরন। ডয়েটরন যদি অন্যান্য সাধারণ নতুন আইসোটোপের মত হতো তাহলে বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল পোষণ করতেন না। কিন্তু এর একটু বিশেষত্ব থাকার দরুণ পৃথিবীর বহু রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে এসম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল। বিশেষত্বটুকু এই যে, সাধারণ হাইড্রোজেন এবং ভারী হাইড্রোজেনের গুণাবলীর পার্থক্য বিচার করা খুব কঠিন নয়। এই কারণেই যে সমস্ত যৌগিক পদার্থে হাইড্রোজেন বর্তমান তাথেকে হাইড্রোজেন সরিয়ে ভারী হাইড্রোজেন বসালে ফল কি হয় দেখবার জন্যে বহু গবেষণা চলেছে।

এই গবেষণার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভারী-জল সম্বন্ধে। সাধারণ জল অক্সিজেন ও সাধারণ হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী। এই সাধারণ হাইড্রোজেন বদলে ভারী হাইড্রোজেন দিলেই ভারী-জলের সৃষ্টি হয়। জিনিসটি বলতে খুবই সোজা মনে হচ্ছে; কিন্তু এর তাৎপর্য অসামান্য। বিজ্ঞানীদের কাছে ভারী জল একটি অমূল্য সম্পদ; কারণ পরমাণুর বুকে লুকানো অসীম রহস্যের মূলোদ্ঘাটনের পথে ভারী-জলের আবিষ্কার একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই ভারী-জল আবিষ্কার করার পুরস্কার স্বরূপ ডাঃ ইউরে ১৯৩৪ সালে রসায়নে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, অক্সিজেনের সঙ্গে ভারী হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটালেই ভারী-জলের উৎপত্তি হবে। সাধারণ জল থেকে ভারী-জলের কোন রকম পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। দু'টো গ্লাসের একটিতে সাধারণ জল এবং অপরটিতে ভারী-জল ভর্তি করে দেখলে দুটোই এক রকম দেখাবে। এমন কি, এদের স্বাদ বা স্পর্শানুভূতিও এক রকমের।

সব রকম সাধারণ কাজ যা আমরা করি ভারী-জল দিয়েও তা করা যেতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে, সাধারণ জল থেকে ভারী-জল শতকরা ১০ ভাগ বেশী ভারী এবং এর স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক সাধারণ জলের চাইতে কিছু বেশী। কিন্তু একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে এই ভারী-জলের—জীবজন্তু বা গাছপালা এর ভেতর বাঁচতে পারে না। ভারী-জলের ভেতর রেখে দিলে বীজ থেকে চারাগাছ গজায় না বা ব্যাঙাচিগুলোও বাঁচতে পারে না। এই ব্যাপার দেখে অনেক বিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক দিন আমরা যে সামান্য পরিমাণ ভারী-জল শরীরের ভেতর গ্রহণ করে থাকি তার ফলে আমাদের স্নায়ুগুলো দুর্বল

হয়ে পড়ে এবং অকাল বার্ধক্য এনে দেয়। আবার অনেকে বলেন যে, পরিমাণে খুব সামান্য হলে এর কোন জৈব-প্রতিক্রিয়া হয় না। ডাঃ ইউরে এবং আরও কয়েকজন খুব সামান্য পরিমাণ ভারী-জল খেয়ে দেখেছেন; কিন্তু তাতে তাঁদের কোনরকম ক্ষতি হয়নি।

সমস্ত জলেই শতকরা ·০১৭ ভাগ ভারী-জল বর্তমান আছে। কাজেই পৃথিবীতে ভারী জলের মোট পরিমাণ বাস্তবিক পক্ষে লক্ষ লক্ষ টন, সন্দেহ নেই; কিন্তু সাধারণ জল থেকে এই সামান্য পরিমাণ ভারী-জলকে পৃথক করার প্রক্রিয়া যেমন জটিল ও তেমনি ব্যয়সাধ্য। ব্যাপারটা অনেকটা একগাদা খড়ের ভেতর থেকে ছোট একটি স্ূঁচ খুঁজে বার করবার মত। পারমাণবিক গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানীরা এই পদার্থটির প্রয়োজনীয়তা খুবই অনুভব করছিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে এই ভারী-জল তৈরী হয়েছিল মাত্র কয়েক পাউণ্ড।

ভারী-জল সর্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছিল সাধারণ জলের ভেতর তড়িৎ-স্রোত পাঠিয়ে—খুব আস্তে আস্তে জলকে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনে ভাগ করে। সাধারণ জলে যে সামান্য পরিমাণ ভারী-জল বর্তমান সেটা শেষ পর্যন্ত রয়ে যায় এবং তড়িৎ-স্রোতের প্রক্রিয়া চালু রেখে যখন মূল জলের পরিমাণ ১০০,০০০ ভাগের এক ভাগে পরিণত হয় তখন তাথেকে প্রায় বিশুদ্ধ ভারী-জল তৈরী করা সম্ভব হয়। কিন্তু এক আউন্সের তিন ভাগের এক ভাগ ভারী-জল তৈরী করতে সাধারণ জল লাগবে এক টন। উপরন্তু এই প্রক্রিয়ার জন্যে যে তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন তার পরিমাণও খুবই বেশী। যুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর সব চাইতে বড় ভারী-জলের প্ল্যাণ্ট ছিল নরওয়ের জুকন সহরে। যখন নাজী-বাহিনী নরওয়ে দখল করে নিল তখন জার্মান বিজ্ঞানীরা এই প্ল্যাণ্টকে পূর্ণোদ্যমে চালিয়েছিল। তিন বছরে যে পাঁচ টন ভারী-জল তৈরী হয় তা তাদের আণবিক বোমা আবিষ্কারে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে এই প্ল্যাণ্ট বিনষ্ট হবার ফলে জার্মেনীর প্রতিযোগিতায় জেতবার আশাও সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নরওয়ের এই ভারী-জলের প্ল্যাণ্টই আমেরিকার আণবিক বোমা তৈরী করার পথ সুগম করে দিয়েছিল। তার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। ১৯৪০ সালে জার্মানরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন ফ্রান্সের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক জোলিও কুরীর নিকট নরওয়ের প্ল্যাণ্ট থেকে তৈরী প্রায় চল্লিশ গ্যালন ভারী-জল ছিল। তিনি এই অমূল্য সম্পত্তিকে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সহকর্মী হলবান্ ও কোভারস্কির সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। ১৯৪৩ সালে অধ্যাপক হলবান ও কোভারস্কি যখন যুক্তভাবে মিত্রপক্ষের আণবিক বোমা তৈরী করার বৈঠকে যোগ দেন তখন এই সম্মেলনের হাতে তাঁরা তাঁদের অমূল্য সম্পত্তিটি দিয়ে দিয়েছিলেন।

ইউরেনিয়ামকে প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত করতে হলে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করতে হয় এবং আণবিক বোমা আবিষ্কারের বহুপূর্ব থেকেই বিজ্ঞানীরা এটা জানতেন যে, ইউরেনিয়াম-পাইলে নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেবার জন্যে 'মডারেটার' হিসেবে দুটো জিনিস ব্যবহার করা যেতে পারে। এই দুটো জিনিস হলো—গ্র্যাফাইট ও ভারী-জল।

গ্র্যাফাইটের কতকগুলো অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, গ্র্যাফাইট মূল্যবান নিউট্রনকে শোষণ করে নেবার চেষ্টা করে ও নিউট্রনগুলোকে কাজ করতে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, নিউট্রনের গতি কমিয়ে দেবার পক্ষে ভারী-জল থেকে এ অনেকটা কম কার্যকরী। কিন্তু গ্র্যাফাইটের মস্ত সুবিধা—প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাধারণ 'লেড' পেন্সিলে যে পদার্থটি ব্যবহৃত হয় সেইটাই গ্র্যাফাইট এবং অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির লুব্রিক্যাণ্ট হিসেবেও

গ্র্যাফাইট ব্যবহৃত হয়। কাজেই অবিলম্বে ইউরেনিয়াম-পাইল তৈরী করবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে গ্র্যাফাইট পাওয়া খুবই সহজ।

কার্যের দ্রুততাই ছিল সেই সময়ে আসল কথা। কাজেই গ্র্যাফাইট-ইউরেনিয়াম-পাইল যদিও তৈরী হচ্ছিল তবুও ভারী-জল তৈরীর দ্রুত পন্থা আবিষ্কারের জন্যে বিজ্ঞানীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। তবুও ১৯৪৩ সালে দেখা গেল—উৎপাদন এতই শ্লথ যে, একটা ইউরেনিয়াম-পাইল নির্মাণ করবার মত ভারী-জল তৈরী করতে অন্ততঃ দুটি বছর লেগে যাবে।

তখন অধ্যাপক ইউরে এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সাধারণ জলের সঙ্গে যদি বিশেষ কতকগুলো অবস্থার ভেতর দিয়ে হাইড্রোজেন মেশানো হয় তাহলে সাধারণ জলে ভারী-জলের পরিমাণ প্রায় তিন চার গুণ বেড়ে যায়। তখন সাধারণ জল থেকে বেশী পরিমাণ ভারী জল পৃথক করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ার জন্যেও প্রচুর পরিমাণ হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তির প্রয়োজন। আর প্রয়োজন একটি প্ল্যান্টের এবং সেটি পরিচালনার জন্যে একদল সুশিক্ষিত কর্মীর। এই ধরনের একটি প্ল্যাণ্ট তৈরী করা হয়েছিল ক্যানাডায় এবং এই প্ল্যাণ্টকে কাজে লাগিয়ে ১৯৪৪ সালে ভারী-জল-ইউরেনিয়াম-পাইল তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল এবং গ্র্যাফাইট পাইলের চাইতে এ পাইল অনেক বেশী কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। এই পাইলে ভারী-জলের ট্যাঙ্কটির আয়তন কি ছিল তা ঠিক জানা যায়নি; কিন্তু ক্যানাডার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল যে একটি পরীক্ষামূলক ট্যাঙ্ক তৈরী করেছিল সেটি মস্ত বড় একটি ঘরের সমান। কিন্তু চাহিদা এবং সরবরাহের দরুণ মূল্যের ওঠা-নামার কঠিন নিয়ম এই দুর্মূল্য পদার্থটির বেলাতেও ঘটেছিল। তাই ১৯৪৭ সালের মে মাসে যুদ্ধের পরে আণবিক-শক্তি কমিশন একটি অদ্ভুত যুদ্ধ-উদ্বৃত্তির ঘোষণা করলেন। সেটি হলো এই ভারী-জল এবং তার দামও করে দিলেন খুব কম।

খুব অল্পমূল্যে ভারী-জল পেয়ে প্রায় সব আণবিক গবেষণাকারী ও পদার্থবিজ্ঞানীরা খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণাগারগুলো এই ভারী-জল পেয়ে খুবই উপকৃত হলো; কারণ মানুষের শরীর কি করে খাদ্যকে গ্রহণ করে দেখবার জন্যে এই ভারী-জলকে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করলেন—ঠিক যেমন করে করেছিলেন তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা। খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ভারী-জল শরীরের মধ্যে যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভেতরও অপরিবর্তিত থাকবে এবং সর্বশেষে এর অবস্থান সহজে আবিষ্কার করা যেতে পারে। জৈব-রাসায়নিকেরাও ভারী-জলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। সমস্ত জীবন্ত বস্তুর গঠনে হাইড্রোকার্বন একটি প্রধান উপাদান এবং হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের জটিল মিশ্রণের দ্বারা যৌগিক পদার্থের সংখ্যাও কয়েক শ' হাজার। বিভিন্ন ওষুধ এবং রং এই হাইড্রোকার্বন পরিবারের অন্তর্গত। কাজেই এই অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের সাধারণ হাইড্রোজেনকে সরিয়ে ভারী হাইড্রোজেনকে বসিয়ে দিলে কি নতুন পদার্থের সৃষ্টি হবে এবং তাদের ধর্মই বা কি হবে—এ এক অতি উত্তেজনামূলক গবেষণার বিষয়।

কিন্তু ভারী-জলের সবচাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবহার হচ্ছে আণবিক শক্তির উৎপাদনে। ডয়েটরন—অর্থাৎ ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিনকে সাইক্লোট্রোন দ্বারা অমিতগতিসম্পন্ন করে অন্য পরমাণু চূর্ণ করা হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে আণবিক শক্তি উৎপাদন ও ইউরেনিয়াম-পাইলে বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী নিয়ন্ত্রণ করবার পক্ষে এইটাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বস্তু।

অধুনা পৃথিবীর বিভিন্নদেশ এই ভারী-জলের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই সেদিন

ক্যানাডা ঘোষণা করেছিল যে, পৃথিবীর সব চাইতে বড় ভারী-জল ইউরেনিয়াম-পাইল তাদের ওণ্টারিওতে স্থাপিত হয়েছে। বৃটেনও ডিডেণ্ট সহরে একটি পাইল স্থাপন করেছে এবং ফ্রান্সও নরওয়ের প্ল্যাণ্টটিকে সারিয়ে নিয়ে তা' থেকে ভারী-জল সংগ্রহ করছে।

সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ লিও মাইট্নার, যিনি আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন—তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ষ্টকহলমে এই ভারী-জলের প্ল্যাণ্ট নির্মাণ করছেন। রাশিয়াও যে ভারী জল উৎপাদনের চেষ্টা করছে এবং তাকে ইউরেনিয়াম-পাইলে ব্যবহারের চেষ্টা করছে—এসম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশকেও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

মৌমাছি পালনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি

শ্রীবিমল রাহা

মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্বে মৌমাছি পালনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

চাকবাস বা 'হাইভ্' ঃ—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন আধুনিক চাকবাসের। যদিও আধুনিক চাকবাস ও আদিম চাকবাসের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই এবং সম অবস্থায় মধু উৎপাদনের পরিমাণও সমান থাকিবার সম্ভাবনা তথাপি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনে আধুনিক চাকবাসেই মধু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। স্বাভাবিক চাকবাস মধুপূর্ণ হইয়া গেলে স্থানাভাব বশতঃ আর অধিক মধু জমাইবার উপায় থাকে না। ফলে চাকের মৌমাছিরা কর্মহীন হইয়া পড়ে এবং এবং দলের পর দল ঝাঁক নিক্ষেপ করিয়া আদি উপনিবেশকে মধু সঞ্চয়ের পক্ষে আংশিক বা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করিয়া দেয়। কিন্তু আধুনিক চাকবাসে ইহা সম্ভব নয়।

আধুনিক চাকবাস ব্যতীত মৌমাছি পালনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা সম্ভব হইয়া উঠে না। আধুনিক চাকবাসে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়োজনানুরূপ কর্মী সৃষ্টি করিয়া প্রচুর পরিমাণ মধু সংগ্রহ করা সম্ভব। পরিবর্তনযোগ্য ফ্রেমযুক্ত আধুনিক চাকবাস সহজেই পরীক্ষা করা যায় এবং যথাসময়ে মধুপূর্ণ ফ্রেম পরিবর্তন করিয়া তাহার স্থলে নূতন চাক সমেত ফ্রেম স্থাপন করা সম্ভব হয়। আধুনিক চাকবাসেই ঝাঁক নির্গমন বহুলাংশে সংযত করা সম্ভব হইয়াছে।

আধুনিক চাকবাস পরস্পর অসংলগ্ন চারি অংশে বিভক্ত। যথা,—(১) নিম্ন তক্তা; (২) লালনাগার; (৩) তল; (৪) ঢাকনা। ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত যে, একটির উপর একটি স্থাপন করিলে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। লালনাগার ও তলে অপসারণযোগ্য ফ্রেম থাকে। এই ফ্রেম সংলগ্ন চাকপত্র-ভিত্তির উপর মৌমাছিরা চাক প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই তল, লালনাগার অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে এবং তল একমাত্র মধু সঞ্চয়ের ভাণ্ডার রূপেই গণ্য হয়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য উভয়ের আকার সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। লালনা-

গারের উপরিস্থিত সমমাপের তল আজকাল দ্বিতীয় লালনাগাররূপে ব্যবহৃত হয়। এই প্রথায় দুইটি রাণী মৌমাছি ব্যবহার করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কর্মী-সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় ও উপযুক্ত সময়ে অধিক সংখ্যক কর্মী পাওয়া যায়।

লালনাগার ও সমস্ত তলের উপরিভাগে প্রথম একটি আবরণী থাকে এবং তাহার উপর ঢাকনা বা চাকবাসের ছাদ থাকে। উত্তাপ সংরক্ষণের জন্যই সাধারণতঃ আবরণী ব্যবহৃত হয়। আবরণী

মিলনের জন্য নিউটন চাকবাস হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ ও ল্যাংস্ট্রথ চাকবাসের ফ্রেমের ঠিক অর্ধ্ব মাপের একপ্রকার চাকবাস ব্যবহৃত হয়। নিউটন চাকবাস ইহারই অনুকরণে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। সমতল প্রদেশের মৌমাছির জন্যও নিউটন চাকবাস উপযুক্ত নহে।

মৌমাছির পালকদের সুবিধার জন্য দেশের সর্বত্র এক প্রকারের চাকবাস প্রচলন করা অত্যাবশ্যক। দেশের বাহিরের মৌমাছি পালকদের সহিত
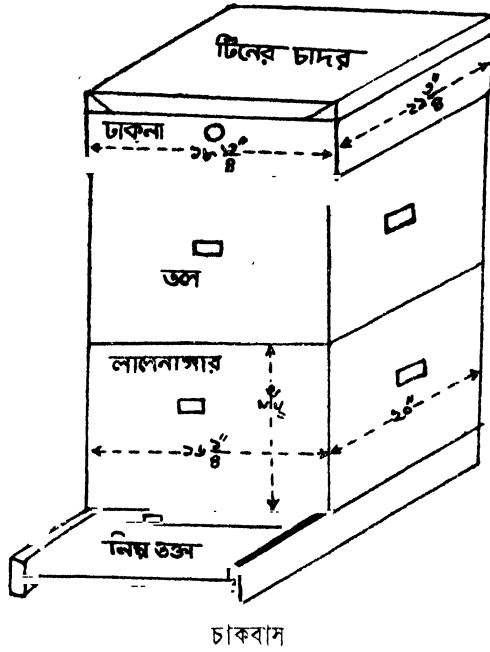
চাকবাস

কাচ, পেষ্টবোর্ড, পাতলা কাঠ অথবা সাময়িকভাবে খবরের কাগজ দিয়াও আবরণীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে চারিপ্রকার চাকবাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—(১) ল্যাংস্ট্রথ, (২) ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড; (৩) জিওলিকোট ও (৪) নিউটন। ইহার মধ্যে ল্যাংস্ট্রথ সর্বাপেক্ষা বড় ও পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিউটন চাকবাস খুবই ছোট। ইহা সমতল প্রদেশের মৌমাছির জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত। আমেরিকায় রাণী মৌমাছিদের

যোগাযোগ বজায় রাখিতে হইলে পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত চাকবাসকেই দেশীয় চাকবাসের মান হিসাবে ধরা উচিত। বিভিন্ন মাপের নিউটন চাকবাসই আমাদের দেশে অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়। ইহা পার্বত্য মৌমাছিদের পক্ষে অত্যন্ত ছোট; কাজেই হিমালয় অঞ্চলে আজকাল ল্যাংস্ট্রথ চাকবাসই অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু হিমালয় প্রদেশেরও সর্বত্র ল্যাংস্ট্রথ চাকবাসে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। এই কারণে চাকবাস

নির্বাচনও আমাদের দেশে একটা কঠিন সমস্যা রহিয়া গিয়াছে।

নিউটন চাকবাসের ন্যায় ক্ষুদ্র চাকবাস ব্যবহার করিলে তাহা অধিক সংখ্যায় বসাইতে হয়। চাকবাসের সংখ্যাধিক্য হইলেই তাহার ব্যবস্থাদির জন্য অধিক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন। ল্যাংস্ট্রথ চাকবাস আয়তনেই কেবল বৃহৎ নহে, পরন্তু ইহার দ্বারা সময় ও শ্রম লাঘব করা যায়। বলা বাহুল্য রাণী মৌমাছির মিলনের জন্য নিউটন চাকবাস প্রশস্ত হইলেও—আধুনিক ব্যবস্থায় মৌমাছি পালনে তাহা উপযুক্ত নহে। ল্যাংস্ট্রথ চাকবাসের উপযুক্ত আয়তনের জন্য অধিকসংখ্যক লালনাগার ও তল উপর্যুপরি আচরণের পার্থক্য হেতু সকল স্থানে সাফল্যের সহিত ল্যাংস্ট্রথ চাকবাস ব্যবহার করা সম্ভব না হওয়ায় ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আয়তনের চাকবাস ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশের সমতল পার্বত্য অঞ্চলের মৌমাছির আকার, আচরণ ও প্রজনন ক্ষমতায় এরূপ পার্থক্য দেখা যায় যে, একই রকমের চাকবাস প্রচলনের চেষ্টা দুরূহ বলিয়াই মনে হয়। অথচ অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষে প্রচলিত চাকবাসের মানের সমতা না করা গেলেও ভারতবর্ষে মৌমাছি পালনের উন্নতির জন্য সর্ব ভারতীয় মান একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মৌমাছি পালনে আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি।
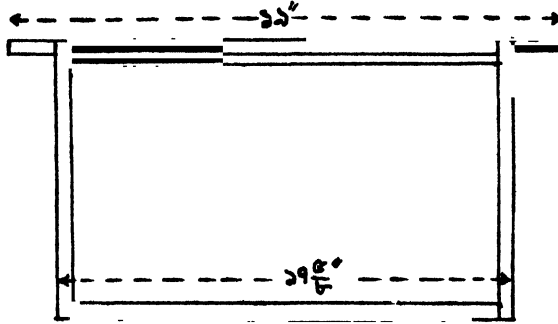
ল্যাংস্ট্রথ ফ্রেম

অনায়াসেই সাজান যায়। এই সুবিধার জন্য আধুনিক মৌমাছি পালনে ল্যাংস্ট্রথ চাকবাস ক্রমান্বয়ে সকল দেশে গৃহীত হইতেছে।

মৌমাছি পালনে আমরা যদি ভারতীয় মৌমাছি ব্যতীত অন্য মৌমাছি ব্যবহার না করি তাহা হইলে ইহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চাকবাস ব্যবহার করিতে হইলেও আমাদের নিউটন অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক আয়তনবিশিষ্ট চাকবাস ব্যবহার করিতে হইবে। যদিও হিমালয় অঞ্চলের সকল মৌমাছির আকার এক নহে তথাপিও এতদঞ্চলের প্রায় সর্বত্র ল্যাংস্ট্রথ চাকবাস প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মৌমাছির আকার ও অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইউরোপ ও আমেরিকায় মৌমাছি পালনের যেরূপ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল বর্তমানে আমাদের দেশের মৌমাছি পালন পদ্ধতি তাহা অপেক্ষা উন্নত নহে। ভারতবর্ষের মৌমাছি পালন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভাল জাতের মৌমাছি আমাদের দেশে আমদানী করা প্রয়োজন। নচেৎ উপযুক্ত দেশীয় মৌমাছি নির্বাচন করিয়া সুপ্রজনন দ্বারা তাহাকে বিদেশী মৌমাছির সমকক্ষ করিয়া লইতে হইবে। শেষোক্ত পন্থায় চলিলে বর্তমান মৌমাছি পালন পদ্ধতি অনুসরণে পাশ্চত্য দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে একশত বৎসর বা তাহারও অধিক সময় লাগিয়া যাওয়া বিচিত্র

নহে। সতর্কতার সহিত বিদেশী মৌমাছি আমদানী করিলে মৌমাছি পালনের বহু সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে।

চাকপত্রভিত্তি ঃ—দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির অক্ষমতা ও অসমতার জন্য সর্বক্ষেত্রে যেমন একই রকমের চাকবাস ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইরূপ মৌমাছির আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য একই মাপের চাকপত্র-ভিত্তি ব্যবহার করাও সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালনের সফলতা অনেকাংশে এই চাকপত্রভিত্তির মাপের সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে। দেশীয় মৌমাছির আকৃতিগত অসমতা হেতু করা হয়। কিন্তু কেবল মৌমাছির মোম দ্বারা প্রস্তুত চাকপত্রভিত্তির বিস্তৃতিপরায়ণতা সংযত করা কষ্টকর বলিয়া ইহার অভ্যন্তরে উদ্ভিজ্জ মোমের পাত দিয়া ইহাকে অবিস্তৃতিপরায়ণ করা হয়। চাকপত্রভিত্তি অবিস্তৃতিপরায়ণ না হইলে ফ্রেমে সংলগ্ন সমগ্র চাকপত্রভিত্তির উপর প্রস্তুত চাকের ঊর্ধ্বাংশ বিস্তৃত হওয়ার দরুণ তাহাতে অণ্ড প্রসবিত হয় না। সেই জন্য মধুউৎপাদন কালে ওই স্থান শূন্য থাকায় মৌমাছিরা ইহাতে মধু ভরিয়া দেয়। এই প্রকার ফ্রেমে মৌমাছির অণ্ড ও কীট পূর্ণ থাকায় নিষ্কাশক যন্ত্রের
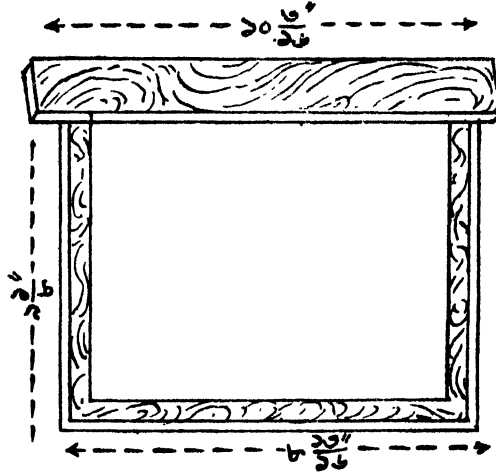
নিউটন ফ্রেম

একই নির্দিষ্ট মাপের চাকপত্রভিত্তি প্রস্তুত সম্ভব নয়। চাকবাস-নির্বাচন সমস্যা হইতেও আমাদের দেশীয় মৌমাছির জন্য সঠিক মাপের চাকপত্র-ভিত্তি প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। অসম মাপের চাকবাসের জন্য মধু উৎপাদনে ইতর বিশেষ হইতে পারে। কিন্তু সঠিক মাপের চাকপত্রভিত্তি ব্যবহার না করিলে অধিক মধু উৎপাদনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইতে বাধ্য, এমন কি সমগ্র মধু উৎপাদনও বিপর্যস্ত হইতে পারে।

চাকপত্রভিত্তির অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম তার অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া ইহার বিস্তৃতিপরায়ণতা নিরোধের চেষ্টা কেন্দ্রাপসারী গতি দ্বারা মধু নিষ্কাশন সম্ভব হয় না।

যদি চাকপত্রভিত্তি প্রস্তুত করা সম্ভব না হইত তাহা হইলে আধুনিক চাকবাস ও অন্য বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও তথ্য সত্ত্বেও মৌমাছি পালন আধুনিক পর্যায়ে পৌছিত কিনা সন্দেহ।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনে চাকবাস, মধু-নিষ্কাশক যন্ত্র ও অন্যান্য বহু প্রকার যন্ত্রের ন্যায় মৌমাছিও একটি যন্ত্র বিশেষ। কাজেই কোনও বিশেষ মৌমাছিকে আধুনিক মৌমাছি পালনের সহিত খাপ খাওয়ান না গেলে তাহাকে বিদায়

দিয়া অন্য উপযুক্ত মৌমাছি আমদানী করিতে হইবে।

মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ঃ—পুরাকালে সর্ব দেশেই মধুপূর্ণ চাক নিংড়াইয়া মধু বাহির করা হইত এবং এখনও আমাদের দেশে অধিকাংশ মধু নিংড়াইয়াই বাহির করা হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৌমাছি পালনে ফ্রেমের মধ্যে প্রস্তুত মধুপূর্ণ চাক কীড়াশূন্য থাকে বলিয়া কেন্দ্রাপসারণী গতি-বেগে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রে বিশুদ্ধ মধু সংগ্রহ সম্ভব হয়। স্বভাবজাত চাকে মধু ও কীড়া সাধারণতঃ একই চাকে থাকে বলিয়া যন্ত্র সহযোগে মধু নিষ্কাশন কালে মধুর সহিত কীড়াও চাক হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই কারণে মধুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কষ্টকর। নিংড়াইয়া বাহির করা মধুর সহিত বহুল পরিমাণে মৌমাছির ডিম্ব, শুক ও কীড়ার রস মিশ্রিত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত নিংড়াইবার কালে হস্তস্থিত ময়লা মিশ্রিত হইয়াও মধুর বর্ণ মলিন হয়। মধু-নিষ্কাশন যন্ত্রে মধু বাহির করিয়া লইয়া ফ্রেমস্থিত চাক বার বার ব্যবহার করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালনে মধুর পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম উপায়। এক পাউণ্ড ওজনের চাকপত্র প্রস্তুত করিতে মৌমাছিরা ইহার পনের গুণেরও অধিক মধু ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই জন্য চাকপত্র অক্ষত রাখিয়া বার বার ব্যবহার করিতে পারিলে মধু উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্কাশিত মধু স্বাদে, বর্ণে, গন্ধে ও বিশুদ্ধতায় নিংড়ানো মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে ভিনিসের মেজর ডি, হ্রুস্চ্কা কেন্দ্রাপসারণী গতির সাহায্যে মধু নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। ইহার পর হইতে এই ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া নানারূপ মধু-নিষ্কাশন যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্তমানে এককালীন শতাধিক ফ্রেম হইতে মধু-নিষ্কাশন উপযোগী বিদ্যুৎ চালিত নিষ্কাশন যন্ত্রও পাওয়া যায়।

ল্যাংস্ট্রথ উদ্ভাবিত পরিবর্তনযোগ্য ফ্রেমযুক্ত আধুনিক চাকবাস এবং হ্রুস্চ্কা উদ্ভাবিত মধু-নিষ্কাশন যন্ত্রই মৌমাছি পালন প্রথায় এতাদৃশ দ্রুত উন্নতির কারণ। বস্তুতঃ ইহার পর হইতেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে মৌমাছি পালন প্রথার প্রচলন হয়।

হাইভ-টুল বা ফালক

ফালক যন্ত্র ঃ—মৌমাছি পালনে প্রয়োজনানুসারে ফালকের নাম করা যায়। বলিতে গেলে আধুনিক মৌমাছি পালনের প্রায় সকল কার্যেই ইহার প্রয়োজন হয়। চাকবাসের অংশ সকল জুড়িয়া গেলে ইহারই দ্বারা সামান্য চাপ দিয়া যুক্ত অংশ মুক্ত করিতে হয়। ফ্রেম, মোম ও মৌমাছি সংগ্রহীত আঠায় শক্ত হইয়া বসিয়া গেলে ইহার এক পাশ দিয়া সামান্য চাড় দিলেই তাহা সহজে বাহির বাহির হইয়া আসে। চাকবাসের ভিতরে কোনও স্থানে আঠা, মোম বা ময়লা লাগিয়া থাকিলে ইহা দ্বারা চাঁচিয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। মৌমাছিশালা পরীক্ষারত মৌমাছি পালকের পক্ষে ইহা সর্বক্ষণের জন্য প্রয়োজন।

ধূমদানী ঃ—চাকবাস পরীক্ষার সময় মৌমাছিদের শান্ত রাখা ও নিজের নিরাপত্তার জন্য চাকবাস খুলিবার কালে ধূম প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ধূমদানী হইতে জোরে ধূম-নির্গমন কালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া মৌমাছিদের কোনও অনিষ্ট সাধন করে না। মৌমাছি পালনে ইহা অত্যাবশ্যক।

মুখাবরণী :—মৌমাছিশালায় কর্মনিরত থাকা কালে মুখাবরণী ব্যবহার করিলে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অনেক সময় নানাকারণে মৌমাছিরা রুষ্ট হইয়া উঠে। সেই সময় মুখাবরণী আত্মরক্ষায় সাহায্য করিয়া থাকে।

দস্তানা :—প্রথম প্রথম মৌমাছি লইয়া কাজ করিবার সময় দস্তানা ব্যবহার করা ভাল। দাস্তানায় অনেক সময় কাজের অসুবিধা হয় বটে; কিন্তু দস্তানায় আঙ্গুলীগুলির মাথা কাটিয়া নিলে আর সে অসুবিধা থাকে না। মৌমাছিদের মধ্যে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইলে আর দস্তানার প্রয়োজন হয় না।

রাণী রোধনী :—ঝাঁক নির্গমনের সময় রাণীর বহির্গমন রোধ করিয়া ঝাঁক নিক্ষেপ বন্ধ করিতে ও পুং মৌমাছিদের বাহিরে রাখিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অধিক মধু উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট।

রাণী-কোষ রক্ষণী :—এক চাকবাসে একাধিক রাণী উৎপাদন করিতে হইলে প্রত্যেকটি রাণী-কোষ ইহার দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ আবৃত না থাকিলে যে রাণী প্রথম নির্গত হয় সে অন্য সকল রাণী-কোষ নষ্ট করিয়া ফেলে।

রাণী পোষা খাঁচা :—রাণী-শূন্য চাকবাসে নূতন রাণী দিবার কালে প্রথম কয়েকদিন তাহাকে বিশেষভাবে নির্মিত খাঁচায় অবরুদ্ধ করিয়া মৌমাছিদের উপনিবেশে দিতে হয়। ধীরে ধীরে রাণীর গাত্রগন্ধ পরিবর্তিত হইয়া নূতন উপনিবেশে রাণীরূপে গৃহীত হইয়া যায়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রাণী পাঠাইতেও ইহা ব্যবহৃত হয় ও স্বস্থানে পৌছিয়া ইহাই রাণী পোষার জন্য রাণী-শূন্য চাকবাসে রক্ষিত হয়।

কোষ উন্মোচনী ছুরিকা :—মধুপূর্ণ হইলে মধুকোষ সমূহ মোমের ঢাকনা দ্বারা আবৃত হয় ও চাক হইতে মধু নিষ্কাশনের পূর্বে কোষ-উন্মোচনী ছুরিকা দ্বারা কোষমুখ কাটিয়া দিয়া নিষ্কাশন যন্ত্রে ঘুরাইলে মধু বাহির হইয়া আসে। কোষমুখ কাটিয়া না দিলে মধু বাহির করা যায় না। ইউরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রচালিত স্বয়ংক্রিয় কোষ উন্মোচনী ছুরিকাও ব্যবহৃত হয়।

এই সকল যন্ত্র ও অস্ত্র ব্যতীত ফ্রেমে তার লাগাইবার ও তার প্রবেশক যন্ত্র এবং কয়েক প্রকার অস্ত্র মৌমাছি পালনে প্রয়োজন হয়। মৌমাছি পালনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যথাস্থানে তাহাদের পরিচয় দেওয়াই সুবিধাজনক।

"প্রাকৃতিক নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্বোধের চোখে ধাঁধা লাগে, বুদ্ধিমানের পক্ষে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপসাধন ঘটে। নির্বোধে বলে, নিউটন আপেল ফল পতনের কারণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধিমান জানেন, নিউটন দেখাইয়াছেন—আপেল ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপগ্রহ হইতে ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড পর্যন্ত সেই নিয়মে চলে। কেন চলে, নিউটন জানতেন না, আমরাও জানিনা নিয়ম আছে, ভাল। নিয়ম না থাকিত, হয়ত আরও ভাল হইত। অন্ততঃ এই দুর্বহ মানবদেহ ধারণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।"

—রামেন্দ্রসুন্দর

নাইট্রোজেন-বন্ধন

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

বর্তমান সভ্যতায় নাইট্রোজেনের দান যে কতখানি তার ইয়ত্তা নেই। কি সৃষ্টি কার্যে, কি ধ্বংস সাধনে প্রত্যেকটিতেই আছে নাইট্রোজেনের একটি স্বতন্ত্র স্থান। উদ্ভিদের খাদ্যরূপে উহা নাইট্রেট আকারে প্রয়োজন। উদ্ভিদ সেই নাইট্রোজেনকে প্রোটিন জাতীয় পদার্থে রূপায়িত করে' আমাদের খাদ্য হিসেবে সঞ্চয় করে থাকে। কিন্তু মৃত্তিকাতে এই নাইট্রেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না বলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার (যথা—অ্যামোনিয়া, নাইট্রোলাইম্ ইত্যাদি) মৃত্তিকাকে সরবরাহ করতে হয়। অতিশয় তেজালো বিস্ফোরক টি, এন্, টি, নাইট্রোগ্লিসারিণ ইত্যাদি, কৃত্রিম নাইট্রোসেলুলোজ তন্তু, অ্যানিলিন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহে নাইট্রোজেন বিদ্যমান।

পৃথিবীর উপরিভাগের মৃত্তিকাস্তরে নাইট্রেট (চিলি সল্টপিটার) এবং উহার অভ্যন্তরে ধাতব নাইট্রাইট রূপে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলই হচ্ছে নাইট্রোজেনের সর্ববৃহৎ উৎস। উহাতে মোটামুটি আয়তন হিসাবে ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২২ ভাগ অক্সিজেন বিদ্যমান। নাইট্রোজেন এমনি একটি মৌলিক পদার্থ যাহা অন্য কোন মৌলিকের সঙ্গে সহজে যুক্ত হতে চায় না। তাই বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের এত প্রাচুর্য সত্বেও উহা মানুষের বড় একটা কাজে আসে না; যেহেতু যৌগিক পদার্থ রূপেই নাইট্রোজেনের প্রয়োজন সব কিছুতেই। বায়ুমণ্ডলের এই মৌলিক নাইট্রোজেনকে যৌগিক নাইট্রোজেনে পরিণত করার প্রণালীই "নাইট্রোজেনের বন্ধন" (Fixation of nitrogen) নামে অভিহিত। এই বন্ধন প্রকৃতিতে কিছু পরিমাণে ঘটে থাকে, কিন্তু সাম্প্রতিক নাইট্রোজেনের অধিকাংশই কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেনের বন্ধনের উপর নির্ভর করে।

ঝড়-বাদলের সময় যখন আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণ হয় তখন উহার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সংযুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে। ঐ অক্সাইড আরও একটু অক্সিজেন আকর্ষণ করে নাইট্রোজেনের উচ্চ অক্সাইডে পরিণত হয়, যাহা জলধারায় শোষিত হয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। ঐ জলীয় নাইট্রিক অ্যাসিড মৃত্তিকায় নেমে এসে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রেটের জন্ম দেয়। ইহা ছাড়া আরও একটি অভিনব উপায়ে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের বন্ধন ঘটে থাকে। লেগুম জাতীয় (ছোলা, মটর ইত্যাদি) শস্যের মূলস্থিত 'নডিউলে' অ্যাজোটো ব্যাক্টর শস্যের সহযোগিতায় (Symbiosis) বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সরাসরি আকর্ষণ করে' তাহাদের আহার জোগায়।

অন্যদিকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। জৈব পদার্থের বিনাশ ও পচনে এবং একপ্রকার ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে প্রত্যার্তন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডল হতে বৈদ্যুতিক এবং জৈব প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের বন্ধন হচ্ছে এবং পুনরায় সেই সংযুক্ত নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলেই ফিরে যাচ্ছে অন্য আর এক প্রকারে। এই সম্মিলিত ঘটনাটিকে "নাইট্রোজেন-চক্র" (Nitrogen cycle) বলা হয়।

স্বাভাবিক উপায়ে এই কিয়ৎ পরিমাণ নাইট্রোজেনের বন্ধনে আমাদের খুব বেশী উপকার হয় না। অথচ আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রায় নাইট্রোজেনের

বিশেষ প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। তাই বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানে উঠে পড়ে লাগলেন।

বিদ্যুৎস্ফুরণের সময় নাইট্রিক অক্সাইড উদ্ভবের কথা বহুদিন হতেই জানা ছিল; কিন্তু ল্যাবরেটরীতে ক্যাভেণ্ডিসই সর্বপ্রথম (১৭৮২ খৃঃ) বিদ্যুতের 'স্পার্ক' প্রবাহিত করে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ ঘটান। ব্যবসায়ের ভিত্তিতে ব্রাড্‌লি ও লাভ্‌জয়ই সর্বপ্রথম (১৯০২) নায়াগ্রার জলপ্রপাত হতে উদ্ভূত বিদ্যুতের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি প্রবর্তিত করেন। তাঁরা মাল্টিপল্ আর্ক ফার্নেস্ ব্যবহার করেন। এরপর বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুৎচুল্লীর উদ্ভাবন করেন এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বিশেষরূপে ব্যবসায়ে প্রয়োগ করেন। এসব প্রক্রিয়ার মূল পদ্ধতিটা এই—নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন (অর্থাৎ বায়ু) বিদ্যুৎ চুল্লীতে উচ্চ তাপে সংযুক্ত হয় এবং এই প্রকারে উদ্ভূত নাইট্রিক অক্সাইড খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। এবার আবও বাতাসের (অথবা পরিশুদ্ধ অক্সিজেনের) সংস্পর্শে এনে উহাকে নাইট্রোজেনের ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হয়। এই পদার্থকে জলে দ্রবীভূত করে জলীয় নাইট্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। কোন কোন পদ্ধতিতে (যেমন নরওয়েতে) এই জলীয় নাইট্রিক অ্যাসিডকে চূণের মধ্যে পরিচালিত করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট প্রস্তুত করা হয়। ইহাই বাজারে নরওয়েজীয়ান সল্টপিটার নামে একটি মূল্যবান সার হিসেবে বিক্রীত হয়। এই পদ্ধতিটার কিন্তু মস্ত এক অসুবিধা এই যে, ইহাতে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং যেখানে বিদ্যুৎ শক্তি সস্তায় পাওয়া যায় সেখানেই শুধু এই পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মেনীতে হাবের, উচ্চ চাপ এবং অনুঘটক প্রয়োগে বাতাসের নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করেন।

লোহিতোষ্ণ কোকের উপর জলীয় বাষ্প পরিচালিত করে হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনোক্সাইড (ওয়াটার গ্যাস) উৎপন্ন হয়। বাতাসকে অনুরূপভাবে লোহিতোষ্ণ কোকের উপর দিয়ে পরিচালিত করলে প্রডিউসার গ্যাস (যাহা নাইট্রোজেন ও কার্বন-মনোক্সাইডের মিশ্রণ) পাওয়া যায়। এখন এই মিশ্রিত ওয়াটার গ্যাস ও প্রডিউসার গ্যাস হতে বস্ প্রণালীতে কার্বন-মনোক্সাইড দূরীভূত করা হয়। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প সহযোগে গ্যাসীয় মিশ্রণটিকে অনুঘটকের (আয়রন ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড) উপর দিয়ে প্রবাহিত করে কার্বন-মনোক্সাইডকে ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হয় এবং উহাকে উচ্চ চাপে ঠাণ্ডা জলে দ্রবীভূত করা হয়। এভাবে পরিশোধিত হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনকে অতি উচ্চ চাপ প্রয়োগে বিদ্যুৎ-তপ্ত অনুঘটকের (আয়রন অক্সাইড ও মলিবডিনাম প্রোমোটার) উপর চালিত করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। এই প্রণালীটি হাবের-বস্ পদ্ধতি নামে খ্যাত। এই প্রণালীর একটা মস্ত সুবিধা এই যে, এতে অল্প বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয়। সুতরাং এই প্রণালী যেখানে খুশী গ্রহণ করা সম্ভব।

এই প্রণালীতে উদ্ভূত অ্যামোনিয়াকে অক্সিডাইজ্ করে (অস্ট্‌ওয়াল্ড পদ্ধতি) নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কিংবা অ্যামোনিয়া জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন করা হয়। এই শেষোক্ত প্রণালীটি বিহারে সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীতে গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

ইহা ছাড়া উচ্চ তাপে বিদ্যুৎ-চুল্লীতে গলিত ক্যালসিয়াম কার্বাইডের উপর নাইট্রোজেন পরিচালিত করে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড (ইহাই নাইট্রোলাইম্) প্রস্তুত করা হয়। এই সায়ানামাইড হতে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয়। ইউরিয়া শুধু সাররূপেই ব্যবহৃত হয় না, আজকাল

প্লাস্টিক শিল্পে ইহার বিশেষ প্রয়োজন (ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড)। কতিপয় মৌলিকের অক্সাইড উচ্চতাপে নাইট্রোজেন শুষে নাইট্রাইডে রূপান্তরিত হয়। এই তত্ত্বের উপরেই সার্পেক্ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। এই প্রণালীতে বিদ্যুৎ-চুল্লীতে বক্সাইট (অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর অক্সাইড), পাথুরে কয়লা প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর নাইট্রোজেন পরিচালিত করা হয় উহাদের মিশ্রণের উপর। ফলে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড প্রস্তুত হয়। এই নাইট্রাইড জলীয় বাষ্পের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া উদ্ভূত হয় এবং অ্যালুমিনিয়ামের হাইড্রক্সাইড পড়ে থাকে। ইহাকে পুড়িয়ে নিলে বিশুদ্ধ বক্সাইট পাওয়া যায়—যাহাকে মৌলিকটির নিষ্কাশনে নিয়োগ করা চলে। এই প্রণালীটি যদি অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের পথে বক্সাইট বিশুদ্ধিকরণের জন্যে গ্রহণ করা হয় তবে অ্যামোনিয়া উপজাত পদার্থ হিসেবে পাওয়া সম্ভব।

উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন ও পরিপুষ্টি

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীমতী সুধীরা দাশ

পৃথিবীতে আমরা যে সকল জিনিস দেখতে পাই তাদের প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়—জৈব এবং অজৈব। প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত জিনিসকে জৈব বলা যেতে পারে। এগুলোর প্রধান উপাদান হচ্ছে—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, অঙ্গার এবং নাইট্রোজেন। গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতিও অল্পাধিক পরিমাণে এগুলোতে বিদ্যমান থাকে। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, তেল, ঘি ইত্যাদি জৈব পদার্থ। বালি, মাটি, কঙ্কর, খনিজ ধাতু এবং অধাতু অজৈব পদার্থের অন্তর্গত। অজৈবকে জৈব পদার্থে পরিণত করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু উদ্ভিদের মাটি, জল ও বাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাদের দেহের অভ্যন্তরে এই সমস্ত অজৈব পদার্থকে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে থাকে। এই জৈব পদার্থগুলো শ্বেতসার, শর্করা, সেলুলোজ, প্রোটিন, উদ্ভিজ তেল ইত্যাদিরূপে উদ্ভিদের দেহগঠন ও পুষ্টি সাধনে নিয়োজিত হয়—উদ্ভিদ-দেহ পত্র, পুষ্প, ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অজৈব ও জৈব জগতের মধ্যে সেতু রচনা করেছে এই উদ্ভিদ। উদ্ভিদ থেকেই মানুষ ও জীবজন্তু তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে। দেশের খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে শুধু অনাবাদী জমিতে যান্ত্রিক প্রণালীতে কৃষিকার্য আরম্ভ করলেই চলবে না, সেই জমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদের খাদ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

উদ্ভিদ-দেহের অধিকাংশই অঙ্গার, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন সমবায়ে নির্মিত সেলুলোজ ও লিগ্‌নিন্ নামক জটিল জৈব পদার্থে গঠিত। তাছাড়া কিছু প্রোটিন, তৈলজাতীয় পদার্থ, শ্বেতসার, রঞ্জন, ভিটামিন ও শর্করা প্রভৃতি স্বল্প পরিমাণে তৈরী হয়ে কোন কোন উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত থাকে। অতি সাধারণ পদার্থ থেকে সাধারণ অথচ অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরী করে থাকে। খাদ্য-প্রস্তুত প্রণালীর প্রাথমিক প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে—ফটোসিন্থেসিস্ অর্থাৎ আলোক-রাসায়নিক প্রণালীতে খাদ্য উৎপাদন। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে মাটির জল ও বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরস্পর সংযুক্ত হয়ে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে। প্রত্যেক পাতার উপরিভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র রয়েছে। এগুলোর নাম ষ্টোম্যাটা। এই ছিদ্র দিয়ে পাতার অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র কোষে পৌঁছান যায়। এই কোষগুলো পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিল নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থে পূর্ণ রয়েছে। বিজ্ঞানী উইলষ্ট্যাটার এবং তাঁর সহকর্মীগণ দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি পত্র-হরিৎ (এ)-র অণুতে ৫৪টা অঙ্গার, ৭২টা হাইড্রোজেন, ৪টা নাইট্রোজেন, ৫টা অক্সিজেন এবং একটা ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর পরমাণু রয়েছে। এই পত্র-হরিতের রং কাল্‌চে নীল। পত্র-হরিৎ (বি) র অণুতে আছে—অঙ্গার ৫৫, হাইড্রোজেন ৭০, নাইট্রোজেন ৪, অক্সিজেন ৬ এবং ম্যাগনেসিয়ামের একটি পরমাণু। এর রং কালচে সবুজ। এই পত্র-হরিৎদ্বয় পরফিরিন জাতীয় পদার্থ। এরা জলে দ্রবীভূত হয় না; কিন্তু সুরাসার, ক্লোরোফর্ম, বেঞ্জিন প্রভৃতি জৈব-দ্রাবকে সহজেই দ্রবণীয়। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড ষ্টোমেটা-দ্বারপথে প্রবেশ করে' পাতার কোষে পৌঁছে যায়। বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ শতকরা ·০৪ ভাগ। অনুমান করা গেছে যে, পৃথিবীর সমস্ত বাতাসে এই গ্যাসের ওজন হবে ২×১০^{১৮} গ্র্যাম এবং পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত এই গ্যাসের পরিমাণ ৪×১০^{১৯} গ্র্যাম। একজন লোক এক বৎসরে যত কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যাগ করে সেই পরিমাণ গ্যাস একটি উদ্ভিদ শোষণ করে নেয়—যার সমস্ত পাতার আয়তন ১৫০ বর্গ গজ। খাদ্য নির্মাণ-কার্য সমাপ্তির পর সে যে পরিমাণ অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়, একটি লোকের সমস্ত বৎসরের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যে ততটা দরকার হয়। পত্র-হরিৎ সূর্যের আলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার পরিমিত স্থান প্রতি মিনিটে সূর্য থেকে ১ হতে ১·৯৫ ক্যালোরী তাপ শক্তিরূপে সংগ্রহ করে থাকে। শস্যক্ষেত্রে ফসল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই শক্তির শতকরা ২—৩ ভাগ উদ্ভিদদেহে সঞ্চিত থাকে। খাদ্য তৈরীর সময় এর ২০ গুণেরও বেশী পরিমাণ শক্তির দরকারঃ হয়; অবশিষ্টাংশ উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাপ-বিকিরণ, বাষ্পীভবন ইত্যাদি কার্যে নষ্ট হয়ে যায়। দৃশ্যমান সূর্যালোকের লাল, কমলা ও নীল আলোকই অধিক পরিমাণে পত্র-হরিৎ শোষণ করে নেয়। ৭০০০ অ্যাংষ্ট্রম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোতে ফটোসিন্থেসিস্ নাকি খুব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। এই আলোক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পত্র-হরিৎ-শোষিত শক্তির সহায়তায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সর্বপ্রথম ফরম্যালডিহাইড নামক জৈব পদার্থ এবং অক্সিজেন প্রস্তুত করে। অক্সিজেন পাতার দ্বার-পথে বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকটি ফরম্যালডিহাইড-অণু তৈরীর কার্যে ১১০ কিলোক্যালোরী তাপ দরকার হয়। সূর্যের আলোক, বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি, বায়ুর উষ্ণতা প্রভৃতিও এই প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তারপর অনেকগুলো ফরম্যালডিহাইড-অণুর সমপাতন বা পলিমেরিজেসনের ফলে গ্লুকোজ প্রভৃতি শর্করা ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের উদ্ভব হয়। প্রত্যেকটি পাতার লক্ষ লক্ষ কোষ এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরী—সেখানে প্রতিদিন এই খাদ্য তৈরী হয়ে রাত্রিযোগে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এই শ্বেতসার ও শর্করা থেকেই ক্রমে সেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি গাছের কাঠামো এবং শক্ত আবরণী তৈরী হয়ে থাকে। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার তৃতীয় পর্যায়ে প্রোটিন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ মাটি থেকে কৈশিক মূলের সাহায্যে জল শোষণ করে' সেই জল পাতায় টেনে নিয়ে আসে। এই জলের সঙ্গে মাটির বিভিন্ন খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে। নাইট্রাইট ও নাইট্রেট জাতীয় লবণ জলের সঙ্গে শোষিত হয়ে এসে কোনক্রমে হাইড্রোক্সিল্যামাইন নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয়; তারপর পাতার কোষে উৎপন্ন ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফরম্যামাইডে পরিণত হতে পারে। এই ফরম্যামাইড থেকেই অ্যামিনো অ্যাসিড, তথা প্রোটিনের সৃষ্টি

হয়। অনেকে বলেন যে, আলোক-রসায়ন প্রক্রিয়ার সহায়তা ব্যতিরেকেও প্রোটিন তৈরী হতে পারে, যেহেতু কোন কোন উচ্চস্তরের গাছের পাতায় অন্ধকারেও এই পদার্থটি প্রস্তুত হয় এবং নিম্ন-স্তরের অনেক পত্র-হরিৎ-শূন্য গাছেও প্রোটিন উৎপন্ন হয়ে থাকে। গাছের কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজম-এর প্রধান উপাদান এই প্রোটিন। বৃক্ষদেহে তৈলজাতীয় পদার্থের প্রস্তুত-প্রণালী এখনও রহস্যময়। এ সম্বন্ধে বহু মতবাদ আছে। অনেকে বলেন যে, পত্র-হরিৎ-শোষিত সূর্যরশ্মির সহায়তায় উদ্ভিদস্থিত এবং তাহার কোষে উৎপাদিত জৈব পদার্থ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিড তথা ফ্যাট বা তৈল জাতীয় পদার্থ গঠন করে।

[যথাঃ—$R\text{-}H + CO_2 \rightarrow R\text{-}COOH$]

অনেক গাছের পাতায় ও ফলে ভিটামিন আছে। উদ্ভিদদেহে ভিটামিন প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। অনেকে বলেন যে, পত্র-হরিৎ ভেঙ্গে গিয়ে ফাইটল নামক পদার্থে পরিণত হয়। এই ফাইটল থেকে কতকগুলো হাইড্রোজেন অণু বেরিয়ে যায়। তারপর অব-শিষ্টাংশের কতকগুলো অণু একসঙ্গে মিশে গিয়ে লাইকোপিন নামক পদার্থে পরিণত হয়ে ক্যারোটিনে রূপান্তরিত হয়। এই ক্যারোটিনই ভিটামিন-এ। ভিটামিনের উৎপাদন এ-ভাবে হতে পারে :—

ফাইটল {
ক্লোরোফিল ——→ ফাইটল
ভিটামিন-এ
↑ ?
ভিটামিন-কে ——
ক্যারোটিনয়েড ←——
}
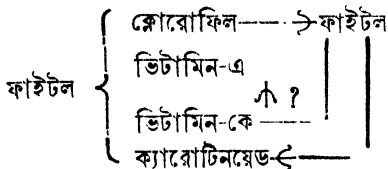
উদ্ভিদদেহের ভিন্ন ভিন্ন প্লাষ্টিড— যথা :—লুকো, ক্রোমো, ক্লোরো প্রভৃতিই নাকি বিভিন্ন ভিটামিন সৃষ্টির উৎস। শর্করা জাতীয় পদার্থ হতে ভিটামিন-সি বা অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড তৈরী হয়—এজন্যে প্রয়োজন হয় সূর্যরশ্মির লাল আলো। উদ্ভিদদেহে খাদ্য উৎপাদনের ইহাই মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

উদ্ভিদের দেহ-পুষ্টি ও দেহ-গঠনের ইতিহাস অত্যন্ত রহস্যময়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল ছাড়াও উদ্ভিদের আহার্যরূপে প্রয়োজন—নানাবিধ খনিজ লবণ। এদের সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপরই উদ্ভিদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কৃষিক্ষেত্রে প্রদত্ত বিভিন্ন সার থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ গ্রহণ করে। পচা গোবর, পচা লতাপাতা বা হিউমাস, অস্থিচূর্ণ, চুন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফস্ফেট প্রভৃতি সাররূপে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদের বেলায় বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ করা হয়। যেমন বাঁধাকপি, পালং লেটুস প্রভৃতি শাকসব্জির ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনঘটিত সারের প্রয়োজন। কিন্তু ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদের বেলায়—যেখানে ফল বা বীজ উৎপাদনই প্রধান লক্ষ্য—অধিক নাইট্রোজেনসম্পন্ন সার অনাবশ্যক। আলু ক্ষেতে চুন না দিয়ে বীটের ক্ষেতে চুন দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পেঁয়াজের ক্ষেতে চুন ও সুপার ফস্ফেট এবং বিলাতী বেগুনের চারাগাছ লাগাবার সময় নাইট্রেট দেওয়া যেতে পারে।

১৮৪০ সালে বিজ্ঞানী লেবিগ প্রচার করেন যে, মাত্র ১০টি মৌলিক পদার্থই উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রী। উদ্ভিদদেহ বিশ্লেষণ করে তিনি এই তথ্য প্রমাণ করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, গাছের যে নাইট্রোজেন দরকার হয়—সেটা মাটির নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ থেকে না নিয়ে গাছ সোজাসুজি বাতাস থেকে গ্রহণ করে। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাটি ছাড়াও শুধু জলের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক, লৌহ প্রভৃতির লবণ মিশিয়ে তাতে গাছ জন্মান সম্ভব ; কিন্তু জল থেকে উপরোক্ত একটি পদার্থও বাদ দিলে গাছের ভাল বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু এই দশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়াও যে পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য অন্য কোন কোন পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে এগুলোর মধ্যে সংমিশ্রিত থাকতে পারে—এরূপ

সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি। ১৯১৪ সালের পর থেকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। উক্ত দশটি মৌলিক পদার্থ ছাড়াও এমন কয়েকটি মৌলিক পদার্থ আছে যাদের অতি সূক্ষ্মতম অংশ উদ্ভিদ-দেহের গঠন ও পুষ্টি-বিধানে প্রয়োজন হতে পারে। ১৯১০ খৃঃ বিজ্ঞানী আগুলহান কৃষি-ক্ষেত্রে স্বীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে দেখান যে—তামা, ম্যাঙ্গানিজ এবং বোরন অতি অল্পমাত্রায় জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করলে ফসলের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ১৯২২ সালে কেন্টকি রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী ম্যাক্‌হারগ উদ্ভিদ-পুষ্টির পক্ষে ম্যাঙ্গানিজ যে অতি প্রয়োজনীয় ধাতু তা প্রমাণ করেন। বহুদিন পূর্বে আমাদের দেশেও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় প্রায় শতাধিক গাছের পাতা ও কাণ্ডে রাসায়নিক পরীক্ষায় ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন এবং আরও দেখিয়েছেন যে, গাছের বৃদ্ধি ও সজীবতার পক্ষে এই ধাতুর স্বল্প পরিমাণ উপস্থিতি অপরিহার্য। ১৯৩১ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার লিপম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি প্রধান খাদ্য; কারণ মৃত্তিকার উপাদানে এদের অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়। কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, তামা, দস্তা ইত্যাদি গৌণ খাদ্য; কারণ, উদ্ভিদ-দেহ গঠনে বিভিন্ন দিকে অতি অল্পমাত্রায় এদের প্রয়োজন হয়। প্রতি এক কোটি ভাগ মাটিতে মাত্র ২।৩ ভাগ পরিমাণ এসব পদার্থ বিদ্যমান থেকেও প্রভূত উপকার সাধন করে। অনেক সময় দেখা যায়, অধিক পরিমাণে এগুলো মাটিতে বর্তমান থাকার ফলেও কোন সুফল দেখা দেয় না। সার হিসেবে আজকাল এসব বিভিন্ন 'ট্রেস্‌ এলিমেণ্ট' বা স্বল্পমাত্রা মৌলিক পদার্থের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। আমেরিকার জমিতে ১৯৪৫ সালে মাত্র ৩৭০০ টন বোরাক্স বা সোহাগা সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল; কিন্তু ১৯৪৮ সালে অনেক কৃষিক্ষেত্রেই এর ব্যবহার হওয়ায় ১০,০০০ টন বোরাক্স খরচ হয়েছিল। তুঁতে, ম্যাঙ্গানিজ-সালফেট, জিঙ্ক-সালফেট প্রভৃতির ব্যবহারও বেড়ে গিয়ে বছরে যথাক্রমে ১২ ০০ টন, ২০,০০০ টন ও ৩০০০ টনে দাঁড়িয়েছে। নির্দিষ্ট স্বল্প মাত্রার চেয়ে বেশী পরিমাণে এই সকল পদার্থের ব্যবহারে উদ্ভিদের বদহজমের ভয় আছে। কৃত্রিম সার হিসেবে যে সুপার ফস্ফেট ও চিলি নাইট্রেট ব্যবহার করা হয় তাতে তামা, দস্তা এবং বোরনের লবণ অতি অল্পমাত্রায় অবাঞ্ছিত পদার্থরূপে বর্তমান থেকেও বাঞ্ছিত উপকার সাধন করে থাকে।

উদ্ভিদ-দেহের এই স্বল্প মাত্রার মৌলিক পদার্থ-গুলোর কার্যকলাপ সুস্পষ্ট নয়। অনেকে বলেন যে, এই পদার্থগুলো উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন রাসায়নিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে সাহায্য করে। পত্র-হরিতের অণুতে ম্যাগনেসিয়াম বিদ্যমান থাকে। এই পত্র-হরিৎ উদ্ভিদ-দেহে খাদ্য-প্রস্তুত কার্যে অত্যাবশ্যক; কাজেই গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে পত্র-হরিৎ উৎপাদনের জন্যে ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহের প্রয়োজন। এই পত্র-হরিৎ প্রস্তুত-কার্যে ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহের উপস্থিতিও আবশ্যক। বৃক্ষদেহে যেখানে অক্সিজেন সংযোগ-ক্রিয়া ঘটে সেখানে তামার অণু থাকা দরকার। উদ্ভিদের প্রোটিন তৈরীর কার্যে সম্ভবতঃ দস্তারও সহায়তা প্রয়োজন হয়। নিম্নের তালিকা থেকে উদ্ভিদের বিবিধ খনিজ খাদ্যের উপযোগিতা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হবে।

উদ্ভিদ খাদ্য	উদ্ভিদের যে অংশ গঠনে সহায়তা করে।	পদার্থটির অভাবে উদ্ভিদদেহে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়।
নাইট্রোজেন	প্রোটিন, পত্র-হরিৎ প্রোটোপ্লাজম।	বৃদ্ধি-হ্রাস, পাতার বর্ণ পীতাভ সবুজ।
ফসফরাস	প্রোটোপ্লাজম, শিকড় গঠন, বীজের পুষ্টি সাধন ও এনজাইম ক্রিয়ায় সহায়তা করে থাকে।	শীর্ণ শিকড়, নীলাভ সবুজ পাতা, ছোট ছোট গাঁট।
পটাসিয়াম	আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া সমাধা, একস্থান হইতে অন্যত্র চিনি সরবরাহ ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনে সাহায্য করে।	স্বল্প বৃদ্ধি, পাতায় পীতাভ দাগ ও অকাল মৃত্যু।
ম্যাগনেসিয়াম	পত্র-হরিৎ, তৈল জাতীয় পদার্থ উৎপাদন ও ব্যবহার।	পাতায় দাগ ও পাতা ঝরে পড়া।
ক্যালসিয়াম	অন্যান্য লবণ শোষণে সহায়তা ও শিকড় বৃদ্ধি।	শিকড় বৃদ্ধি হ্রাস, মুকুল ও কচি পাতা কুঁকড়ে পড়া।
লৌহ	পত্র-হরিৎ।	পাতার রং পীতাভ, শিকড়ের বৃদ্ধি হ্রাস।
গন্ধক	প্রোটিন, কোন কোন মূলদেশে নডিউল বা গুটি গঠন।	শীর্ণকায় শিকড়।
ম্যাঙ্গানিজ	অক্সিডেসনে সাহায্য, পত্র হরিৎ ও ভিটামিন-সি তৈরী।	পাতায় দাগ, কচি গাছের মৃত্যু।
বোরন	কোষ-বিভক্তিকরণে সহায়তা।	কচি মুকুল ও পাতা ঝরে পড়া।
তামা	অক্সিডেসনে সহায়তা।	বীজ গঠনে অক্ষমতা।
দস্তা	প্রোটিন তৈরীতে সাহায্য।	ক্ষুদ্র পাতা ও সাদা মুকুল।

উদ্ভিদের দেহ-গঠন ও পুষ্টি-সাধনে আরও কতকগুলো জিনিসের ব্যবহার প্রয়োজন। এদের মধ্যে কতকগুলো জৈব রাসায়নিক পদার্থ ভিটামিন এবং উদ্ভিজ্জ হরমোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"বিজ্ঞান শিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জাতীয় জীবনমরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধিশালী লোকেরা কবে উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবসা বানিজ্য করিয়া ইহলোকে দশজন নিরন্নকে প্রতিপালনপূর্ব্বক অপার কীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য অনন্ত পুন্য সঞ্চয় করিবেন ?"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
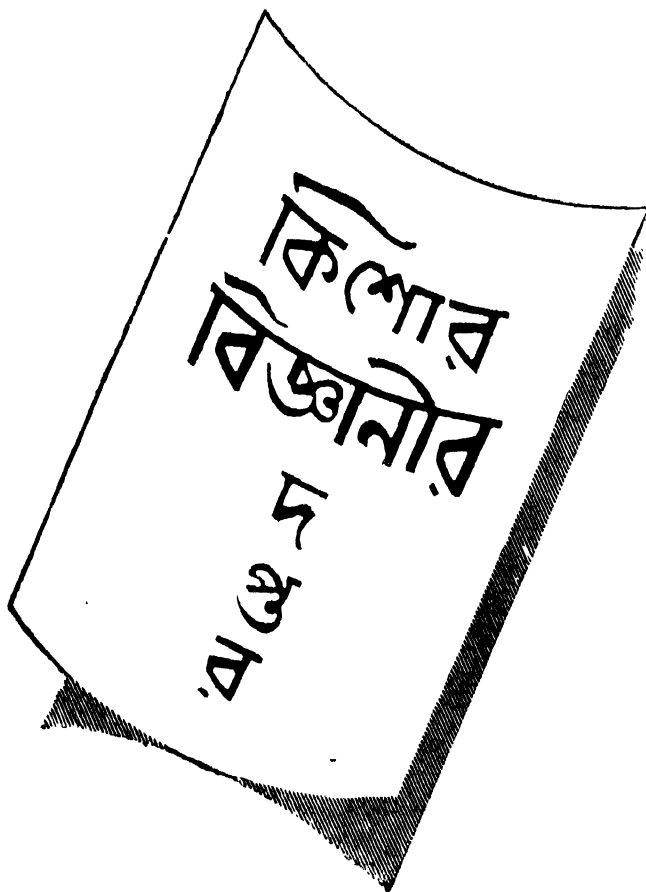
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ,—৪র্থ সংখ্যা

বিখ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের ছবি এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করবার জন্যে তোমাদের অনেকে অনুরোধ জানিয়েছে। এখন থেকে আমরা মাঝে মাঝে দেশীয় এবং বিদেশীয় বিজ্ঞানীদের ছবি সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো। ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এবারে আমরা বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের (ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিতীয় এফ. আর. এস.) জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করবো।—স

শ্রীনিবাস রামানুজন এফ, আর, এস,

জন্ম—১৮৮৮ মৃত্যু—১৯২০

২৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করে দেখ

ছোটদের মাইক্রস্কোপ তৈরীর সহজ ব্যবস্থা

অণুবীক্ষণ যন্ত্র অর্থাৎ মাইক্রস্কোপের কথা তোমরা সকলেই জান। তোমাদের অনেকের পক্ষেই যে মাইক্রস্কোপ ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অতি ক্ষুদ্র যে সব জিনিস আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, মাইক্রস্কোপের সাহায্যে সেগুলো বর্ধিত আকারে আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়। আমাদের দৃষ্টির বাইরে যে বিশাল অদৃশ্য জীবজগতের অস্তিত্ব রয়েছে, মাইক্রস্কোপের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করাই সম্ভব হতো না। তোমাদের আশেপাশে যে সব খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, নালা-নর্দমা দেখতে পাও তা থেকে এক ফোঁটা জল তুলে নিয়ে দেখ—পরিষ্কার জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সেই এক ফোঁটা জল মাইক্রস্কোপের ভিতর দিয়া দেখ—দেখবে, তাতে কত রকমের অদ্ভুত আকৃতির প্রাণী ঘোরাফেরা করছে। মাইক্রস্কোপের শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও—আরও বেশী রকমারি প্রাণী নজরে পড়বে। এসব অদ্ভুত প্রাণীদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে তোমাদের অনেকেরই হয়তো যথেষ্ট কৌতূহল আছে, অথচ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভাবে কৌতূহল নিবৃত্তি করা সম্ভব নয়। তাদের জন্যেই মাইক্রস্কোপ তৈরীর একটা সহজ উপায়ের কথা বলছি।

কাচের অথবা পিতলের সরু এক টুকরা লম্বা নল জোগাড় কর। সহজে জলে ভিজে না, এরকম কাগজের নলেও কাজ চলবে। নলের ছিদ্রটার মাপ পাশাপাশিভাবে এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ থেকে ষোল ভাগের তিন ভাগের মধ্যে হওয়া দরকার। এই লম্বা নল থেকে খুব ছোট্ট একটু অংশ কেটে নাও। এই কর্তিত অংশটুকু লম্বায় হবে—এক ইঞ্চির আট ভাগের তিন ভাগ মাত্র। পিতল, কাগজ অথবা কাচের নল থেকে এরকমের ছোট্ট অংশ কেটে দুদিকের কাটা মুখ ঘষে পালিশ করে নাও। কালো রঙের সিলিংওয়াক্স (সিল করবার গালা)
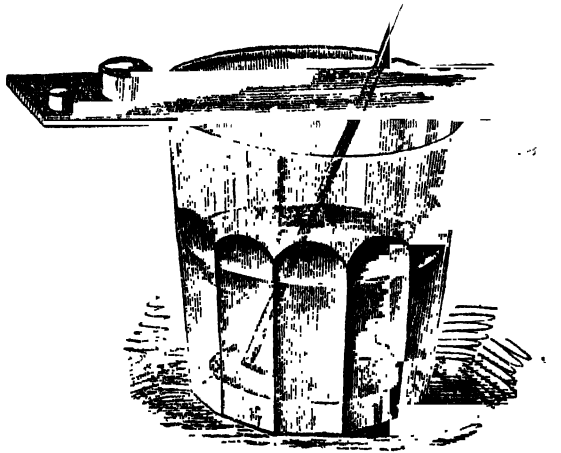
এক নম্বর চিত্র

বা অন্য কোন অনুজ্জ্বল কালো ভার্নিস দিয়ে নলের টুকরাটার ভিতরে বাইরে কালো করে দিতে হবে। নলের টুকরাটাকে একখানা পাতলা কাচের উপর বসিয়ে কালো সিলিং ওয়াক্স দিয়ে কাচের সঙ্গে জুড়ে দাও। এক নম্বরের ছবিটা দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ছবির মত একখানা পাতলা কাচের উপর এরূপ একাধিক নলের টুকরা বসিয়ে নিতে পার। এবার ছোট্ট একটি কাঠির ডগা জলে ডুবিয়ে কাচের উপর বসানো ছোট্ট নলের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে ভর্তি কর। জলের উপরিভাগটা যেন সমতল না হয়ে উপরের দিকে ধনুকের আকারে বাঁকা হয়ে থাকে। এটিই হলো জলের লেন্স। এই লেন্সের নীচে কোন সূক্ষ্ম জিনিস রেখে তাকালেই সেটাকে অনেক বড় দেখাবে। কাঠির সাহায্যে জল কমিয়ে বাড়িয়ে জলের উপরের বক্রতা প্রয়োজনমত কমবেশী করা যেতে পারে। নলের ভিতরকার মাপ এবং জলের উপরকার বক্রতার তারতম্যানুযায়ী নীচে স্থাপিত দেখবার জিনিসটাকে কমবেশী বড় দেখাবে। এই লেন্সের সাহায্যে তোমরা হাইড্রা, ইনফিসোরিয়া এবং কয়েক জাতের বিচিত্র প্রোটোজোয়া অনায়াসেই দেখতে পাবে।
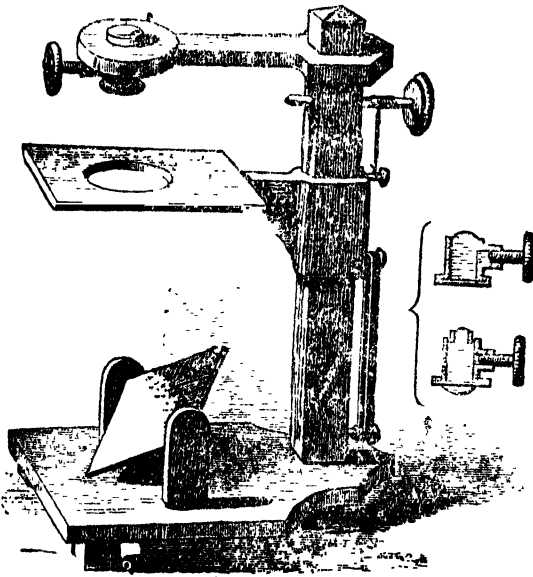
দুই নম্বর চিত্র

জলের লেন্স দিয়ে কিভাবে একটা সাধারণ মাইক্রস্কোপ তৈরী করতে পার সেকথা বলছি। দুই নম্বরের ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ছবি থেকেই বুঝবে—কিভাবে যন্ত্রটা তৈরী করতে হবে। ভারী একখানা বোর্ডের উপর একটা কাঠের ষ্ট্যাণ্ড বসাও। ষ্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে শয়ানভাবে প্রসারিত একটা কাঠের বাহু এঁটে দাও। এই বাহুটার শেষ প্রান্তের ছিদ্রের মধ্যে জলের লেন্সখানা স্ক্রু দিয়ে আটকানো থাকবে। এই বাহুর নীচে, ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে একটা লম্বা স্ক্রু বসিয়ে দিতে হবে। তার নীচে থাকবে বেশ বড় গর্তওয়ালা একখানা চৌকা তক্তা পাশের দিকে প্রসারিত একটা বাহুর সঙ্গে সংলগ্ন। এই বাহুটা চৌকা কলারের সাহায্যে ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে আলতোভাবে পরানো থাকবে। কলারের গায়ে ডানদিকে, উপরে নীচে দুটা লম্বা পেরেক বসানো আছে। উপরের স্ক্রুতে জড়ানো শক্ত একগাছা সূতার শেষ প্রান্ত নীচের কলারের পিনের সঙ্গে বেঁধে দাও। কলারের নীচের দিকের পেরেক এবং ষ্ট্যাণ্ডের গোড়ার

দিকে বসানো পেরেকের উপর দিয়ে একটা রাবারের ব্যাণ্ড পরিয়ে দিতে হবে। এবার উপরের স্ক্রুটা সামনে অথবা পিছনে ঘোরালেই চৌকা তক্তখানা উপরে নীচে ওঠানামা করবে। নীচের বোর্ডখানার উপর ছবির মত করে ছোট্ট একখানা আরশি এমনভাবে বসাও যেন ইচ্ছামত উপরে নীচে হেলানো যেতে পারে। এবার পাতলা কাচের উপর একফোঁটা ময়লা জল রেখে কাচখানাকে চৌকা তক্তার গর্তের উপর বসিয়ে লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখ। আরশিখানাকে প্রয়োজনমত হেলিয়ে কাচের উপরে রক্ষিত জলের ফোঁটার তলার দিক দিয়ে আলো ফেললেই দৃশ্যবস্তু পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

দুই নম্বর চিত্রের ডানদিকে জলের লেন্সের উন্নত গঠন-কৌশল দেখানো হয়েছে। পিতলের নলের পাশের দিকে সরু টিউবের মধ্যে একটি স্ক্রু বসানো হয়েছে। স্ক্রুটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে লেন্সের জলের উপরিতলের বক্রতা কমবেশী করে' প্রয়োজনমত ফোকাস করা যেতে পারে। তার নীচের ছবিটিও আর একটি লেন্সের। পূর্বোক্ত মাপের নলের মধ্যে আর একটি সরু নল ঢুকিয়ে দিলে ভিতরকার ছিদ্রের মাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে দৃশ্যবস্তু অধিকতর বর্ধিতায়তনে দৃষ্টিগোচর হবে। নলের নীচে সংলগ্ন পাতলা কাচের তলায় এক ফোঁটা জল লাগিয়ে লেন্সের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারা যায়। নিজের হাতে-গড়া এই যন্ত্রটি বেশী দামী না হলেও তোমাদের পরীক্ষার কাজ বেশ ভালভাবেই চলবে।

জেনে রাখ

অ্যামিবা ও হাইড্রার বিচিত্র কাহিনী

'অ্যামিবা' কথাটা তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। অ্যামিবা পদার্থটা কি, কোথায় থাকে, তাদের চালচলনই বা কি রকম—এ সম্বন্ধে তোমাদের অনেকেরই হয়তো কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। তোমরা যাতে এগুলোকে নিজের চোখে দেখতে পার তার সহজ ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দিচ্ছি। পূর্ব অধ্যায়ে যে মাইক্রস্কোপ তৈরীর কথা বলেছি—সেরকম একটা মাইক্রস্কোপের সাহায্যেই অ্যামিবা এবং আরও অনেক রকমের বিচিত্র প্রাণী প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কিন্তু কথা হচ্ছে–এই বিচিত্র প্রাণীগুলোকে পাওয়া যাবে কোথায়? এগুলো সবই আণুবীক্ষণিক প্রাণী; এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্নজাতের প্রাণীদের অন্ত্রে এবং ময়লা জলের মধ্যে রকমারি অ্যামিবা ও অন্যান্য প্রোটোজোয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি' নামটা তোমাদের অপরিচিত নয়। কারণ এ-রোগে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক জাতের

অ্যামিবা মানুষের অন্ত্রে বংশবিস্তার করে' এ-রোগ উৎপন্ন করে। মাইক্রস্কোপের নীচে রোগীর মল পরীক্ষা করলে অসংখ্য অ্যামিবার সন্ধান পাওয়া যায়।

যাইহোক, আন্দাজী খুঁজে খুঁজে তোমাদের পক্ষে অ্যামিবা সংগ্রহ করা সহজ নয়। যদিও এরা দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করে এবং নোংরা, ময়লা জায়গার প্রায় সর্বত্রই ছড়ানো রয়েছে—তবুও খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় বলে খুঁজে বের করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য অনুকূল পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত আহার্য না পেলে এদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না; কারণ প্রতিকূল পরিবেশে এরা অতি সূক্ষ্ম গুটিকার আকৃতি ধারণ করে' নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। সে অবস্থায় তেমন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও এদের চিনে বের করা সহজ ব্যাপার নয়!
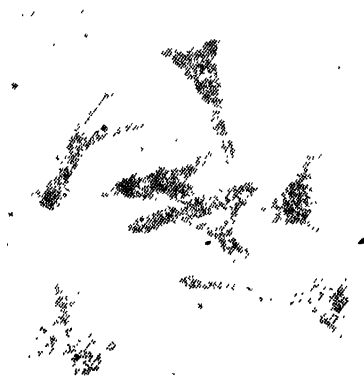
কতকগুলো জীবন্ত অ্যামিবার ছবি। ইতস্ততঃ বিচরণশীল অ্যামিবাগুলো বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করেছে।

অ্যামিবার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবার পূর্বে এক সময়ে শক্তিশালী মাইক্রস্কোপের আইপিসের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ রেখেও নাজেহাল হতে হয়েছিল। মাসাধিক কাল অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অকস্মাৎ একদিন একটা চলন্ত অ্যামিবা চোখে পড়ে গেল। অপূর্ব দৃশ্য! এই একটিমাত্র জীবন্ত অ্যামিবাকে কি দুর্লভ বস্তুই না মনে হয়েছিল সেদিন! তার দ্রুত পরিবর্তনশীল আকৃতি, খাদ্যসংগ্রহ প্রণালী, অদ্ভুত গতিবিধি দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। জীব-বিজ্ঞানের বই-পুস্তকে অ্যামিবা সম্বন্ধে যেসব বিবরণী দেওয়া আছে—তার চেয়ে অনেক কিছুই যেন চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। দেখে আর আশা মিটে না! জানা ছিল—একটা অ্যামিবা ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটা হয়ে যায়—দুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার চারটে হয়। এভাবে ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকে। অবশ্য খাদ্যের প্রাচুর্যই দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধির সহায়ক। সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যাপারটা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবার জন্যে কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। কিন্তু সেটা দেখাও সহজে সম্ভব হয়নি। যাহোক, এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত চেষ্টা করেও কদাচিৎ দু'-একটা
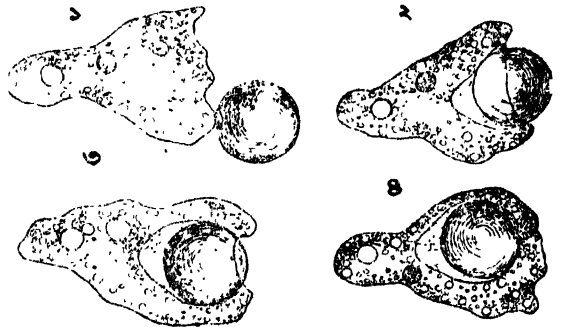
অ্যামিবা কেমন করে খাদ্য আত্মসাৎ করে, ক্রমিক নম্বর দিয়ে ছবিতে তা-ই দেখানো হয়েছে।

ছাড়া অ্যামিবার সাক্ষাৎ মিলেনি। মাস দুই পরে আকস্মিকভাবেই একদিন অসংখ্য অ্যামিবার সন্ধান মিলে গেল।

গুটি বাঁধবার কৌশল প্রত্যক্ষ করবার জন্যে টবের গাছে শুঁয়াপোকা পুষেছিলাম। টবটা বসানো ছিল জল ভর্তি একটা থালার মধ্যে, যাতে শুঁয়াপোকাগুলো পালাবার পথ না পায়। শুঁয়াপোকাগুলো অনবরত পাতা খায় আর মলত্যাগ করে। গুটি গুটি মল গড়িয়ে জলে পড়ে এবং জলটা ক্রমশঃই নোংরা ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন সেই বিবর্ণ জলের একফোঁটা শ্লাইডের ওপর রেখে মাইক্রস্কোপের ভিতর দিয়ে নজর দিতেই দেখলাম—ঠিক তারকা চিহ্নের মত গোটাকয়েক অদ্ভুত পদার্থ এখানে সেখানে প্রায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করছে। কিছুক্ষণ এভাবে অবস্থান করবার পর দু-একটাকে একটু একটু নড়াচড়া করতে দেখা গেল। গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ পরিবর্তনশীল অ্যামিবার আকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো—তারকার আকৃতি আর নেই—লম্বাটে হয়ে এগিয়ে চলেছে। শামুক যেমন করে এগিয়ে চলে, ঠিক তেমনি করে অগ্রসর হচ্ছে। সামনে-পিছনে, এপাশে-ওপাশে চারদিক দিয়েই একবার এদিকে আবার ওদিকে তরতর করে ডালপালা গজিয়ে উঠছে। ডালপালাগুলো একদিকে গজায় তো অপরদিকে মিলিয়ে যায়। যাহোক, অনুসন্ধানে বোঝা গেল—শুঁয়াপোকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মল, উদ্ভিদ বা জান্তব পদার্থ জলে পচলে সেখানে অজস্র অ্যামিবার উৎপত্তি ঘটে। কেবল অ্যামিবাই নয়—এরূপ জলের মধ্যে শশা বা ঝিঙে বিচির মত, চায়ের পেয়ালার মত, গ্রামোফোনের চোঙের মত এবং অন্যান্য অনেক কিছুর মত—আরও বিচিত্র প্রাণী নজরে পড়বে। অ্যামিবা দেখতে হলে তোমরাও এই উপায় অবলম্বন করতে পার।
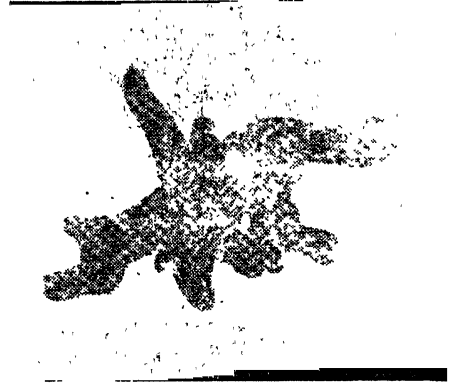
বহুগুণ বর্ধিত আকারে অ্যামিবার ছবি

ছোট্ট একটা কাচের পাত্রে জল রেখে তাতে কিছু শুকনো ঘাস বা শুঁয়াপোকার পরিত্যক্ত মল ভিজিয়ে রাখ। খুব ছোট্ট একটুকরা মাছ বা মাংসও ভিজিয়ে দেখতে পার। একদিন রাখবার পর সেই পাত্র থেকে পিপেটে করে এক ফোঁটা জল তুলে একখানা পাতলা কাচের শ্লাইডের উপর রাখ। এই জলের ফোঁটার উপর পাতলা কাগজের মত একখানা কভারশ্লিপ চাপা দিলে ভাল হয়। এবার শ্লাইডখানাকে মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে পরীক্ষা কর। দেখবে—সেই একফোঁটা জলের পরিধি কত বেড়ে গেছে! সেই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে এখানে সেখানে অতি ক্ষুদ্র এক

এক বিন্দু জেলীর মত পদার্থ পড়ে আছে। সেগুলো যে এক একটা জীবন্ত প্রাণী, প্রথমে তা বুঝতে পারবে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখবে—নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলো লম্বাটে হয়ে ক্রমশঃ গতিশীল হয়ে উঠছে এবং চেহারা ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। একদিকে ডালপালা গজায়, অপরদিকের গুলো সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। চলবার মুখে অতি সূক্ষ্ম কোন জৈব পদার্থের টুকরা সামনে পড়লে অ্যামিবা তার শরীরটাকে দুইদিকে বাড়িয়ে দিয়ে সেটাকে দেহসাৎ করে নেয়। 'উদরসাৎ' না বলে 'দেহসাৎ' বলায় তোমাদের একটু খটকা লাগতে পারে। কিন্তু ঠিক উদর বলে এদের দেহের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন স্থান দেখা যায় না। দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। কারণ মাইক্রস্কোপে এদের শরীরের ভিতরটাও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দিন কয়েক ভাল করে পরিচয় ঘটলে এদের বংশবৃদ্ধির কায়দাটাও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যথেষ্ট আহার্য দেহসাৎ করবার পর পরিপুষ্ট হলে চলন্ত অবস্থাতেই হয়তো দেখবে—অ্যামিবার শরীরের একাংশ ক্রমশঃ সরু হয়ে আসছে। কোন একটা আঠালো পদার্থের ডেলাকে ধীরে ধীরে দুদিকে টানতে থাকলে মধ্যস্থল ক্রমশঃ সরু হতে হতে অবশেষে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অ্যামিবাও ঠিক তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েই সংখ্যা-বৃদ্ধি করে থাকে।

বর্ধিত আকারে হাইড্রার ছবি। উপরে শুঁড়, নীচে শরীরের দুপাশ থেকে কুঁড়ির মত দুটা নতুন হাইড্রা উদ্গত হচ্ছে।

অ্যামিবার কথা তো শুনলে! ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু নিজের চোখেই দেখতে পাবে। এবার আর একটা অদ্ভুত আণুবীক্ষণিক প্রাণীর কথা বলছি, যাকে অ্যামিবার চেয়ে আরও সহজে দেখা সম্ভব। প্রাণীটার নাম হাইড্রা। জলের উপরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা অথবা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের গায়ে এগুলোকে পাওয়া যায়। খালি চোখে দেখা না গেলেও এরা অ্যামিবার চেয়ে আকারে অনেকটা বড়। কাজেই মাইক্রস্কোপ ছাড়াও ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যেই হাইড্রার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য সুস্পষ্টভাবে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে হলে মাইক্রস্কোপের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

তোমরা জোঁক দেখেছ নিশ্চয়ই! হাইড্রার আকৃতি এবং চালচলন কতকটা জোঁকেরই মত। জোঁকের মত লম্বা দেহটার উপরের দিকে, মুখের চারদিক থেকে কয়েকটা লম্বা শুঁড় বেরিয়ে গেছে। কোন কোন জাতের হাইড্রার শুঁড়গুলো তার শরীরের অন্ততঃ ৪।৫ গুণ লম্বা। তাদের শুঁড়ের গায়ে ছোট ছোট পেয়ালার মত কতকগুলো শোষণ-যন্ত্র সারবন্দিভাবে সাজানো দেখা যায়। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জলাধারে রক্ষিত

ক্ষুদে পানার মধ্যে এ-ধরণের হাইড্রারই প্রাচুর্য দেখেছি। জোঁকের মত শরীরের নিম্ন প্রান্তের সাহায্যে কোন কিছু আঁকড়ে ধরে শরীরটাকে লম্বা করে খাদ্যের সন্ধানে এরা শুঁড় গুলোকে চতুর্দিকে প্রসারিত করে দেয়। সাধারণতঃ এরা শুঁড় গুটিয়ে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে; কিন্তু খাদ্যের সন্ধান পেলেই অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। জলের মধ্যে আহার্য বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ ছড়িয়ে দিলেই তাদের কর্মচাঞ্চল্য দেখতে পাবে। আহার্য বস্তুর প্রাচুর্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের ফলে শরীরটা অসম্ভব রকমে স্ফীত হয়ে ওঠে। তখন প্রায় নির্জীবের মত চুপ করে থাকে। হাইড্রার চলবার ভঙ্গীও জোঁকের মত। সময় সময় ডিগবাজী খেয়ে উপরের দিক নীচে এবং নীচের দিক উপরে তুলে নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে। খাদ্য না পেলে কখনও কখনও বা বিরক্ত হয়েই যেন, শরীরটাকে গুটিয়ে শিকড়ে আটকানো একটা পিণ্ডাকার পদার্থের মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ছবি থেকে এদের রকমারি গতিভঙ্গীর নমুনাটা মোটামুটি বুঝতে পারবে। হাইড্রার বংশবিস্তার পদ্ধতিও অতি অদ্ভুত। উদ্ভিদ-দেহে যে রকম অঙ্কুরোদ্গম হয়ে থাকে হাইড্রার শরীরেও সেরূপ অঙ্কুর উদ্গত হতে দেখা যায়। সময়মত সেটা নতুন হাইড্রা-রূপে মূল শরীর থেকে খসে পড়ে। তাছাড়া যৌনমিলনোদ্ভূত বংশবিস্তারও হয়ে থাকে।

ক্রমিক সংখ্যানুসারে হাইড্রার বিভিন্ন রকমের গতিভঙ্গী দেখানো হয়েছে।

বড় বড় গাছপালার আড়ালে অবস্থিত নালা, ডোবা কিংবা পুকুর থেকে কিছু ক্ষুদে পানা বা জলঝাঁঝি সংগ্রহ করে এক ফোঁটা জলসমেত তাদের কোন একটার এক টুকরো পাতা কাচের শ্লাইডের উপর রেখে পাতলা কাচের কভারশ্লিপ চাপা দাও। কাঠির ডগা জলে ডুবিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দিলেই কভারশ্লিপের তলায় সমানভাবে জল ছড়িয়ে যাবে। এবার শ্লাইডখানা মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে পর্যবেক্ষণ করলেই দু-একটা হাইড্রার সন্ধান পেয়ে যাবে। একবার সন্ধান পেলে ভবিষ্যতে অ্যামিবা বা হাইড্রার খোঁজে তেমন আর অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।* গ. চ. ভ.

* ছবিগুলো, গ্রেস হোয়াইটের জেনারেল বায়োলজির টেক্সটবুক থেকে সংগৃহীত।

কই মাছের কথা
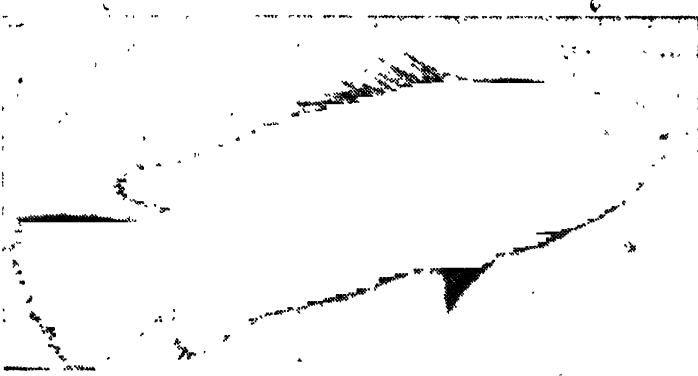
কই মাছ আমাদের সকলেরই পরিচিত। আমাদের দেশে ছোট বড় কয়েক জাতের কই মাছ দেখা যায়। অনেকের ধারণা—ছোট বড় সব রকমের কই মাছ একই জাতীয়, বয়স ভেদে ছোট কিংবা বড় দেখায় মাত্র। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ইহারা সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ পরিপূর্ণ অগভীর জলে বা বদ্ধ জলাশয়েই বিচরণ করে। কই মাছ উভচর হইলেও প্রধানতঃ জলেই বেশী সময় বাস করে। বর্ষার সময় ডিম পাড়িবার সময় হইলেই ইহারা নূতন জলের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। সেই সময়ে ডাঙ্গার উপর দিয়াও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে।

কথায় বলে—'কই মাছের পরাণ'—ইহাদের জীবনীশক্তি যেন অফুরন্ত! রান্নার জন্য কাটিয়া কুটিয়া, নূন হলুদ মাখাইয়া তপ্ত কটাহে ছাড়িয়া দাও—দেখিবে তখনও দাপাদাপি করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। আবার জল ছাড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাঙায় বিচরণ করিবার সময়ও ইহাদের জীবনীশক্তি যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় এমন কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কর্দমাক্ত একটু ঘোলা জলের মধ্যেও তারা দিনের পর দিন সুস্থ দেহে কাটাইয়া দেয়। কোন রকম খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও ইহাদিগকে মাসের পর মাস পূর্ণ জীবনীশক্তি লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়। জীবনীশক্তির এতটা প্রাচুর্য সত্ত্বেও কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। আকস্মিক ভাবে কোন উপায়ে ইহাদের মুখটাকে একটু হাঁ করাইয়া দিলেই আর নড়াচড়া না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ লইয়া পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে কই মাছ ধরা হইয়া থাকে। কই মাছেরা কীটপতঙ্গ এবং জলজ পোকা খাইতে পছন্দ করে। স্থানীয় লোকেরা সূতা বাঁধা বেতের টুকরা ধনুকের মত বাঁকাইয়া দুইটি মুখ ছোট ছোট কয়ার-ফড়িঙের গায়ে বিঁধাইয়া দেয়। এরূপ অনেকগুলি কয়ারফড়িং সারবন্দিভাবে একটা লম্বা দড়ির গায়ে সূতায় বাঁধিয়া দড়িটাকে জলের উপর ফেলিয়া রাখে। ফড়িংটাকে গ্রাস করিবার সময়ে বেতের টুকরার দুই মুখ খুলিয়া গিয়া স্প্রিঙের মত মাছের মুখটাকে হাঁ করাইয়া রাখে। অকস্মাৎ এরূপ অদ্ভুত অবস্থায় ভীত হইয়াই হউক, কি অন্য কোন কারণেই

হউক, মাছটা একেবারে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে। পরের দিন দড়ি তুলিলেই দেখা যায়, দড়ির দুই ধারে অনেক মৃত কইমাছ আটকাইয়া রহিয়াছে। ইতিপূর্বে সম্পাদক মহাশয় যে পরীক্ষার কথা জানাইয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—কই মাছ জলে ডুবিয়া বাতাস গ্রহণ না করিতে পারিলে, পনর বিশ মিনিটের মধ্যেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কই মাছের কানকোর ঢাকনার প্রান্তভাগে ছোট বড় কতকগুলি তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। ডাঙার উপর চলিবার সময় কই মাছ এই কান্‌কোর ঢাকনার সাহায্যেই কাৎভাবে অগ্রসর হয়। কান্‌কোর ঢাকনার সাহায্যে ইহারা সময় সময় হেলানো গাছের উপরও উঠিয়া পড়ে। অবশ্য মতলব করিয়া ইহারা গাছে চড়ে না—ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা।

কই মাছের শিকার পদ্ধতিও অদ্ভুত। বর্ষার সময় পূর্বাঞ্চলের ধানের ক্ষেত জলে ডুবিয়া যায়। সেই সময়ে কই মাছেরা জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ধান গাছের পাতায় উপবিষ্ট পোকামাকড় শিকার করিয়া উদরপূরণ করে। তাছাড়া পাকা ধানের ছড়াগুলি যখন জলের উপর নুইয়া পড়ে কই মাছের তখন ধান খাওয়ার মরসুম লাগিয়া যায়। তাহারা জলের উপর লাফাইয়া উঠিয়া ছড়া হইতে ধান ছিঁড়িয়া উদরস্থ করে।

কই মাছের মুখের সামনে কতকগুলি ধারালো দাঁত ছাড়াও উপরের ঠোঁটের দুইধারে বাইরের দিকে সাঁড়াশির মত বাঁকানো দুইটি তীক্ষ্ণ দাঁত আছে। শত্রুকে আঘাত করিবার ইহাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। সাঁড়াশির মত এই দাঁত দুইটি পাশের দিকে সামনে-পিছনে নড়াচড়া করিতে পারে। কই মাছকে হাতে ধরিয়া তুলিলেই দেখা যায়, সে তাহার সাঁড়াশির মত দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে। অনেক সময় দাঁতে কামড়াইয়া কাপড়চোপড়ে শক্তভাবে আটকাইয়া থাকে।

কই মাছের আর একটা অদ্ভুত স্বভাব দেখা যায়। শত্রুর কবলে পড়িলে বা কোন কিছুতে বাধা পাইলে ইহারা কান্‌কোর ঢাকনাটাকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই স্বভাবের সুযোগ লইয়াই লোকে অতি সহজ উপায়ে কইমাছ শিকার করিয়া থাকে। জালে কইমাছ ধরিবার জন্য বিশেষ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। বড় ফাঁকওয়ালা এক প্রস্থ জাল জলস্রোতের আড়াআড়িভাবে পর্দার মত ঝুলাইয়া রাখা হয়। জালের ছিদ্রের মধ্য দিয়া মাথাটা সহজেই গলিয়া যায়—কিন্তু শরীরটা চওড়া বলিয়া গলিয়া যাইতে পারে না। এরূপে বাধা পাইয়া সে কান্‌কোর ঢাকনা প্রসারিত করিয়া রাখে; ফলে আর জালের বন্ধন ছাড়িয়া বাহির হইতে পারে না। জাল তুলিলেই দেখা যায়–জালের ছিদ্রের মধ্যে অনেক কইমাছ এখানে সেখানে আটকাইয়া রহিয়াছে। কীটপতঙ্গ শিকারের লোভে কইমাছ কচুরি পানার মধ্যেও বিচরণ করে। দলসুদ্ধ কচুরিপানা টানিলেও এই কারণে কই মাছ ধরা পড়ে।

শ্রীরাণী ভট্টাচার্য (প্রথম বার্ষিক শ্রেণী)

শ্রীনিবাস রামানুজন, এফ. আর. এস.

১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এরোদ নামক স্থানে এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে রামানুজন জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর বয়সেই তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হয়। নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করবার সময় থেকেই গণিতের প্রতি তাঁর একটা প্রবল আসক্তি দেখা যায়। বয়সে বালক হলে কি হয়—সেই বয়সেই গাণিতিক শূন্য এবং কল্পিত সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর নানাবিধ প্রশ্নে শিক্ষকেরা বিব্রত হয়ে উঠতেন।

১৯০৩ সালে কুম্বকোনম টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক্যুলেশন পাশ করে তিনি কুম্বকোনম গভর্ণমেণ্ট কলেজে এফ, এ, ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ভর্তি হলে কি হবে—গণিত শাস্ত্রের প্রতি তাঁর ছিল একটা মজ্জাগত অনুরাগ; ফলে পাঠ্যতালিকার অন্য সব বিষয় ছেড়ে তিনি গণিতের আলোচনাতেই ব্যাপৃত থাকতেন। এই অসাধারণ গণিত-অনুরাগের ফল তাঁকে হাতে হাতেই পেতে হলো--এফ, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন খুব শোচনীয়ভাবেই।

পরীক্ষায় ফেল করবার পর প্রায় বছর পাঁচেক ধরে তিনি নানাস্থানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা ছাড়েননি। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে গণিতশাস্ত্রের আলোচনা পুরাদমেই চলতে থাকে। ১৯১০ সালে মাদ্রাজে গিয়ে উপস্থিত হন—সঙ্গে মোটা মোটা ছুখানা নোট বুক। নোটবুক ছুখানা গণিত সম্পর্কিত তাঁর গবেষণার ফলাফলে ভর্তি। জন কয়েক বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় সেখানে তিনি হার্বার ট্রাষ্ট অফিসে একটা কেরাণীগিরির চাকরী যোগাড় করতে সক্ষম হন। চাকরি পাওয়ার ফলে তাঁর মাদ্রাজে থাকা সম্ভব হয়। সেখানে গণিত সম্পর্কীয় পুস্তক এবং সাময়িক পত্রাদি পাওয়ার সুযোগ ঘটায় অব্যাহত গতিতে তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯১২ সালে হঠাৎ একদিন একটি অমীমাংসিত গাণিতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হার্ডির (জি, এইচ,) মন্তব্য নজরে পড়ে। রামানুজন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করে হার্ডির সঙ্গে পত্র ব্যবহার সুরু করেন। হার্ডিকে তিনি ক্রমিক ভগ্নাংশ, সংখ্যাতত্ত্বে ইলিপ্‌টিক ফাংসান প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ শতাধিক ফলাফলও লিখে জানান। রামানুজনের এই দুরূহ জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানের নিখুঁৎ এবং বিস্ময়কর সুক্ষ্ম প্রণালী দেখে হার্ডি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। তাঁর অপূর্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে হার্ডি তাঁকে তাঁর গবেষণার অন্যান্য ফলাফল জানাতে অনুরোধ করেন। তাঁর বিবিধ গবেষণার বিষয়, বিশেষ করে Definite Integrals, Elliptic Functions এবং সর্বোপরি Theory of partitions দেখে তিনি বুঝলেন—রামানুজন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ। হার্ডি তখন তাঁকে কেম্ব্রিজে আসবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। ইতিমধ্যে গাণিতিক প্রতিভার জন্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে একটি গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করেন। এ সময়ে মিঃ নেভিল (ই, এইচ,) বিশ্ববিদ্যালয়-বক্তৃতাবলী প্রদানের জন্যে মাদ্রাজে আসেন। হার্ডি

তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করে জানান—কেম্ব্রিজে ফিরে আসবার সময় তিনি যেন রামানুজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তাঁরই চেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড হিসেবে তিন বছরের জন্যে বিশেষ বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে রামানুজন বিলাতে পদার্পণ করেন। কেম্ব্রিজে হার্ডি তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। হার্ডি এবং লিটল্‌উডের সহায়তায় গণিত সম্বন্ধীয় সাময়িক বিলাতী পত্রিকাসমূহে রামানুজনের গবেষণার বিষয় প্রকাশিত হতে থাকে। কেম্ব্রিজে তাঁকে রিসার্চ ডিগ্রি দেওয়া হয়। তাঁর গাণিতিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৭ সালে বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি তাঁকে সভ্য মনোনীত করেন। ১৯১৮ সালে তাঁকে ট্রিনিটির ফেলোসিপ দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

এ সময় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আরও পাঁচ বছরের জন্যে বিনাসর্তে বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড হিসেবে তাঁর বৃত্তি মঞ্জুর করেন। ১৯১৭ সাল থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। স্বাস্থ্য ভঙ্গের দরুণ ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং কাবেরীর তীরবর্তী কোডুমুডি গ্রামে বাস করতে থাকেন। ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল এখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

—গ—

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী

গত ১১ই এপ্রিল' ১৯৫০ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়ন বিভাগের বক্তৃতাগৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন সভ্য এই সভায় যোগদান করেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শোক সংবাদ

১। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য ৺ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশ এবং সাধারণ সভ্য অধ্যাপক ৺ বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন এবং পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত সদস্যগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

কর্মসচিবের বিবৃতি

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর গত ১৯৪৯ সালের পরিষদের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান বছরে সভ্যগণের অধিকতর সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করিয়া পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্যের আশা ব্যক্ত করেন।

২। তারপর কর্মসচিব মহাশয় গত ১৯৪৯ সালে পরিষদের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব ও ১৯৫০ সালের আনুমানিক বাজেট সভায় উপস্থিত করেন। যথোচিত আলোচনার পর পরীক্ষিত হিসাব ও আনুমানিক বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতির ভাষণ

সভাপতি মহাশয় অতঃপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে তিনি পরিষদের কার্যাবলী ও আশা-আকাঙ্খার বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন; এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বিষয়গুলির আর পুনরুল্লেখ না করিয়া পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে সভ্যগণের সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানান।

কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

৩। পরিষদের বিগত কার্যকরী সমিতির সুপারিশ ও সভ্যগণের মনোনয়নপত্র বিবেচনা করিয়া কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের কার্যকরী সমিতি ও কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলীর বিভিন্ন পদে যথারীতি নির্বাচিত হন :—

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
" —শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন
" —শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
কর্মসচিব—শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
সহঃ কর্মসচিব—শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়
" —শ্রীদেবীপ্রসাদ বর্মন
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

কার্যকরী সমিতির সভ্য :—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
শ্রীভবেশচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুকুমার বসু
শ্রীরমণীমোহন রায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅরুণকুমার সেন
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
শ্রীজীবনময় রায়
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাব পরীক্ষক

৪। পরিষদের গত বছরের সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বর্ষশেষে হিসাব-পরীক্ষার সময় কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার সহযোগিতা না পাইয়া পরিষদের সভাপতি মহাশয় কার্যপরিচালনার জন্য গত বছরের হিসাব পরীক্ষার কাজে রেজিষ্টার্ড অডিটর শ্রীহিমাংশুশেখর ঘোষ মহাশয়কে নিয়োজিত করেন। সভাপতি মহাশয়ের এই নিয়োগ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর ১৯৫০ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য পূর্বোক্ত রেজিষ্টার্ড অডিটর শ্রীহিমাংশু শেখর ঘোষ মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

এইরূপ স্থির হয় যে, বর্তমান বর্ষের পরীক্ষিত হিসাবপত্র আগামী সাধারণ অধিবেশনে উপস্থাপনের পূর্বে পরিষদের সাধারণ সভ্য শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন মহাশয়কে দেখাইয়া লইলে ভাল হয়।

সারস্বত সংঘ

পরিষদের সারস্বত সংঘের কর্মসচিব শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় গত বছরে সারস্বত সংঘের কার্যাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করেন। সংঘের উদ্যোগে লোকপ্রিয় বক্তৃতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোকচিত্রাদির কার্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। আর্থিক অসুবিধা ও উপযুক্ত কর্মীর অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া সংঘসচিব মহাশয় সভ্যগণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন।

এই সভায় বর্তমান বছরের জন্য শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় সংঘসচিব পদে পুনর্নির্বাচিত হন। সারস্বত সংঘের বিভিন্ন শাখার সভ্যগণ বর্তমান বর্ষেও যথাযথরূপে সর্বসম্মতিক্রমে বহাল রহিলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত সভ্যগণ এই বছর সারস্বত সংঘের নূতন সভ্যরূপে নির্বাচিত হন—

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পদার্থবিদ্যা
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন—পদার্থবিদ্যা
শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়—কৃষিবিজ্ঞান

অনুমোদক মণ্ডলী

উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য লইয়া অনুমোদকমণ্ডলী গঠন করা হয় :—

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত বছরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য পরিষদের সভাপতি ও কর্মসচিব মহাশয়কে উপস্থিত সভ্যবৃন্দ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভার কার্য শেষ হয়।

স্বাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি) স্বাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (কর্মসচিব) স্বাঃ অমিয়কুমার ঘোষ
স্বাঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বাঃ রবীন বন্দ্যোপাধ্যয় স্বাঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ | মে—১৯৫০ | পঞ্চম সংখ্যা

ইস্পাত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

ইস্পাত কাহাকে বলে

লৌহ এবং ইস্পাত যে স্বতন্ত্র পদার্থ একথা অনেকেই অবগত নহেন। লৌহ অষ্ট ধাতুর অন্যতম। ইস্পাতকে ধাতু বলা যায় না। লৌহের সহিত অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং ইহাকে মিশ্র কিংবা সঙ্কর ধাতু বলা হয়। লৌহের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, উহা উচ্চ তাপে অঙ্গারকে দ্রবীভূত করিয়া শোষণ করিয়া লইতে পারে। লৌহের গলণাঙ্ক ১৫৩০° সেন্টিগ্রেড। সুতরাং লৌহ যখন গলিতে আরম্ভ করে তখন ইহা পারিপার্শ্বিক অঙ্গারজাত পদার্থ হইতে অঙ্গার শোষণ করিয়া লইতে থাকে। অঙ্গার লৌহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আয়রন কার্বাইড উৎপন্ন করে। এই কার্বাইডকে সিমেণ্টাইটও বলা হইয়া থাকে। সিমেণ্টাইট অত্যন্ত কঠিন পদার্থ। ইস্পাতের কাঠিন্যের জন্য দায়ী এই সিমেণ্টাইট। গলিত লৌহ যখন কঠিন পদার্থে পরিণত হয় তখন এই সিমেণ্টাইট উহার মধ্যে সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া ইহাকে কঠিন করিয়া তোলে। লৌহ অবশ্য যত ইচ্ছা অঙ্গার দ্রবীভূত করিতে পারে না। ইহা বড়জোর শতাংশের ৪.৫ ভাগ মাত্র অঙ্গারকে দ্রবীভূত করিতে পারে। আবার এই অঙ্গারের সবটাই লৌহের সহিত যুক্ত হইয়া আয়রন কার্বাইড উৎপন্ন করে না। মাত্র ১.৫-১.৬ ভাগ মাত্র যুক্ত হয়। বাকীটুকু মুক্ত গ্র্যাফাইট রূপে লৌহের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় লৌহকে ইস্পাত না বলিয়া ঢালাই লোহা বা চীনে লোহা বলা হয়। প্রকৃত ইস্পাতের মধ্যে মুক্ত গ্র্যাফাইট থাকিতে পারে না—থাকিলে লৌহ ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। অঙ্গার যাহা থাকে তাহা লৌহের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে—ইস্পাত, লৌহ এবং অঙ্গার মিশ্রিত ধাতু ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য ইহার মধ্যে সিলিকন, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি অন্যান্য পদার্থ থাকে বটে, তবে তাহাদের উপস্থিতি অঙ্গারের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নহে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, অঙ্গার ব্যতীত কোন ইস্পাত প্রস্তুত হইতে পারে না। অঙ্গারের পরিমাণের উপর ইস্পাতের গুণাগুণের তারতম্য নির্ভর করে। লৌহ বলিলে বুঝিতে হইবে, উহা অঙ্গার মুক্ত বিশুদ্ধ ধাতু বিশেষ।

ইতিহাস

বর্তমান যুগে ইস্পাতের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইলেও কবে যে ইস্পাতের আবিষ্কার হইয়াছিল সে কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে এই পদার্থটির ব্যবহার যে অতি প্রাচীন কালেও অজ্ঞাত ছিল না—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ অধুনা ইস্পাত-নির্মিত এমন সব অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই থাকিতে পারে না। অতি প্রাচীন কালে কঠিন পাহাড় কাটিয়া যে সব ভাস্কর্য এবং কারুকার্য সম্পন্ন হইত তাহার জন্য নিশ্চয়ই কোমল প্রকৃতির লৌহের অস্ত্র ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ বিশুদ্ধ লৌহে প্রস্তুত অস্ত্র সাহায্যে এই সব কঠিন প্রস্তর কাটা সম্ভব নহে। হেরোডোটাস বলিয়াছেন যে, মিশরের পিরামিড নির্মাণে ব্যবহৃত লৌহের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এই পিরামিডের রাজ্য হইতে এমন একখণ্ড লৌহাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহার বয়স অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসরের কম নহে। ইহার মধ্যে সামান্য অঙ্গারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারতে যে সব অস্ত্র-শস্ত্রের উল্লেখ আছে তাহাদের বর্ণনা হইতেই বোঝা যায় যে, এই সব পদার্থ বিশুদ্ধ লৌহ হইতে নির্মিত হয় নাই। এমন একটি পদার্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে যাহা লৌহ অপেক্ষা অনেক কঠিন। সুতরাং বলা যায় যে, লৌহ এবং ইস্পাতের ব্যবহার মহাকাব্যের যুগে ভালভাবেই জানা ছিল। তবে সে যুগে কি ভাবে যে ইস্পাত প্রস্তুত করা হইত সে খবর জানা যায় না।

উট্জ, দামাস্কাস্ এবং টলেদো ইস্পাত

প্রাচীন কালের ইস্পাতের মধ্যে ভারত-বর্ষের উট্জ ইস্পাত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পরেই দামাস্কাস্ ইস্পাত এবং স্পেন দেশীয় টলেদো ইস্পাতের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের ‘পান’ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য ধরনের। ইহারা সমস্তই ক্রুসিবল্ পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাতের অনুরূপ। এই ইস্পাতের মধ্যে টাংস্টেন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, এমন কি আধুনিক যুগের হাইস্পীড ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য যে যে পদার্থ ব্যবহৃত হয় সেই সব পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

উট্জ ইস্পাত অতি উচ্চাঙ্গের। অ্যারিষ্টটলের মতে ইহা খৃঃ পূঃ ৩৫০ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের পার্বত্য জাতির মধ্যে আজও এই ধরনের ইস্পাত প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী লৌহাশ্রিত পদার্থ হইতে মৃত্তিকা নির্মিত এক প্রকার বিশেষ ধরনের চুল্লীর সাহায্যে লৌহ নিষ্কাশিত করা হয়। এই ভাবে লৌহের একটি নমনীয় তাল পাওয়া যায়। নমনীয় তালটিকে হাতুড়ির সাহায্যে পিটাইয়া ইহার মধ্যস্থিত আবর্জনা—লৌহাশ্রিত পদার্থের অংশবিশেষ নিঙরাইয়া বাহির করিয়া লয়। এই ভাবে প্রাপ্ত তালটিকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া পুনরায় হাতুড়ির সাহায্যে পেটাই করা হয়। তারপর এই টুকরাগুলিকে (প্রায় আধসের ওজনের মত) একটি বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা নির্মিত মুচির মধ্যে লইয়া খুব মিহি কাঠের গুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং সমস্ত পদার্থটির উপর কতকগুলি কাঁচা পাতা ঢাকা দিয়া মুচিটির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এইবার মাটির মধ্যে একটি চুল্লী নির্মাণ করিয়া মুচিটিকে উহার মধ্যে রাখিয়া হাপরের সাহায্যে সজোরে বাতাস করিতে থাকে। এইভাবে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর মুচির মধ্যস্থ সমগ্র পদার্থটি সম্পূর্ণরূপে গলিয়া গেলে মুচিটিকে ঠাণ্ডা করিয়া ভাঙিয়া ফেলা হয়। প্রক্রিয়াটি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইলে একটি তাল পাওয়া যায়। উহার উপরিভাগের ‘আঁশ’ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মসৃণ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

খুব প্রাচীনকাল হইতেই উট্জ ইস্পাত তরবারি নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইত। পূর্বেই বলা হইয়াছে

যে, এই ইস্পাতে অতি সুন্দররূপে 'পান' ধরাইতে পারা যায়। শোনা যায় যে, সঠিকভাবে পান-ধরান ইস্পাত নির্মিত তরবারির সাহায্যে একটুকরা লোহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেও ইহার ধারের কোনরূপ ক্ষতি হইত না। কিংবদন্তী আছে যে, শূন্যে রেশমের সুতা উড়াইয়া দিয়া এই তরবারির সাহায্যে উহাকে দুই টুকরা করিয়া কাটিতে পারা যাইত। ভারতবর্ষে যে যুগে উট্‌জ ইস্পাত প্রস্তুত হইত সে যুগের পূর্বে যে পৃথিবীর অন্য কোথাও ইস্পাত প্রস্তুত হইত না, এমন কথা বলা যায় না। শোনা যায় চীন দেশে ক্রুসিবলে প্রস্তুত এক প্রকার ইস্পাত পাওয়া যাইত; তাহা নাকি ভারতীয় ইস্পাত অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী জানা যায় নাই। তবে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ভারতীয় প্রণালী হইতে ভিন্ন ধরনের নহে। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে, ভারতীয় এবং চীন দেশীয় লোকেরা উভয় দেশের মধ্যে অবস্থিত অধিত্যকার বাসিন্দাদের নিকট হইতে এই বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছিল।

দামাস্কাস ইস্পাতও এক প্রকার ক্রুসিবল প্রস্তুত ইস্পাত। অন্যান্য ইস্পাত হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় উহার উপরি ভাগের আকৃতি হইতে। উহার উপরি তলে শিরার আকারে এমন কতকগুলি রেখা দেখা যায় যাহা সত্যই উহার দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। এই ইস্পাতে লৌহ এবং ইস্পাতের খুব পাতলা পাতলা পাতগুলি পাশাপাশি থাকিয়া এইরূপ বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক সমতলের সৃষ্টি করে; যেন ঝাল দেওয়া হইয়াছে এইভাবে উহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। সিরিয়ার অন্তর্গত পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সহর দামাস্কাসে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহা দামাস্কাস ইস্পাত নামে বিখ্যাত। ক্রুসেডারদের দ্বারা এই ইস্পাতের গুণাগুণ সারা পাশ্চাত্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে স্পেন দেশের অন্তর্গত টলেদো সহরে এই ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়। টলেদোর প্রস্তুত তরবারির খ্যাতি দামস্কাসে প্রস্তুত ইস্পাতের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাদের পান-ধারণ ক্ষমতা ছিল উট্‌জ ইস্পাতের মত। এমন কি, সময় সময় ইহাকে গুটাইয়া আজকালের স্প্রিংের মত বাক্সবন্দীও করিতে পারা যাইত। প্রাচীনকালের ইস্পাতের গুণাগুণ হইতে বোঝা যায় যে, তাহারা সত্য সত্যই সে যুগ এবং এ যুগেরও বিস্ময়ের বস্তু। উহারের পান-গ্রহণ করিবার যে অপরূপ ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইস্পাত আধুনিক যুগেও প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। এই সব ইস্পাত হইতে তখনকার দিনে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাদের সাহায্যে ধাতব পদার্থ কাটা হইত।

তবে প্রাচীন কালের ইস্পাতের গুণাগুণ সব সময়ে যে একই প্রকারের হইত তাহা নহে, উহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও প্রকাশ পাইত। এইরূপ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কারণ সেযুগে যেসব পদার্থ ব্যবহৃত হইত তাহাদের প্রকৃতি সব সময়ে একই ধরনের হইত না। অধিকন্তু তাহাদের প্রস্তুত-প্রণালীর মধ্যেও প্রভেদ থাকিত। কোন কোন খনিজ পদার্থের মধ্যে এমন সব মৌলিক পদার্থ থাকিত যাহা অপরের মধ্যে থাকিত না। সে ক্ষেত্রে ইস্পাতের গুণাগুণ বিভিন্ন হইত। আবার ধাতু নিষ্কাশন করিবার সময় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত তাহাদের কোন কোনটি হয়ত অঙ্গারের সংস্রবে অনেকক্ষণ থাকিত। ফলে উহারা বেশী পরিমাণ অঙ্গার শোষণ করিয়া লইত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক ইস্পাতের গুণাগুণ সব সময়ে একই প্রকারের হইয়া থাকে।

ইস্পাতের উৎকর্ষ সাধন

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ধাতব পদার্থ কাটিতে

ইস্পাত ব্যবহৃত হইত। ক্রমশই এই কার্য সম্পন্ন করার জন্য মেসিনের সাহায্য লওয়া হইল। কিন্তু যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজ করা হইত তাহাদের উৎকর্ষ সাধন করা অপেক্ষা মেসিনের উৎকর্ষ সাধনে সকলে সচেষ্ট হইলেন। অতএব ইস্পাতের পরিবর্তে মেসিনেরই যত কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। ইস্পাতের প্রকৃতি পূর্বের মতই থাকিয়া গেল। তাহার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইল না। কিন্তু এই ভুল ধরা পড়িল। দেখা গেল যে, যন্ত্রপাতিগুলির কাটিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। ধাতব পদার্থ কাটিবার সময় কর্তন-যন্ত্রের সহিত ধাতব পদার্থের ঘর্ষণের ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপকে শোষণ করিয়া লইয়া যন্ত্রটি ক্রমশই উত্তপ্ত হইতে থাকে। ইহার উপর যদি কাজটিকে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করিবার চেষ্টায় গতিবেগ বৃদ্ধি করা যায় তবে ঘর্ষণজনিত উত্তাপের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, যন্ত্রটির 'পান' নষ্ট হইয়া যায়। ফলে উহা ভোঁতা হইয়া পড়ে। কাটিবার গতিবেগ বৃদ্ধির সহিত ভোঁতা হইবার ক্ষমতা ঠিক জ্যামিতিক হারে বাড়িয়া চলে। সুতরাং, বর্তমান যুগে—যাহার লক্ষ্য হইতেছে গতিবেগ—এইরূপ যন্ত্রের উপযোগিতা নিতান্ত কম। এদিকে এতদিন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। সুতরাং কয়েক হাজার বৎসরের মধ্যে এইদিক দিয়া ইস্পাতের উৎকর্ষতাও বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই।

প্রাচীন যুগে যেভাবে ইস্পাত প্রস্তুত হইত, অল্পদিন পূর্বেও ঠিক অনুরূপ প্রণালীতেই ইস্পাত প্রস্তুত হইত। অনেকদিন হইতে এ কথা জানা ছিল যে, লৌহের পাতকে যদি অঙ্গারের সহিত একত্রে বাক্সবন্দী করিয়া উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে লৌহের পাত অঙ্গার শোষণ করিয়া লইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে উহার উপরিভাগে এক প্রকার গুটি গুটি দাগ পড়িয়া যায়। এইজন্য ইহাকে ব্লিষ্টার লৌহ বা গুটি-পড়া লৌহ বলা হয়। এই লৌহ ইস্পাত নামে অভিহিত হইলেও আসলে ইহার উপরি-ভাগের ত্বকটুকুকে মাত্র ইস্পাত বলা যাইতে পারে, ভিতরের অংশটুকু নহে। কারণ অঙ্গার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া সেখানকার লৌহের সহিত মিলিত হইতে পারে না। এই ইস্পাতকে হাতুড়ির সাহায্যে পেটাই করিতে থাকিলে ইহার গুণের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং ইহাকে যন্ত্র প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সহস্রবার পেটাই করিয়াও ইহাকে একেবারে বেদাগী করিতে পারা যায় না। কিন্তু এমন একসময় আসে যখন এই দাগেরও অবসান ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হাণ্টস্‌ম্যান এমন এক প্রণালী আবিষ্কার করেন যাহার সাহায্যে দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা যাইত এবং ইস্পাতের আকৃতি এবং প্রকৃতি সর্বত্র একই রকমের হইত। এই প্রণালীটিকে হাণ্টস্‌ম্যান অন্যান্য ব্যবসায়ীর নিকট হইতে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। এই গোপনীয়তা প্রকাশ পাইয়া গেল। কোন এক ব্যবসায়ী একদিন ঝড়ের রাত্রে আশ্রয় গ্রহণের অছিলায় তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়া এই প্রক্রিয়াটি শিখিয়া গেলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, ব্লিষ্টার বা দাগী ইস্পাতকে একটি মুচির মধ্যে গলাইয়া লইয়া এইরূপ সুন্দর ইস্পাত প্রস্তুত করা হইতেছে। অন্য যে প্রক্রিয়াটি তিনি লক্ষ্য করিলেন তাহা নূতন কিছু নয়। উহা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কারণ পৃথিবীর কোন কোন অংশে মুচিতে করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত পুরাতন প্রথা। হাণ্টস্‌ম্যানের পদ্ধতির দ্বারা প্রস্তুত ইস্পাতকে ক্রুসিবল ষ্টীল বা মুচিতে প্রস্তুত ইস্পাত বলা হয়। এইভাবে প্রস্তুত ইস্পাত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার ব্যাপারে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার পরের আবিষ্কার হইতেছে মাসেট ষ্টীল। মাসেটের প্রণালীতে ব্লিষ্টার ষ্টীলের পরিবর্তে ইস্পাতের

'বার' বা পরিত্যক্ত ইস্পাতের অংশগুলিকে অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুচির মধ্যে গলান হয়। অবশ্য এইভাবে যে ইস্পাত পাওয়া যায় তাহা ভারতীয় ইস্পাতের সহিত কোন অংশেই তুলনীয় নহে। এমন কি, হাণ্টস্‌ম্যানের প্রস্তুত ইস্পাতের মতও উচ্চাঙ্গের নহে। ক্রুসিবল পদ্ধতির পর ইস্পাত প্রস্তুতের নানাপ্রকার পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ফলে, ওপেন হার্থ, বেসিমার, বৈদ্যুতিক প্রণালী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইল। এস্থলে ইহাদের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অঙ্গারের পরিমাণের তারতম্যের উপর ইস্পাতের গুণাগুণের অনেক পার্থক্য হইয়া থাকে। লৌহের মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ শতাংশের ০'১৫—১'৫০ ভাগ হইলে তাহাকে বলা হয় ইস্পাত। ১'৫০—২'৫০ ভাগের মধ্যে হইলে তাহাকে বলা হয় আধা ঢালাই লোহা; ২'৫০ ভাগের উর্ধে এবং ৪'৫০ ভাগের মধ্যে হইলে বলা হয় ঢালাই লোহা বা চীনা লোহা।

অঙ্গারের পরিমাণ অনুযায়ী ইস্পাতকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) নরম ইস্পাত—ইহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে শতকরা ০'১৫—০'৩০ ভাগ। ইহা খুব সাধারণ নরম প্রকৃতির ইস্পাত। কড়ি, বরগা, রেলিং, শিক এবং অন্যান্য সাধারণ পদার্থ এই ইস্পাত দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (২) মধ্যমান অঙ্গারবিশিষ্ট ইস্পাত বা মধ্যমান ইস্পাত—ইহার মধ্যে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে শতকরা ০'৩০—০'৭০ ভাগ। ইহা অপেক্ষাকৃত শক্ত। ইহা হইতে অন্যান্য দামী ও মজবুত জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। রেল লাইন যে ইস্পাতে প্রস্তুত করা হয় তাহাতে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে প্রায় ০'৬০ ভাগ। (৩) উচ্চ অঙ্গার বিশিষ্ট ইস্পাত—ইহার মধ্যে শতকরা ১'৫০ ভাগ অঙ্গার থাকে। ইহা অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির ইস্পাত। ইহার দ্বারা ভ্রমর, ক্ষুর, করাত ইত্যাদি নানা প্রকার যন্ত্রপাতি নির্মিত হইয়া থাকে।

(৪) এই তিন প্রকার ইস্পাত ছাড়াও মিশ্র বা সঙ্কর ইস্পাত আছে। ইহা আধুনিক যুগের অভিনব আবিষ্কার। ইস্পাতের সহিত নিকেল, ক্রোমিয়াম, মলিবডিনাম, টাংস্টেন, ভ্যানেডিয়াম, কোবাল্ট প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু মিশ্রিত করিয়া ইহা উৎপন্ন করা হয়। এই ইস্পাত অত্যন্ত দামী, বিশেষ বিশেষ কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধাস্ত্র, উড়ো-জাহাজ ও জাহাজের অংশবিশেষ, বড় বড় পুল ও নানাপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে এই সব ইস্পাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রস্তুত প্রণালী

ঢালাই লোহা অথবা রট আয়রন উভয় পদার্থ হইতেই ইস্পাত প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ঢালাই লোহায় অঙ্গারের পরিমাণ বেশী। সুতরাং ইহাকে অঙ্গার বিমুক্ত করিয়া ইস্পাতে পরিণত করা হয়। কিন্তু রট আয়রনে অঙ্গারের পরিমাণ থাকে কম। সুতরাং ইহার সহিত অঙ্গার মিশ্রিত বা যুক্ত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। তবে রট আয়রনের মধ্যে ভেজাল কম থাকার দরুণ ইহা হইতে যে ইস্পাত উৎপন্ন হয় তাহা খুব নির্ভরযোগ্য। ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। যথা,—(১) সিমেণ্টেসন প্রণালী (২) ক্রুসিবল প্রণালী (৩) বৈদ্যুতিক প্রণালী (৪) অ্যাসিড বেসিমার এবং বেসিক বেসিমার প্রণালী (৫) সিমেন-মার্টিন প্রণালী।

১। সিমেণ্টেসন প্রণালী

রট আয়রনের বিশুদ্ধ পাতগুলিকে (সুইডিস লোহা খুব বিশুদ্ধ) অগ্নিসহনক্ষম ইষ্টক নির্মিত বাক্সের মধ্যে কাঠ কয়লার দ্বারা বোঝাই করিয়া ৮—১১ দিন ধরিয়া ১০০০° তাপে উত্তপ্ত করা হয়। কি ধরনের যে

প্রতিক্রিয়া হয় তাহা জানা যায় না। তবে এই সময়ের মধ্যে পাতগুলি ধীরে ধীরে অঙ্গার শোষণ করিয়া লইয়া ইস্পাতে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ কাঠ পুড়িয়া প্রথমে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন মনোক্সাইড লৌহ কর্তৃক শোষিত হইয়া থাকে। এই কার্বন মনোক্সাইড পরে কার্বন ডাই-অক্সাইডে এবং অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গত হইয়া আসে এবং কাঠকয়লার সংস্পর্শে কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। অঙ্গার লৌহের মধ্যে থাকিয়া যায়। কার্বন মনোক্সাইড পুনরায় লৌহ কর্তৃক শোষিত হইয়া থাকে। এইভাবে চক্রটি আবর্তিত হইতে থাকে। ($CO \rightarrow CO_2 \rightarrow CO$ ......)। সর্বশেষে চুল্লী ঠাণ্ডা করিয়া পাতগুলিকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় বলিয়া পাতগুলির গায়ে অসংখ্য ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এই জন্য ইহাকে 'ব্লিষ্টার ষ্টীল' বলা হয়।

এইভাবে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয় তাহা খুব বিশুদ্ধ ইস্পাত বটে, তবে ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এইজন্য এই প্রণালীটি ক্রমশ লুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। ক্রুসিবল্ প্রণালী

এই প্রণালীতে বিশুদ্ধ রট আয়রনের পাত-গুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিসহনক্ষম মুচির মধ্যে গলান হয়। গলিত লৌহ অঙ্গার শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে ইস্পাতে পর্যবসিত হয়। কতখানি লৌহে কি পরিমাণ অঙ্গারের প্রয়োজন, তাহা অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং সেইভাবেই লৌহের সহিত অঙ্গার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ক্ষুর, উখা, প্রভৃতি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা হয়।

৩। বেসিমার প্রণালী

বেসিমার প্রণালী আবিষ্কার হওয়াতে ইস্পাত জগতে যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে। এই প্রণালীর সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যে দশ টন ইস্পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং ইহাতে যে খরচা হয় তাহা পূর্ববর্তী প্রণালীগুলির তুলনায় অতি নগণ্য।

এই প্রণালীটির মূল রহস্য হইতেছে এই যে, যদি একটি বিশেষ ধরনের পাত্রের মধ্যে গলিত পিগ আয়রনের মধ্য দিয়া বাতাসকে সবেগে চালিত করা যায়, তাহা হইলে পিগ আয়রনের সহিত সংশ্লিষ্ট ভেজাল পদার্থগুলি 'অক্সিডাইজড' হইয়া উহাকে রট-আয়রনে বা পেটা লৌহে পরিণত করে। তারপর এই রট আয়রনে স্পাইজেল নামক পদার্থের সাহায্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার-প্রয়োগ করিয়া ইহাকে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। স্পাইজেল একপ্রকার ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ। লৌহ এবং ম্যাঙ্গনিজকে একত্রে গলাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। যে বিশেষ ধরনের পাত্রে এই প্রক্রিয়াটি করা হয় তাহাকে কন্‌ভার্টার বলে। ইহা রট আয়রনের পাতের দ্বারা প্রস্তুত ডিম্বাকৃতি পাত্র-বিশেষ। ইহার অভ্যন্তর ভাগে অগ্নিসহনশীল মৃত্তিকার আস্তরণ দেওয়া থাকে। দুইপাশে অবলম্বনের সাহায্যে পাত্রটিকে এমনভাবে বসান হয় যে, ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন অবস্থায় ঘুরাইয়া আনিতে পারা যায়। ইহার তলদেশে কতকগুলি ছিদ্র থাকে। এইসব ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাতাসকে ইহার অভ্যন্তরে সবেগে চালনা করা যাইতে পারে। প্রথমে পাত্রটিকে একপাশে কাৎ করিয়া মারুৎ-চুল্লী হইতে প্রায় দশ টন গলিত পিগ আয়রন ইহার মধ্যে ভর্তি করা হয়। সেই সঙ্গে ইহার মধ্য দিয়া বাতাসকে সবেগে চালনা করা হয়। এই অবস্থায় কন্‌ভার্টারটিকে সোজাভাবে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। প্রবল বাতাসের দাপটে পিগ আয়রনের মধ্যস্থ অঙ্গার, সিলিকন, গন্ধক, ম্যাঙ্গানিজ, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি পদার্থগুলি যোগ-ধর্মান্বিত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে

তাপের মাত্রা বাড়িয়া যায়। অঙ্গার হইতে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং উহা কনভার্টারের মুখে আসিয়া জ্বলিতে থাকে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলন্ত লোহার স্ফুলিঙ্গ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। গন্ধক পুড়িয়া সালফার ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় এবং উহা বাতাসের সহিত মিশিয়া পলাইয়া যায়। অন্যান্য অক্সাইডগুলি পাত্রটির আস্তরণের সহিত মিশিয়া গাদের সৃষ্টি করে। পাত্রটির মুখে যতক্ষণ অগ্নিশিখাটি জ্বলিতে থাকে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়া ঠিক সমভাবেই চলিতেছে। কিন্তু উহা অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় যে, প্রতিক্রিয়াটি শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন কনভার্টারটিকে আর একবার কাৎ করিয়া বাতাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে কনভার্টারের মধ্যস্থিত পিগ আয়রন, রট আয়রনে পরিণত হয়। ইহাকে ইস্পাতে পরিণত করিতে হইলে ঠিক পরিমাণমত স্পাইজেল বা স্পাইজেলেজ্‌ম্‌ টুকরা বা ডেলার আকারে ইহার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। ইহা লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ এবং অঙ্গারযুক্ত পদার্থ। ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্গার আছে। এইবার সমস্ত পদার্থটিকে ভালভাবে মিশ্রিত করিবার জন্য আর একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য পাত্রের মধ্য দিয়া বাতাস চালনা করা হয়। এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ১০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ইহাকে কনভার্টার হইতে ঢালাই পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

৪। অ্যাসিড এবং বেসিক প্রণালী

কনভার্টারের ভিতরের আস্তরণটি যদি বালি জাতীয় পদার্থের হয় তাহা হইলে এই কনভার্টারের দ্বারা যে ইস্পাত প্রস্তুত হয় তাহাকে বলা হয় অ্যাসিড ইস্পাত এবং প্রণালীটিকে বলা হয় অ্যাসিড প্রণালী। অ্যাসিড প্রণালীর দ্বারা গন্ধক বা ফস্‌ফরাসকে অপসারণ করা যায় না। কারণ গন্ধক বা ফস্‌ফরাস অম্লাত্মক পদার্থ এবং বালি জাতীয় পদার্থের আস্তরণটিও অম্লাত্মক। সুতরাং অম্লাত্মক আস্তরণ অম্লাত্মক পদার্থের সহিত মিশিয়া গাদের সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং গন্ধক এবং ফস্‌ফরাস ইস্পাতেরই মধ্যে থাকিয়া যায়; কিন্তু আস্তরণটি যদি ক্ষারাত্মক হয় অর্থাৎ ডলোমাইট জাতীয় পদার্থের হয়, তাহা হইলে অম্লাত্মক গন্ধক এবং ফস্‌ফরাস ক্ষারাত্মক ডলোমাইটের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া ক্যালসিয়াম সালফাইড এবং ফস্‌ফাইড উৎপন্ন করে। উহারা শেষ পর্যন্ত গাদে পরিণত হইয়া অপসারিত হয়। এই প্রণালীটিকে বলা হয় ক্ষারাত্মক বা বেসিক প্রণালী এবং এইভাবে প্রস্তুত ইস্পাতকে বলা হয় বেসিক ইস্পাত। বেসিক প্রণালীর দ্বারা ইস্পাতের মধ্যস্থিত গন্ধক এবং ফস্‌ফরাসকে ইচ্ছামত অপসারিত করিতে পারা যায়।

৫। সীমেন এবং মার্টিনের 'ওপন হার্থ' প্রণালী

এই প্রণালীতে যে ফার্নেস বা চুল্লী ব্যবহৃত হয় তাহা চৌকা একটি ঘরবিশেষ। ঘরটি অগ্নিসহনশীল ইটের দ্বারা প্রস্তুত। চুল্লীটির সমুখভাগে কয়েকটি দরজা থাকে। এই দরজার মধ্য দিয়া চুল্লীর গর্ভটিকে অব্যবহার্য লোহা বা ইস্পাত, পিগ আয়রন এবং লালমাটি বা হেমেটাইট (Fe_2O_3) দ্বারা ভতি করা হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এইভাবে পূর্ণ করার ব্যাপারটিকে বলা হয় চুল্লীকে 'চার্জ' করা। চুল্লীটিকে পূর্ব হইতেই প্রডিউসার-গ্যাস জ্বালাইয়া প্রায় শ্বেতোত্তপ্ত করিয়া রাখা হয়। চার্জ করিবার পর হইতেই প্রডিউসার গ্যাসের সাহায্যে পদার্থকে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গলিয়া যায়। একটি বিশেষ ধরনের চুল্লীর মধ্যে কয়লা পোড়াইয়া বাতাসের সহযোগে প্রোডিউসার গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। ইহার মধ্যে থাকে কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন, কিছুটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং

নাইট্রোজেন। প্রোডিউসার হইতে নির্গত হইবার পর এই গ্যাস মিশ্রণটিকে ইষ্টক পরিপূর্ণ জাফ্রীকাটা গরম ঘরের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া অধিকতর উত্তপ্ত করিয়া লওয়া দরকার। এই ঘরটি মারুৎচুল্লীসংলগ্ন কুপার স্তম্ভের (লৌহ ও ইস্পাত—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জানুয়ারি, ১৯৫০) অনুরূপ কাজ করিয়া থাকে। এইভাবে পূর্বে উত্তপ্ত গ্যাস যখন চুল্লীর মধ্যে আসিয়া জ্বলিতে থাকে তখন তাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। প্রায় আধঘণ্টা অন্তর প্রডিউসার গ্যাসের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। তখন গ্যাসটি আবার অপর প্রান্তস্থিত গরম ঘরের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত হইয়া আসিয়া চুল্লীর মধ্যে জ্বলিতে থাকে এবং অব্যবহার্য গ্যাস বিপরীত প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়া প্রথমোক্ত প্রকোষ্ঠগুলিকে উত্তপ্ত করিতে থাকে। সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠগুলি (সংখ্যায় চারিটি) আসল চুল্লীর তলদেশে নির্মিত হয়। এইভাবে প্রকোষ্ঠগুলিকে উত্তপ্ত করিয়া অব্যবহার্য গ্যাসের উত্তাপকে কাজে লাগানো হয়। এইপ্রকার চুল্লীকে 'রিজেনারেটিভ' চুল্লী বলা হয়। যখন সমস্ত পদার্থটি ভালভাবে গলিয়া যায়, তখন মাঝে মাঝে লালমাটি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লালমাটির কাজ হইতেছে—ইস্পাতের অঙ্গারকে যোগধর্মান্বিত করিয়া ক্রমশই উহার পরিমাণ কমাইয়া আনা। সময় সময় হাতার সাহায্যে খানিকটা ইস্পাত তুলিয়া আনিয়া উহার অঙ্গারের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। যখনই বোঝা যায় যে, অঙ্গারের পরিমাণ ঠিক মাত্রায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখনই নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ এবং ফেরো-সিলিকন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সমস্ত পদার্থটিকে ভালভাবে নাড়িবার পর ইস্পাতকে চুল্লীর মধ্য হইতে ঢালাই পাত্রের মধ্যে ঢালিয়া ফেলা হয় এবং সেখান হইতে ছাঁচে পূর্ণ করা হয়।

বৈদ্যুতিক প্রণালী

এই প্রণালীতে বৈদ্যুতিক তাপের সাহায্যে লোহাকে গলাইয়া ইস্পাতে পরিণত করা হয়। বৈদ্যুতিক চুল্লীর আকৃতি অনেকটা উপরোক্ত কনভার্টারের অনুরূপ। ইহা পেটাই লোহার পাতের দ্বারা প্রস্তুত অর্ধ গোলাকৃতি আধার বিশেষ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ প্রথমে অগ্নিসহনক্ষম ইটের দ্বারা গাঁথিয়া তাহার উপর পোড়ান ডলোমাইটের আস্তরণ দেওয়া হয়। দুইপাশে অবলম্বের সাহায্যে চুল্লীটিকে এমনভাবে বসান হয় যে, ইহাকে যে কোন অবস্থায় ঘুরাইয়া আনিতে পারা যায়। চুল্লীটির অভ্যন্তরে দুইটি বড় বড় বিদ্যুৎবাহক অঙ্গার দণ্ড ঝুলান থাকে। ইহা-দিগকে ইচ্ছানুযায়ী উঠাইতে বা নামাইতে পারা যায়। প্রথমে অব্যবহার্য লোহা, লালমাটি এবং কিছু পরিমাণ চুনের দ্বারা চুল্লীটিকে পূর্ণ করা হয়, তারপর বিদ্যুৎবাহক দণ্ডের সাহায্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করা হয়। তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লৌহ গলিতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে লালমাটি ও চুন প্রয়োগ করা হইতে থাকে। লালমাটির কাজ হইতেছে—যে সমস্ত অব্যবহার্য ইস্পাত গলন-কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহা-দিগকে অঙ্গার মুক্ত করা। লালমাটির অক্সিজেন ইস্পাতস্থ অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হওয়ার কালেই ইস্পাত অঙ্গার মুক্ত হয়। এই ভাবে ইস্পাতকে সম্পূর্ণভাবে না পারিলেও যতদূর সম্ভব অঙ্গার মুক্ত করা হয়। চুনের কাজ হইতেছে—একদিকে ইস্পাতের ফস্‌ফরাস এবং গন্ধকের সহিত যুক্ত হইয়া গাদের সৃষ্টি করা এবং অপরদিকে গাদটিকে তরল কিংবা পাতলা করিয়া তোলা। চুল্লীর গায়ে যে ডলোমাইটের আস্তরণ দেওয়া থাকে, গলিত ইস্পাত তাহার সংস্পর্শে আসিলে উভয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফাইড এবং ক্যালসিয়াম

কার্বাইড নামক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহারা শেষ পর্যন্ত গাদে পরিণত হয়। এই ভাবে বৈদ্যুতিক চুল্লীর সাহায্যে ইস্পাত হইতে গন্ধক ও ফস্‌ফরাসের পরিমাণ কমান হইয়া থাকে। লৌহ অপেক্ষা গাদ হাল্কা। সুতরাং উহা গলিত লৌহের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। যখন দেখা যায় যে, গাদের ঘনত্ব ঠিক পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে তখন চুল্লীটিকে বৈদ্যুতিক উপায়ে কাৎ করিয়া ভাসমান গাদটিকে ঢালিয়া ফেলা হয়। গাদ ঢালিয়া ফেলার পর হইতেই গলিত লোহার মধ্যে কি পরিমাণ অঙ্গার থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। তখন যে প্রকৃতির ইস্পাত প্রস্তুত করার প্রয়োজন এবং তাহাতে যে পরিমাণ অঙ্গার থাকা উচিত সেই পরিমাণ অঙ্গার অ্যানথ্রাসাইট কয়লার সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়।

এতক্ষণ গলন-কার্যটি যোগধর্মী আবহাওয়ার মধ্যে সমাধান হইতে থাকে। গাদ নিষ্কাশনের পর হইতে বিয়োগধর্মী আবহাওয়ার মধ্যে গলন-কার্য চলিতে থাকে। এই সময়ে মাঝে মাঝে চুল্লীর মধ্যে কয়লা এবং চুন প্রয়োগ করিতে হয়। যখন দেখা যায় যে, ইস্পাতের উপরিস্থ গাদটি পুনরায় পাতলা হইয়া আসিয়াছে এবং উহা ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে সেই সময় ইস্পাতকে ঢালাই পাত্রে ঢালিয়া ফেলা হয়। ঢালিবার পূর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ এবং ফেরো-সিলিকন ইস্পাতের মধ্যে প্রয়োগ করা হয়। আমরা পৃথিবীতে যে সব ইস্পাতের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকি তাহাদের জন্ম উপরোক্ত যে কোন একটি না একটি প্রণালীর সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই সব ইস্পাতের দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর, বাড়ী, কড়ি, বড়গা, ছিটকিনি, বল্টু প্রভৃতি গৃহস্থালীর নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত হয়।

ধাতব পদার্থগুলির মধ্যে ইস্পাত সর্বাপেক্ষা সস্তা। অবশ্য সব ইস্পাতই যে সস্তা তাহা নয়। ইস্পাতের মধ্যে এমন সব সঙ্কর-ইস্পাত আছে যাহাদের মূল্য অনেক ধাতব পদার্থ অপেক্ষা বেশী। এই সব ইস্পাত বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রস্তুত হইলেও তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালীর মধ্যে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে।

"অরণ্যবাসী মনুষ্য যেদিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লেবরেটরীতে সেই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুযায়ী কারখানা অদ্যাপি চলিতেছে। এই আত্মরক্ষার প্রযত্নে, এই আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্রে একদিন যাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর খাটাইতেছি। কবিকল্পিত লঙ্কেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে সেবকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যাবলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা লঙ্কেশ্বর হইয়াছি। যে বাহ্য জগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্য জগৎ একদিন না একদিন আমাদের উপর জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দম্ভের সহিত প্রভুত্ব খাটাইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জয়জয়কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ?"

—রামেন্দ্রসুন্দর

ফ্লোরেসেণ্ট লাইটের বিপদ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আজকাল বড় বড় দোকান, সিনেমা, থিয়েটার এবং অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতে সাদা নলের মত একরকম বাতি দেখা যায়। ইহাকে ফ্লোরেসেণ্ট বাতি বলে। এই বাতিগুলিতে অল্প বিদ্যুৎ খরচায় অধিক আলো পাওয়া যায়। সাধারণ বাল্‌ব্‌ অপেক্ষা ইহাদের পরমায়ুও অনেক বেশী।

কিন্তু এই ফ্লোরেসেণ্ট বাতিতে অত্যন্ত বিষাক্ত এক প্রকার পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গা ফ্লোরেসেণ্ট টিউব হইতে যদি কোন ক্ষত জন্মে তাহা হইলে কালক্রমে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাইতে পারে। এই বাতি কিনিবার সময়ে যে পুস্তিকা দেওয়া হয় তাহাতে এ বিষয়ে কোন সতর্কতাই থাকে না। জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে অবহিত করিয়া দেওয়া উচিত।

কোন বিশেষজ্ঞ ধারণাও করেন নাই যে, পুরাতন ফ্লোরেসেণ্ট টিউব, খেলিবার ব্যাট অথবা অনুরূপ কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু অনেক বালকই এরূপ করিয়াছে। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের হাণ্টিংটন হাসপাতালের তিনজন বৈজ্ঞানিক Journal of Industrial Hygiene and Toxicology-তে এরূপ একটি দুর্ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। একটি ১২ বছরের বালকের চোয়ালে বেদনাহীন ছোট একটি আব দেখা দেয়। ইহার তিনমাস পূর্বে সে একদিন তাহার বন্ধুদের সঙ্গে ময়লা ফেলিবার স্থানের নিকটে খেলা করিতেছিল। নিকটেই কতকগুলি পুরাতন ফ্লোরেসেণ্ট বাতি পড়িয়াছিল। একটি বালক মনে করে যে, এগুলিকে বেসবল খেলিবার ব্যাটরূপে ব্যবহার করা চলে। এই ভাবিয়া সে একটি ফ্লোরেসেণ্ট টিউব লইয়া একটি বোতলে আঘাত করে। ইহাতে টিউবটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং কাচভাঙ্গাতে পূর্বোক্ত রোগীর ঘাড়ের কতকাংশ কাটিয়া যায়। ডাক্তার আসিয়া কাচের টুকরাগুলি বাহির করিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেন। তিনমাস পরে ঘা শুকাইলেও ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল না। স্থানে স্থানে আব দেখা দিল। প্রত্যেকটি আবের নীচে একটি শক্ত পিণ্ড অনুভব করা যাইত। অস্ত্রোপচার করিয়া এগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। দুই মাস পরে বালকটির মুখের পাশে আবার আব জন্মে এবং পুনরায় অস্ত্রোপচার করা হয়।

আমেরিকায় আর একটি বালকের এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। বালকটি একটি ফ্লোরেসেণ্ট টিউব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে পড়িয়া যায় ও তাহার হাতের মধ্যেই টিউবটি ভাঙ্গিয়া যায়। কাচের টুকরা বাহির করিয়া ক্ষতস্থানগুলি সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। তারপর বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও ঘাগুলি কিছুতেই শুকায় নাই। অবশেষে আশা করা হয় যে, প্ল্যাষ্টিক সার্জারীর সাহায্যে তাহাকে আরোগ্য করা যাইবে।

ডাঃ এইচ, এস, মার্টল্যাণ্ড বলেন যে, ক্ষতস্থান গুলিকে অবিলম্বে কোন পচন-নিবারক ঔষধের সাহায্যে পরিষ্কার করা উচিত। তারপর বহুদিন ধরিয়া ক্ষতস্থানগুলিকে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি ক্ষত বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আক্রান্ত পেশীগুলিকে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

ফ্লোরেসেণ্ট বাতির সকেট যদি আলগা থাকে তাহা হইলে মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হইতেছে, অবিলম্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইয়া কিছুক্ষণ পরে

একটি সরু ঝাঁটার সাহায্যে কাচের টুকরাগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে। ঝাঁট দিবার পূর্বে জল দিয়া ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। তারপর একটি ভিজা কাপড়ের সাহায্যে ঘরের মেঝে সাবধানে মুছিয়া কাপড়টি ফেলিয়া দিতে হইবে।

ফ্লোরেসেণ্ট বাতির এইসকল বিপদের কারণ কি? এই টিউবগুলিতে শুভ্র নীলাভ আলো দিবার জন্য একরকম পাউডার ব্যবহৃত হয়। এই পাউডারের সহিত বেরিলিয়াম চূর্ণ থাকে। বৈজ্ঞানিকদের মতে যে সকল ক্ষেত্রে ক্ষত শুকাইতে চায় না তাহার জন্য বেরিলিয়ামই প্রধানতঃ দায়ী।

কয়েক বৎসর পূর্বে ওয়াশিংটনে ডাঃ জে, জি, টাউনসেণ্ডের সভাপতিত্বে একটি চিকিৎসা বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। ইহাতে ওয়েষ্টিংহাউস, জেনারেল ইলেকট্রিক, সিলভেনিয়া প্রভৃতি কোম্পানীর ডাক্তারগণও ছিলেন। বহু আলোচনার পর প্রধান প্রধান ফ্লোরেসেণ্ট বাতি প্রস্তুতকারকগণ এই বাতিতে বেরিলিয়ামের ব্যবহার বন্ধ করিতে সম্মত হইয়াছেন; কিন্তু কারখানায় যে সকল মাল মজুত রহিয়াছে তাহা বিক্রয় করা হইবে। বিশেষতঃ বেরিলিয়ামের পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হইবে তাহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই। সেইজন্য উপদেষ্টা পরিষদ এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলেন।

ফ্লোরেসেণ্ট টিউব অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ অগ্নিতে ইহার বিষক্রিয়া নষ্ট হয় না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাহাতে ইহা নাড়াচাড়া না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবর্জনার সহিত ইহা ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। আমেরিকার স্বাস্থ্যবিভাগ অব্যবহৃত ফ্লোরেসেণ্ট টিউবগুলিকে পুরু কাগজে মুড়িয়া "Flourescent tube" লিখিয়া দিয়া আবর্জনা সাফাইকারীদের জন্য আলাদা স্থানে রাখিয়া দিতে বলিয়াছেন। এই টিউবগুলিকে ভিজা মাটিতে বুলডোজারের দ্বারা গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই কায করিবার সময়ে কর্মীদিগকে হাতে দস্তানা ও চোখে গগোল্‌স্ পরিতে হয়। আমাদের দেশে এখনও এরূপ কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আমরা পুরাতন ফ্লোরেসেণ্ট টিউবগুলিকে খরস্রোতা নদীতে ফেলিয়া দিতে অথবা গভীর গর্তে পুঁতিয়া ফেলিতে পারি।

ফ্লোরেসেণ্ট বাতি যদি সতর্কতার সহিত ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে বিপদের কোন সম্ভবনা নাই। এই বাতিগুলির অনেক সুবিধাও আছে। সাধারণ বৈদ্যুতিক বাতির জীবন বড়জোর ১০০০ ঘণ্টা। সেক্ষেত্রে ফ্লোরেসেণ্ট বাতির জীবন ২০০০ ঘণ্টারও বেশী। কোন কোন উন্নত শ্রেণীর ফ্লোরেসেণ্ট বাতি ৮৫০০ ঘণ্টাও জ্বলে। ইহা ব্যবহার করিলে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। ইহার স্নিগ্ধ আলো চক্ষের পক্ষেও উপকারী। ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ কারখানাতেই এই বাতি ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ইহার উপযোগীতা অনেক। গরম জামা-কাপড় হীরা-মুক্তা প্রভৃতি এই আলোতে আরোও সুন্দর দেখায়। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় আজকাল এই আলো ব্যবহৃত হয়। রাত্রিকালে তাহারা যখন জ্বলিয়া উঠে তখন সমগ্র নগরী অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

"বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো, ষ্টীমশিপ আর এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।"

—রামেন্দ্রসুন্দর

জাভায় করিল উপনিবেশ

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

দাদা, বললেন, “পড়”।

দেখলাম পুরানো সংখ্যার, ১৯৪১ সালের The Bulletin of the History of Medicine. পড়ে গেলাম।

“১৪ই জানুয়ারি ১৬৪১ সালে কার্থেজিনা সহরে বিশেষ ধার্মিকা কাউণ্টেস অফ সিনকন, ডনা ফ্রান্সিস্কা হাঁরিকে ড্যা রিবেরার পরলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।”—

দাদার দিকে চাইতেই, বললেন, “কেমন হলো তো?”

“কি হলো?”

“ঐ যে তোমাদের উপাখ্যান?”

“কিসের?”

ঐ যে সিনকোনা ছালের, যা থেকে কুইনিন তৈরী হয়। বলে না, স্প্যানিশ ভাইসরয়ের স্ত্রী কাউণ্টেস অফ সিনকনের ম্যালেরিয়া হয়েছিল, আর ‘লিমা’ দেশের ‘কিনা’ গাছের ছালের পাচন খেয়ে ম্যালেরিয়া সেরে গিয়েছিল। তাতে কাউণ্টেস, ম্যালেরিয়ার যম এই অমোঘ পাচনটি সাধারণ্যে প্রচার করেন। এ হলো ১৬৩০ সালের কথা। এমন কি লিনিয়স সাহেব পর্যন্ত এ গুজব বিশ্বাস করেছিলেন এবং সিনকনের গৌরবে গাছটির গোষ্ঠীর নামকরণ করেছিলেন সিনকোনা।

পড়ে দেখলে তো, কাউণ্টেসের কোনদিন ম্যালেরিয়াই হয়নি। বরং কাউণ্টের মাঝে মাঝে হতো। তখন কিন্তু লিমাতে কেউ এ ছালের ব্যবহার জানতো না। ১৫৩৭ সালে পিজারো পেরু জয় করেন। তখনকার ইতিবৃত্তে কিন্তু ‘কিনা’র কোন উল্লেখ নেই। গুজব এই যে, ১৬৩০ সালে লিমার ক্যাথলিক যাজকেরা সর্বপ্রথম সিনকোনা ছালের ব্যবহার প্রচার করেন। ১৬৪৩ সালে প্রকাশিত একটি ফরাসী ভাষায় লিখিত বইয়ে সিনকোনা ছালের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন একজন বেলজিয়ান। হারমান ভ্যান দের হেডেন নাম তাঁর। এইটি সিনকোনার সর্বপ্রথম উল্লেখ বলে প্রকাশিত। আর ১৬৭৭ সালে সিনকোনার ছাল জাতে উঠলো, অর্থাৎ বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় স্থান করে নিল।

ফলে হলো কি? না, সিনকোনার বৃক্ষমেধ যজ্ঞ সুরু হলো। দক্ষিণ আমেরিকা বুঝি বা নির্বৃক্ষ হয়ে পড়ে। বৃটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা নৌকা ভর্তি করে সিনকোনার ছাল আমদানি করতে লেগে গেল। সিনকোনা গাছের জঙ্গলে সূর্য-কিরণ হেসে বেড়াতে লাগলো। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা প্রমাদ গণলেন। পরামর্শ করলেন—সিনকোনার চাষ সুরু করা যাক।

১৮২০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত সিনকোনার ভেষজগুণ কেন হয় তা কেউ জানতো না। তারপর ১৮২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পেলেটিয়ে আর কাভেন্টো প্যারিসের এক রসায়নাগারে সিনকোনা গাছের ছাল থেকে কুইনিন আবিষ্কার করে ফেললেন। তখন চাষ করার কথাটা আবার একটু জোরালো হয়ে উঠলো। ১৮৪৮ সালে ওয়েডেল বলিভিয়া থেকে বীজ আনালেন সিনকোনা ক্যালিসায়ার (*C. calisaya.*)। প্যারিসের ভেষজ উদ্যানে তার চাষের চেষ্টা চললো। তারপর তা থেকে উক্ত সিনকোনার চারা প্রেরিত হলো আলজিয়রে ও জাভায়। বলতে হয়—সিনকোনার প্রথম প্রচার সুরু হলো জাভায়।

বৃটিশ ও ওলন্দাজেরই মাথাব্যথা হলো বেশি।

কেন না, বৃটিশ সরকার আর ওলন্দাজ সরকারের রাজত্বে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বললেন, বাপু আমাদের দেশে চাষ কর। 'বেনিয়া' সরকার বললেন, তাতে লাভ হবে কি? আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, কুইনিন নিষ্কাশন করে ওষুধ প্রস্তুত করে ফেলতে পারলে সংখ্যাতীত জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। আটকে গেল আসল জায়গায়, টাকা আনা পাইয়ের হিসেব যোগে!

রয়েল ছিলেন সাহারানপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ। ১৮৩৫ সালে তিনি বৃটিশরাজকে খাসিয়া ও নীলগিরিতে সিনকোনার চাষ করতে অনুরোধ করেন। বারো বছর পরে আবার এই কথা স্মরণ করান। শিবপুর বাগানের অধ্যক্ষ ফক্‌নারও ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালে একই কথা সরকারকে নিবেদন করেন। ইতিমধ্যে শোনা গেল—বিটেনজর্গ বটানিক্যাল গার্ডেন থেকে হাসকার্ল রওনা হয়ে গেছেন দক্ষিণ আমেরিকায়, সিনকোনার বীজ ও চারা সংগ্রহ করতে। এ হলো ১৮৫২ সালের কথা। তুর্ভাগ্যবশে তিনি বিবিধ জাতের সিনকোনার চারা সংগ্রহ করলেও তাদের ছালে কুইনিনের পরিমাণ অত্যন্ত সামান্যই পেলেন। একমাত্র *C. calisaya*-র বীজ কাজে লাগলো। হাসকার্ল ফিরে এলেন তু-বছর পরে এবং সিনকোনা বাগানের কর্ণধার হলেন। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৪ পর্যন্ত হাসকার্ল সিনকোনার চাষে ব্যাপৃত রইলেন।

বৃটিশরাজ হাই তোললেন। ১৮৫৮ সালে মার্খামকে দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মার্খাম স্প্যানিশ ভাষা জানতেন। তাছাড়া যে সব অঞ্চলে সিনকোনা জন্মায় সে সব অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা জানতেন। তিনি একটি দল নিয়ে যাত্রা করলেন ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। সঙ্গে রইলেন গাছপালার কাজ-জানা অভিজ্ঞ লোক। বলিভিয়া অঞ্চলে গেলেন মার্খাম স্বয়ং, আর ইকুয়েডর অঞ্চলে তিনি পাঠালেন ডক্টর প্রুসকে, পেরুভিয়া অঞ্চলে গেলেন প্রীচেট। *C. calisaya*-র চারা সংগ্রহ করা হলো ৫০০; *C. succirubra*-র বীজ পাঠানো হলো ডাকযোগে ভারতবর্ষে এবং ১৮৬১ সালে নীলগিরিতে তার চাষের ব্যবস্থা হলো। ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে মিতালি করে মাদ্রাজ ও জাভার বাগানের সহযোগিতায় সিনকোনার চাষ উন্নত হতে লাগলো। সিনকোনার কিছু চারায় ডালপালা গজালো বটে, কিন্তু কুইনিনের পরিমাণ বড্ড কম দেখা গেল। বাগানের সবুজ শোভা হলেই তো হয় না, জ্বর সারে কৈ?

যে সময় বৃটিশ ও ওলন্দাজেরা বীজ সংগ্রহের জন্যে দক্ষিণ আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন। তখন চার্লস লেজের বলে একজন ইংরেজ সিনকোনা-ব্যবসায়ী পেরুতে বাস করতেন। তাঁর ভাল জাতের সিনকোনা-ছালের সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান ছিল। সিনকোনা-ছালের ব্যবসায়ে তাই তিনি লাভবান হতেন। বলা বাহুল্য, লেজেরের এই অভিজ্ঞতার উৎস ছিলেন তাঁর একজন স্থানীয় অধিবাসী কর্মচারী। আজ কুইনিন-শিল্প প্রসঙ্গে সেই কর্মচারীটিও বিখ্যাত হয়ে গেছেন। নাম তাঁর ম্যানুয়েল ইনক্রা মামানি। লেজের তাঁকে পাঠালেন বলিভিয়ার নিকটবর্তী অ্যামাজোন অঞ্চলে। মামানি সংগ্রহ করলেন সাত সের বীজ। লেজের পাঠালেন সে বীজ লণ্ডনে, তাঁর সহোদরকে। বলে পাঠালেন বৃটিশ সরকারকে সে বীজ দিতে, ভারতবর্ষে চাষ করার জন্যে। সরকারের তত দয়া হলো না। তখন লেজেরের সহোদর ভাবলেন যে, বীজ তো চিরকাল ভাল থাকবে না, কাজেই স্মরণ করলেন তিনি ওলন্দাজ সরকারকে। বললেন, জাভায় চাষ করবে কি? জাভা সরকার এক সের বীজ কিনলেন একশ' ফ্রাঙ্ক দিয়ে। শোনা যায়, লেজেরের সহোদর বাকী বীজ লণ্ডনের রাস্তায় ফেরি করে বেড়িয়েছিলেন এবং বলা বাহুল্য, ক্রেতা পাননি; তারপর একজন সিনকোনা চাষীর কাছে অনেক কষ্টে বিক্রি করেন। চাষী ফিরে এলেন

ভারতবর্ষে এবং বৃদ্ধি করে বললেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সিনকোনা প্লান্টেশনকে যে, এই বীজের পরিবর্তে জাভা থেকে *C. succirubra* বীজ আনাও না কেন!

১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস। জাভার চাষে দেখা গেল লেজের প্রেরিত বীজ থেকে সব চেয়ে ভাল জাতের সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হয়েছে এবং আরও পরে দেখা গেল, এই সিনকোনার ছালে সব চেয়ে বেশি কুইনিন পাওয়া যাচ্ছে। এই গাছের নামকরণ হলো লেজেরের সম্মানার্থে *C. Ledgeriana*। এই আকস্মিক আবিষ্কারের মুখপাত্র হিসেবে চার্লস লেজেরকে ওলন্দাজ সরকার বহু পুরস্কারে তুষ্ট করেছিলেন। প্রথমে দিয়েছিলেন বীজের মূল্যস্বরূপ একশত ফ্রাঙ্ক। তারপর বীজ ভাল জাতের অনুমান করে ২৪ পাউণ্ড। ১৮৮০ সালে লেজেরের বীজই যখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে কুইনিনযুক্ত সিনকোনার গাছ উৎপাদনে সক্ষম বলে সুপ্রমাণিত হলো তখন দিয়েছিলেন ১২০০ গিলডার; আর ১৮৯৫ সালে লেজের ব্যবসা থেকে অবসর নিলে তাঁকে মাসিক বৃত্তি দিয়েছিলেন ১০০ গিলডার। আর বৃটিশ সরকার? জাভা থেকে ওলন্দাজেরা পরীক্ষিত ভাল বীজ বলে লেজের প্রেরিত বীজ পাঠালেন ভারতবর্ষে। মার্খাম বললেন বৃটিশ সরকারকে, লেজেরকে পুরস্কৃত করতে। উত্তর পেলেন খুব সংক্ষিপ্ত—'না'। তখন বৃটিশ সরকার হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ করেছিলেন ভাল জাতের চারার ভাল চাষের জন্যে।

লেজের পুরস্কার পেলেন সোয়েন্সের গবেষণার জন্যে। ১৮৭২ সালে সোয়েন্স হাজার হাজার বিভিন্ন জাতের সিনকোনার ছাল থেকে কুইনিন নিষ্কাশন করে সুপ্রমাণিত করেন যে, লেজের প্রেরিত বীজের গাছের ছাল থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কুইনিন পাওয়া যায়।

C. Ledgeriana-র উপর সোয়েন্সের গবেষণা

১৮৭২ সাল সাল	৭টি গাছের ছাল পরীক্ষার ফল	গড়ে শতকরা ৮·১৫ কুইনিন সালফেট
১৮৭৩	২০	১০·৯
১৮৭৪	২৯	১১·৬৮
১৮৭৫	১৪	১০·৭২
১৮৭৬	৫২	১৩·২৫
১৮৭৭	১৯	১২·৩১
১৮৭৮	৫৪	১০·৬৭

এই ফলাফল জানবার আগে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কুইনিন পাওয়া গিয়েছিল শতকরা তিন ভাগ, খুব ভাল পরিপুষ্ট গাছের ছাল থেকে। ১৮৭৮ সালের এই আবিষ্কার আজও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে।

এখন উঠলো *C. Ledgeriana* বহুল পরিমাণে চাষ করার কথা। অনুসন্ধান করতে হলো—কি রকম মাটিতে বা আবহাওয়ায় *C. Ledgeriana* সহজে জন্মাবে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—পুষ্ট ছাল আহরণ করতে হলে গাছগুলোকে কত বড় করতে হবে, অর্থাৎ কত বছর অপেক্ষা করতে হবে! পরীক্ষালব্ধ তথ্য হলো—১৪ বছরে *C. Ledgeriana*-র গাছ প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু হয়। তার গুঁড়ি আট ইঞ্চি মোটা। আর যখন ৪৫ বছর বয়স তখন হয় ৭৫-৮০ ফুট উঁচু, আর ১৪-১৬ ইঞ্চি মোটা। সবচেয়ে ভাল বাড়ে ৩,০০০ থেকে ৭,০০০ ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে, যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার ১২৫ ইঞ্চি। বৃষ্টি ৯০ ইঞ্চির কম হলে চলবে না। সারা বছর ধরে বৃষ্টি হলেই ভাল; ৩০ দিনের বেশি একাদিক্রমে শুকনো দিন হলে এদের পছন্দ হয় না। আর দৈনিক উত্তাপের মাত্রা হওয়া ভাল ৫৩°—৮৬° ফাঃ।

জাভায় চাষ করতে গিয়ে বোঝা গেল *C. Ledgeriana*-কে বাঁচান ও বাড়ান আয়াস-

সাধ্য। কিন্তু আর এক জাতের সিনকোনা, *C. Succirubra* সহজেই বাঁচে ও বাড়ে। তখন *C. Succirubra*-র গাছে *C. Ledgeriana*-র 'কলম' করা সুরু হলো। তাতে ভয় হলো আবার *C. Ledgeriana*-র কুইনিনের পরিমাণ কমে যাবে না তো? আবার সুরু হলো রাসায়নিক গবেষণা। ১৯১৯ সালে এর সঠিক ফল পাওয়া গেল। না, পরিমাণ কমছে না!

সত্য কথা বলতে কি, জাভা কুইনিন চাষের অগ্রণী। বৃটিশ চালিত ভারতবর্ষে জাভার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চাষ চলেছে মংপুতে ও নীলগিরিতে। জাভায় পরীক্ষালব্ধ ফলের উপর ভাগ বসিয়ে আসছে ভারতবর্ষের সরকারী চাষীরা। ১৮৬১ সালে অ্যাণ্ডারসন ছিলেন শিবপুর বাগানের কর্তা। তিনি হুকার সাহেবের কাছ থেকে সিনকোনার কিছু বীজ পেয়েছিলেন এবং গোটা তিরিশ চারা তৈরী করতে পেরেছিলেন। বৃটিশরাজ তাকে জাভায় পাঠিয়েছিলেন সিনকোনার চাষ শিখতে। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন চারশ' সিনকোনার চারা আর কিছু বীজ। ১৮৬২ সালের মার্চ মাসে অ্যাণ্ডারসন সর্বপ্রথম এলেন দার্জিলিং অঞ্চলে সিনকোনা চাষের চেষ্টায়। যেহেতু সিনকোনার গাছ ঠাণ্ডা পছন্দ করে, আর চায় প্রচুর বৃষ্টি। অ্যাণ্ডারসন সাহেব ঘুম ষ্টেশন থেকে খানিক দূরে ৯০০০ ফুট উঁচু সিঞ্চল পাহাড়ে পহেলা জুন দু-শ' চারা পুঁতে ফেললেন। পাঁচ মাস যাবৎ চারাগুলোর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভাব দেখা গেল; কিন্তু ডিসেম্বর মাসের সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তে লাগলো। অ্যাণ্ডারসন সাহেব তখন অপেক্ষাকৃত গরম, লিবং অঞ্চলে গাছগুলো নিয়ে গেলেন। পরের বছর সিনকোনার গোটা আবাদটাই সরালেন রংবি উপত্যকায়, দার্জিলিং সহর থেকে বারো মাইল দূরে, সিঞ্চল পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে, ৪৫০০ ফুট উঁচু জায়গায়। নীলগিরি থেকে অনেক চারা এনে সেখানে লাগানো হলো।

তখন দার্জিলিং অঞ্চলে রেল হয়নি। তখনকার দিনে সেখানে শীত ছিল যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টিও হতো তেমনি প্রচুর। অ্যাণ্ডারসনকে খুবই ভুগতে হয়েছিল। ঘন বন কেটে চাষের উপযোগী জায়গা করে তুলতে হয়েছিল। যে জায়গায় তিনি ভেবেছিলেন তিন মাসের ভিতর চাষের কাজ সুরু করতে পারবেন, সে জায়গায় তাঁর লেগে গেল দু-বছর সময়। তখনকার দিনে দার্জিলিংয়ের লোকেরা ফুলের টব কাকে বলে জানতো না। টব আনাতে হতো কলকাতা থেকে। ভাল জাতের বালি পর্যন্ত পাওয়া যেত না। এক মণ বালি নিয়ে যেতে হলো শিবপুরের বাগান থেকে। তার উপর কলকাতা থেকে মালপত্র আসতে সময় লাগতো ছ'সপ্তাহেরও বেশী। যাইহোক ধৈর্য ধরে কাজ করতে করতে ১৮৬৪ সালে রংবি উপত্যকায় বিভিন্ন উচ্চতায় সিনকোনার চাষ চলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তিস্তার উপত্যকায় চাষের কাজ এগিয়ে চললো। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বৃটিশরাজ কেবল খরচই করে চলেছিলেন। এই তের বছরের ভিতর সিনকোনার চারা বেচে আয় হয়েছিল কেবল মাত্র ৭,৯৫৮ টাকা।

২। দার্জিলিং অঞ্চলে সিনকোনা চাষের প্রথম তেরো বছরে আয়-ব্যয়

বছর	আয়	ব্যয়
১৮৬২	...	৯৪৫৫
১৮৬৩	...	১০৪২১
১৮৬৪	...	৩৯০৯৬
১৮৬৫	.	৫৯০৬৩
১৮৬৬	...	৪৮৯৬৪
১৮৬৭	১০৬৮	৬৭৮০১
১৮৬৮	৫৪৩	৭৫৯৬৫
১৮৬৯	১৫৬	৫৪৫৪২
১৮৭০	...	৫৪৫৭৬
১৮৭১	১৪৮৪	৬০০২৩
১৮৭২	২৩২০	৫০৭৯৫
১৮৭৩	২৩৮৭	৫৫৬২০
১৮৭৪	...	৫৯৯৪২
মোট টাকা	৭৯৫৮	৬৪৬২৪৩

৩। আমাদের দেশে যেসব স্থানে সিনকোনা চাষের চেষ্টা হয়েছে তার তালিকা

মাদ্রাজে : উইনাড জেলা
দক্ষিণ কানারা
গঞ্জাম
কুর্গ
নালামালি পার্বত্য অঞ্চল
ত্রিবাঙ্কুর
পালনি পার্বত্য অঞ্চল
টিন্নাভেলি পার্বত্য অঞ্চল
শেভারয় পার্বত্য অঞ্চল
নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল

বোম্বাইয়ে : মহাবালেশ্বর

বাঙ্গালায় : মংপু

আসামে : খাসিয়া পাহাড়

দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ :
সাহারানপুর
ডেরাডুন
মুসৌরি
গাড়ওয়াল
কুমায়ুন
রানিখেত
আরকালি
কাংরা উপত্যকা

১৮৯৮ সালে রংবির আবাদ মংপু পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। ১৮৮৮ সালে কুইনিন তৈরি আরম্ভ হলো এবং সে বছরে তিনশ' পাউণ্ড তৈরি হলো। বলাবাহুল্য আজকাল এর মাত্রা বেড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে এর মুনাফাও।

৪। কুইনিনের মাত্রা ও মুনাফা

সাল	কুইনিনের পরিমাণ (পাউণ্ডে)	আয় (টাকায়)
১৯৩৬	২০৮৩৯	৬১২৭২৩
১৯৩৭	১৪০১৯	৮৩১৮১৮
১৯৩৮	১৬৫২৫	৯৪১৬১৬
১৯৩৯	১৬০২৫	৮৯৫০২০
১৯৪০	১৮৯২২	১৩৯১৯৪৫

মংপুর চাষে বার্ষিক আয় কিছু কম নয়। কিন্তু জাভার সঙ্গে যখন তুলনা করি—তুলনা করার কারণও আছে—প্রায় একসময়েই জাভা ও ভারতবর্ষে সিনকোনার চাষ আরম্ভ হয়; তখন দেখি জাভায় হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে তার কষ্টলব্ধ ফলটুকু। জাভায় চাষ হয়েছে বিস্তৃত, উন্নত, সিনকোনার বিবিধ বিষয়ের গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর ভারতবর্ষ নকল করেই ক্ষান্ত হয়েছে। আজকের দিনে মোটমাট ফলাফল হয়েছে কি? না, জাভায় সারা পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ কুইনিন তৈরী হয়, আর ভারতবর্ষে হয় মাত্র ৪ ভাগ; সুতরাং কেবলমাত্র মংপুতে আরও কম। অথচ কেবলমাত্র আমাদের দেশেই ম্যালেরিয়া সারাতে যে পরিমাণ কুইনিন দরকার তার তিন-ভাগের এক ভাগ মাত্র তৈরী হয় এদেশে। জাভার মুখ চেয়ে থাকতে হয় আমাদের আজও।

"নিম্ন পর্য্যায়ের জীব মানুষের মত জগৎকে সুনিয়ত দেখে না। মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্য্যায়ের জীব; মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত সুনিয়ত দেখে, সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষী; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।"

আবর্জনা থেকে সার

শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশমাতৃকার বন্দনা গান গেয়ে ঋষি বঙ্কিম একদিন বলেছিলেন, সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্। একদিন সত্যিই আমাদের এই বাংলা দেশ সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ছিল। সেদিন বাংলার মাঠে মাঠে ছিল ধান, গোয়ালভরা ছিল গরু, পুকুর ভরা ছিল মাছ। তখন দেশে এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত যে দেশবাসী দু-বেলা পেট পুরে খেয়েও পর্যাপ্ত থাকত। তাই অন্ন তখন বিতরিত হত দেশবিদেশে। বাংলার সে সুখের দিনের ছবি আমাদের কাছে আজ অবাস্তব বলেই মনে হয় যেন! আজ বরাদ্দ খাদ্য সংগ্রহের জন্যে প্রতি সপ্তাহে রেশনের দোকানে গিয়ে আমাদের ধর্ণা দিতে হয়।

আজ এদেশে যে প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্য সংকুলান হচ্ছে না, তার প্রধান কারণ জমির উর্বরতা সংরক্ষণের দিকে আমাদের মনোযোগ নেই বিশেষ। যে গরু দুধ দেয়, তাকে উপযুক্ত পরিমাণে খোল ভূসি খেতে না দিলে তার দুধ তো কমে যাবেই। তেমনি জমি থেকে আমরা যদি ক্রমাগত তার সার বস্তু ফসলের মধ্য দিয়ে টেনে নিই এবং পরিবর্তে জমিকে যদি পুষ্টিকর কিছু ফিরিয়ে না দিই, তা হলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাবে না কেন? তাই জমিতে সার প্রয়োগ করে তার পুষ্টিসাধন করা দরকার। প্রয়োজন ও গুরুত্বের দিক দিয়ে জল সরবরাহ ও উন্নত বীজের পরেই সার প্রয়োগের স্থান।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্যে নানারকম রাসায়নিক সার আছে। সে গুলোর প্রায় অধিকাংশই বিদেশ থেকে এদেশে আমদানি হয়। সম্প্রতি বিহারের সিন্দ্রী অঞ্চলে ভারত সরকার এদেশে রাসায়নিক সার উৎপাদনের একটি সুবৃহৎ কারখানা স্থাপন করেছেন। রাসায়নিক সারের দাম একটু বেশী, তাই আমাদের দেশের গরিব চাষীদের পক্ষে তা কিনে জমিতে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না সহজে। অথচ এমন সার আছে যার দাম কিছুই নয় বলতে গেলে, কিন্তু কাজের দিক থেকে সেগুলো দামী সারের মতই কার্যকরী। এই নিবন্ধে এরূপ কয়েকটি সার সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

আমাদের দেশে সহর ও গ্রামাঞ্চলে আবর্জনা সংরক্ষণ ও তার সদ্ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা নেই, প্রায় ২০ লক্ষ টন আবর্জনা বৃথা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই আবর্জনা পচিয়ে যদি সার তৈরী করা হয় এবং সেই সার যদি জমিতে প্রয়োগ করা যায়, তা হলে জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে যাবে এবং দেশের খাদ্যের ঘাটতি অনেক পরিমাণে পূরণ হবে। ১৯৪৮-৪৯ সালে এদেশে ৩৫ লক্ষ টন এরকম পচাই সার উৎপাদন করা হয়েছিল এবং ১৭ লক্ষ একর জমিতে তা প্রয়োগ করে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টনেরও বেশী শস্য উৎপন্ন হয়েছিল।

আবর্জনা পচিয়ে সার তৈরী করলে তাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে। এই নাইট্রোজেন গাছের দেহ-গঠনের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। চারা গাছের বৃদ্ধির সময় এটি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন গাছের পাতা এবং কাণ্ডের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করে এবং তাদের গাঢ় সবুজ রঙের করে তোলে। এর অভাবে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং নীচের দিকের পাতা ফ্যাকাসে হলদে হয়ে যায়।

পচাই সার তৈরীর পক্ষে গোময় ও গোমূত্র দুটি প্রধান উপাদান। ভারতে প্রায় ২০ কোটি গবাদি পশু আছে। এই সমস্ত জন্তুর মলমূত্র যদি গর্তের মধ্যে জমিয়ে রাখা হয়, তা থেকে ৩০ লক্ষ টনেরও বেশী নাইট্রোজেন জমিতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গোময়কে এভাবে জমির সারের কাজে না লাগিয়ে আমরা তা ঘুঁটে করে পুড়িয়ে নষ্ট করি কিংবা ফাঁকা জায়গায় ফেলে রেখে রোদে বৃষ্টিতে নষ্ট করে দিই।

পচাই সার প্রস্তুত করার প্রণালী অতি সহজ। প্রথমে একটা ৪ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া ও ৩।৪ হাত গভীর আন্দাজ গর্ত খুঁড়তে হবে। তারপর ঐ গর্তের তলায় লতাপাতার আবর্জনা বিছিয়ে তার ওপর গোময় এবং গোমূত্র ফেলতে হয়। এভাবে ক্রমাগত গোময় এবং গোমূত্র ঢেলে গর্তটাকে প্রায় ভরে ফেলতে হবে। তারপর গর্তের ওপর কাদামাটি বা ছাই দিয়ে লেপে দিতে হয়। মধ্যে মধ্যে কাদা সরিয়ে ঐ গোময় ও গোমূত্রকে একটা ডাণ্ডা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। এই আবর্জনাগুলো পচে গিয়ে দেড়-মাস কি দু-মাস পরে দামী সারে পরিণত হবে। তখন এই পচাই সার জমিতে দেওয়া চলবে।

মানুষের মলমূত্র থেকেও অনুরূপভাবে সার তৈরী করা যায়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রায় ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাস করে। তাদের মলমূত্র থেকে ৫ কোটি টন সার তৈরী হতে পারে। যে সব গ্রামে নিয়মিত ঝাড়ুদারের ব্যবস্থা নেই, সে সব জায়গায় বিষ্ঠা থেকে সার তৈরীর ব্যবস্থা করলে স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে না। গর্তে বিষ্ঠা ফেলবার পর তার ওপরে কিছু ধূলাবালি আবর্জনা ছড়িয়ে দিতে হয়। বিষ্ঠার সার দু-মাসে তৈরী হয়ে যায়।

কচুরী পানা থেকেও খুব ভাল পচাই সার হয়। পাট ও আলুর চাষে কচুরী পানার সার আশাতীত ফল দেয়। গ্রামবাসীরা যদি সকলে দলবদ্ধ হয়ে খাল বিল পুকুর ডোবা ইত্যাদি থেকে কচুরী পানা উঠিয়ে সেগুলোকে পচাই সারে পরিণত করেন, তা হলে তাঁরা যেমন একদিকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবল থেকে রক্ষা পাবেন তেমনি তাঁদের জমির উর্বরতাও বেড়ে যাবে।

আর এক রকম সার আছে, তাকে বলা হয় সবুজ সার। ধনচে, শন প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় ফসল দিয়ে এই সার তৈরী করা হয়। কাঁচা বা নরম অবস্থায় এই ফসলগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে মাটির উর্বরা শক্তি বেড়ে যায়।

নর্দমার জল ও ময়লা থেকেও সার তৈরী করা যায়। এই জল ও ময়লা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশের খাদ্য-উৎপাদন অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে। বড় বড় সহরের নর্দমার ময়লা জল এভাবে সার হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। পশ্চিম-বাংলা সরকার কলকাতা সহরের নর্দমা-জলের তলানী, সার হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কলকাতার আশেপাশে ২৫।৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাকে করে এবং অন্যত্র রেলে এই সার তাঁরা সরবরাহ করছেন। এই সারের দাম খরচাদি সমেত টন প্রতি ৫ টাকা। বিঘা প্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যায়।

কীট-পতঙ্গের দেহোদ্ভূত ছত্রাক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গায়েন

কিছুকাল পূর্বে ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে পচা লতাপাতার মধ্যে অদ্ভূত রকমের কতকগুলো মরা বোল্‌তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। (প্রকৃত-প্রস্তাবে সেগুলো অবশ্য বোল্‌তা নয়, ভুলক্রমে ভীমরুলকেই বোল্‌তা বলা হয়েছিল) স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে এসম্বন্ধে যে খবর বেরিয়েছিল তাতে প্রকাশ—'এদের ছয়টি-পা আর শুঁড় ছাড়াও কতকগুলো সরু সরু উপাঙ্গ দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বোল্‌তাগুলো(?) যদিও মৃত তথাপি এই উপাঙ্গগুলোর মধ্যে সজীবতার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে'।

বর্তমানে বহুবিধ বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যুগে এই খবরটা অনেকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক না-ও হতে পারে; তাঁরা হয়তো মনে করবেন—কতকগুলো মরা বোল্‌তার পিছনে আমাদের সৃষ্টিকামী উৎসাহকে এভাবে অযথা অপচয় করা হচ্ছে।

এ-কথার জবাবদিহি এই যে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী একটু অন্য রকমের। আপাতদৃষ্টিতে যা নেহাৎ তুচ্ছ ঘটনা তার মধ্যেও যে বিশ্বপ্রকৃতির অনেক বিরাট সত্য আত্মগোপন করে আছে—বিজ্ঞানীরা তা বহুবার উপলব্ধি করেছেন। গাছ থেকে আপেল ফলটাকে মাটিতে পড়তে দেখেই নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন—মাধ্যাকর্ষণ। আর একথাও ঠিক যে, বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগই বিজ্ঞান-চর্চার সব কথা নয়। বিজ্ঞানচর্চার আরও একটা দিক আছে, যাকে বলা যেতে পারে তত্ত্বের দিক বা থিওরেটিক্যাল আস্‌পেক্ট। বস্তুতঃ বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীকে যা সবচেয়ে উৎসাহিত করেছে তা হচ্ছে তার জানবার অদম্য ইচ্ছা। জানবার তাগিদে মানুষ বিজ্ঞানের যা কিছু নিয়ম-সূত্র আবিষ্কার করেছে, প্রয়োজনের তাগিদে তাকেই সে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছে ব্যবহারিক জীবনের চতুঃসীমায়। অতএব এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের ব্যবহারিক সার্থকতা যদি কিছু না-ও থাকে, তবু নিছক জ্ঞানচর্চার খাতিরেও যে এজাতীয় আলোচনার বিশেষ সার্থকতা রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কীটের দেহে যে সূত্রাকার 'উপাঙ্গের' সৃষ্টি হতে পারে এ ব্যাপারটা প্রাচীনকালের লোকেরও অগোচর ছিল না; বরং তাদের মনে এক অদ্ভূত ধারণার সৃষ্টি করেছিল। এরকম কোন ঘটনা দেখলেই তারা মনে করতো কীটের দেহটা যেন ধীরে ধীরে উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বা দৈবপ্রভাবেই। চীন দেশের ভেষজ-শাস্ত্রে ঠিক এই রকমই একপ্রকার রূপান্তরিত কীটের উল্লেখ আছে।

কিন্তু এরকম অদ্ভুত কীট-পতঙ্গের সঙ্গে বহুকাল ধরে মানুষের অল্পবিস্তর সাক্ষাৎ-পরিচয় থাকলেও এসবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও তথ্যানুসন্ধান সুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ফলে জানা গেল যে, প্রাচীনেরা যাকে উদ্ভিদে রূপান্তরিত কীট বলে মনে করতো সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কীটের উদ্ভিদ-রূপ প্রাপ্তির নিদর্শন না হলেও কীটদেহোদ্ভূত উপাঙ্গগুলো যে উদ্ভিদ-বিশেষ এই সত্যোপলব্ধির গৌরবটুকু প্রাচীনদেরই। বৈজ্ঞানিক মহলে এবার পটপরিবর্তন সুরু হলো। কীট-পতঙ্গ সম্পর্কীয় এ-সব ঘটনা একে একে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের আলো-

চনার বিষয়ীভূত হয়ে পড়লো এবং এ-বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীর তরফ থেকে, বিশেষকরে যাঁরা ছত্রাক সম্পর্কিত গবেষণা করে থাকেন।

এ প্রবন্ধের সূচনায় উল্লিখিত মরা বোল্‌তার (?) দেহে কিভাবে যে সূত্রাকার সজীব উপাঙ্গ উদ্গত হতে পারে তা আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় সহজেই ধরা পড়লো যে, বোল্‌তার দেহোদ্ভূত উপাঙ্গের মত পদার্থগুলোর সঙ্গে তার দেহকোষের আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য নেই। এথেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এসব সূত্রাকার সজীব অংশগুলো আসলে বোল্‌তাটির জীবন-ক্রিয়ার সহায়ক তো নয়ই, বরং তার পরিপন্থী। ছত্রাক ক্রিয়া চালাতে হয়। পূতিগন্ধময় আবর্জনাস্তূপ থেকে অনিন্দ্যকান্তি মানবদেহ পর্যন্ত সব কিছুকে আশ্রয় করেই গোত্র-গোষ্ঠী-জাতি-প্রজাতির ধারাবাহী স্রোতে বহুদূর প্রসারিত এদের জীবনযাত্রা। ছত্রাকদের মধ্যে যারা কীটপতঙ্গের শরীর থেকে পরিপুষ্টি লাভ করে, শুধু মাত্র তাদের জীবনপ্রণালীর এক অতি সাধারণ পরিচয় দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন জাতীয় ছত্রাকের জীবনধারার মধ্যে এমনই এক একটা বৈশিষ্ট্য এসে গেছে যে, বিশেষ এক আবেষ্টনীর বাইরে সে বাঁচতে পারে না। এমন কি, কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর কীটের দেহ আশ্রয় করে যে ছত্রাক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাকে অপর কোন বিশেষ শ্রেণীর কীটদেহে

মৃত ভীমরুলের শরীর থেকে ছত্রাক জন্মগ্রহণ করেছে

স্থানান্তরিত করলে তার খাদ্য-শোষণ-ব্যবস্থায় এমনই একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে, যে অবস্থায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এ বিষয়ে অবশ্য গবেষণার প্রচুর অবকাশ রয়েছে।

শ্রেণীর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণারত কয়েকজন বিজ্ঞানী এমন কয়েক শ্রেণীর ছত্রাকের সন্ধান পেলেন, যারা কীটদেহ আক্রমণ করে তাদের মৃত্যু ঘটায় এবং পরে সেই ধ্বংসস্তূপের উপরেই নিজেদের জীবন-সৌধ গড়ে তোলে। মরা বোল্‌তার দেহে উপাঙ্গের মত যে সরু সরু সূত্র গজিয়েছে সেগুলো আসলে কিন্তু এরকমই এক শ্রেণীর কীটদেহ-পরিপুষ্ট ছত্রাকের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছত্রাকের জীবনবৈচিত্র্যে অভিনবত্ব আছে। উদ্ভিদজগতের অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের জীবকোষে ক্লোরোফিল বা পত্র-হরিৎ নেই। তাই সূর্যকিরণকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষমতা নেই বলেই প্রাণী বা উদ্ভিদদেহ শোষণ করেই এদের জীবন-

মরা বোল্‌তার (?) দেহে যে ছত্রাকের জীবন-প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া গেছে তা Ascomycetes পর্যায়ের এক বিশেষ শ্রেণীর ছত্রাক—বিজ্ঞানের ভাষায় *Cordyceps sphecocephala* (Kl) Sacc. নামে অভিহিত। এই *Cordyceps* জাতীয় ছত্রাক-কুল সংখ্যায় নেহাৎ নগণ্য নয়; আজ পর্যন্ত এদের প্রায় ২০০ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে এছাড়া এদেরই কোন স্বজাতি আজও

যে বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে এই বিরাট পৃথিবীর প্রকৃতি রাজ্যে আত্মগোপন করে নেই, এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

কিভাবে এসব ছত্রাক কীটদেহ অবলম্বন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সেকথা অনুধাবন করে দেখা যাক। এদের 'স্পোর' কোনও প্রকারে কীটদেহে আশ্রয় পেলে প্রথমেই তা থেকে সূক্ষ্ম একটি অঙ্কুর উদ্গত হয়। এই সূক্ষ্ম অঙ্কুরই যে একদিন তার আশ্রয়দাতার প্রাণঘাতী হয়ে উঠবে কে তা জানতো! কিন্তু জৈব প্রকৃতিতে এরই নাম জীবনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়েই ঘটে জীবনের বিকাশ। তাই দেখি 'স্পোর' থেকে উদ্গত অঙ্কুরটি কীটের বহিরাবরণ ভেদ করে তার দেহমধ্যে প্রবেশ করছে অতি সন্তর্পণে। এবার সে সুরু করে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। কীটের দেহরসে পুষ্ট হয়ে এখন সে সূত্রাকার শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হয় কীটদেহের অভ্যন্তরে। এ অবস্থায় কীটটি মারা পড়ে। ছত্রাকসূত্রের বেপরোয়া শোষণ-ক্রিয়ার ফলে তার দেহের কোমলাংশগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। শুধু অটুট থাকে তার বাইরের দেহাবরণটুকু; কেন না, ছত্রাকসূত্রের পারস্পরিক আড়াআড়ি বিন্যাসের ফলে অপেক্ষাকৃত কঠিনাবয়ব যে ছত্রাকদেহের (Sclerotium) সৃষ্টি হয়, তা কীটদেহের বহিরাবরণকে চুপসে ভেঙ্গে পড়তে দেয় না। পূর্ণাবয়ব ছত্রাকদেহ যখন পুষ্টির আতিশয্যে ভরে ওঠে তখন তার কোষ-মধ্যে দেখা যায় গ্লাইকোজেন আর তৈল-পদার্থের উপচয়।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই তুঙ্গ অবস্থায় আসে বংশপ্রতিষ্ঠার পালা। ছত্রাকজীবনের এ-অধ্যায়ের সূচনায় আমাদের আলোচ্য বোল্‌তার (?) দেহাশ্রয়ী *Cordyceps sphecocephala*-র ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, তাদের দেহ-গাত্র ভেদ করে কতকগুলো সূত্রাকার অংশ বেরিয়ে এসেছে। এগুলোকে উপাঙ্গ বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। আসলে কিন্তু এগুলো ছত্রাকের দেহোদ্ভূত পরস্পর জট পাকানো ছত্রাকসূত্রের স্তবক। এই স্তবকের মাথায় দেখা যায় ছত্রাকের 'স্পোর' উৎপাদনকারী অঙ্গ, যাদের বলা হয় Perithecium, একপ্রান্ত ঈষৎ সূক্ষ্মাকার দেখতে, অনেকটা নারকলি কুলের মত। Perithecium-এর বহিরাবরণ ভেদ করলেই ভিতরে দেখা যাবে আটটি দীর্ঘাকার Ascospore সাজানো রয়েছে। উপযুক্ত সময়ে এই স্পোরগুলো Perithecium-এর সূক্ষ্ম প্রান্তমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং অপর কোন বোল্‌তার দেহে আশ্রয় পাবার অপেক্ষায় থাকে। এই হলো সংক্ষেপে এদের জীবনযাত্রার ইতিহাস।

Cordyceps জাতীয় ছত্রাকদের স্বাভাবিক বাসস্থান নিরক্ষীয় অঞ্চলে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মধ্য আমেরিকা, ব্রেজিল ইত্যাদি স্থানে এদের বহু প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। বস্তুতঃ ফাদার টরুবিয়া নামে একজন পাদ্রী কিউবা দ্বীপে *C. sphecocephala*-র প্রথম সন্ধান পান। সে প্রায় ১৯০ বছর আগেকার কথা। পূর্ব গোলার্ধেও *Cordyceps* জাতীয় ছত্রাক বিরল নয়। সিংহলে এদের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। তবে ভারতবর্ষে এ জাতীয় ছত্রাক বড় একটা চোখে পড়ে না। আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চল থেকে এপর্যন্ত মাত্র দুটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে—একটি ***C. falcata*, Berk.** এবং অপরটি ***C. racemosa*, Berk.** এরা কিন্তু বোল্‌তার দেহাশ্রয়ী নয়; এদের দেখা গেছে প্রজাপতির মৃত শূককীটের দেহে। এছাড়া এ জাতীয় ছত্রাকের বিবরণ ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে আর পাওয়া যায়নি। সুতরাং এদেশে সংগৃহীত *Cordyceps*-দের ক্ষুদ্র তালিকায় *C. sphecocephala* (Kl) Sacc তৃতীয় স্থান লাভ করলো, এ কথা বলা চলে।

Cordyceps জাতীয় ছত্রাক ছাড়াও বিজ্ঞানীরা আরও নানা শ্রেণীর যেসব কীট-পতঙ্গ-দেহোদ্ভূত

ছত্রাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে ***Isaria, Hirsutella, Gibellula, Myriangium*** প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ প্রবন্ধের অল্প পরিসরের মধ্যে দু-চার কথায় এদের প্রত্যেকের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এসব বিভিন্ন শ্রেণীর ছত্রাকের জীবনবৈচিত্র্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছেই। প্রত্যেকেই চায় বিশেষ এক পরিবেশ এবং যে সব কীটের দেহে এরা আশ্রয় নেয় তারাও নানা জাতের। কোনটার আশ্রয়দাতা বিশেষ এক জাতের প্রজাপতি, কোনটার বা মাকড়সা; কেউ জন্মায় পূর্ণাঙ্গ কীটদেহে, কেউ বা কীটের লার্ভা বা পিউপায়।

স্থানীয় পত্রিকাসমূহে মরা বোল্‌তার খবর প্রকাশিত হবার প্রায় এক বছর পূর্বে কলকাতা থেকে মাইল কয়েক দূরে আগড়পাড়ায় পি, সুর এবং বহরুদ্দিন নামে দু-জন ছাত্র এরকম বোল্‌তার প্রথম সন্ধান পায়। এদের অদ্ভুত চেহারা দেখে তাদের মনে কৌতূহল জাগে এবং স্কুলে গিয়ে তাদের বিজ্ঞান-শিক্ষককে সেগুলো দেখায়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনও সদুত্তর না পেয়ে তাঁরই পরামর্শে তারা দু-জনে এই বোলতা-গুলোকে কলকাতার বসুবিজ্ঞান মন্দিরে জমা দিয়ে আসে। তারপর এগুলো কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সহকারী লেক্‌চারার শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেনের হাতে পড়ে। বিশেষ আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় এই মরা বোল্‌তাদের দেহজাত ছত্রাকের গোত্র নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে Massee, Koltzsch, Kobyasi প্রভৃতি ছত্রাকবিদ *Cordyceps sphecocephala* (Kl) Sacc নামে যে কীট-পতঙ্গ-দেহপরিপুষ্ট ছত্রাকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার সঙ্গে এই নবলব্ধ ছত্রাকের গঠন-প্রকৃতি হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই পরীক্ষালব্ধ ফল বৈজ্ঞানিক মহলে প্রকাশ করার ('Current Science' July—1949) মাস কয়েক পরে যখন খবর পাওয়া গেল যে, বোড়াল গ্রামেও অনুরূপ মরা বোল্‌তার(?) সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন সেখান থেকেও কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করে এনে আবার তিনি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে দেখলেন, পূর্ব-বর্ণিত আগরপাড়ার ছত্রাকের সঙ্গে এই ছত্রাকের কোন প্রভেদ নেই।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৬-২৭ সালের মধ্যে কোনও এক সময়ে আসাম থেকে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে কতকগুলো মৃত ভীমরুল পাঠানো হয়। প্রত্যেকটি ভীমরুলের শরীর থেকে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা সূচের মত ২।৩টি করে ছত্রাক বেরিয়ে ছিল। '২৯ সালের শেষের দিকে শ্রীহট্ট থেকে ৪।৫টি মৃত শোঁয়াপোকা বিজ্ঞানমন্দিরে পরীক্ষার জন্যে আসে। ১৯৩৬ সালে মনিরামপুর থেকে এক ভদ্রলোক একটি বড় উইচিংড়ি (ঘুঘরা পোকা) পাঠিয়েছিলেন। তার মুখ ও ঘাড়ের কাছ থেকে তিনটি বেশ বড় ছত্রাক বেরিয়ে ছিল। ছত্রাকগুলো দেখতে আঁকাবাঁকা সূচের মত। প্রবন্ধে বর্ণিত আগড়পাড়া ও বোড়াল গ্রামের বোল্‌তা ও ভীমরুলগুলোও বসুবিজ্ঞান মন্দিরে প্রেরিত হয়েছিল—স]

"সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখবহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র।

কারিগরী বিদ্যা

শ্রীঅমূল্যধন দেব

বিধাতার সৃষ্টিরহস্য যুক্তির সাহায্যে সাধারণের বোধগম্য করা বা সংঘটিত ঘটনাবলীর কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি-দ্বারাই সম্ভব। তাদের চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশ পায়। যেখানে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শেষ, সেখানেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সূচনা। বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রসূত সূত্র বা গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল জগতকে উপহার দেন ইঞ্জিনিয়ার। অবশ্য বৈজ্ঞানিক সূত্রে বা গণিতের সংজ্ঞায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা একমাত্র ঘটনাচক্রে অনেক বড় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক আবিষ্কারেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্ভব। পরিকল্পনাবিদ, বৈজ্ঞানিক সূত্র বা গণিতের সংজ্ঞা অনুযায়ী চলিতে বাধ্য।

হাওড়ার সেতুতে হাজার হাজার অংশ আছে এবং প্রত্যেকটি অংশ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটি বিকল হইলে সেতুটিই বিকল হইবে। যাঁহারা এই সেতুর পরিকল্পনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকটি অংশের শক্তি গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী নির্ধারণ করিয়া সেই ভাবে নক্সা প্রস্তুত করিয়াছেন। একটি রেলওয়ে ইঞ্জিনে প্রায় চার হাজার অংশ থাকে। যাঁহারা পরিকল্পনা ও নক্সা প্রস্তুত করেন, প্রত্যেকটি অংশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিঃসন্দেহ হইতে হয়, কারণ যে কোনও একটি দুর্বল বা বিকল হইলে বিপর্যয় অনিবার্য। যাঁহারা বৃত্তি হিসাবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা পরিপক্ক হইলে, সব সময় গণিতের সূত্রের উপর নির্ভর না করিয়া, তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেও একটি বস্তুর পরিকল্পনা রচনা করিতে সমর্থ হন।

ফলিত বিজ্ঞানের বা ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের গবেষণালব্ধ ফল বা অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক কাজে কার্যকরী করার বৃত্তি যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহারা 'কারিগর' পর্যায়ভুক্ত। কারিগরী বৃত্তি শ্রমসাধ্য-এজন্য প্রত্যেক কারিগরই 'শ্রমিক'। অবশ্য প্রত্যেক শ্রমিকই কারিগর নহেন; যেমন ষ্টেশনের মজুর বা কারখানা যাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন বা কারখানার অভ্যন্তরে মালপত্রাদি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করেন তাঁহারা শ্রমিক হইলেও কারিগর পর্যায়ভুক্ত নহেন।

আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার সুরু হওয়ায় এবং কাহারও কাহারও মতে যন্ত্রশিল্প অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় কারিগরদের প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি হইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে যখন কুটীর শিল্পের প্রচলন ছিল—যেমন কাশ্মীরের শাল, ঢাকার মসলিন, মহীশূর দারুশিল্প, তখন কারিগরদের পেশা বংশগত ছিল এবং কারিগরী বিদ্যা আপন গৃহেই আয়ত্ত করা যাইত। যন্ত্রশিল্পের বেলায় কারিগরী বিদ্যা বাড়ীতে বসিয়া শিক্ষা করা সম্ভব নয়, কোন শিল্প-উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইবে এবং বই পড়িয়া নয়, কাজ করিয়া শিখিতে হইবে।

যে কোন যন্ত্রশিল্প সংস্থায়, উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে গবেষণা ছাড়াও পরিসংখ্যান, অর্থনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকদের উপর শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে, কাজেই শ্রমিকদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দিতে হয়, এইজন্য সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহার ও শিল্পসংস্থার প্রয়োজন।

কারখানার কর্ম-বিন্যাসের যে স্তরে কারিগররা প্রকটিত হন, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল।
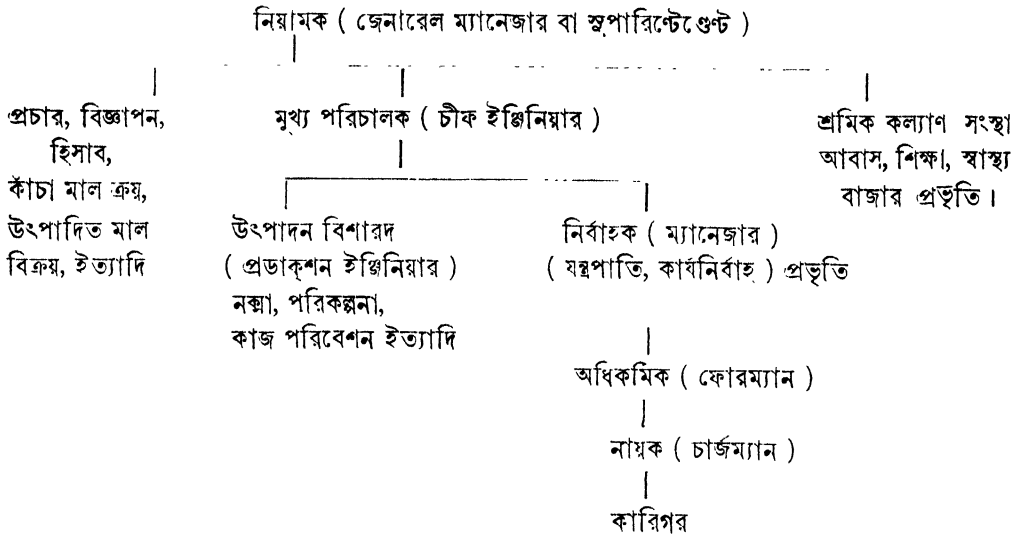
উল্লিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী কারিগররা সংস্থার সর্বনিম্ন স্তরে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং একমাত্র তাঁহাদের সহযোগীতার উপরই উৎপাদন নির্ভর করে। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ যুবকই এখন বেকার জীবনের অবসানকল্পে কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু পাকা কারিগর হইতে হইলে কারিগরের ন্যায় চিন্তা করিতে হইবে, কারিগরের স্বপ্ন দেখিতে হইবে। আমাদের অনেক যুবক কারিগর-জীবন সার্থক করিতে সক্ষম হন না; কারণ তাঁহারা মনে করেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহারা করিগরী বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। কারিগরী বৃত্তি গ্রহণে বুঝিবা মর্যাদা হানি হইল, সংস্কৃতির ব্যাঘাত ঘটিল; "বাবুয়ানী" বা মসী-জীবির মনোবৃত্তি নিয়া যাঁহারা কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও নিপুণতা বা সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন না। অশান্তি, অভিমান ও ব্যর্থতা তাহাদের সাথী হয়। বিদেশে অনেক কারিগরই কারখানার সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। অনেক কারিগর মহামূল্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের দেশেও তাহা অসম্ভব নয়। সুষ্ঠু প্রণালীতে কারিগরী বিদ্যার অনুশীলন করিলে এবং মনে উচ্চ আশা ও প্রেরণা নিয়া বৃত্তি গ্রহণ করিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমাদের যুবকরা যেন কখনই ভগ্ন-মনোরথ ও উদ্যমহীন না হন। কারিগর হইতে হইলে কি কি বিষয়ে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রয়োজন তাহা বিবৃত করিবার পূর্বে কারখানার উৎপাদন সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

একটি প্রবাদ আছে যে 'নক্সাই ইঞ্জিনিয়ারদের ভাষা'। ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞানের অভিব্যক্তি নক্সা ব্যতিরেক সম্ভব নয়। আমাদের দেশের অনেক যন্ত্রপাতিই বিদেশ হইতে আসে, এদেশেও যিনি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন বা উৎপাদন বিশারদের কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের সঙ্গে কারিগরদের সাক্ষাৎ সংস্রব ঘটে না। পরিকল্পনাবিদ বা আবিষ্কর্তা নক্সার মাধ্যমেই কারিগরদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। হাজার মাইল দূর হইতে আসিলেও নক্সায় বর্ণিত ইমারত বা যন্ত্র তৈয়ারী করিতে কারিগরদেও কোনও অসুবিধা হয় না। একই নক্সা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পাঠাইলেও তৈয়ারী জিনিস বিভিন্ন জায়গায়, একই রকম হইবে। কারিগরী বৃত্তিতে উৎকর্ষ লাভ করিতে নক্সা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ত্রিমাত্রিক নক্সাই ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এখনও

প্রচলিত। যে কোনও নক্সা এমনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে যাহাতে যে বস্তুটি উৎপাদন করিতে হইবে তাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা বেড় এবং গভীরতার মাপ পাওয়া যায়।

নক্সা ও ছবির পার্থক্য নিম্নের অঙ্কন হইতে বুঝা যাইবে।

গায় কাটিয়া উপরের স্তর অপসারণ করা হইয়াছে, এইরূপ দৃশ্য দেখাইতে হয়।

নক্সায় অঙ্কিত বস্তুটি কি জিনিস দ্বারা তৈয়ারী, তাহাও নক্সায় লেখা থাকে। দুইটি জিনিস মিলাইবার জন্য মাপের পার্থক্য কত হওয়া প্রয়োজন তাহাও নক্সায় লেখা থাকে। এক ইঞ্চি
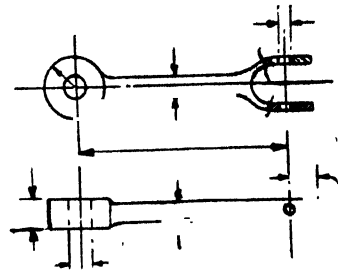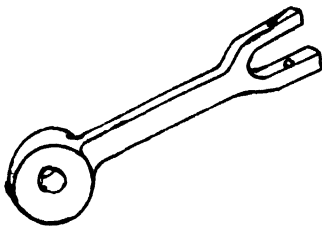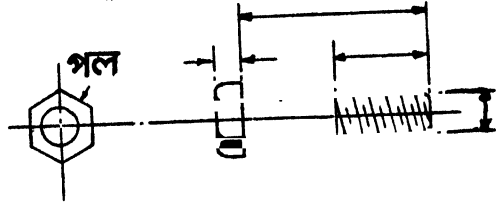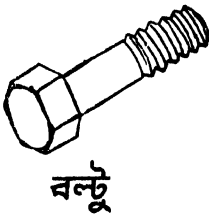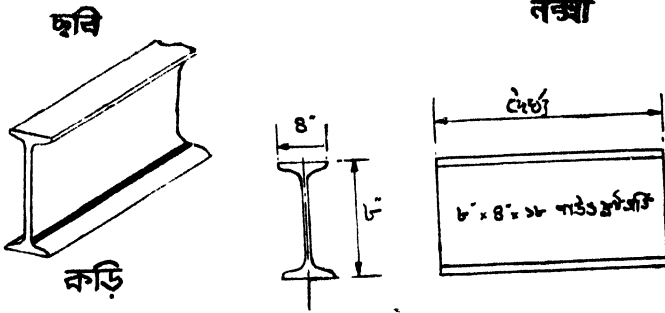
যে কোন একটি দৃশ্য হইতে দুইটির মাপ পাওয়া যায়। অতএব দুইটি দৃশ্য হইতে তিনটি মাপ গ্রহণ করা যায়। এইজন্য দুইটি দৃশ্য অঙ্কন করার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় ভিতরের মাপগুলি দেখাইবার জন্য বস্তুটি সুবিধামত জায়-

ব্যাসের একটি লৌহ শলাকা, এক ইঞ্চি ব্যাসের একটি ছিদ্রপথে সহজে প্রবিষ্ট হইবে না। এইজন্য মাপের তারতম্য প্রয়োজন। যেমন শলাকাটি যদি ১"—·০০২" এই মাপের হয় তবে অনায়াসেই ১" ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইবে। বিভিন্ন প্রকারের

মিল-এর জন্য মাপের অনুরূপ তারতম্য হয়। বস্তুটির বাহ্যিক মসৃণতা কি প্রকার হওয়া উচিত, যেমন শানদার। পালিশকরা বা হাতে ঘষিয়া পালিশ করা বা পালিশ বিহীন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্যও নক্সায় সন্নিবদ্ধ থাকে।

একটি বস্তুর নক্সা দেখিয়া, বস্তুটি তৈয়ার করিতে কোন্ কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন, কোন্ কোন্ যন্ত্রে কতঘণ্টা সময় লাগিবে, মজুরী কত পড়িবে, কি কি হাতিয়ার প্রয়োজন, কতটুকু কাঁচামাল লাগিবে—সমস্তই কারিগর বুঝিতে পারেন; কিন্তু কার্যতঃ কারিগরদের এজন্য দায়িত্ব নিতে হয় না। উৎপাদন বিভাগ হইতেই সমস্ত কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা, হাতিয়ারের ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ যন্ত্রে কত ঘণ্টা কাজ হইবে তাহা নির্দিষ্ট ফর্মে পূরণ করিয়া দেন এবং কোন্ খাতে মজুরীর হিসাব করিতে হইবে তাহাও লেখা থাকে। উক্ত ফর্ম বা কাজের হুকুম অধিকর্মিকের কাছে দেওয়া হয়। তিনি নায়ককে সব বুঝাইয়া দেন এবং প্রয়োজন হইলে উৎপাদন বিশারদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। নায়ক তাহার অধীনস্থ কারিগরকে সব বুঝাইয়া দেন এবং উৎপাদন শেষে পরীক্ষা করিয়া সামগ্রী 'পাশ' করেন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কারখানার উৎপাদন নির্বাহ হয় এবং কারিগর তাহার কর্তব্য সম্পাদন করেন। যোগ্য কারিগরের পক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন :—

(১) নক্সা।

(২) কাঁচামাল :—লৌহ অনেক প্রকারের আছে। একটি বল্টু, একটি স্প্রীং, একটি বাটালী একই প্রকার ধাতব সামগ্রী হইতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট লৌহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য তৈয়ারী হয়। পিতল, কাঁসা ও বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন হয়। এইসব ধাতু বা ধাতু-সঙ্কর সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(৩) হাতিয়ার ও জোগান :—যে বস্তুটি উৎপাদন করিতে হইবে তাহাকে যন্ত্রের উপর কি ভাবে বসাইতে হইবে বা বাঁধিতে হইবে, মাপ-জোক করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। বস্তুতঃ এইখানেই কারিগরদের নিপুণতার পরীক্ষা হয়। বস্তুটি যন্ত্রের উপর পটুতার সহিত বাঁধিতে পারিলে অনায়াসে কাজ হয় এবং কারিগরকে চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়—কি পন্থায় অনায়াসে ও কম সময়ে কাজ সম্পন্ন হইবে।

(৪) বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একটি ছিদ্র করিতে হইলে ড্রিল, বোরিং যন্ত্র বা লেদ্-এ করা যায়; কিন্তু কোন্ যন্ত্রে করিলে সহজে ও কম সময়ে হইবে তাহা কারিগরেরা বুঝিতে পারেন। অবশ্য যন্ত্র সম্বন্ধে হুকুম, নায়ক বা অধিকর্মিকই দিয়া থাকেন।

যদি কোনও কারিগরী বিদ্যালয় বা কারখানায় কারিগরী বৃত্তি শিখিতে হয় তবে শিক্ষার্থীকে নক্সাঘরে, ঢালাইঘরে, ফর্মাঘরে, কামারশালে, মেশিনশপে, ফিটিংশপে ও টুলরুমে হাতেকলমে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। বাড়ীতে বসিয়া বই পড়িয়া এই সম্বন্ধে ধারণা করা অসম্ভব নয়; কিন্তু কারখানায় নিজ হাতে কাজ না করিলে নিপুণতা অর্জন করা যায় না। কারিগরী বিদ্যায় নিপুণতাই সর্বাধিক কাম্য। নিপুণ কারিগরের অভাব পৃথিবীর সর্বত্রই এবং তাহাদের মর্যাদা কারখানা-মহলে সবচেয়ে বেশী।

নক্সা সম্বন্ধে দুই চার কথা পূর্বে লিখিয়াছি। ঢালাইঘরে কাজ শিখিবার সময় ফর্মার সাহায্যে মাটিতে ছাঁচ তৈয়ারী করা শিখিতে হইবে। বিভিন্ন প্রকারের ঢালাই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। চীনা লোহার বেলায় সিলিকন ও ফসফরাসের প্রভাব কি রকম তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। তামা বা দস্তার সংমিশ্রণে যে সঙ্কর-ঢালাই হয় তাহারও বিভিন্ন অনুপাত ও গুণাবলী লক্ষ্য করিতে হইবে। ফর্মা তৈয়ারী করিতে হইলে

নক্সা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হইলে আয়তনে কমে; এইজন্য ফর্মা তৈয়ারী করিবার সময় সেই অনুপাতে মাপ বড় রাখিতে হয়। কামারশালে প্রস্তুত বস্তুকে পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে—যেমন অ্যানিলিং, নরমেলাইজিং কাযের উপযোগী করিতে হয়। টুলরুমে কাজ করিলে বিভিন্ন হাতিয়ার ও জোগান সম্বন্ধে ধারণা হয়; তাছাড়া কাটিবার বাটালী ইত্যাদিকে কি ভাবে ধার দেওয়া হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। যেমন—টেম্পারিং, কোয়েঞ্চিং। মেশিন ও ফিটিংশপে কাজ করিলে বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রের উৎপাদিত সামগ্রীকে কি ভাবে সংযোজন করা যায় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

আমাদের দেশে প্রায়ই শোনা যায় যে, উপযুক্ত কারিগর পাওয়া যায় না। অথচ এদিকে কারিগরী বিদ্যালয়-ফেরৎ হাজার হাজার বেকারও আছেন। নিপুণতার অভাবই এই অসামঞ্জস্যের প্রধান কারণ। অন্য কারণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যাহারা কারিগরী শিক্ষা পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের পরিকল্পনার বা বাস্তব জ্ঞানের নিতান্ত অভাব।

আমাদের দেশে কারিগরী বিদ্যা শিখাইবার নিম্নলিখিত সংস্থা আছে:—

(১) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:—পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদের দেশীয় স্নাতকেরা বিদেশীয়দের সমকক্ষ; কারণ একই পাঠ্য-পুস্তক (সমস্তই বিদেশীয়) এদেশে ও বিদেশে পড়ান হয়। তবে হাতেকলমে কাজ শিখিবার সুযোগ আমাদের দেশীয়েরা তেমন পান না, এজন্য মর্যাদায় খাটো। আমাদের দেশে ইঞ্জিনিয়ারদের গবেষণার সুযোগ নাই। বিশেষজ্ঞও বিশেষ নাই। ব্রিটিশ আমলে বিলাতের ইনষ্টিটিউশন অব সিভিল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস্ আমাদের দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর আমল দিত না। বর্তমান লেখক এজন্য আন্দোলন করিয়াও কৃতকার্য হন নাই; কারণ তখনও বেশীর ভাগ দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারই সরকারী চাকুরিয়া এবং অবশিষ্ট ঠিকাদার, যাহাদের এসব বিষয়ে মাথাব্যথা নাই। তাছাড়া প্রভাবশালী কোনও সংস্থাও নাই; রাজনৈতিক অনুমোদন তো নাই-ই। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে পাশ করিয়াও অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী লাভে সমর্থ হন না। ঠেকায় পড়িয়া তাহারা কারিগরী বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনেকেই নিজেকে নিম্ন-অবস্থায় খাপ খাওয়াইতে পারেন না এবং জীবন বিফল হইয়াছে মনে করেন। উপযুক্ত সুযোগ দিলে ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলে ইহারাও কর্মজীবনে উন্নতি করিতে পারেন। নীচের ধাপ হইতে উপরে উঠা ইহাদের পক্ষে সহজসাধ্য। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত নিপুণতার সংযোগ ঘটিলে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়।

(২) ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল:—স্কুলে সাধারণতঃ এই রকম শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে স্নাতকেরা নায়ক ও অধিকর্মিকের পদে যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন। কার্যক্ষেত্রে তাহাদের পারদর্শিতা নিজ নিজ নিপুণতার উপরই নির্ভর করে। স্কুল ত্যাগের পর তাহারা কোনও কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে হাতেকলমে কাজ করিতে পারেন।

(৩) অ্যাপ্রেন্টিস স্কুল:—অনেক সমৃদ্ধ কারখানার কর্তৃপক্ষ নিজেরাই শিক্ষানবীশ নিযুক্ত করেন এবং কারখানায় হাতেকলমে কাজ শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ ইহাদের শিক্ষানবীশী কাল পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এবং শিক্ষা শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মত নায়ক পদের যোগ্যতা লাভ করেন। রেলওয়ে, পোর্ট-কমিশনারস্, সামরিক কারখানা প্রভৃতিতে নিজস্ব শিক্ষানবীশ নেওয়ার প্রথা আছে এবং নায়ক পদের জন্য তাহারা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রদের মুখাপেক্ষী নহেন। এই জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্রেরা চাকুরী জুটাইতে কষ্ট পান।

একটি কারখানায় গড়ে প্রতি ৫০ জন কারিগরের জন্য একজন নায়ক প্রয়োজন হইতে

পারে। এইজন্য কারিগরের তুলনায় নায়কের সংখ্যা কম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নায়ক প্রতি বৎসর কারিগরী বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে এবং বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করিতেছে। অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে চারিটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

(৪) বঙ্গদেশের হিজলীতে পূর্ব ভারতীয় কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ পর্ব চলিতেছে। এই বিদ্যালয়ের স্নাতকেরাও কারখানার নায়ক পদের প্রার্থী হইবেন বলিয়া অনুমান হয়। ইহাতে নায়ক পদ প্রার্থীদের বেকার সমস্যা বাড়িবে। আমাদের প্রয়োজন কারিগরের। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী মনোনীত সংস্থা এই চারিটি সর্বভারতীয় বিদ্যালয়ের নিয়ামক; তাহার সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নহেন। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ইঁহাদের পরিচয় নাই; থাকিলেও অন্যের রিপোর্ট মারফত। সরকারী আরও সংস্থা আছে; যেমন—জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইত্যাদি—সেখানে ইঞ্জিনিয়ারেরা নিয়ামক নহেন। রাজনীতি বা ক্ষমতালোলুপ স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক যতদিন না যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিবেন ততদিন যে কোন সংস্থাই প্রাণবন্ত হইবে না। সমস্ত কৃতকর্ম ফাইলেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৫) কারিগরদের শিক্ষার জন্য যুদ্ধের সময় অনেক কেন্দ্র খোলা হয় এবং মাস ছয়েক সাধারণ কারিগরী শিক্ষা দিয়া ইহাদিগকে কারিগরী কার্যে নিয়োগ করা হইত। বর্তমানেও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্য যুদ্ধোত্তর এই রকম কয়েকটি কেন্দ্র চালু আছে। এই সব সংস্থা হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হন তাঁহারা কারিগরী কার্যে নিযুক্ত হন। ইহার পর নিপুণতা অর্জন করা কারিগরদের নিজের বুদ্ধিমত্তা, অনুরাগ ও শ্রমের উপর নির্ভর করে। আমরা এমন অনেক বিদেশীয় উদ্ভাবকের কথা জানি যাহারা কারিগর ছিলেন; কিন্তু নিজ প্রতিভায় তাহারা অনেক কিছু উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কারিগরেরা যদি তাহাদের চাকুরে-মনোবৃত্তি পরিহার পূর্বক স্বাধীন চিন্তা করেন এবং নব নব উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে চিন্তা করেন তবে আমাদের দেশেও কারিগরদের মধ্যে উদ্ভাবকের সৃষ্টি হইতে পারে। বিদেশে অনেক কারিগরই কারখানার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। কারখানার কাজ সমাপনের পর তাহারা নৈশ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ডাকযোগেও শিক্ষা দিবার বেসরকারী সংস্থা আছে। অশেষ ধৈর্য, শ্রম ও অনুরাগের সহায়তায় কর্মজীবনে সর্বনিম্ন পদ হইতে সর্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করা সম্ভব হইতে পারে। আমাদের দেশে কবে সেদিন আসিবে যখন কারিগরেরা কারখানার প্রধান কর্মকর্তার পদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন?

কারখানাই কারিগরী বিদ্যার পীঠস্থান, স্কুল-কলেজ নহে। আমাদের দেশে যাহারা কারিগরী বিদ্যা নিয়ে আলোচনা বা মন্তব্য করেন তাহারা এই সত্যটি প্রায়ই বিস্মৃত হন। কারিগরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে কারিগরদের গুণ বা নিপুণতা বৃদ্ধি হয় না। নায়কদের জন্য স্কুল খুলিলে কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না। যে বিষয়ে সব চেয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন সেখানেই শিথিলতা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শিল্পপতিরাও এজন্য দায়ী কি? অনেক কারখানায় কারিগরদের পুঁথিগত যৎসামান্য বিদ্যাদানের জন্য কারখানার ভিতরেই কাজের ফাঁকে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা পড়ান হয়। ইহাদিগকে ট্রেড অ্যাপ্রেণ্টিস বলা হয়। সাধারণতঃ চারি বৎসর ব্যাপী এই পড়া হয়। অনেক কারখানার সংলগ্ন নৈশ বিদ্যালয়ও আছে। সত্যিকারের যাহারা কারিগর তাহাদের মান-এর উন্নতি বা নিপুণতা লাভের সুযোগ একমাত্র ট্রেড অ্যাপ্রেণ্টিস ও নৈশ বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনেই সম্ভব। বর্তমানে এই সংস্থাগুলি একমাত্র কারখানার মালিকই চালনা করেন; যতটুকু তাহাদের দরকার

ততটুকুই তাহারা ভাবেন, কারিগরদের নিপুণতার কথা ভাবেন কি? বর্তমান ব্যবস্থায় অনুরাগ সৃষ্টি বা প্রতিভা বিকাশের তেমন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন না। (কোনও কারিগর যদি প্রতিভার পরিচয় দেয় তবে তাহাকে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত —ইহা একটি কারণ কি?)। অন্যান্য দেশের কারিগরদের ন্যায় আমাদের দেশেও কারিগরদিগকে তাহাদের বৃত্তির উন্নতির জন্য সব রকম সুযোগ দিতে হইবে। কারখানার কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আরও উদার ও বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিলেই দেশে নিপুণ কারিগর সৃষ্টি হইবে। কারখানার অভ্যন্তরেই কারিগরী বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইবে। স্কুল স্থাপন করিলেই ইহা হইবে না। ইঞ্জিনিয়ারেরা বই পড়িয়া যাহা শিখেন, কারিগরেরা হাতে কাজ করিয়া সেইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে এবং বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন। তাহাদিগকে সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিলেই দেশে নিপুণ কারিগর সৃষ্টি হইবে, শিল্পের উন্নতি হইবে। অন্যথায় বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে।

রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে যক্ষ্মারোগ নির্ণয়

বর্তমানযুগে শ্রমশিল্প ও ভেষজশিল্পে রঞ্জেন রশ্মির ব্যাপক ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৮৯৫ সালে রণ্টগেন অদ্ভুত এক রশ্মি আবিষ্কার করেন। এই রশ্মি সম্বন্ধে তখন বিশেষ কিছু জানা যায় নাই বলিয়া তিনি ইহার নামাকরণ করেন এক্স্-রে। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, রঞ্জেন রশ্মির কতকগুলি পদার্থ ভেদ করিবার শক্তি আছে। বর্তমানে ধাতুর গঠন এবং ধাতুর দোষ-ত্রুটি নির্ণয়ের জন্য ধাতুশিল্পে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে দন্ত পরীক্ষা বর্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই কার্যের জন্য এরূপ এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহা যে কোন দন্ত চিকিৎসক অনায়াসে এবং বিশেষ সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন।

ক্যানসার এবং অন্যান্য কয়েকটি রোগের চিকিৎসায় রঞ্জেন রশ্মি ব্যবহারে আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া যায়। রঞ্জেন রশ্মি এই সকল রোগের বৃদ্ধি রোধ করে এবং ইহা প্রয়োগের ফলে শরীরের রোগাক্রান্ত অংশের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের উপর কোন মন্দ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। চিকিৎসকদের অবশ্য সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, কারণ এই রশ্মির মাত্রাধিক্য ঘটিলে দেহের ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়া থাকেন। ফলে, বর্তমানে রোগী এবং রশ্মি প্রয়োগকারী উভয়েরই কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে।

রণ্টগেনের আবিষ্কার মানবজাতির পক্ষে এক বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুসফুসের যক্ষ্মার মত সাংঘাতিক ব্যাধি অতি অল্পই আছে। প্রাথমিক অবস্থার ধরা পড়িলে এই রোগ নিরাময় করা অসম্ভব নহে। বর্তমানে রঞ্জেন রশ্মি প্রয়োগের দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হইতেছে। রণ্টগেন যে যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন তদ্দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইত না; কারণ যন্ত্রটি ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং নিখুঁত ছবি তুলিবার মত তখন প্রয়োজনীয়

মালমশলাও পাওয়া যাইত না। কালক্রমে রশ্মি প্রয়োগের জন্য উন্নত ধরনের যন্ত্র নির্মিত হয়; কিন্তু অতি দ্রুত বহু সংখ্যক ছবি তুলিবার জন্য একটি যন্ত্রনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৯৩০ সাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য যত্নবান হন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। যুদ্ধকালে যক্ষ্মারোগের অত্যধিক বিস্তার ঘটায় যুক্তরাজ্য গভর্ণমেণ্ট এই রোগ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা করিতে থাকেন। বর্তমানে বৃটেনে এরূপ উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি নির্মিত হইতেছে যাহার সাহায্যে চিকিৎসকদের অবশ্য প্রয়োজনীয় কেবলমাত্র যে সুন্দর, সুস্পষ্ট ও নিখুঁত ছবি তোলা যাইতেছে তাহাই নহে, অত্যন্ত দ্রুত বহু সংখ্যক ছবি তোলাও সম্ভব হইতেছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে Mass Miniature Radiography. এই নামকরণের কারণ হইল এই যে, ইহাতে ৩৫ মিলিমিটারের ফিল্ম ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং ইহার সাহায্যে একসঙ্গে বহু লোকের ছবি তোলা সম্ভব হয়।

বহনযোগ্য Mass Radiography-র যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোন কারখানার সমস্ত কর্মীদের অথবা কোন অঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণের ফুসফুস পরীক্ষা করিয়া যক্ষ্মারোগ আক্রমণ নির্ণয় করা হয়, যে অবস্থায় রোগের কোন বহির্লক্ষণ প্রকাশ না-ও পাইতে পারে। ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য ব্যাধিও ইহার সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি কিছুকালের মধ্যে Mass Radiography-র সাহায্যে বৃটেনের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এক সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ কালের মধ্যে ছবি গ্রহণের কাজ শেষ হয় এবং একজন দক্ষ অপারেটর ও তাঁহার সহকারী মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ১২০ জন লোকের ফুসফুসের ছবি তুলিতে সক্ষম হন।

যুক্তরাজ্যের কতকগুলি কারখানায় Mass Miniature Radiography-র যন্ত্রপাতি ও রঞ্জেন রশ্মির টিউব প্রচুর পরিমাণে নির্মিত হইতেছে এবং বিদেশেও যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানি করা হইতেছে। কমনওয়েলথ দেশগুলিই প্রধান ক্রেতা; কিন্তু নিকট প্রাচ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশও এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হইতেছেন। আগামী জুলাই মাসের ১৪ তারিখ হইতে ২৮ তারিখ পর্যন্ত লণ্ডনে রেডিওলজি সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে লণ্ডনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে—যেখানে বৃটেনে নির্মিত Mass Miniature Radiography এবং রঞ্জেন রশ্মি সংক্রান্ত বহুপ্রকার যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হইবে।

উক্ত সম্মেলন বিশ্বের সকল দেশের রেডিওলজিষ্টদের পক্ষে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিগত সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোতে, ১৩ বৎসর পূর্বে। এই সময়ের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যার এই ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে, জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে বহুপ্রকার নূতন নূতন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত এবং ব্যবহৃত হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা হইতে সম্ভবত বহু বৎসর লাগিত। এই সকল যন্ত্রপাতি যে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদেরই কাজে লাগিবে তাহা নহে, বিশ্বের যে কোন দেশের পল্লীবাসীরাও ইহার সাহায্যে উপকৃত হইতে পারে। রোগ পরীক্ষার জন্য যাহাদের সহজে হাসপাতালে যাইবার উপায় নাই, হাসপাতালকেই অতি সহজে তাহাদের নিকট লইয়া যাওয়া চলে। লিওনার্ড, জি, রুল।

বৃটিশ প্লাসটিক ইনডাস্ট্রিজের তৈরী প্লাসটিকের বিভিন্ন রকমের জিনিস
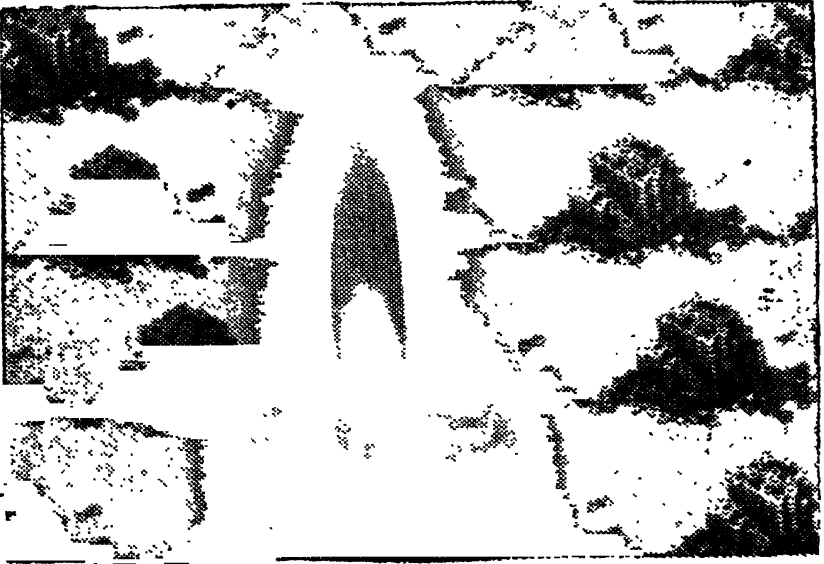
উত্তাপ প্রয়োগে চিনি অথবা প্যারাফিনের মত জিনিসের অণুগুলো যেমন পরস্পর সংযুক্ত না থেকে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় প্লাস্টিকের অণুগুলোও সেরূপ ব্যবহার করে থাকে।

জাগতিক সমস্ত পদার্থই অণু দিয়ে গঠিত, এই অণুগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণাবিশেষ। ২৫,০০০,০০০ অণু পাশাশাশি সাজালে এক ইঞ্চি পরিমাণ হয়।

যন্ত্র সাহায্যে প্লাসটিকের আঁশ বা সূতা তৈরী হচ্ছে

সমস্ত অণুই চুম্বক লোহার মত একে অন্যের সঙ্গে আটকে থাকে। এর প্রকৃতি প্রায় 'আঠালো' বলা যেতে পারে। এই ভাবে তারা আটকে থাকে বলেই কঠিন পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব।
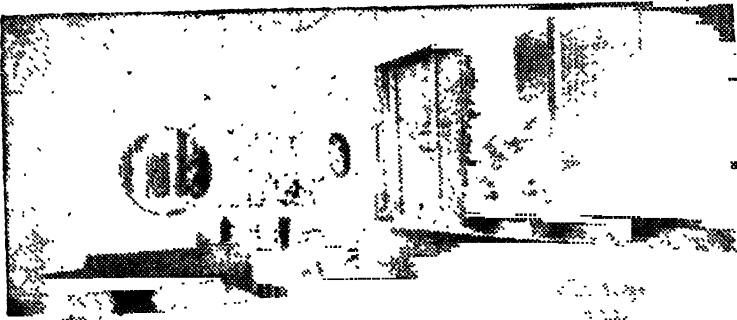
প্লাসটিকের তৈরী বিভিন্ন রকমের আসবাব পত্র

তাছাড়া অণুগুলোকে খুব বেশী উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে প্রয়োজন মত জমাট বাঁধিয়ে ফেলা যায়। তাতে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তা রেশম, পশম, তুলা, কাঠ এবং রবারের মত বহু প্রাকৃতিক দ্রব্যের মধ্যেও বহু পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়।

এই টেলিফোনটি থার্মোসেটিং প্লাসটিকের তৈরী

এই পদার্থের বিশেষ গুণ হলো তার কাঠিন্য। এগুলো তরল নয়, কিন্তু নমনীয় বা প্লাস্টিক।

আজকাল সর্বত্র অন্যান্য পদার্থের সাহায্যে নানাধরনের প্লাস্টিক প্রস্তুত হচ্ছে। তা গরম করে যেকোন ছাঁচে ঢেলে ইচ্ছামত জিনিস তৈরি করা যায়, ঠাণ্ডা হলে তা আবার শক্ত হয়। এই পদার্থকে বলে থার্মোপ্লাস্টিক।

বৃটেনে এই প্লাসটিক শিল্প ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করছে। তাতে আজকাল নানারকম নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই শিল্প বয়সে তরুণ হলেও বিশ্বব্যাপী আগ্রহ এবং উৎসাহ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

"* * * এইরূপ খাপছাড়া ব্যাপার নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাদুরি। অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে পান, ইহাতেই তাঁহার এতটা দর্প। অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত একটা নূতন তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয়। আপাততঃ ইহা একটা সমস্যা বলিয়া ঠেকে। কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে ; কিন্তু যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নূতন সত্যকে পুরাতন পূর্ব্বপরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোঠায় না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধির বলে তিনি কালে সেই সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন ; তখন তাহা আর অসমঞ্জস বা খাপছাড়া থাকে না। বিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাসই তা-ই—যাহা এককালে খাপ ছাড়া ছিল, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে * * *"

—রামেন্দ্রসুন্দর

বন্ধু জীবাণুর কথা

শ্রীদিলীপকুমার দাস

জীবাণু নামটা শুনলে প্রথমেই মনে পড়ে এদের ভয়ঙ্করত্বের কথা। সাংঘাতিক সব রোগের বীজ এরা বহন করে বেড়ায়, প্রতিদিন অজস্র লোককে এরা রোগগ্রস্ত করে তোলে আবার প্রতিদিন অজস্র লোকের রোগজনিত প্রাণহানির জন্যে এরাই মুখ্যতঃ দায়ী। এদের ভয়াবহ স্বরূপ জ্ঞাত হবার পর স্বভাবতই এদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষভাব জেগে ওঠে ও মনে হয় জীবাণুগুলোকে শেষ করে ফেলতে পারলেই ঠিক হতো। সমগ্র জীবাণুজাতির প্রতি এরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করে আমরা ভুল করি; কারণ জীবাণুমাত্রেই আমাদের শত্রু নয়। এদের মধ্যে অনেক জীবাণু আছে যারা আমাদের বন্ধুর মত কাজ করে।

পৃথিবীতে যদি শুধু অনিষ্টকারী জীবাণুই থাকতো তাহলে তারাই এতদিনে পৃথিবী ছেয়ে ফেলতো এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব সংশয়জনক হয়ে দাড়াতো। এক ধরনের জীবাণু আছে যারা এই অনিষ্টকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলছে এবং এই কাজের দ্বারা তারা আমাদের বন্ধুত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে। আর এক ধরনের জীবাণু আছে যারা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে নানা ধরনের কাজ দ্বারা আমাদের উপকার করছে যার জন্যে তারাও আমাদের বন্ধু পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, জীবাণু নাম শুনেই আঁৎকে ওঠা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা এখন নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধু জীবাণুদের কথা আলোচনা করতে পারি।

বন্ধু জীবাণুদের কথা সম্পূর্ণভাবে অবগত হবার বহু পূর্বেই রোগ জীবাণু অথবা অনিষ্টকারী জীবাণুর কথা জানতে পারা গিয়েছিল। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে জীবাণুর অস্তিত্বের কথা বর্ণিত আছে। অথর্ব বেদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সংক্রামক রোগ ও তাদের প্রতি-ষেধনের জন্যে যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা লিখিত আছে তাতে মনে হয়, প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ জীবাণু অথবা ঐ জাতীয় কোনও রোগ উৎপাদনকারী পদার্থে বিশ্বাসী ছিলেন।

আধুনিক যে জীবাণু-বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা পরিচিত, যার ফলে আজ আমরা জীবাণু সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি, তার ইতিহাসের সুরু খুব বেশীদিন আগে হয়নি। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারক ওলন্দাজ লিউয়েন-হোয়েক প্রথম জীবাণুদের কথা জানতে পারেন। লিউয়েনহোয়েকের পর স্প্যাল্লানজানি, রবার্ট কক্‌, পাস্তর এবং আরও অনেকে জীবাণু সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। এঁরা প্রায় সবাই রোগ-জীবাণু নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বেশী। শুধু মেচনিকফই, রোগ-জীবাণু নিয়ে গবেষণা করলেও, ঐ জীবাণুগুলোর শত্রু এবং আমাদের বন্ধু, একপ্রকার জীবাণুর কথা জানতে পেরেছিলেন।

রোগ-জীবাণুর শত্রু জীবাণুর কথা আলোচনা করবার পূর্বে যে সমস্ত জীবাণু প্রত্যহ আমাদের অগোচরে নানাভাবে আমাদের উপকার করছে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ডাষ্টবিন অথবা আবর্জনার স্তূপ এবং নর্দমা থেকে আমরা প্রায়ই দুর্গন্ধ পেয়ে থাকি। দুর্গন্ধ বেরুলে পর আমরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলি 'পচাগন্ধ বেরিয়েছে'। যে আবর্জনাগুলো ফেলে

দেওয়া হয়েছিল সেইগুলোই পচে ঐ রকম দুর্গন্ধ বেরোয়। ঐ পচা জিনিসগুলোর মধ্য থেকে যদি কোনও অংশ তুলে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য জীবাণু রয়ে গেছে ঐ অংশটুকুর মধ্যে। এই জীবাণুগুলোই আবর্জনাগুলোকে পচিয়ে ফেলে এবং তার জন্যেই দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। আবর্জনার মধ্যে জলের পরিমাণ বেশী থাকলে দুর্গন্ধ আরও বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। যে কোনও জিনিস পচবার জন্যে জীবাণুরাই দায়ী।

জীবাণুরা জৈব পদার্থের দেহের উপাদানগুলো, যথা—প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ ইত্যাদি বিয়োজিত করে' নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে এবং এই পদার্থগুলোই কালক্রমে মাটির সঙ্গে মিশে সারের কাজ করে। সাধারণতঃ জীবাণুদের দ্বারা এইভাবে জৈব পদার্থের দৈহিক উপাদানগুলো বিয়োজিত করাই হলো পচনক্রিয়া। পচনক্রিয়া কোনও একপ্রকার নির্দিষ্ট জীবাণুর দ্বারা সমাধা হয় না, এর জন্যে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য জীবাণুর। এই জীবাণুগুলোর পর্যায়ক্রমে কাজ করবার ফলেই সম্ভব হয় পচনক্রিয়া।

জীবাণুরা যদি পচনক্রিয়ার এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ না করতো তাহলে মৃতদেহ এবং অন্যান্য আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করে তোলা মানুষের পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো। শুধু আবর্জনা অপসারণই নয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষকে উদ্ভিদের আহারোপযোগী করে তুলে জীবাণুরা উদ্ভিদ-জগৎ তথা সমগ্র জীব-জগৎকে জীবন ধারণে সহায়তা করছে।

আর এক ধরনের জীবাণু আছে যারা পচনক্রিয়ার মতই একটা কাজ করে—যার নাম হলো সন্ধানক্রিয়া বা ফারমেনটেশন। সন্ধানক্রিয়া বলতে সাধারণতঃ জীবাণুর প্রভাবে শর্করাজাতীয় পদার্থের গাঁজিয়ে ওঠাকেই বোঝায়। শর্করাজাতীয় পদার্থ ছাড়াও আরও কতকগুলো ক্ষেত্রে এই জাতীয় জীবাণুর কতকগুলো কাযকে সন্ধানক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। কাযতঃ, সন্ধানক্রিয়া ও পচনক্রিয়ার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। পচনক্রিয়া ও সন্ধানক্রিয়া নির্বাহকারী জীবাণুগুলো এক গোষ্ঠীভুক্ত না হলেও এদের কাযপ্রণালী মূলতঃ এক। উভয়ক্ষেত্রেই জীবাণুগুলো বিয়োজন-কাযে নিযুক্ত থাকে। অবশ্য, জীবাণুদের বেশীরভাগ কাজেই এই বিয়োজন-কায দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক, সন্ধানক্রিয়ার সাহায্যে জীবাণুরা মদ, পাউরুটি প্রভৃতি তৈরী করতে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

আমাদের মধ্যে অনেকের জানা নেই, যে দই আমরা খেয়ে থাকি সেটা একপ্রকার জীবাণুরই কীর্তি। এই জীবাণুগুলো দুধের মিল্ক সুগারকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে ও ল্যাকটিক অ্যাসিডের জন্যে দুধের কেসিন জমে যায় এবং দই তৈয়ারী হয়। 'চীজ' তৈরী করবার সময়ও জীবাণুরা বহুল পরিমাণে সাহায্য করে থাকে।

তামাক পাতা থেকে তামাক পাবার পূর্বে 'কিওরিং' ও 'রাইপেনিং' প্রক্রিয়াদ্বয়কে সাহায্য করে একপ্রকার জীবাণু। জীবাণুর এই সহায়তার জন্যেই বিভিন্ন ধরনের স্বাদ ও গন্ধবিশিষ্ট তামাক পাওয়া সম্ভবপর হয়।

কাঁচা চামড়া থেকে ব্যবহারোপযোগী চামড়া তৈরী করবার সময় একধরনের জীবাণুর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। আজকাল যদিও এই কাযে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বেড়ে চলেছে তাহলেও কাঁচা চামড়া থেকে মেদ ও অন্যান্য পদার্থ অপসারণ কার্যে জীবাণুর সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পচনক্রিয়া আলোচনার সময় জীবাণুদের দ্বারা জৈব পদার্থের দেহস্থিত যৌগিক পদার্থগুলোকে বিয়োজনের কথা বলা হয়েছে। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার

সময় জৈব পদার্থগুলোর দেহস্থিত প্রোটিন, অ্যামোনিয়ার কতকগুলো যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। মাটিতে অবস্থানকারী দুইপ্রকার জীবাণু যথাক্রমে উক্ত যৌগিক পদার্থগুলোকে নাইট্রাইটে, ও নাইট্রাইট থেকে নাইট্রেটে পরিবর্তিত করে। এই-ভাবে জীবাণুদের দ্বারা তৈরী নাইট্রেট উদ্ভিদ জগৎ গ্রহণ করে থাকে।

পচনক্রিয়ার সাহায্যেই শুধু জীবাণুরা যে উদ্ভিদ জগৎকে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে থাকে, তা নয়। লেগুমিনাস শ্রেণীর উদ্ভিদের সঙ্গে মিথোজীবি-জীবন যাপন করে এক শ্রেণীর জীবাণু। তারা ওই উদ্ভিদকে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য জোগানো ছাড়াও জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। জীবাণুরা প্রথমে মূল রোমের ভিতর দিয়ে মূলে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বাসা বাঁধে। মূলের যে জায়গায় এরা বাসা বাঁধে সে জায়গাটা স্ফীত হয়ে থাকে। জীবাণুগুলো মাটিতে যে নাইট্রোজেন পায় সেটাকে যৌগিক পদার্থে পরিণত করে গাছকে দেয় এবং প্রতিদানে গাছ জীবাণুকে শর্করা এবং অন্যান্য খাবার যোগায়। গাছকে নাইট্রোজেন থেকে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ সরবরাহ করলেও গাছের মূলে, জীবাণুদের বাসস্থানে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থ বেশ খানিকটা থেকে যায়। গাছের মৃত্যুর পর গাছের মূল মাটির নীচে থেকে গেলে সেগুলো কালক্রমে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মূলের ভেতরে অবস্থিত জীবাণুর দ্বারা তৈরী নাইট্রোজেনঘটিত যৌগিক পদার্থগুলোও মাটির সঙ্গে মিশে যায় ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

আর এক ধরনের জীবাণু আছে যারা অন্য কোনও উদ্ভিদের সাহায্য না নিয়েই মাটিতে স্বাধীনভাবে বাস করে' জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে পারে। হিসেব করে দেখা গেছে, এরা এক বছরের মধ্যে এক একর জমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ পনের থেকে চল্লিশ পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

এবার রোগ-জীবাণুর শত্রু ও আমাদের বন্ধু জীবাণুর কথা আলোচনা করা যাক। আজ জীবাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-মহলে ধারাবাহিক গবেষণা ও গবেষণাগারের বাইরে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান কৌতূহলের কারণ হলো, যে সমস্ত ব্যাধি মানব-সমাজে ত্রাসের সঞ্চার করে থাকে তাদের কতক-গুলোকে বিজ্ঞানীরা দমন করতে সমর্থ হয়েছেন, জীবাণু থেকে লব্ধ ওষুধের সাহায্যে। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে প্রচারিত হয়—ফ্লেমিং আবিষ্কৃত পেনি-সিলিনের কথা। এরও আগে আবার কয়েকজন বিজ্ঞানী জানতে পেরেছিলেন, পেনিসিলিনের কার্য-ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণুর কথা। ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকার মত এই কাহিনী। এই প্রসঙ্গে সেই কাহিনী অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন লিউয়েনহোয়েক এবং তার ফলে তিনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন জীবাণুর কথা। জীবাণুর প্রকৃতি অথবা গুণাগুণ সম্বন্ধে তার অবশ্য কিছু জানা ছিল না। এরপর ইটালীর স্প্যাল্লানজানীর গোচরে আসে, জীবাণু-গুলো জীবিত এবং তারা স্বয়ম্ভূ নয়। পাস্তুর ও রবার্ট ককের গবেষণা থেকে রোগবাহক জীবাণুর কথা জানতে পারা যায়। অ্যানথ্রাক্স ও জলাতংক রোগের হাত থেকে অনাক্রম্য করে তোলবার জন্যে পাস্তুর টিকা দেবার প্রথার প্রচলন করেন। পাস্তুর এই ধরনের আবিষ্কার করলেও তৎকালীন জীবাণু-বিজ্ঞানীরা রোগবাহক জীবাণু আবিষ্কারেই অধিক সচেষ্ট থাকেন। ব্যতিক্রম দেখা যায় রুশীয় বিজ্ঞানী মেচনিকফের মধ্যে। জীবাণু সম্বন্ধে কুতূহলী হবার পরেই তাঁর মনে জাগে রোগজীবাণু-বিরোধী একপ্রকার জীবাণুর কথা। এই জীবাণুদের চিন্তা মেচনিকফকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত। কোন বিজ্ঞানীই শুধু চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারেন না, মেচনিকফও রইলেন না। তাঁর

কল্পিত জীবাণুর অস্তিত্ব তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করতে সমর্থ হন। মেচনিকফের কার্যে পাস্তুর তাঁর সমর্থন জানান এবং তাঁর গবেষণাগারের একাংশ মেচনিকফের হাতে ছেড়ে দেন।

যদিও মেচনিকফের তত্ত্বের পরিণতি ঘটে ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কারে, তাহলেও ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারের পূর্বে, মেচনিকফের সময়ে এবং তৎপরবর্তীকালে, এমন কতকগুলো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছিল যেগুলো তৎকালীন বিখ্যাত মনীষীগণ অবজ্ঞা বা অবহেলা না করলে বহুদিন পূর্বেই পেনিসিলিন বা ওই জাতীয় ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হতো।

পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধগুলোর কার্যক্ষমতা কতকগুলো নির্দিষ্ট জীবাণুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাছাড়া, এরা যে রোগজীবাণুনাশক ঠিক তা-ও নয়। পেনিসিলিন নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার সময় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেনিসিলিন রোগ জীবাণুদের বৃদ্ধি রোধ করে এদের নিষ্ক্রিয় করে তোলে। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পর আরও যে সমস্ত এই জাতীয় ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের কার্যক্ষমতাও কতকগুলো নির্দিষ্ট রোগ জীবাণুর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কার্যকলাপ রোগজীবাণু-বৃদ্ধি-রোধকারী ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগ-জীবাণুনাশক, উভয় রকমেরই, দেখা গেছে। ওষুধ উৎপত্তিকারী জীবাণুগুলো রোগ জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ ও বিনাশ সাধনে সমর্থ হয়, তাদের (ওষুধ উৎপত্তিকারী জীবাণুদের) দেহ নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে।

যে সব জীবাণুদের কাছ থেকে নানারকমে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি, তাদের 'বন্ধু জীবাণু' এই গোত্রভুক্ত করে ও বিশদ বিবরণের মধ্যে না গিয়ে, তাদেরই কথা মোটামুটিভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক পাঠিকারা যেন একটা কথা স্মরণ রাখেন—জীবাণুদের প্রতিটি কাজেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি জীবাণুর কার্য-কলাপ বোঝায়, অল্পসংখ্যক কয়েকটি জীবাণুর কার্যকলাপ নয়।

প্রকৃতির রাজ্যে আমাদের হিতসম্পাদনের এই ধরনের যে সব আয়োজন রয়ে গেছে, সেগুলো কোনও 'বাজেট' দ্বারা স্থিরীকৃত কিনা জানা নেই। তবে প্রকৃতির রাজ্যে যে সব হিতসাধনী আয়োজন রয়ে গেছে সেগুলো আমাদেরই কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা, আমাদের সরকারী বাজেট দ্বারা যথাযথভাবে স্থিরীকৃত হতে পারে না কি?

রাশিয়ার খনিজ সম্পদ

শ্রীসমীরকুমার রায়চৌধুরী

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য অতুলনীয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে রাশিয়ার চেয়ে বেশী কাঁচা মাল মজুত আছে। তার প্রায় অর্ধেক জায়গা এখনও পরীক্ষা করা হয়নি; কিন্তু এই অপরীক্ষিত অবস্থাতেই তার কয়লা, লোহা, তেল, পটাস, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ সম্পদের পরিমাণ এত বেশী যে, পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রই এ বিষয়ে তার সমকক্ষ নয়।

জারের আমলে রাশিয়ার অফুরন্ত সম্পদ থাকলেও লোকে এবিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার ওই গুপ্তধন আবিষ্কারের চাবিকাঠি বিধাতা বোধ করি সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক এবং ভূতত্ত্ববিদদের

জন্যেই রেখে দিয়েছিলেন। জারের সময় রাশিয়ার শ্রমশিল্প কাঁচা মালের জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হতো বিদেশী রাষ্ট্রের ওপর। অথচ তার নিজের কাঁচামাল বা খনিজ দ্রব্য তার জমির মাত্র কয়েক ফিট নীচেই ছিল। তাই তার ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়েছিল। এখন সোভিয়েট শাসনে তার মান-চিত্রের ঐ পরিবর্তন চলছে; আর তা এত দ্রুত গতিতে চলছে যার তুলনা মেলা ভার। সমস্ত শক্তি দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া তার যতরকম প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তাদের, বিশেষ করে কয়লা, তেল আর জলশক্তির উন্নতি ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে।

প্রথমে কয়লার কথাই ধরা যাক। জারের রাশিয়ায় কয়লা ছিল প্রচুর—ইংল্যাণ্ড, এমনকি অবশিষ্ট সমস্ত ইউরোপের চেয়েও বেশী কয়লা ছিল তার। কিন্তু থাকলে কি হবে, এসম্বন্ধে লোকজন সবাই ছিল একরকম অজ্ঞ, রাজকর্মচারীরা ছিলেন উদাসীন। জারের আমলে রাশিয়ায় বছরে কয়লা উঠত ২৯০ লক্ষ টন করে। আর সোভি-য়েট শাসনে ১৯৩৮ সালে কয়লা তোলার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩৭০ লক্ষ টন। এখন তো আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। যদি জারের আমলের একটা কয়লার মানচিত্র খোলা যায় তাহলে দেখা যাবে সমগ্র রাশিয়ার মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ য়ুঃ রাশিয়ার ডন উপত্যকায় উল্লেখযোগ্য খনি ছিল। মানচিত্রের আর বাদবাকী জায়গা একেবারে খালি। কিন্তু এখন? এখন এমন সব জায়গায় কয়লা উঠছে, যেখানকার নাম-ই এর আগে কেউ শোনেনি। সোভিয়েট রাশিয়ায় কয়লার খনি গড়ে ওঠা একটা যা' তা' ব্যাপার নয়। প্রথমে যান ভূ-তত্ত্ববিদেরা—তাঁরা গিয়ে প্রথমে জমির একটা মানচিত্র তৈরী করে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা খাড়া করে ফেলেন; তারপর খুঁটি পুঁতে আদেশ দেন—"খোঁড় এখানে।" বাস্। তারপর তৈরী হয় রেলপথ, খোঁড়া হয় সুড়ঙ্গ, তৈরী হয় চিমনী, গড়ে ওঠে শ্রমিক পল্লী (আমাদের মত বস্তী নয়)। আরম্ভ হয় লোকজনের বসবাস। মাখম, ডিম, মাংস প্রভৃতি সরবরাহ করবার জন্যে সেখানে তৈরী হয় বড় বড় ফার্ম। তারপর আসে মিলওয়ালা, রুটিওয়ালা, কামার, কুমোর, ছুতোর দর্জি, মুচি; তৈরী হয় ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল-কলেজ, ছাপাখানা, জনসাধারণকে নির্মল আনন্দ দেবার জন্যে গড়ে ওঠে থিয়েটার-বায়োস্কোপ।

সোভিয়েট রাশিয়ায় যেখানে যখনই কোন খনি আবিষ্কৃত হয় তখনই ওই সব ঘটনা ঘটে; আর তা ঘটে বেশ একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনাকে অবলম্বন করে—হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্র বা ভেল্কীর জোরে নয়। আল্তাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত কুজ্‌নেজের নাম এর আগে কি কেউ শুনেছে? অথচ অনুমান করা হয়েছে যে, কুজ্‌নেজে প্রায় ৪৫,০০,০০০ লক্ষ টন কয়লা আছে; আর তার মধ্যে প্রায় ৫৪০,০০০ লক্ষ টন কয়লা হলো প্রথম শ্রেণীর। কুজ্‌নেজের উত্তরে য়েনেসী নদীর তীর বরাবর যে অঞ্চলটা সাইবেরিয়ার ভেতর চলে গেছে সেখানে প্রায় কুজ্‌নেজেরই সমান কয়লা ভূগর্ভে মজুত আছে। উত্তরের বরফাচ্ছন্ন আর্কটিক পেকোরা অঞ্চলে আর কাজাকস্থানে কারগান্ডা অঞ্চলে কয়লার খুব বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমে ডোনেজ্ উপত্যকাতেও প্রচুর কয়লা আছে। এতো গেল পশ্চিমের কথা। পূর্বাঞ্চলের কি অবস্থা? যদি জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাঁধে তখন সে কি করবে? সুদূর য়ুরোপীয় রাশিয়া থেকে এশিয়াস্থ রাশিয়ায় সমর-সম্ভার, শিল্পজাত মালপত্র বয়ে এনে যুদ্ধ চালানো—সে এক অসম্ভব ব্যাপার! তাই সে তার পূর্বাঞ্চলকে শিল্প বা সমর-সম্ভার উৎপাদনের ব্যাপারে একেবারে স্বাবলম্বী করে তুলেছে। শিল্প কলকারখানা চালাতে হলে চাই কয়লা। এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটে। সোভিয়েট বিজ্ঞানী ভূতত্ত্ববিদ এলেন, জায়গা পরীক্ষা করলেন,

ম্যাপ তৈরী করলেন, বললেন "খোঁড় এখানে।" বাস্, আর কি! রেল এলো, শ্রমিক এলো, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল এলো, একে একে গড়ে উঠল স্বাবলম্বী জনপদ, নগর আর গ্রাম। আমরা জানি আমুর নদী বয়ে গিয়ে পড়েছে জাপানের উত্তরে ওখ্‌টস্ক সাগরে। ওই আমুর নদী অঞ্চলে যে কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে তা পরিমাণে এবং শ্রেষ্ঠতায় পশ্চিমের ডোনেজ্ খনির কয়লারই মত। রাশিয়াকে পূব আর পশ্চিম, এই দু-ভাগে ভাগ করেছে যে পাহাড়, সেই উরাল পাহাড় অঞ্চলেও প্রচুর কয়লা উঠেছে।

এইবার লোহার কথায় আসা যাক। প্রাক্-বিপ্লব যুগে রাশিয়ার চার ভাগের তিনভাগ লোহা আসতো ডন্‌বাস আর নীপার জেলা থেকে। ডন্‌বাস অঞ্চল "ব্লিৎস্-ক্রিগ্" করে জার্মানরা নিয়ে নিল। তখন রাশিয়ার কি হবে? প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময় ওই অঞ্চল তো জার্মানরা নিয়েই নিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো সে হারেনি বা সমরোপকরণের কোন অভাব ঘটেনি। না ঘটার কারণ আছে। ১৯১৪-১৮ সালের জারের রাশিয়ার সঙ্গে ১৯৪০-৪৪ সালের সোভিয়েট রাশিয়ার তফাৎ আছে প্রচুর। জার আমলের ধনী-শিল্পপতিরা শুধু ডন্‌বাস অঞ্চল নিয়েই মশগুল ছিলেন। অন্য কোন অঞ্চলে লোহা আবিষ্কার করার বা লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করবার কোন চেষ্টাই করেননি। ফলে সমগ্র রাশিয়াকে অতি বিপজ্জনকভাবে নির্ভর করে থাকতে হতো এই একটা জায়গার ওপর। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া কেবলমাত্র ডন্‌বাস বা তুলা অঞ্চলের লোহা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি। দিকে দিকে বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ পাঠিয়ে লোহার সন্ধান করেছে, বড় বড় লোহার কারখানা, ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করেছে—ফলে যুদ্ধের সময় এক অঞ্চল হারালেও, সে আর অন্যান্য অঞ্চল থেকে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়েছে। এখন রাশিয়ায় নিম্নলিখিত অঞ্চলে প্রধানতঃ লোহা উৎপন্ন হয়।—(১) কুর্স্ক্ অঞ্চল (২) দক্ষিণ উরালের ওর্স্ক্ অঞ্চল (৩) কুজ্‌বাসের তেল্‌বস্ অঞ্চল (৪) মুরমান্স্ক্ উপদ্বীপ (৫) ম্যাগনেট পর্বতের ম্যাগনিটগর্স্ক্ অঞ্চল (৬) যুক্রাইনের ক্রিভয়রগ। এশিয়াটিক রাশিয়ার ইর্কুট্স্ক্, ইয়াকুটস্ক আর কম্‌সোমল্‌স্ক অঞ্চলেও বেশ লোহা পাওয়া যায়। ওই সব অঞ্চলে যন্ত্রপাতি কলকব্জার স্থানীয় অভাব মেটানোর জন্যে বড় বড় কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

অ্যালুমিনিয়াম, প্রভৃতি কৃত্রিমসার, ট্যানিন তৈরী করবার জন্যে অ্যাপেটাইট আর ন্যাফেলিন বলে দুটা জিনিসের দরকার হয় খুব। কোলা উপদ্বীপে ঐ দুটা জিনিস পর্যাপ্ত পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। অ্যাপেটাইটের পরিমাণ দু'শো কোটি টন বলে অনুমিত হয়েছে। কোলা উপদ্বীপের ন্যাফেলিনের পরিমাণ বলতে গেলে অফুরন্ত। "প্রিবালখাশস্কী কম্বাইন" বলে যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার উদ্দেশ্য হলো কাজাখস্থানের তাম্রসম্পদের প্রসার ও উন্নতিসাধন করে তাকে পৃথিবীর অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ এবং বৃহত্তম তাম্র-শিল্প প্রতিষ্ঠান করে তোলা।

আমাদের ভারতবর্ষ ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে প্রথমস্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু এখন রাশিয়াই এবিষয়ে প্রথম। প্রধানতঃ দুটা অঞ্চল থেকেই ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়—জর্জিয়ান গণতন্ত্রের কুটাই প্রদেশের চিয়াতুরিতে আর যুক্রাইনের নিকোপোল অঞ্চলে।

এবার দেখা যাক রাশিয়ায় সোনার কি অবস্থা। আগেকার যত সব পুরনো, জলপ্লাবিত, পরিত্যক্ত খনি ছিল সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করে তাথেকে এখন আবার সোনা তোলা হচ্ছে। নতুন নতুন খনিও আবিষ্কৃত হচ্ছে যথেষ্ট; উত্তরের মেরু অঞ্চলে, কাজাকস্থানের সমতলভূমিতে, পামিরের পার্বত্যাঞ্চলে, উত্তর ককেশাসের উপত্যকায় আর উরাল পাহাড়ের পাদদেশে সোনা পাওয়া যায়।

কিস্টোন-ড্রিল, ক্রেলিন্স-ড্রিল, সুলিভ্যান-ড্রিল প্রভৃতি নানাধরনের খোঁড়বার যন্ত্রপাতি নিয়ে সোভিয়েট সন্ধানীর দল দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন সোনার সন্ধানে। তারপর যেখানেই তাঁরা মাটির সঙ্গে মিশ্রিত সোনা পান তাকে পাঠিয়ে দেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রসজ্জিত সোভিয়েট গবেষণাগারে—অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষণার জন্যে। যখনই কোথাও কোন সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়, তখনই সেখানকার উট, বল্‌গা হরিণ আর সেই মান্ধাতার আমলের যানবাহনের পরিবর্তে আসে আধুনিকতম যান-বাহন, তৈরী হয় সুন্দর মজবুত ম্যাকাডেম-রাস্তাঘাট, রেলপথ, আর আকাশপথ—যা দিয়ে ওই অঞ্চলকে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়; যার ফলে ওই সব নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো আর বিচ্ছিন্ন, নাম-না-জানা অবস্থায় পড়ে থাকে না। আগেকার মত শ্রমিকরা কেবল কোদাল-কুড়ুল-শাবল দিয়ে খনির কাজ করে না, —এখন তারা প্রধানতঃ বিদ্যুৎ এবং বাষ্পচালিত যন্ত্রের সাহায্যেই কাজ করে। বৃদ্ধ অভিজ্ঞ যেসব শ্রমিক আছে তারা তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে তরুণ শ্রমিকদের সাহায্য করে। আগেকার সেই জঘন্য বস্তীগুলো ভেঙে দিয়ে সেখানে তোলা হয়েছে শ্রমিকদের জন্যে এক একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আদর্শ পল্লী বা ব্যারাক। তাদের নিজেদের সুবিধার জন্যে সেখানে গড়ে ওঠে দোকান, বাজার, রেস্তোরাঁ, দিবা এবং নৈশ-স্কুল; নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজ। সোভিয়েট রাশিয়ায় সোনার খনি অঞ্চলে ৫৭৬টা স্কুলে প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার (১৯৩৯ সালের হিসেব অনুযায়ী) ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করে।

অনেকে হয়তো খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারেন, যে সোনা দুর্বল জাতি এবং মূক জনসাধারণকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবার জন্যে যুগ যুগ ধরে ধনতান্ত্রিক জগতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেই সোনাকে তোলবার জন্যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার এত উদ্যম, এত আগ্রহ কেন? যাঁরা এই প্রশ্ন করেন তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, সোভিয়েট রাশিয়া আজও ধনতান্ত্রিক দেশদ্বারা পরিবেষ্টিত। আর ওই সব দেশগুলোতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হবার জন্যে সোনার যথেষ্ট মূল্য আছে। নিজের দেশের মধ্যে রাশিয়ার সোনার চাহিদা বা মূল্য খুব বেশী নেই—একমাত্র দাঁত বাধানো বা ঐ ধরনের ব্যবহার ছাড়া। কিন্তু যতদিন রাশিয়াকে বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক রাখতে হবে ততদিন তার কাছে সোনারও মূল্য থাকবে। তবে সে অন্যান্য দেশের মত সোনাকে লোহার সিন্দুক বা চোরকুঠরিতে জমিয়ে রাখে না—সোনা দিয়ে সে বাইরে থেকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, মালমশলা, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি আনে—যে সব জিনিস নাকি তার নেহাৎ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে লাগে।

যাহোক, এই হলো আজকের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার খনিজ সম্পদ ও তার উন্নতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এ থেকে আমাদের দেশের কর্ণধারদের অনেক কিছু দেখবার, শেখবার এবং বোঝবার আছে। রাশিয়া যে জিনিসকে শত বাধা, শত বিঘ্নের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করতে পেরেছে, সফল করতে পেরেছে, আমরাই বা তা কেন করতে পারব না? তার জন্যে অবশ্য চাই সুষ্ঠুপরিকল্পনা আর তাকে কার্যকরী করার জন্যে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। রাশিয়ার ওই বিস্ময়কর উন্নতির মূলে কি আছে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তার পদ্ধতিকে গ্রহণ করলে আমাদের দেশের কি কৃষিজ, কি খনিজ সকল সম্পদকেই দেশের উন্নতির কাজে লাগানো যেতে পারে।

আইনষ্টাইনের আবিষ্কার

শ্রীআলোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের খুঁটিনাটি বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেননা গণিতের কথা তো সম্পূর্ণ অবান্তর, শুধুমাত্র বর্ণনা করেও তার আবিষ্কার সহজবোধ্য করা অত্যন্ত দুরূহ। তাই এখানে বিশেষকরে দেখান হয়েছে, আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের ধারাটি। কেমন করে এই প্রতিভাবান ভদ্রলোক শুধুমাত্র গাণিতিক চিন্তা ও যুক্তির পটভূমিকায় আবিষ্কার করলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুগুপ্ত নিয়মাবলীকে—হয়ে উঠলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক!

নিউটনের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী বিজ্ঞান-জগতে এতদিন একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে এসেছে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ থেকেই বিজ্ঞানী মহলে সন্দেহ জাগলো,—ওই নিয়মগুলো সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিনা। ম্যাক্সওয়েল তাঁর তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্বে অতিকষ্টে নিউটনের নিয়মাবলীর সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। হাৎস্ সোজাসুজি অস্বীকার করলেন—এমন ধারার কোন সংযোগ রাখতে। আবার দেখা গেল, বুধ-গ্রহের কক্ষ-পথটি এমন ব্যবহার করে যা অন্য কোন গ্রহ করে না। নিউটনের নিয়মের সাহায্যে এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। এক সর্বব্যাপী ইথরের ধারণা এতদিন বিজ্ঞানীদের মন অধিকার করেছিল। এরই সাহায্যে তাঁরা আলোক-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু ১৮৭৯ সালে বিখ্যাত মর্লি-মাইকেলসন পরীক্ষার পর ইথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। পদার্থ-বিজ্ঞানের এ হেন দুর্দিনে আবির্ভাব হলো আইনষ্টাইনের।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন প্রথম প্রকাশ করলেন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের প্রাথমিক বিশেষ তত্ত্ব। আইনষ্টাইনের বয়স তখন ছাব্বিশ। বহুদিন বেকার থাকার পর সবেমাত্র এক পেটেণ্ট আফিসে চাকরী পেয়েছেন এবং বিবাহ করে নাকি স্বচ্ছল জীবন যাপন করছেন। যথেষ্ট পারিবারিক শান্তি পেলেও পদার্থ বিজ্ঞানের উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিরন্তর ব্যাকুল করে তুলছিল এই তীক্ষ্ণ মেধাবী যুবকটির মনকে। বাল্যাবধি তাঁর মনে হয়েছে—বিশ্বকে জানতে হলে বুঝতে হবে বিশ্বের নিয়মগুলোকে। তাইতো পদার্থ-বিজ্ঞান তাঁর অত প্রিয়; কেননা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারই তার কাজ। তাঁর অতি প্রিয় বিষয়টিতেও যদি গোলযোগ জাগে তবে অন্তরে বেদনা তো খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই তখন আইনষ্টাইনকে দেখাত যেন সকল বিষয়েই নিস্পৃহ, সব সময়েই কি যেন এক গভীর ভাবে তন্ময়। পেটেণ্ট আফিসে চাকরী করলেও আসলে তিনি ওখানকার বিজ্ঞানীমহলের সব খবরই রাখতেন। ইথরের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ কত, এ সম্বন্ধে মর্লি-মাইকেলসনের পরীক্ষা যখন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো তখন আইনষ্টাইন ভাবলেন—আলোক-কে যে ইথরে একরকমের যান্ত্রিক কাঁপুনি বলে মনে করা হয়, নিশ্চয় এই ধারণাটুকুই সব নয়। আলোকের আরও কিছু গুণ আছেই আছে। এমনি অতি সাধারণ কয়েকটি বিশ্বাস থেকে আইনষ্টাইন খাড়া করলেন—তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ তত্ত্বটি। এ থেকে তখনই জানা গেল, বিশ্বের সকল বস্তুর গতি পরস্পর আপেক্ষিক হলেও আলোকের স্বভাব এ দিক দিয়ে একেবারেই সৃষ্টিছাড়া, একগুঁয়ে। দেশের মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ওর ছোটা চাই-ই। কোন অবস্থাতেই এই গতিবেগের নড়চড় হবে না। আইনষ্টাইন তাঁর সমীকরণগুলো (equations) একটু ভিন্ন ভিন্ন

রূপে লিখে দেখলেন, চমৎকার এবং নানা অজ্ঞাত সত্যের সন্ধান দিচ্ছে ওই সমীকরণগুলো। যেমন সমীকরণের একটি রূপ থেকে দেখা গেল, কোন ওজনওয়ালা বস্তু যখন জোরে ছোটে তখন তার ভেতরের বস্তুপুঞ্জের পরিমাণ যায় বেড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিকেট খেলোয়াড়ই বোলিং-এর সময় বলটির ওজনের মাপ কিছু বাড়িয়ে নিতে পারেন। অবশ্য যত জোরেই ছুঁড়ুন না, বলটি এমন জোরে যাবে না যাতে এর অত্যল্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ওজন সম্বন্ধে ব্যাট্‌স্‌ম্যান কিছু টের পাবেন। বাস্তবিক সেকেণ্ডে বেশ কয়েক হাজার মাইল জোরে না ছুটলে জড়-বস্তুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুপুঞ্জের (mass) মাপ বড়ই কম হয়। কিন্তু সত্যসত্যই এত জোরে কোন বস্তু ছুঁড়ে দেওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। অথচ তা' বলে আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত ওই সত্য অমীমাংসিত ভাবে পড়ে নেই। বিজ্ঞানীরা ঝুঁকে পড়লেন অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলোর দিকে। ল্যাবরেটরীতে ইলেকট্রন-গুলোকে তীব্র গতিবেগ সম্পন্ন করা যায়। এভাবে দেখা গেল, ইলেকট্রনের অতি অল্প ওজনও সত্যই কিছুটা বেড়েছে। শুধু গাণিতিক বিচারে আইন-ষ্টাইন তাঁর তত্ত্ব থেকে আর একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত করেন। সেটা এই যে, বস্তু ও শক্তির মধ্যে মূলতঃ কোন তফাৎ নেই এবং অতি সামান্য পরিমাণ বস্তুকে ধ্বংস করতে পারলেও প্রভূত শক্তি উদ্ভূত হবে। ল্যাবরেটরীতে কোন পরীক্ষা না করেও তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন। অথচ আশ্চর্য, তাঁর এই সিদ্ধান্তের চরম পরীক্ষা হয়ে গেল জাপানের বুকে, যেখানে অতি সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম বস্তুপুঞ্জ ধ্বংস করে সেই তেজে দুটি বিরাট জনপদ নিশ্চিহ্ন করা হলো। কিন্তু তবুও আইনষ্টাইন নির্দোষ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বাইরে আরও দুটি বড় বড় আবিষ্কার সম্পন্ন করেন। তার একটি হচ্ছে,—ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে। বিষয়টি বেশ মজার। এতদিন শুধু ধরে নেওয়া হয়েছিল—বাতাস কতকগুলো অতিক্ষুদ্র অণু ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এ অণুগুলো এমনি দুরন্ত ও অশান্ত যে, সৃষ্টিকাল থেকেই পরস্পর ছুটাছুটি ও ধাক্কাধাক্কি করেও কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করে না। অণুদের এই ছুটাছুটির গুণ দিয়েই বিজ্ঞানীরা বাতাসের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু মুশকিল হলো ওদের ওই মজার ছুটাছুটি চাক্ষুষ দেখা যায় না; কারণ বাতাসের অণুগুলো খুবই ছোট। তাই তাঁরা খুঁজতে লাগলেন এমন ধরনের বড় কোন অণু যার ছুটাছুটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হতে পারে। ব্রাউন নামে এক ইংরেজ সর্ব-প্রথম এই বিচিত্র ছুটাছুটি স্বচক্ষে দেখতে পান। তিনি একটি অতি সাধারণ মাইক্রস্কোপ ব্যবহার করেছিলেন এবং তা দিয়ে জলের মধ্যে ফুলের কতকগুলো পরাগকণার ছুটাছুটি দেখতে পান। অবশ্য ওই পরাগকণাগুলো বিশেষভাবে আলোকজ্জ্বল করতে হয়েছিল। জল ঝাঁকালে বা কাঁপালে তাদের দৌড়াদৌড়ির বেগের কোন তারতম্য হয় না। তারতম্য হয় তাপ দিলে। তখন ওরা বেশী ছুটাছুটি করে। আবার পদার্থের অণুদেরও তাপ দিলে পারস্পরিক ছুটাছুটি বেড়ে যায়। আইনষ্টাইন দেখালেন, যে নিয়মে অদৃশ্য বাতাসের অণুগুলো ছুটাছুটি করে, দৃশ্যমান ব্রাউনীয় কণাগুলোর ছুটাছুটির পেছনেও ওই একই নিয়ম খাটে। তাই মাইক্র-স্কোপের সাহায্যে ওই কণাগুলোর ছুটোছুটি দেখে অদৃশ্য অণুদের ছুটাছুটি আঁচ করা সহজ। এক একক আয়তনের মধ্যে কতগুলো অণু আছে তা নির্ণয় করার পদ্ধতিও আইনষ্টাইন দেখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। যাহোক, এতদিন শুধু ধরে নেওয়া হয়েছিল বাতাসের অণুর অস্তিত্বের কথা। আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের দ্বারা এবার নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো যে, তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

ওই বছরেই তাঁর আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে—ফটোন তত্ত্বের সাহায্যে আলোকের

গুণাগুণ ব্যাখ্যা। তাঁর আবিষ্কারের কিছুদিন আগে প্ল্যাংক বহুদিনের গবেষণার পর আবিষ্কার করেন, তাপ বা অন্যান্য শক্তি যখন কোন উৎস থেকে বের হয়, তখন একটানা ভাবে বের হতে পারে না। বের হয় ছিন্নভিন্ন এককে (indiscrete unity); অথবা যখন কোন জিনিস বাইরে থেকে তাপ শোষণ করে তখনও তা করে ছাড়া ছাড়া অংশে। কিন্তু উৎস থেকে বের হওয়া এবং কোথাও গিয়ে শোষিত হওয়া এই দুই সময়ের মধ্যে তেজ শক্তি যখন শূন্যপথে উড়ে চলে, তখন কি তার ঐ ছাড়া ছাড়া কণিকার কোয়াণ্টা রূপ বর্তমান থাকে? প্ল্যাংকের আবিষ্কার থেকে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। আইনষ্টাইন এর উত্তর দিলেন। বললেন—হ্যাঁ, শূন্যপথে চলবার সময়েও আলোকের ওই কণিকারূপ বর্তমান থাকে। একথার সত্যাসত্য বিচারের জন্যে আইনষ্টাইন একটি পরীক্ষার নির্দেশও দিলেন।

আইনষ্টাইন তার এই অমূল্য আবিষ্কারগুলো করেন বার্ণে, পেটেণ্ট আফিসের চাকরী জীবনে শুধুমাত্র গাণিতিক প্রতিভাকে সম্বল করে। বলাবাহুল্য, এইগুলো প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীমহলে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ক্লাইজের। তিনি আইনষ্টাইনের বক্তব্য ভালমত না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলেন, তিনি অদ্ভুত কিছু করেছেন। তাই আইনষ্টাইনকে হাতে রাখা তাঁর সমীচীন বোধ হলো। আইনষ্টাইন চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিযুক্ত হলেন জুরিখের অধ্যাপক। এরপর আইনষ্টাইন প্র্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। এখানেও তাঁর সর্ববিষয়ে নিস্পৃহতা লক্ষণীয় ছিল। তাঁর শ্লেষপূর্ণ কৌতুকে সকল সহকারী অধ্যাপকই বিব্রত বোধ করতেন। এখানে একজনের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলে মিশতেন এবং নানা আলোচনা করতেন। তিনি হচ্ছেন গণিতের অধ্যাপক পিক। গণিতে এঁর নানা মৌলিক অবদান আছে। তাছাড়া ইনি ভাল বেহালা বাদক। আবার আইনষ্টাইনও ছিলেন বেহালা বাজনায় বিশেষজ্ঞ। এঁরই কাছে আইনষ্টাইন ব্যক্ত করতেন তাঁর চিন্তাধারার কথা। বলতেন—তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (general theory of relativity) গণিত খাড়া করতে বড় বেগ পেতে হচ্ছে। আরও বলতেন—অতি সহজ সামান্য গণিতের সাহায্যেই তিনি তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ করতে চান। কেননা দুরূহ জটিল গণিত তাঁর একটুও পছন্দ নয়। ওটা যেন আছে শুধু সাধারণকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই। কিন্তু পিক আইনষ্টাইনের এই ধারণার প্রতিবাদ করতেন। বলতেন, উচ্চতম আবিষ্কারের যথাযথ প্রকাশের জন্য উচ্চতম গণিতের সাহায্য অপরিহার্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আইনষ্টাইনকে পরামর্শ দিলেন, তাঁর সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্যে ইতালীয় দুজন গাণিতিক রিচি এবং লিভিসিভিটার দুরূহ Tensor Calculus -এর সাহায্য নিতে ও রীম্যানের জ্যামিতি তত্ত্ব আয়ত্ত করতে। এই পরামর্শ আইনষ্টাইনের খুব মনোমত হলো। তিনি ফিরে চললেন জুরিখে (১৯১২ খৃঃ)। এবার ওখানকার পলিটেকনিক স্কুল থেকে তাকে ডাকা হয়েছিল।

জুরিখে পৌঁছে তিনি তাঁর বাল্যবন্ধু মার্শেল গ্রসম্যানের সাহায্যে লেগে গেলেন—লেভিসিভিটার Calculus আয়ত্ত করতে। তাঁর নবাবিষ্কৃত সাধারণ তত্ত্বটি এর আগেই প্র্যাগে প্রকাশ করে এসেছিলেন। কিন্তু যথোপযুক্ত গণিতের সাহায্য না থাকায় বিষয়টি তত পরিষ্কার হয়নি। এবার এই বন্ধুটির সাহায্যেই তিনি মাধ্যাকর্ষণের সকল ব্যাপার বিচার করে প্রকাশ করলেন (১৯১৩ খৃঃ)। তবে এতেও কিছু খুঁৎ ছিল এবং সম্পূর্ণ নিখুঁতরূপে প্রকাশ পায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৬ খৃঃ)। অধ্যাপক মিনকাউস্কি (১৯০৮ খৃঃ) বিশুদ্ধ গণিতের দিক থেকে আইনষ্টাইনকে খুব সাহায্য করেছিলেন।

আপেক্ষিকতাবাদের এই সাধারণ তত্ত্ব শুধুমাত্র

নিউটনীয় বলবিদ্যার উন্নত সংস্করণ নয়। বরঞ্চ force, acceleration, absolute space ইত্যাদি সম্পর্কে এতকালের নিউটনীয় ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হলো। এই তত্ত্বে যতগুলো নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মোটামুটি ছটো ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) ক্ষেত্রের নিয়মাবলী। এথেকে জানা যায় বস্তুর উপস্থিতিতে কেমন করে দেশে বক্রতার সৃষ্টি হয়।

(২) জড় অথবা আলোককণিকার গতির নিয়মাবলী। এ থেকে জানা যায়, বক্রতা জানা কোন দেশের মধ্য দিয়ে যেতে গেলে ওই কণিকাগুলো ঠিক কি ধরনের বক্রপথে (geodesic lines) যাবে।

এইবার প্রশ্ন উঠলো আইনষ্টাইনের এই সব আবিষ্কার কি শুধুই গণিত অথবা দর্শনের কল্পনা-বিলাস, অথবা এর বাস্তব সত্যতা প্রমাণ করা যায়?

আইনষ্টাইন দেখালেন, মৃদু মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর তত্ত্ব ও নিউটনের তত্ত্ব একই ফল দেবে। কিন্তু সূর্য অথবা ওই রকম কোন জ্যোতিষ্কের কাছাকাছি যেসব জায়গায় মধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র খুব শক্তিশালী, সেখানে নিউটনের ব্যাখ্যা একেবারেই বিফল, কিন্তু আপেক্ষিকতার ব্যাখ্যা থেকে গভীর তৃপ্তি পাওয়া যায়। বুধ গ্রহের ব্যবহারে একথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। এইটি সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহ। দেখা গেল, এর ডিম্বাকার কক্ষপথটি সূর্যের চারপাশে অতি ধীরে ধীরে ঘুরছে (প্রতি শতাব্দীতে মাত্র ৪৩½ সেঃ কৌণিক মাপে)। নিউটনের গণিত অনুযায়ীএর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। কেননা তাঁর মতে সূর্যের চারপাশে যে কোন গ্রহেরই কক্ষপথের অবস্থান নিত্য। কিন্তু আইনষ্টাইন দেখলেন—তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী-বুধের গতি দৃষ্টগতির মতই হওয়া উচিত।

সূর্যের অবস্থানের জন্যে চতুষ্পার্শস্থ দেশে যে বক্রতার সৃষ্টি হয়, তাতে ওখান দিয়ে আলো আসতে গেলে তার গতিপথ কিছুটা বিচ্যুত দেখাবে। আইনষ্টাইন দেখলেন, ঠিক সূর্যের পিঠ ছুঁয়ে যেতে গেলে ওই বিচ্যুতি (deflection) দাঁড়ায় ১"৭৫ সেঃ কৌণিক মাপ। আর কিছু না হোক, যদি এইটি যাচাই করা যায় তবে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যাচাই করতে গেলে চাই একটা পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। কেননা গ্রহণ হয়ে অন্ধকার না হলে সূর্যের ঠিক পাশের তারাটিকে দেখা যাবে কেমন করে? যাচাই করার কাজে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা খুব উৎসাহী। তারা বললেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হবে এবং এটি পরীক্ষার জন্যে খুব উপযোগী। কারণ হিয়াডিস্ মণ্ডলের উজ্জ্বল তারকাগুলো তখন ঠিক সূর্যের পাশেই থাকবে। অবশেষে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ থামবার পরেই এক কমিটি গঠিত হলো। পৃথিবীর ছটি সুবিধাজনক স্থানে ওই পূর্ণগ্রহণ দেখা যাবে। কমিটিকে ওসব অঞ্চলে অভিযান করতে হবে। একটা হচ্ছে উত্তর ব্রেজিলের কোন অঞ্চলে, আর একটা হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলে। প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন ছিলেন এই অভিযান কমিটির উদ্যোক্তা। তিনি নিজে উপস্থিত হলেন পশ্চিম আফ্রিকায়।

একমাস আগে থেকে অভিযাত্রীদল আফ্রিকার প্রিন্সেপ দ্বীপে উপস্থিত হলেন আবশ্যকীয় তোড়-জোড় করতে। মনে তাঁদের গভীর উদ্বেগ। বুঝি বা মেঘে ঢাকা পড়ে এতদিনের উদ্যোগ-আয়োজন সব ব্যর্থ হয়! অবশেষে এলো সেই বহুপ্রতীক্ষিত কয়েক মিনিটব্যাপী গ্রহণের মহা-মূল্যবান সময়টুকু। এডিংটন এই সময়ে বর্ণনা দিয়েছেন—

"গ্রহণের দিন আবহাওয়া ছিল অপ্রীতিকর। যখন পূর্ণগ্রহণ আরম্ভ হলো অন্ধকার চন্দ্রের চারপাশে দেখা যেতে লাগলো সূর্যের ছটামণ্ডল; অবস্থাটা ঠিক যেন তারকাহীন আকাশে মেঘের মধ্যে চাঁদ রয়েছে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করা এবং সাফল্য আশা করা ছাড়া করবার আর কিছুই ছিল না। একজন

প্লেটগুলো দ্রুত পাল্টে দিচ্ছিল আর একজন টেলিস্কোপের সামনে একটি পর্দা ধরে ছিল এবং লক্ষ্য রাখছিল যাতে টেলিস্কোপটা একটুও না কেঁপে যায়।

আমাদের সমস্ত নজর রাখতে হয়েছিল ছায়া-বাক্সের দিকে। ওদিকে ওপরে যে কত অদ্ভুত দৃশ্য খেলে যাচ্ছে, সূর্যের পিঠ থেকে লক্ষ মাইল দূরে যে একটা অপূর্ব সৌরশিখা দেখা গেছে যা ফটো প্লেটের ধরা পড়েছিল, সেসব দিকে আমাদের চোখ ফেরানোর একটুও সময় ছিল না। শুধু এটুকু সচেতন ছিলাম যে, জায়গাটা ছিল মৃদু আলোকিত, প্রকৃতি ছিল নিস্তব্ধ। আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, পর্যবেক্ষকদের ডাক আর ঘড়িটার ৩০২ সেকেণ্ড ধরে টিক্ টিক্ আওয়াজ—যতক্ষণ ছিল পূর্ণতা।

ষোলটি ফটোগ্রাফ নেওয়া হলো। ২ থেকে ২০ সেকেণ্ড পর্যন্ত এক্সপোজার দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিককার ফোটোগুলোয় কোন তারা ওঠেনি। পরে শেষের দিকে মেঘ কমে যেতে কয়েকটা ছবি উঠেছিল। কোন কোন প্লেটে প্রয়োজনীয় তারাগুলো ওঠেনি এবং এ প্লেটগুলো নষ্ট হলো। তবে একটাতে পরিষ্কার পাচটা তারার ছবি উঠেছিল। পরীক্ষায় এইটিই খুব কাজ দিল।"

আনন্দে, উত্তেজনায় এডিংটন ও সহকর্মীরা তাদের তোলা সর্বোত্তম ফটোগুলোর সঙ্গে তুলনা করলেন লণ্ডনে তোলা সেই তারারই ছবি। লণ্ডনে সেই তারাগুলো থেকে যে আলো পৌঁচেছে তা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র থেকেও অনেকদূর দিয়ে গেছে। তাই সে আলোর গতিপথ একটুও প্রভাবান্বিত হয়নি। সেই কারণে দুটো ফটোগ্রাফের প্লেটে একই তারা ঠিক একই জায়গায় অবস্থিত দেখা গেল না। তাদের অবস্থানের তফাৎ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র আলোকের গতিপথে কত প্রভাব বিস্তার করে। আইনষ্টাইন তাঁর তত্ত্বের হিসেব মত বলেছিলেন, আলোর পথ বিচ্যুত হওয়া উচিত ১·৭৫ সে. কৌণিক মাপে। দুটো অভিযানে তোলা ফটো থেকে দেখা গেল, এই বিচ্যুত ঘটেছে ১·৬৪ সে. কৌণিক মাপে। এই সামান্য তফাৎটুকু যন্ত্রের দোষঘটিত ব্যাপার।

অবশেষে এল ১৯১৯ সালের বিখ্যাত দিন ৬ই নভেম্বর। এদিন ইংল্যাণ্ডর রয়্যাল সোসাইটীতে স্যার জে, জে, টমসন, স্যার আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড প্রভৃতির উপস্থিতিতে ঘোষণা করা হলো, আইষ্টাইনের আবিষ্কৃত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সত্যতা। সাধারণ লোক বাইরে থেকে বিস্মিত হয়ে শুনলো—আলোকের ওজন আছে এবং দেশও বেঁকে যায়।

বৈজ্ঞানিক হিসেবে আইষ্টাইনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করলেন এবং প্রচুর সম্বর্ধনা পেলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে তাঁর চিরকেলে নিস্পৃহভাব তার উদ্ভাবনী শক্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বাস্তবিক একটানা গভীর চিন্তা করার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল। বার্লিনে থাকাকালে কোন এক অধ্যাপকের সঙ্গে কথায় কথায় আইনষ্টাইন বললেন, তারা এ বিষয় নিয়ে পট্স্ড্যাম ব্রিজের ওপর আলোচনা করবেন। অধ্যাপকটি প্রথমে সম্মত হলেও পরে কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"না, আপনি কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করবেন। আমি নতুন এসেছি এখানে, ব্রিজটা খুঁজে আসতে হয়তো দেরী হয়ে যাবে।" আইনষ্টাইন বললেন, "না, না কিছু সময় নষ্ট হবে না। বাড়ীতে বসে যদি চিন্তা করতে পারি তবে পট্স্ড্যাম ব্রিজেও পারব।" বাস্তবিক নদীর জলধারার মত তিনি চিন্তা করে চলতেন। নদীতে কেউ ঢিল ফেললে হয়তো সেখানকার জল একটু বাধা পায়। কিন্তু পরক্ষণেই তা আবার বয়ে চলে। তেমি যে কোন বাধাই পড়ুক, শীঘ্রই আইনষ্টাইনের চিন্তা-প্রবাহ চলতো পূর্বেরই মত।

এমনি অসাধারণ চিন্তাশক্তি ছিল বলেই নাজীদের ক্রমবর্ধমান অত্যাচার সত্ত্বেও এর বছর দশ বারো পরে প্রকাশ পেল তার ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী। এর সাহায্যে তিনি মাধ্যাকর্ষণের টান,

বৈদ্যুতিক টান ইত্যাদি বিভিন্ন টানের ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপন করেন। তার এই আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৩৩ সাল থেকেই জার্মাণীতে নাজীদের অত্যাচার ভয়ানক বেড়ে যায় এবং কালক্রমে আইনষ্টাইন জার্মাণী ছেড়ে আমেরিকায় বসবাস করতে বাধ্য হন।

কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক চিরদিনই সক্রিয়। বৃদ্ধ আইনষ্টাইন তাঁর এই ৭১ বছর বয়সেও আবার এক নূতন আবিষ্কারের দ্বারা জগতকে স্তম্ভিত করেছেন। এবারে তিনি যে সমীকরণগুলো খাড়া করেছেন তার সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ—পদার্থ বিজ্ঞানের এ দুটি বিষয়ে মূলসংযোগের কথা জানা গেছে। আইনষ্টাইন তাঁর আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন—মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ মতবাদ। বিষয়টি সাধারণের বোধগম্য করে প্রকাশিত হয়নি এখনও।

পরিশেষে, আইনষ্টাইন তার স্বকীয় আবিষ্কার-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে দু-একটি কথা বলেছেন তা আলোচনা করা হয়তো অসমীচীন হবে না। জার্মেনীতে থাকাকালে একবার এমনি একটা কথা ওঠে যে, বিশুদ্ধ গাণিতিকেরা তো অনেক কিছুই কাগজে কলমে করেন, কিন্তু ল্যাবরেটরীতে ছেড়ে দিলে তাঁরা অত অকেজো বনে' যান কেন? এখানে আইনষ্টাইন ব্যাখ্যা করেন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানীদের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে। তিনি বলেন, তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের প্রথম কাজই হচ্ছে কতকগুলো প্রাথমিক সিদ্ধান্ত মনে মনে খাড়া করা। প্রকৃতিতে অনুষ্ঠিত নানা বিচিত্র ঘটনা থেকে সূত্রবদ্ধ এই সিদ্ধান্তগুলো আগে তাঁদের কল্পনায় দাঁড় করিয়ে নিতে হয় এবং যদিও এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক তবু এইগুলো দাঁড় করাতেই পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রধান কৃতিত্ব এবং প্রথম প্রয়োজন। তাই আইনষ্টাইন বলছেন—"To the discoverer in this field the products of his imagination appear so necessary and natural that he regards them and would have them regarded by others not as creations of thought but as given realities." তারপর বলছেন, একবার প্রাথমিক সূত্রটি ধরতে পারলে অনুসিদ্ধান্তের পর অনুসিদ্ধান্ত মনে আসে এবং তখনই এগুলো পরীক্ষা করার জন্যে তিনি গবেষণাগারের প্রয়োজন বোধ করেন। এই প্রসঙ্গে আইনষ্টাইনের একথাটিও উল্লেখযোগ্য—"The supreme task of the physicist is to arrive at those universal elementary laws from which the cosmos can be built up by pure deduction. There is no logical path to these laws; only intuition resting on sympathetic understanding of experience, can reach them."

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব জগতের সাধারণের কাছে এক মহাবিস্ময়ের বস্তু। তার এই আবিষ্কার নিয়ে নানা গল্প কথাই ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। রটনা এই যে, আইনষ্টাইনের আবিষ্কার নাকি জগতে বারো জনের বেশী কেউ বোঝে না। আইনষ্টাইন নিজেই একথার প্রতিবাদ করেছেন—যে কেউ বোঝবার চেষ্টা করবে সেই তাঁর কথা বুঝতে পারবে এবং এ-ও বলেছেন—বার্লিনে তো সকল ছাত্রই তাঁর আবিষ্কারের কথা বুঝেছে। অবশ্য শেষের কথাটা বলেছেন নিতান্ত ছাত্রপ্রীতির বশেই।

ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে তার আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং যে যার খুশীমত, নিজ নিজ মত বা ধারণার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে আইনষ্টাইনের আবিষ্কারের কথা। একবার আইনষ্টাইন ইংল্যাণ্ডে গেছেন; এক ধর্মযাজক শশব্যস্তে তার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করেন—ধর্মের সঙ্গে আপেক্ষিকতার সম্পর্কের কথা। আইনষ্টাইন তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন—"কিছুনা কিছুনা, ধর্মের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের কোনই সম্বন্ধ নেই। ওটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপার।" দর্শন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর আবিষ্কার নিয়ে পছন্দসইভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

প্যারা অ্যামিনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড

শ্রীঅজিতকুমার উকীল বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দশ বছরে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, অরিওমাইসিন, প্রভৃতির আবিষ্কার মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার পথে আরও কয়েক পা এগিয়ে দিয়েছে। মানুষের পয়লা নম্বরের শত্রু যক্ষ্মারোগেরও কয়েকটি প্রতিষেধক বেরিয়েছে, তার মধ্যে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও পি, এ, এসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পি, এ, এস-এর ব্যবহারে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের অপেক্ষা আশাতীত ফল পাওয়া যায় বলে জগতের অনেক বিশিষ্ট চিকিৎসক ও গবেষকের মত। তবে পি, এ, এস-এর সঠিক কার্যকারিতা বিশেষভাবে জানতে হলে রুগীকে কেবলমাত্র এই ওষুধ খাইয়ে গবেষণা করা উচিত। কিন্তু এই চেষ্টা কতদূর করা হয়েছে বা কতদূর করা সম্ভবপর তা বলা মুশ্‌কিল, কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রুগীকে পি, এ, এস এবং ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন একত্র প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা হয়।

পেনিসিলিন বা ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের মত পি, এ, এস ছত্রাকজাত নয়, এটা সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয়। এর আবিষ্কার করেন সীডেল এবং বিটেনার নামে দু-জন বৈজ্ঞানিক। বহু গবেষণার পর এঁরা পি, এ, এস-কে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংশ্লেষণ করতে সমর্থ হন। এর পর পি, এ, এস-এর বহুরকম রাসায়নিক গুণ নির্ধারণ করেন লামেন নামে আর এক বৈজ্ঞানিক। যক্ষ্মারোগে পি, এ, এস-এর কার্যকারিতা আবিষ্কারে তিনিই অগ্রণী হন।

রসায়ন শাস্ত্রে পি, এ, এস-এর সম্পূর্ণ নাম প্যারা অ্যামিনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড (Para Amino Salicylic Acid)। কার্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন, প্রভৃতির মত জৈব রসায়ন শাস্ত্রে বেনজিন্ গুষ্ঠীর মধ্যেই পি, এ, এস এর বংশপরিচয় মেলে।

যক্ষ্মারোগে পি, এ, এসের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। পেনিসিলিনের প্রয়োগে যেমন নিউমোনিয়া প্রভৃতির বীজাণু অল্পসময়ের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যক্ষ্মারোগের সে রকম কোন প্রতিষেধক নেই। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন অথবা পি, এ, এস-এর কাজ হচ্ছে—প্রধানতঃ জীবাণুদের প্রসার-শক্তি বন্ধ করা এবং ধীরে ধীরে তাদের জীবনধারণের ক্ষমতাকে নষ্ট করা—অর্থাৎ পেনিসিলিন এবং পি, এ, এস-কে যথাক্রমে গুলি করে ও মাটিতে পুঁতে তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

যক্ষ্মারোগে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগে দুটি প্রধান অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ অনেক শ্রেণীর যক্ষ্মা বীজাণু কিছুদিন ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগের পর এক অদ্ভুত ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন-প্রতিরোধক ক্ষমতা পায়, যার ফলে ষ্ট্রেপটোমাইসিন এর কার্যকারী ক্ষমতা লোপ পায়। তা ছাড়া ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগের পর রুগীর শরীরে নানাপ্রকার কুফল দেখা যায়। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগের এই দুটি প্রধান প্রতিবন্ধক প্রায় দূরীভূত হয়েছে পি, এ, এস-এর ব্যবহারে। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রতিরোধক বহু শ্রেণীর যক্ষ্মাজীবাণুকে পি, এ, এস ঘায়েল করতে পারে; অথচ এর ব্যবহারে সাধারণতঃ বিশেষ কোন কুফল হয় না। মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে পি, এ, এস ব্যবহারের ফলে বমি বমি ভাব, উদরাময় ইত্যাদি উপসর্গ দেখা গেছে। এই সব ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে এবং ওষুধ খাবার আগে

Alkali Mixture খাইয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। উদরাময় দেখা গেলে chalk বা opium দেওয়া যেতে পারে। রক্তের ওপর বা শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের ওপর পি, এ, এস-এর কোন কুফল আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। মোটের ওপর ষ্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন প্রয়োগে যে সব কুফল দেখা যায় পি, এ, এস-এর ক্ষেত্রে এইসব উপসর্গ তাদের তুলনায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

পি, এ, এস-এর ব্যবহারের আরও একটা বড় সুবিধা আছে। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন রুগীকে দিনে দু-বার 'ইনজেক্ট' করতে হয়, কিন্তু পি, এ, এস খাওয়ানো চলে। এই ওষুধের মাত্রা হচ্ছে দিনে ১৮ গ্রাম—সকাল ৯টা থেকে সুরু করে রাত ৯-৩০ পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা অন্তর প্রতিবার ৩ গ্রাম করে। সপ্তাহে একদিন ওষুধ খাওয়ান বন্ধ রাখা হয়। অল্প বয়সের ছেলেদের ও শিশুদের ওষুধের মাত্রা বয়স অনুসারে ঠিক করা হয়। ওষুধ খাওয়ার পর রক্তের মধ্যে পি, এ, এস-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে পি, এ, এস-এর পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়। এরপর মূত্র ইত্যাদি থেকে পি, এ, এস বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পরিমাণ কমতে থাকে। এই জন্যেই রক্তে পি, এ, এস-এর পরিমাণ ঠিক রাখার জন্যে বার বার ওষুধ খেতে হয়। পি, এ, এস ফুসফুস, মূত্রযন্ত্র, যকৃৎ ইত্যাদিতে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে; কিন্তু যদি যক্ষ্মারোগের অনেকদিন আক্রমণের ফলে ফুসফুসে গর্তের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে গর্তের মধ্যে পি, এ, এস প্রবেশ করে অতি মন্থর গতিতে। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে পি, এ, এস-এর কার্যকারিতা আশানুরূপ হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে পি, এ, এস-এর ব্যবহারে গর্তের আকার ক্রমশঃ ছোট হতে দেখা গেছে।

পি, এ, এস পাওয়া যায় চিনিমিশ্রিত বড়ি অথবা চূর্ণ হিসেবে। একে সুগন্ধ ও সুস্বাদু করবার জন্য পিপারমেণ্ট, যষ্টিমধু অথবা সরবতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে। এই ওষুধের গুণ ঠিক রাখার জন্যে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা উচিত এবং ওষুধ তৈরী হবার এক সপ্তাহের মধ্যে খাওয়া উচিত।

পি, এ, এস খাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে রুগীর শরীরের উত্তাপ নেমে আসে, নাড়ীর স্পন্দন প্রায় স্বাভাবিক হয়, রাতের ঘাম কমে যায় ক্ষিদে বাড়ে, শরীরের ওজন বেশী হয়, শরীরে ও মনের স্ফূর্তি বেড়ে ওঠে এবং সব চেয়ে বড় কথা থুতুর মধ্যে যক্ষ্মারোগের জীবাণুর পরিমাণ অনেকক্ষেত্রে একেবারে শূণ্য হয়ে যায়। এর ফলে যক্ষ্মারোগ অন্য সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হতে পারে না। সাধারণতঃ তিন মাসের চিকিৎসাতেই রুগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে রোগের অবস্থা ও রুগীর রোগ সহ্য করবার ও প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে' এই সময়ের তারতম্য ঘটে। ফুসফুসের যক্ষ্মা ছাড়াও দেহের অন্যান্য স্থানের যক্ষ্মাতেও পি, এ, এস প্রয়োগ করা হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পি, এ, এস এবং ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সমবেত প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগের মাত্রা দিন দিন প্রসার পাওয়ার ফলে বহু লোক এই ব্যাধির কবলে পড়ে অকালে মারা যান। এঁদের অনেকেই অর্থাভাবের দরুণ বিদেশী দামী ওষুধ কিনতে পারেন না এবং তার ফলে একরকম বিনা চিকিৎসায় মারা যান। শুধু তাই নয়, মারা যাবার আগে একজন যক্ষ্মা-রোগী আরও কয়েকজনের মধ্যে এই দুরন্ত ব্যাধির বীজাণু ছড়িয়ে যান। সম্প্রতি আমাদের দেশে জি, ডি, এ কেমিক্যালের ডাঃ এন, গাঙ্গুলির তত্ত্বাবধানে সিন্থেটিক পি, এ, এস তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই ওষুধের জন্যে আমাদের আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। ভারতের শত সহস্র যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় আনন্দের সংবাদ। আশা করি আমাদের জাতীয় সরকার অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে দরিদ্র যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার সুযোগ দিয়ে এই ভীষণ রোগের চিরনির্বাসনের ব্যবস্থা করবেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ,—৫ম সংখ্যা
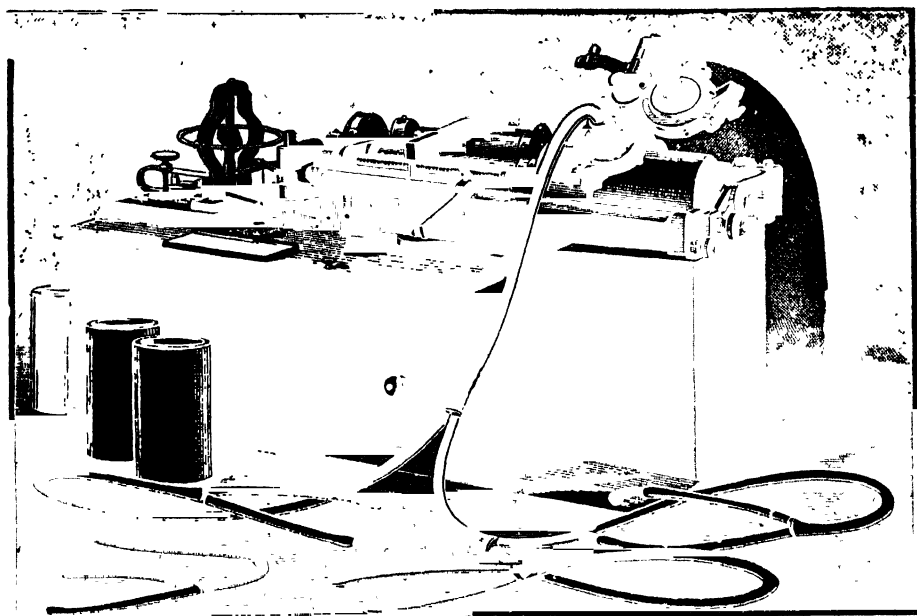
এডিসন উদ্ভাবিত প্রথম ফনোগ্রাফ। তখন কানে নল লাগিয়ে গান-বাজনা শুনতে হতো। তখনকার রেকর্ড ছিল গোল চোঙের মত।

৩১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ডাঃ টমাস আলভা এডিসন

জন্ম—১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ মৃত্যু—১৮ই অক্টোবর ১৯৩১

৩১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

করে দেখ

সংখ্যার ছন্দ

সংখ্যার ছন্দ ? সে আবার কি! সংখ্যার মধ্যে আবার ছন্দ থাকে না কি ? কি বাজে বকছি, নয় ? ছন্দ তো তোমরা মেলাও অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে। সংখ্যার মত বিশ্রী জিনিসে আবার ছন্দ পাওয়া যাবে কি করে ? সংখ্যা ও অঙ্ক—এগুলোকে হয়তো তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বর্জন করেই এসেছ, অঙ্কের নামেই হয়তো গায়ে জ্বর আসে ! তোমরা ভাবছ, সংখ্যার মত বিদ্‌ঘুটে জিনিসে আবার ছন্দ বলে কিছু থাকে না কি ?

থাকে যে, তা তোমরা গত মার্চ সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' 'মজার অঙ্ক'তে দেখেছ। সেখানে দেখেছ যে, অঙ্কের মত নীরস জিনিসেও রস থাকে এবং সংখ্যাকেও ছন্দোবদ্ধভাবে সাজানো যায়—তার মধ্যেও ভারি চরৎকার সাদৃশ্য বা মিল পাওয়া যায়। এই রস ঠিক মত গ্রহণ করতে পারলে মাঝে মাঝে সামান্য ও সাধারণ অঙ্কের মিল বা ছন্দের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হতে হয়।

কবিতার ছন্দ যেমন নানান রকমের থাকে, সংখ্যার ছন্দও সেই রকম বহু প্রকারের হতে পারে। এখানে কেবল বিশেষ এক ধরনের ছন্দের কতকগুলো অঙ্ক দেখাচ্ছি। ভবিষ্যতে আরও দেখাবার ইচ্ছে রইল—অবশ্য এগুলো যদি তোমাদের ভাল লাগে। অঙ্কগুলো নীচে কষে দেওয়া আছে, মিলিয়ে নাও।

১ নং

৯, ৯৮, ৯৮৭, ৯৮৭৬ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে ৯ দিয়ে গুণ করে যাও এবং গুণফলের মিলটি লক্ষ্য কর। প্রথমটি—একটি ৮ এর পরে ১, দ্বিতীয়টি—দুটি ৮ এর পরে ২, তৃতীয়টি—তিনটি ৮ এর পরে ৩ ইত্যাদি।

৯ × ৯ = ৮১
৯৮ × ৯ = ৮৮২
৯৮৭ × ৯ = ৮৮৮৩
৯৮৭৬ × ৯ = ৮৮৮৮৪
৯৮৭৬৫ × ৯ = ৮৮৮৮৮৫
৯৮৭৬৫৪ × ৯ = ৮৮৮৮৮৮৬
৯৮৭৬৫৪৩ × ৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৭
৯৮৭৬৫৪৩২ × ৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯

এই অঙ্কটিকে একটু অন্য রকম করেও লেখা যায়। যেমন—প্রথমটির সঙ্গে ৭ যোগ কর, দ্বিতীয়টির সঙ্গে ৬, তৃতীয়টির সঙ্গে ৫ ইত্যাদি এবং শেষটির থেকে ১ বাদ দাও। তাহলে প্রথমটি দুটি ৮, দ্বিতীয়টি তিনটি ৮, তৃতীয়টি চারটি ৮ ইত্যাদি—এই রকম দাঁড়াবে।

৯ × ৯ + ৭ = ৮৮
৯৮ × ৯ + ৬ = ৮৮৮
৯৮৭ × ৯ + ৫ = ৮৮৮৮
৯৮৭৬ × ৯ + ৪ = ৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫ × ৯ + ৩ = ৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪ × ৯ + ২ = ৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩ × ৯ + ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩২ × ৯ + ০ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ − ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮

২ নং

এবার ১, ২১, ৩২১, ৪৩২১ প্রভৃতি সংখ্যাগুলোকে ৯ দিয়ে গুণ কর। এখানেও গুণফলের মধ্যে মিলটি লক্ষ্য কর। প্রথমটি শুধু ৯; তার পরেরটি ১, তার পরে একটি ৮ ও তার পরে ৯; তৃতীয়টি ২ তার পরে দুটি ৮ ও তার পরে ৯ ইত্যাদি।

১ × ৯ = ৯
২১ × ৯ = ১৮৯
৩২১ × ৯ = ২৮৮৯
৪৩২১ × ৯ = ৩৮৮৮৯
৫৪৩২১ × ৯ = ৪৮৮৮৮৯
৬৫৪৩২১ × ৯ = ৫৮৮৮৮৮৯
৭৬৫৪৩২১ × ৯ = ৬৮৮৮৮৮৮৯
৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ = ৭৮৮৮৮৮৮৮৯
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৯

এই অঙ্কটিরও একটু রকমফের করা যায়। প্রত্যেকটি থেকে যদি ১ বিয়োগ করা যায় তাহলে প্রথমটি ৮, দ্বিতীয়টি ১, তার পরে দুটি ৮, তৃতীয়টি ২, তার পরে তিনটি ৮ ইত্যাদি—এই রকম দাঁড়াবে।

৩ নং

৯, ৯৯, ৯৯৯, ৯৯৯৯ প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে ৯ দিয়ে গুণ কর এবং গুণফলের মধ্যে মিল লক্ষ্য কর।

৯ × ৯ = ৮১

৯৯ × ৯ = ৮৯১

৯৯৯ × ৯ = ৮৯৯১

৯৯৯৯ × ৯ = ৮৯৯৯১

৯৯৯৯৯ × ৯ = ৮৯৯৯৯১　　ইত্যাদি।

এখানে লক্ষ্য কর যে, ৯×৯=৮১ এবং ৯ এর পরে আর যতগুলো ৯ বসানো যাবে তাকে ৯ দিয়ে গুণ করলে ৮ ও ১-এর মাঝে ঠিক ততগুলো ৯ বসবে। মজার নয় কি? এটিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। যেমন, যতগুলো ইচ্ছে ৯ পর পর রেখে তাকে ৯ দিয়ে গুণ কর। তাহলে প্রথম ৯টিকে ৮ ও ১-এ ভেঙে ফেল (৯=৮+১)। এখন ৮টিকে প্রথমে রাখ এবং ১টিকে শেষে নিয়ে এস। তা হলেই গুণফল পাওয়া যাবে।

এই অঙ্কটিতে ৯ দিয়ে গুণ না করে ৮, ৭ অথবা অন্য যে কোনও এক-অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা দিয়ে (অবশ্য ১ ছাড়া) গুণ করলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

৯ × ৮ = ৭২

৯৯ × ৮ = ৭৯২

৯৯৯ × ৮ = ৭৯৯২

৯৯৯৯ × ৮ = ৭৯৯৯২

অথবা　　৯ × ৫ = ৪৫

৯৯৯ × ৫ = ৪৯৯৫

এই রকম　　৯৯৯৯৯ × ৩ = ২৯৯৯৯৭　　ইত্যাদি।

এবারে যে অঙ্কগুলো দেখাচ্ছি তাতে শুধু গুণ না করে ১ নং অঙ্কটির রকমফেরের মত কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে হবে। ছন্দটি মিলিয়ে নাও।

৪ নং

১ × ৮ + ১ = ৯

১২ × ৮ + ২ = ৯৮

১২৩ × ৮ + ৩ = ৯৮৭

১২৩৪ × ৮ + ৪ = ৯৮৭৬

১২৩৪৫ × ৮ + ৫ = ৯৮৭৬৫

১২৩৪৫৬ × ৮ + ৬ = ৯৮৭৬৫৪

১২৩৪৫৬৭ × ৮ + ৭ = ৯৮৭৬৫৪৩

১২৩৪৫৬৭৮ × ৮ + ৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮ + ৯ = ৯৮৭৬৫৪৩২১

৫ নং

০ × ৯ + ১ = ১
১ × ৯ + ২ = ১১
১২ × ৯ + ৩ = ১১১
১২৩ × ৯ + ৪ = ১১১১
১২৩৪ × ৯ + ৫ = ১১১১১
১২৩৪৫ × ৯ + ৬ = ১১১১১১
১২৩৪৫৬ × ৯ + ৭ = ১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭ × ৯ + ৮ = ১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮ × ৯ + ৯ = ১১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৯ + ১০ = ১১১১১১১১১১

৬ নং

১ × ৯ − ৮ = ১
২ × ৯ − ৭ = ১১
১৩ × ৯ − ৬ = ১১১
১২৪ × ৯ − ৫ = ১১১১
১২৩৫ × ৯ − ৪ = ১১১১১
১২৩৪৬ × ৯ − ৩ = ১১১১১১
১২৩৪৫৭ × ৯ − ২ = ১১১১১১১
১২৩৪৫৬৮ × ৯ − ১ = ১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ − ০ = ১১১১১১১১১

এখানে বাঁদিকের গুণ্য রাশিটির মিল ধরতে আশা করি, অসুবিধা হবে না। ১, ২ থেকে আরম্ভ করে যে কোনও একটি অঙ্ক বাদ দিয়ে তার পরেরটিতে রাশিটি শেষ হয়েছে। যেমন ১২৪, অথবা ১২৩৪৫৭ ইত্যাদি। মূলতঃ এই অঙ্কটি কিন্তু ৫নং অঙ্কেরই রকমফের মাত্র।

৭ নং

৯ × ৯ − ৭ × ১০ = ১১
১৯ × ৯ − ৬ × ১০ = ১১১
১২৯ × ৯ − ৫ × ১০ = ১১১১
১২৩৯ × ৯ − ৪ × ১০ = ১১১১১
১২৩৪৯ × ৯ − ৩ × ১০ = ১১১১১১
১২৩৪৫৯ × ৯ − ২ × ১০ = ১১১১১১১
১২৩৪৫৬৯ × ৯ − ১ × ১০ = ১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ − ০ = ১১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৯ + ১ × ১০ = ১১১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮৯৯ × ৯ + ২ × ১০ = ১১১১১১১১১১১

এই অঙ্কটিকে ৫ নং অঙ্কের রকমফের বলা যেতে পারে।

এই ধরনের মিলের উদাহরণ আরও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই। এই মজার অঙ্কগুলোর চমৎকার মিলের কথা ভেবে দেখো, হয়তো তোমরা নিজেরাই এই রকম মিল আরও অনেক খুঁজে বের করতে পারবে।

শ্রীগুরুদাস সিংহ।

জেনে রাখ

শুক্‌নো বরফ

মনে কর, জ্যৈষ্ঠের দুপুর—প্রচণ্ড রোদ, অসহ্য গরম, গলা শুকিয়ে কাঠ, প্রাণ ওষ্ঠাগত—দেহের খাঁচাটা থেকে এই বেরোয় তো এই বেরোয়। এমনি যখন অবস্থা তখন যেন শ্যামের বাঁশি—'চাই আইস্ ক্রিম্, ম্যাগনোলিয়া আইস্ ক্রিম,' 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।' মাত্র কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে বিশ্বের আরাম যেন মাথায় ঝরে পড়লো। লোকটা যেন দোরে দোরে প্রাণ বিলি করে' গেল—না ?

যে বস্তুটির জন্যে এই আইসক্রিম পাওয়া এবং খাওয়া এত সহজ সেইটি হলো শুক্‌নো বরফ বা ড্রাই আইস। বিস্ময়ে হাঁ করো না, এটা সত্যি যে বরফও শুক্‌নো থাকে। ত্রিশ বছরের কিছু বেশী হলো লণ্ডনের এক ফার্ম এই মনোরম উদ্ভাবনটি করে' তোমাদের গ্রীষ্মার্ত মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এখন অবশ্য এই উদ্ভাবন আর নতুন কিছু নয়, তবে এর ব্যবহার এবং প্রসার কিন্তু অতি সম্প্রতিই বিস্তৃতি লাভ করেছে। এর ব্যবহারে নানাবিধ সুবিধা এবং বহু প্রয়োজনে এর উপযোগিতা, এর চাহিদা ও উৎপাদন অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিয়েছে।

আচ্ছা এবার শোন, শুক্‌নো বরফ বস্তুটি কি ? মন দেবে কিন্তু, নইলে অঙ্কে মিলবে না।

মনে রাখবে, সব বস্তু তিন রকম অবস্থায় থাকতে পারে। এই তিনটি অবস্থা হলো—কঠিন, তরল, গ্যাসীয় বা বায়বীয়। ধর যেমন জল—জল বরফ, তরল জল, অথবা বাষ্প যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে। সোনাও নিতে পার—সোনা তোমরা কঠিন ডেলার আকারেই দেখ। তাপ দিয়ে একে গলিত অবস্থায় আনা যায় এবং আরও বেশী তাপে গলিত সোনাকে গ্যাস-এ পরিণত করা যেতে পারে। বায়ুও তাই। বায়ুকে আমরা গ্যাস অথবা কতকগুলো গ্যাস-এর সমষ্টিরূপেই জানি। এই বায়ুকেও চাপ এবং অত্যধিক শীতলতা দিয়ে তরল করা যায় এবং আবশ্যক হলে এই তরল বায়ুকে কঠিন পদার্থে পরিবর্তিত করা চলে।

বায়ুতে যতগুলো গ্যাস আছে তার মধ্যে একটি হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড। জীবমাত্রেই—মানুষ বল, জীবজন্তু বল, স—ব শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা বায়ু হতে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে বায়ু হতে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাই। কিন্তু বায়ুই কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর একমাত্র প্রাপ্তিস্থান নয়। বিয়ার, স্পিরিট, ভিনিগার প্রভৃতি প্রস্তুত করতে বহুল পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিতে হয়। পূর্বে এগুলো নষ্ট হতো, কোন কাজে লাগানো হতো না। কিন্তু এখন লেমোনেড, লাইম্‌জুস্ প্রভৃতি পানীয়ের জন্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে চাপের দ্বারা সঞ্চিত রাখা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে চাপের দ্বারা জোর করে এই সব পানীয়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, আর পানীয়গুলো বেশ শক্ত, মজবুত বোতলে ভরে দেওয়া হয়। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, যখন এসব বোতলের ছিপি খুলে দেওয়া হয় তখন গ্যাসটা বুদ্‌বুদের আকারে ভস্ ভস্ করে বেরিয়ে আসে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা গ্যাস। একে যথেষ্ট ঠাণ্ডা করে তরল আকারে নেওয়া যায় এবং আরো ঠাণ্ডা করে একে জমিয়ে ফেলা যায় অর্থাৎ বরফে পরিণত করা যায়।

যাকে আমরা ড্রাই আইস বা শুক্‌নো বরফ বলি তা আর কিছুই নয়—কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস-এর কঠিন অবস্থা। তাহলে শুক্‌নো বরফ বস্তুটি কি সেকথা সম্যকরূপে বুঝলে তো? এবার এর প্রয়োজনীয়তাটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। বাস্তবিক, শুক্‌নো বরফ আমাদের বহু প্রয়োজনে লাগে। আমরা সাধারণতঃ বরফ দিয়ে জিনিস ঠাণ্ডা রাখি। বরফ কি করে জিনিস ঠাণ্ডা রাখে সে তো জানই—গলে গলে সে জিনিস ঠাণ্ডা রাখে। বরফ 0 ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেডে গলে; সুতরাং জিনিসপত্র সে এই ডিগ্রি পর্যন্তই ঠাণ্ডা রাখতে পারে। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড 0 ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড অপেক্ষা আরো ৮০ ডিগ্রি কমে (minus 0 ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড) গলে; তাই জিনিসপত্র সে বরফের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা করতে পারে। তাহলে দেখ, ঠাণ্ডা রাখার কাজে বরফ অপেক্ষা এর উপযোগিতা বেশী। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড শুধু যে জিনিস বেশী ঠাণ্ডা করে তা নয়, যে-হেতু এটা গলতে বেশী তাপের প্রয়োজন তাই এর অল্প কিছুটাই অনেকক্ষণ কাজ দেয়। বিক্রেতা যদি আইসক্রিমের বাক্সে মাত্র সের খানেক শুক্‌নো বরফ নেয় তবে তার সারাদিন চলে যাবে; কিন্তু সেই স্থলে মাল ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে যদি সে বরফ নেয় তবে তাকে ওর দশগুণ বরফ নিতে হবে। তবেই দেখ, মিতব্যয়িতার দিকেও শুক্‌নো বরফের দাম উল্লেখযোগ্য।

আরো একটা কথা—বরফ গলে কি কাণ্ডটাই না করে! জলে জলাকার! কিন্তু শুক্‌নো বরফের এসব বালাই নেই! সে সোজা কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস হয়ে উড়ে যায়—একফোঁটাও নোংরামি নেই।

রোসো, এর প্রয়োজনীয়তা এখানেই শেষ হয়নি; আরো আছে। বর্তমান যন্ত্র-যুগে সে মস্ত একটি প্রয়োজন সাধন করে। সেটা হলো এই:—তোমরা বোধহয় জান চাকার ভেতর গাড়ীর বম্ বা shaft ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পূর্বেও বম্ ঢুকিয়ে দেবার জন্যে চাকাটাকে খুব তপ্ত করা হতো। তাপে চাকার প্রসারণ ঘটতো, তখন বম্‌টা ঢুকিয়ে দেওয়া হতো, পরে চাকাটা ঠাণ্ডা হলে সঙ্কুচিত হয়ে বম্‌টাকে শক্ত করে এঁটে ধরতো।

বুঝতেই পারছো নিশ্চয়; এটা একটা মস্ত অসুবিধার কাজ। শুধু অসুবিধার নয়, চাকার যে সব অংশ লোহার পাত দিয়ে তৈরী, এই ব্যবস্থা সে সব অংশের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। কারণ অত্যধিক তাপে ধাতুর শক্তি হ্রাস পায়। কাজেই তাকে আবার সবল ও কার্যকরী করতে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। শুক্‌নো বরফকে অশেষ ধন্যবাদ—সে এই সব হাঙ্গামা ও অপচয় থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে! অধুনা বম্‌টাকে কয়েক মিনিটের জন্যে শুক্‌নো বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়। ফলে, ঠাণ্ডায় সেটা সঙ্কুচিত হয়ে যায়; তখন তাকে চাকার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পরে যখন ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে তার স্বাভাবিক তাপে ফিরে আসে তখন চাকাটার ভেতরে সে বেশ শক্ত হয়ে বসে যায়।

লতিকা দত্ত

বিজ্ঞানের যাদুকর

ডাঃ টমাস আলভা এডিসন

গ্রামোফোন যন্ত্রটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ। খুব বেশী-দিনের কথা নয়, এমন এক সময় ছিল যখন কেউ ভাবতেই পারতো না যে, যন্ত্র আবার মানুষের মত কথা বলতে পারবে! অথচ দেখ, আজকাল কিন্তু এটাকে তেমন কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার বলেই মনে হয় না। অতি-পরিচয়ের ফলে অবশ্য এরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যান্ত্রিক-কৌশলে কণ্ঠস্বরকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে ইচ্ছামত যখন তখন অবিকৃতভাবে শুনিয়ে দেওয়া যে কি বিস্ময়কর ব্যাপার, একটু চিন্তা করলেই সেকথা বুঝতে পারবে। যিনি এই অপূর্ব যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছিলেন;

তোমরা অনেকেই বোধহয় তাঁর নাম শুনেছ। এই অপূর্ব প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের নাম – টমাস আলভা এডিসন। সংক্ষেপে এডিসন নামেই তিনি বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। কেবল যে গ্রামোফোন উদ্ভাবন করেই তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা নয়—বিজলী বাতি, ডায়নামো, চলচ্চিত্র প্রভৃতি থেকে সুরু করে কত কিছুই যে তিনি উদ্ভাবন করে গেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তো দূরের কথা, একমাত্র অভিনব উদ্ভাবনের সংখ্যার কথা শুনলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। আজ ঘরে ঘরে রেডিওর প্রচলন হয়েছে। থার্মোআইওনিক ভাল্‌ভ্ নামক জিনিসটা উদ্ভাবিত না হলে আজ রেডিও মারফৎ দেশ-বিদেশের খবর-বার্তা বা গান-বাজনা শোনা সম্ভব হতো না। এই থার্মোআইওনিক ভাল্‌ভের মৌলিক রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন—এডিসন। পদার্থ-বিজ্ঞানের বইয়ে সেই রহস্যটাই 'এডিসন এফেক্ট' নামে পরিচিত। মোটের উপর, আজ পর্যন্ত আর কেউ বোধহয় উদ্ভাবনী-শক্তিতে এডিসনের মত বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। এই অপূর্ব প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের মতই তাঁর জীবনের ঘটনাবলীও বৈচিত্র্যপূর্ণ। অতি সংক্ষেপে আজ সেকথাই তোমাদিগকে বলছি।

অল্প বয়সের একটি বালক। রাতদিন কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। একগ্লাস জলে একদিন খানিকটা সিডলিজ পাউডার ঢেলে দিতেই দেখে—জলটা উতলে উঠছে। বালকের মনে খেয়াল চাপে—বাঃ বেশ তো! তবে তো এই জিনিস দিয়েই মানুষকে বেলুনের মত আকাশে ওড়ানো যেতে পারে! পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে অপর একটি বালককে বেশ কিছুটা সিডলিজ পাউডার খাইয়ে দেয়। ফল যা হলো বুঝতেই পার! বেগতিক দেখে পরীক্ষক বালক উধাও হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজির পর গোলাঘরের এককোণে তাঁর গুপ্ত ল্যাবরেটরী থেকে বের করে এনে শাসিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতি বালকের কিছুমাত্র ঝোঁক কমবার লক্ষণ দেখা গেল না।

এই বালকটি কে, জান? এই বালকটিই বড় হয়ে তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় বিশ্ববাসীকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। এই সেই বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভাবক এডিসন।

এডিসন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৭ সালে ওহিওর মিলান সহরে। তাঁর বাবা ছিলেন ডাচ, আর মা ছিলেন স্কচ। ছোটবেলায় তাঁকে খুব সুস্থ সবল বলে মনে হতো না। খুব শান্তশিষ্ট চিন্তাশীল প্রকৃতির ছেলে, অথচ ভয়ানক কৌতূহলী। যা দেখেন তাতেই কেবল—জিজ্ঞাসা। সমবয়সীরা তো বটেই, অভিভাবকেরা পর্যন্ত তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করতে বিব্রত হয়ে পড়তেন। পাঁচ ছয় বছরের বালক সময় সময় এক একটা জটিল বিজ্ঞোচিত প্রশ্ন করে বসতো। তাছাড়া তখন থেকেই কলকব্জার ব্যাপারে তাঁর একটা প্রবল ঝোঁক দেখা যেত। স্বাস্থ্য খারাপ ভেবে বাপ-মা অন্যান্য ছেলের মত তাঁকে স্কুলে পাঠাতে ভরসা পাননি। পরে অবশ্য স্কুলে দেওয়া

হয়েছিল; কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকা সম্ভব হয়নি। দুর্বল মস্তিষ্কের ছেলে বলে স্কুলের শিক্ষক তার সম্বন্ধে ইনস্‌পেক্টরকে রিপোর্ট করেছিলেন। একথা শুনে এডিসনের মা ভয়ানক চটে গিয়ে ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। এক সময়ে এডিসনের মা ছিলেন ওখানকার হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। কাজেই ছেলের লেখা-পড়া শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতেই গ্রহণ করলেন। মায়ের তত্ত্বাবধানে ছেলে পড়া-শুনায় বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে যেতে লাগলো। দশ এগারো বছর বয়স থেকে বালকের ঝোঁক পড়লো রসায়ন শাস্ত্রের উপর। রসায়ন শাস্ত্রের কয়েকখানা বই যোগাড় করে সে রাতদিন সেগুলো নিয়েই ব্যাপৃত থাকে। তারপর অনেক অনুরোধ উপরোধে মাকে রাজী করিয়ে বাড়ীর একটা ঘরে ছোট্ট একটা পরীক্ষাগার তৈরী করে নেয়। জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে স্থানীয় ওষুধের দোকান থেকে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিনে এনে পরীক্ষাগারটি সাজিয়ে তোলে। ক্রমে ক্রমে পরীক্ষাগারটিতে প্রায় দু-তিন শ' শিশি বোতল জমা হয়। কেউ যাতে এসব জিনিস স্পর্শ না করে সেজন্যে প্রত্যেকটি শিশি বোতলের গায়ে 'বিষ' কথাটি লেখা থাকতো। বইয়ে লেখা থাকলেই সেকথা অভ্রান্তভাবে মেনে নিতে হবে, এটা ছিল ছোটবেলা থেকেই এডিসনের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শেষ বয়স পর্যন্ত এই স্বভাবটা তাঁর অব্যাহতই ছিল।
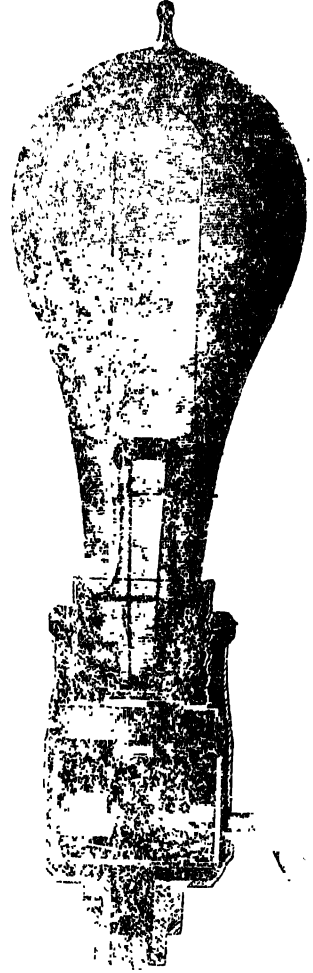
এডিসন-উদ্ভাবিত প্রথম বিজলী বাতি। এতে কার্বন ফিলামেণ্ট ব্যবহৃত হতো

যাহোক, বছর দুই এভাবে কাটবার পর দেখা গেল, নতুন যন্ত্রপাতি না পেলে আর পরীক্ষা চলে না; অথচ সামান্য হাতখরচার পয়সা দিয়ে সেসব কেনাও সম্ভব নয়। তখন সে খবরের কাগজ ফেরী করে কিছু পয়সা উপার্জনের মতলব করে। অনেক বলে কয়ে মা-বাবাকে এ বিষয়ে সম্মত করায়। অবশেষে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়ের চলতি গাড়ীতে খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, লজেঞ্জ প্রভৃতি ফেরী করতে সুরু করে দেয়। জিনিসপত্র রাখবার জন্যে তাকে লাগেজ-ভ্যানের খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। গাড়ীর মধ্যে সে তাঁর ল্যাবরেটরী তুলে আনে এবং বিস্তৃতভাবে পরীক্ষার কাজ সুরু করে দেয়। তাছাড়া ছোট্ট একটা মুদ্রাযন্ত্র এবং কিছু টাইপ কিনে

গাড়ীর মধ্যেই উইক্‌লি হেরাল্ড নামে একটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকে। এডিসনের বয়স তখন বছর তেরোর বেশী নয়। এই তেরো বছরের বালকই ছিল উইক্‌লি হেরাল্ডের সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক ইত্যাদি সব কিছু। এই উইক্‌লি হেরাল্ডই ছিল পৃথিবীর বয়োকনিষ্ঠ সম্পাদক পরিচালিত সর্বপ্রথম চলন্ত ট্রেনে মুদ্রিত সংবাদপত্র। এই কাগজখানার স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যা চার শ'য়েরও উপরে উঠেছিল। প্রায় দু-তিন বছব নির্বিঘ্নে কাজ চলবার পর অকস্মাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ফস্‌ফরাস ভর্তি একটা শিশি তাকের উপর থেকে মেঝেতে পড়ে গাড়ীতে আগুন ধরে যায়। কণ্ডাক্টর ভীষণ চটে গিয়ে যাবতীয় জিনিসপত্র সমেত এডিসনকে গাড়ী থেকে বের করে দেয়। বের করে দেবার সময় কণ্ডাক্টর তার কানের উপর এমন জোরে ঘুষি মেরেছিল যে, তার ফলে এডিসনকে সারা জীবন বধির হয়েই কাটাতে হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে এডিসন নিজের জীবন বিপন্ন করে ষ্টেসন এজেন্টের ছোট্ট ছেলেকে গাড়ী চাপা পড়বার বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এডিসনের এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়েব পর সেই এজেন্ট ভদ্রলোকটি কৃতজ্ঞতা পরবশে তাঁকে টেলিগ্রাফী শিখবার ব্যবস্থা করে দেন। এডিসনও পরম আগ্রহে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য রাসয়নিক পরীক্ষা ও পড়াশুনাব কাজ নিয়মিতভাবেই চলতে থাকে। টেলিগ্রাফী শিখে এডিসন পনেরো বছর বয়সে অপারেটরের কাজে নিযুক্ত হন। কাজে তার অপরিসীম উৎসাহ। মাত্র ঘণ্টা চারেক ঘুমিয়ে প্রত্যহ প্রায় বিশ ঘণ্টাই কাজে লেগে থাকতেন। নির্দিষ্ট সময় অপারেটরের কাজ করে কেবল রাসায়নিক পরীক্ষাই নয়, টেলিগ্রাফ এবং তড়িৎ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার জন্যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। অসম্ভব পরিশ্রম এবং আগ্রহ নিয়ে কাজ করবার ফলে এই পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক সে সময়কার একজন প্রথমশ্রেণীর অপারেটরের যোগ্যতা অর্জন করেন এবং তদনুরূপ আর্থিক সুবিধাও ঘটতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় অপারেটরের কাজ করবার সময় তিনি যেসব উদ্ভাবনী কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন সেগুলোও কম বিস্ময়কর নয়। সেসব বিষয় পরে তোমরা জানতে পারবে। প্রায় বছর পাঁচেক পরে এই অপারেটর বালকটি ডুপ্লেক্স সিষ্টেম নামে টেলিগ্রাফীর এক অভিনব ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া ১৮৬৯ সালে ষ্টক-টিকার নামে আর একটি অভিনব যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছিলেন। এসব যন্ত্রাদি উদ্ভাবনে তাঁর যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়ে যায়, অথচ স্বার্থান্বেষী লোকের কৌশলে এসব উদ্ভাবন থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থার কোন সুরাহা হয়নি। কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি ভাগ্যান্বেষণে নিউইয়র্কে চলে যান। নিউইয়র্কে এসে প্রথমতঃ তাঁকে একরকম অনাহারেই কাটাতে হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীতে তিনি চাকুরীর জন্যে আবেদন করেন এবং কোন কাজের সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত গোল্ড ইণ্ডিকেটর

কোম্পানীর ব্যাটারী-রুমে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে নেন। আবেদনের উত্তরের প্রতীক্ষায় সারাদিন তিনি ওই কোম্পানীর অপারেটিং রুমেই কাটাতেন। তৃতীয় দিনে কি একটা দুর্ঘটনার ফলে হঠাৎ কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ আদান-প্রদান যন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেয়; ফলে, বাইরের প্রায় শ'তিনেক মেসিনের কাজও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় এবং চতুর্দিকে একটা বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। কোন কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে না পেরে কর্মচারীরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এডিসন তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। যন্ত্রে গোলযোগ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন—ব্যাপারটা কি এবং কোথায় ঘটেছে। তিনি তখন কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে জানালেন—আপনার অনুমতি পেলে আমি যন্ত্র ঠিক করে দিতে পারি। প্রেসিডেন্টের অনুমতি পেয়ে তিনি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই যন্ত্র ঠিক করে দিলেন; পূর্বের মত সুশৃঙ্খলায় কাজ চলতে লাগলো।
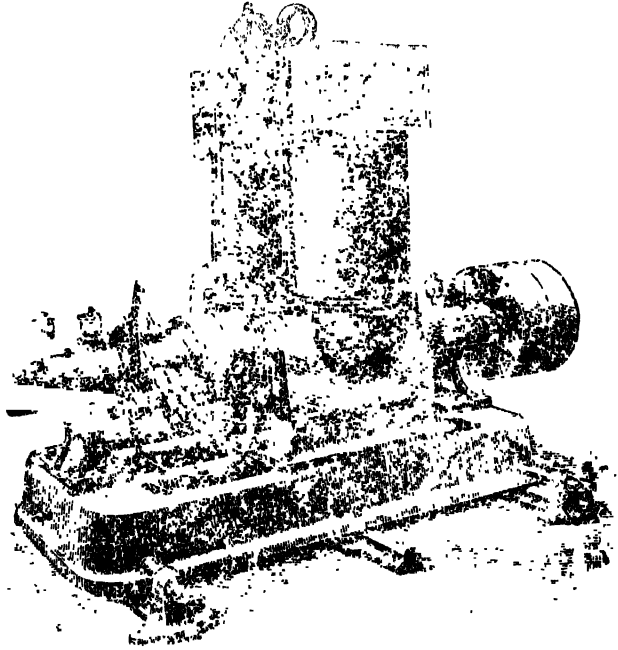
তড়িৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে এডিসন উদ্ভাবিত প্রথম ডায়নামো

এই ঘটনার ফলে কোম্পানী এডিসনকে জানালেন—তিনি মাসিক তিন-শ' ডলার বেতনে কোম্পানীর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদ গ্রহণ করতে রাজী আছেন কিনা। এই অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-পরিবর্তনে তাঁর মনের উল্লাসের কথা অনায়াসেই কল্পনা করতে পার। এখান থেকেই এডিসনের সত্যিকার কর্মজীবন এবং উদ্ভাবনী প্রতিভার বিকাশ সুরু হয়। এই কোম্পানীতে কিছুকাল কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি কতকগুলো নতুন যান্ত্রিক-কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং তার প্রতিদানে কোম্পানী তাঁকে এককালীন ৪০,০০০ ডলার দিয়ে পুরস্কৃত করেন। এডিসনের বয়স তখন বাইশ বছর মাত্র। উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির জন্যে

জীবনে এই তাঁর প্রথম অর্থপ্রাপ্তি। এই বিপুল অর্থ দিয়ে নিউআর্কে তিনি একটা ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করেন, এই ফ্যাক্টরীতে টেলিগ্রাফের বিভিন্ন রকমের যন্ত্রপাতি তৈরী হতো। কয়েক বছর তিনি এই ব্যবসায় চালিয়েছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে অটোমেটিক টেলিগ্রাফ, ডুপ্লেক্স ও কোয়াড্রুপ্লেক্স টেলিগ্রাফ, ইলেট্রোমোটোগ্রাফ প্রভৃতি অনেক নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তারপরে তিনি ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর অনুরোধে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের জন্যে ইলেকট্রো-কেমিক্যাল ডিকম্পোজিসনের সাহায্যে পরিচালিত একরকম 'রিলে' পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ১০০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেন।

এরপরে তিনি যখন হার্মোনিক টেলিগ্রাফ সম্পর্কিত উদ্ভাবনা-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন সে সময়ে গ্র্যাহাম বেল টেলিফোন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। টেলিফোন উদ্ভাবনের খবর পেয়েই এডিসন তার খুঁটিনাটি বিবরণ অর্থাৎ যন্ত্রের দোষত্রুটি জেনে নিয়ে উন্নতধরনের ট্রান্সমিটার যন্ত্র উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কার্বন ট্রান্সমিটার উদ্ভাবনে সমর্থ হন। এই ট্রান্সমিটার উদ্ভাবনের ফলেই ঘরে ঘরে টেলিফোন সহজলভ্য হয়ে পড়ে। আজও সেই ট্রান্সমিটার সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানী ১০০,০০০ ডলারের বিনিময়ে এডিসনের কাছ থেকে কার্বন ট্রান্সমিটারের সত্ত্ব ক্রয় করে নেন।

অতঃপর যন্ত্রশিল্পের ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৮৭৬ সালে নিউআর্ক থেকে মেলনো পার্কে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে নতুন নতুন যন্ত্রাদি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। এখান থেকেই ১৮৭৭ সালে ফনোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই আশ্চর্য যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র একটা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। ওই সময়ে তিনি বিজলী বাতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও মনোনিবেশ করেছিলেন; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

ফনোগ্রাফ উদ্ভাবনে পৃথিবীব্যাপী যে সাড়া পড়েছিল, তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে বৎসরাধিককাল তাঁকে নানাভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়—এর ফলে তিনি কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণে বাধ্য হন। এরপর তিনি বিজলী বাতি সংক্রান্ত ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন এবং রাতদিন পরিশ্রম করতে থাকেন। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮৭৯ সালে ২১শে অক্টোবর প্রথম ইনক্যাণ্ডেসেণ্ট ল্যাম্প তৈরী করেন। বায়ুশূন্য কাচ গোলকের মধ্যে কার্বন ফিলামেণ্টের সহায়তায় এই বাতি তৈরী হয়েছিল। বিজলী বাতির ক্ষেত্রে এই প্রথম অপূর্ব সাফল্য! তিনি কেবল বিজলী বাতি উদ্ভাবনেই ব্যাপৃত ছিলেন না, বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদন সম্পর্কিত যাবতীয় পদ্ধতি, যেমন—বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ স্রোত পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, এমন কি—পরিমাপ প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারেরই অভিনব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে এমন ডায়নামো তৈরী করেছিলেন যা তখনকার দিনে কারোর ধারণায়ও আসেনি। এই ডায়নামো উদ্ভাবনের ফলেই

১৮৮০-৮২ সালের মধ্যে ইলেকট্রিক রেলওয়ে সিষ্টেম কার্যকরী হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এডিসন উদ্ভাবিত ডায়নামো তৈরীর রীতি অনুযায়ী আজও পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ব্যাপার সম্পর্কে আমরা আজ যে কত রকমের অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখতে পাই, এর অনেকের মূলেই রয়েছে এডিসনের উদ্ভাবনী প্রতিভা।

যাহোক, এর পরে অরেঞ্জ ভ্যালিতে বিরাট কারখানা ও ল্যাবরেটরী স্থাপন করে ১৮৮৭ সালে এডিসন সেখানে চলে যান। নতুন ল্যাবরেটরীতে গিয়ে তিনি ফনোগ্রাফ যন্ত্রের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। প্রায় বছর দশেক পূর্বে ফনোগ্রাফ উদ্ভাবন করেছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তার আর কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি উন্নত ধরনের ফনোগ্রাফ সম্পর্কিত প্রায় ৮২টি নতুন পেটেন্ট গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফনোগ্রাফের চাহিদা মিটাবার জন্যে তাঁকে পাঁচটি বিরাট কারখানা তৈরী করতে হয়েছিল। এসব কারখানায় কয়েক হাজার লোক কাজ করতো। ১৮৯১ সালে এডিসন মোটর, জেনারেটর, ইলেকট্রিক রেলওয়ে এবং বিজলী আলোর ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করেন। এই সালেই তাঁর চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আবিষ্কারসমূহ সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। ১৮৯১ সালের ৩১শে জুলাই তিনি চলচ্চিত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। এর পর নয় বছর পর্যন্ত চৌম্বকশক্তির সাহায্যে খনিজ পদার্থ থেকে লোহা পৃথকীকরণের বহু যান্ত্রিক-কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার! এস্থলে সে সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। এই সম্পর্কেও তিনি পঞ্চাশটিরও বেশী পেটেন্ট রাইট নিয়েছিলেন। এর পরে তিনি ষ্টোরেজ ব্যাটারী উদ্ভাবনে আত্মনিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ বিষয়ে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। অতঃপর পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট উৎপাদন এবং ছাঁচে-ঢালা সিমেন্টের বাড়ী তৈরীর অতি সহজ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। সেও আর এক বিরাট ব্যাপার। ঢালাই কংক্রিটের বাড়ী তৈরীর যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনে ব্যাপৃত থাকার সময়েই ডিস্ক ফনোগ্রাফের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ করেন। ১৯১৩ সালে উন্নত ধরনের ডিস্ক ফনোগ্রাফ বাজারে বের হয়।

মোটের উপর ১৮৬৯ সাল থেকে আরম্ভ করে তিনি ৩ হাজারেরও বেশী উদ্ভাবনের পেটেন্ট গ্রহণের জন্যে পেটেন্ট অফিসে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের পেটেন্ট অফিস থেকে তাঁকে দেড় হাজারেরও বেশী পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়েছিল। এ ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশবাসীর আগ্রহে এবং অনুরোধে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু সাহায্য করেন। এক মাত্র নৌ-বিভাগের জন্যেই পঁয়তাল্লিশটি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা চালান এবং সাবমেরিন সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সুমাধান করে দেন। ১৯১৪-১৫ সালে কার্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন অয়েল, অ্যানিলিন সল্ট, মারবেন, বেঞ্জল, প্যারাফেনিলিনডায়ামিন এবং অন্যান্য অনেক জিনিস উৎপাদনের প্ল্যান্ট নির্মাণে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করেন। তখন এ সব জিনিস ইউরোপের বিভিন্ন দেশ

থেকে আমদানী করতে হতো। ১৯৩১ সালে ১৮ই অক্টোবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্তও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। একটি লোকের জীবনে এরূপ বিরাট কার্যাবলী সম্পন্ন হলো কেমন করে—সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নেই! বিশ্ববাসী চিরকালই এই অপূর্ব প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে মস্তক অবনত করবে। —গ-—

বিবিধ

যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনায় ময়ূরাক্ষী

যুদ্ধোত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনায় ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ নির্মাণ কার্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। অ্যাডমিনেষ্ট্রেটর শ্রী এ, বি, গাঙ্গুলী বলেন, এ পর্যন্ত প্রায় দু-কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা মুখ্যতঃ সেচ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাটি দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে সাঁওতাল পরগণার ময়ূরাক্ষী নদীতে একটি উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করে জলাধারের সৃষ্টি করা, আর দ্বিতীয় ভাগে সিউড়ীতে বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননের ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে ৬ লক্ষ একর ভূমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্ভব হবে। ইহার ফলে ৩ লক্ষ টন ধান ও ৫০ হাজার টন রবিশস্য উৎপন্ন হবে। ইহার সঙ্গে ৪ হাজার কিলোওয়াট জল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যাবে। এই জল-বিদ্যুৎ বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্নাংশের শিল্পোন্নতির কার্যে সরবরাহ করা হবে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনানুসারে ময়ূরাক্ষী নদীতে মোট ছয়টি বাঁধ নির্মিত হবে; যথা—মসাঞ্জোরের উচ্চ বাঁধ, ময়ূরাক্ষী বাঁধ, বক্রেশ্বর বাঁধ, কোপাই বাঁধ, দ্বারকা বাঁধ এবং ব্রাহ্মণী বাঁধ। এই পরিকল্পনা দ্বারা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান এবং সাঁওতাল পরগণার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা-কার্যে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকগণ প্রায় সবাই ভারতীয়। তন্মধ্যে বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা যথেষ্ট। পূর্বে এখানে প্রায় ১৫ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী কাজ করতেন। বর্তমানে প্রায় ৭ হাজার কর্মী বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন কাজে নিযুক্ত আছে। আগামী ১৯৫৪ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

১৯৫১ সালের লোক গণনা

আগামী ১৯৫১ সালের লোক গণনা সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, দশ লক্ষাধিক গণনাকারী এই কার্যে নিযুক্ত হবেন। এই গণনাকারীরা অবৈতনিকভাবে কাজ করবেন। এই লোক গণনার পরিপ্রেক্ষিতে সাতলক্ষ কোটি তথ্য লিপিবদ্ধ হবে, তন্মধ্যে অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্যের সংখ্যাই হবে দশলক্ষের উপর। যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হবে তার মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকবে:—(১) ভারতের প্রত্যেকটি নাগরিক অর্থ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী অথবা পরের উপর নির্ভরশীল, (২) অর্থোপার্জনের জন্যে নিযুক্ত থাকলে কোন্ প্রকার কার্যে নিযুক্ত; জীবিকার্জনের প্রধান ও পরিপূরক উপায় কি, (৩) যে ব্যক্তি কৃষিজীবি সে নিজস্ব জমি চাষ করে অথবা পরের জমি, (৪) মজুর হিসেবে কাজ করে কিনা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক লোকের মাতৃভাষা, শিক্ষার মান, অন্য ভাষার জ্ঞান, পুরুষ কি নারী, ধর্ম, জাতি (বর্ণ), অনুন্নত শ্রেণীর লোক কিনা, বাসস্থান প্রভৃতি বিষয়

তো থাকবেই। পাকিস্থানী উদবাস্ত হলে, কবে এসেছেন এবং পাকিস্থানের কোন্ জেলা থেকে এসেছেন, এ সমস্ত তথ্যও লিপিবদ্ধ হবে। লোক গণনা এবং এই সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে প্রায় এক বছর সময় লাগবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ভারতের বিপুল সংখ্যক জনগণের সম্পর্কে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করে যে বিরাট গ্রন্থ সংকলিত হবে, তা ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধীয় গবেষণাকারীরা যাতে ব্যবহার করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক নর-নারীর সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত এক একটি রেজিষ্টার প্রত্যেক তহশীল অথবা জেলার প্রধান কার্য্যালয়ে সংরক্ষিত হবে, এরূপ পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

সমগ্র ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংগৃহীত ধানের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অযৌক্তিক। ধানের মূল্য বৃদ্ধি করলে, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্যও বেড়ে যাবে।

যে সকল পরিবারের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ধান থাকে এবং যাদের ৪ একরেরও অধিক জমি থাকে সে সকল পরিবারের ৪০ লক্ষ লোক ধানের মূল্য বৃদ্ধির ফলে লাভবান হবে। কিন্তু বাকী ২ কোটি ১০ লক্ষ লোকের উপর ধানের মূল্য বৃদ্ধির ফল খারাপই হবে। ধানের মূল্য বৃদ্ধি করলে উহার উৎকর্ষও বাড়বে এ ধারণা নির্ভুল নয়। ধান সংগ্রহ থেকে বণ্টন পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই যাতে ভেজাল না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি (১৯৫০) থেকে আসামে শস্য মরশুম আরম্ভ হয়েছে। তার মধ্যে আসাম হতে ভারতীয় ইউনিয়নের ঘাটতি অঞ্চলে ১০ হাজার টন চা'ল রপ্তানি করা হয়েছে। ৫ই এপ্রিল (১৯৫০) পর্য্যন্ত কোলাপুরে ৭৪ হাজার ৪০৯ টন শস্য সংগৃহীত হয়েছে। বহু সংখ্যক ছোটখাট সেচ কাযের সংস্কারের জন্যে গভর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে অগ্রিম ঋণ দান করছেন। গভর্ণমেণ্ট প্রতি জেলায় কালেক্টরকে চেয়ারম্যান, এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার সেক্রেটারী এবং কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তিকে সদস্য করে এক একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। ঐ কমিটি সেচ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং সেগুলো কার্যকরী করবার জন্যে এজেণ্ট নিযুক্ত করবেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাইকে ১ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন।

হায়দরাবাদের যে সকল জমিতে ধান উৎপন্ন হয় তার বেশীর ভাগ জমিতে সেচের অভাবে দ্বিতীয় কোন প্রকার ফসল হয় না। যদি এই সকল জমিতে কূপ খননের ব্যবস্থা করা যায় তবে সেগুলোতে দ্বিতীয় কোনপ্রকার ফসল উৎপন্ন হতে পারে। যদি জোয়ার ও অন্যান্য প্রকার শস্যের সেচের ব্যবস্থা করা যায় তবে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। সেজন্যে প্রতি বৎসর ১ হাজার করে নূতন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষকেরা—যাতে কূপ খনন করতে পারে সেজন্যে গবর্ণমেণ্ট তাদের ঋণ দানের সিদ্ধান্ত করেছেন। প্রতিটি কূপ খননের জন্যে অনূর্ধ্ব আড়াই হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে। ঋণ মঞ্জুরের সময় শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দেওয়া হবে। এই টাকায় যথাযথ কাজ সম্পন্ন হলে শতকরা ৫০ টাকা দেওয়া হবে। কূপ খনন শেষ হলে বাকী টাকা দেওয়া হবে। ঐ কূপ থেকে জল নিয়ে যে জমিতে সেচ দেওয়া হবে তাতে কূপ খননের পর ৫ বৎসরকাল কেবলমাত্র খাদ্যশস্য উৎপন্ন করা হবে বলে কৃষকদিগকে অঙ্গীকারপত্র লিখে দিতে হবে। যদি তারা অঙ্গীকার পালন না করে তবে শতকরা ৬½ টাকা সুদসহ সমস্ত ঋণের টাকা অবিলম্বেই আদায় করে নেওয়া হবে। উত্তর প্রদেশের ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান বৎসরে ৩৬ হাজার একর জমির জঙ্গল

কাটবার, ৬৭ হাজার একর চাষযোগ্য জমিতে আবাদ করবার এবং ২,৫৯,০০০ একর জমিতে লাঙ্গল দিবার পরিকল্পনা করেছেন।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, এই পরিষদে ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যে কৃষি ও পশুপালনের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চলে। খাদ্যশস্য ও অর্থকরী শস্যের পোকামাকড় এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও গবেষণা চলছে। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ও হাঁস-মুরগীর রোগনিবারণ পরিকল্পনাও কার্যকরী করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং এ-সম্পর্কেও কয়েকটি সুফল পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে যেসব সুফল পাওয়া গেছে, তা প্রয়োগের জন্যে একটি আদর্শ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা "দিল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা" নামে অভিহিত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে যে সুফল পাওয়া গিয়েছে, দিল্লীর দশটি গ্রামে তা পরীক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হবে।

বোম্বাই, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদে ডাল, চা'ল উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে সয়াবিনের ব্যবহার সম্পর্কে পাঞ্জাবে গবেষণা চলছে। অন্যান্য ফলমূল ও শাকসব্জী সম্পর্কেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। মানুষের ব্যবহারের উপযোগী তৈল, ডালদা ও গব্য ঘৃতের পুষ্টিকারিতা সম্পর্কেও পরীক্ষা চলছে।

ক্ষার মিশ্রিত চা'ল ও গমের খড় বাছুরকে খাওয়ালে তার পুষ্টি বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

উত্তর প্রদেশ ও কোচিনে গবাদি পশু উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করা হচ্ছে। দুগ্ধ সম্পর্কেও কয়েকটি পরিকল্পনার পরীক্ষা চলছে।

কলকাতায় দুগ্ধ সরবরাহে সরকারী প্রচেষ্টা

কলকাতা নগরীতে দুগ্ধাভাব মিটাবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরিকল্পনা স্থির করেছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী দক্ষিণ কলকাতায় সরকার পরিচালিত ৪০টি ডিপো থেকে আগামী জুন মাসের প্রারম্ভে এই সহরে ১০০ মণ দুগ্ধ ১২ আনা সের দরে সরবরাহ করা হবে। এই দুগ্ধ বিক্রয় কার্যে অল্প সময়ের কার্য হিসেবে ছাত্রীদের নিযুক্ত করা হবে। সরকার এই আশা করছেন যে, এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত সহরে দুগ্ধ সরবরাহের জন্যে উহার পরিমাণ ৫ হাজার মণ পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন। পুষ্টির মান অনুসারে কলকাতার জন্যে ২০ হাজার মণ দুগ্ধ প্রয়োজন।

এই পরিকল্পনার কথা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সাংবাদিকদের বলেন যে, অল্প সময়ে লোকজন যাতে দুগ্ধ পেতে পারে তজ্জন্য এই পরিকল্পনাটি করা হয়েছে। এরূপ দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা বোম্বাইতে কার্যকরী হয়েছে এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করেন, উক্ত পরিকল্পনা কলকাতায়ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। এই দুগ্ধ হরিণঘাটার কৃষি কেন্দ্র ও সরকারী ডেয়ারী থেকে আনা হবে। সরকার আশা করেন যে, এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলকাতা নগরীতেই এই পরিকল্পনানুযায়ী দুগ্ধ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

শ্রীযুক্ত সেন আরও জানান যে, দক্ষিণ কলকাতার একটি অংশকে কেন্দ্র করে এই পরিকল্পনাটি প্রথমে পরীক্ষা করা হবে। প্রত্যেক পরিবারকে নির্দিষ্ট 'কোটা' অনুযায়ী প্রত্যহ দুগ্ধ সরবরাহ করা হবে। এই হেতু প্রত্যেককে সরকার পরিচালিত ডিপোতে তাদের মাসিক আবশ্যকের পরিমাণ জানাতে হইবে। প্রতি ডিপো থেকে ২ মণ ২০ সের দুগ্ধ সরবরাহ করা হবে। ডিপো অ্যাসিষ্ট্যান্টকে মাসে ৪০ টাকা এবং সেলস্‌ম্যানকে ২০ টাকা দেওয়া হবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

তৃতীয় বর্ষ | জুন—১৯৫০ | ষষ্ঠ সংখ্যা

যক্ষ্মা নিবারণী টিকা বি, সি, জি

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

যক্ষ্মারোগ ভারতবর্ষের একটি গুরুতর সমস্যা। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এই সমস্যা আজ সর্বত্রই দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এই রোগে ৫ লক্ষ লোক মারা যায় এবং মৃত্যুর হার প্রতি মিনিটে একটি। বাংলা দেশে এক লক্ষ লোক প্রতিনিয়ত এই রোগে ভুগছে। ইংল্যাণ্ডের তুলনায় আমাদের দেশে এই রোগে মৃত্যুহার ৫ গুণ।

আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্যে যে ব্যবস্থা আছে—রোগীর সংখ্যার তুলনায় তা নিতান্ত সামান্য। এই ভীষণ ব্যাধির সংক্রমণ নিবারণের জন্যে নানারকম গবেষণা চলছে। অনেকগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করবার জন্যে আজকাল টিকার আবিষ্কার হয়েছে। বসন্তের টিকার সঙ্গে আপনারা সকলেই পরিচিত এবং এই টিকায় জীবন্ত বসন্ত-বীজাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। মৃত বীজাণুর টক্সিন বা বিষ প্রয়োগ করেও টিকা দেওয়া হয়—যেমন কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি রোগের টিকা। যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধ করবার জন্যে আজকাল একরকমের একটি টিকার আবিষ্কার হয়েছে এবং আবিষ্কারকদের নামানুসারেই তার নাম দেওয়া হয়েছে—"ব্যাসিলাস ক্যামেৎ গেরাঁ" বা সংক্ষেপে—বি, সি, জি। এই নামকরণও আবিষ্কর্তারাই করেছেন।

যক্ষ্মারোগের বীজাণু আবিষ্কার করেন ১৮৮২ সালে—জার্মেনীর রবার্ট কক্। কলেরা রোগের বীজাণু আবিষ্কারের সম্মানও এঁরই প্রাপ্য। কলেরা সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় ১৮৮৪ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে কিছুদিন ছিলেন। যক্ষ্মা বীজাণু আবিষ্কার করার পর তিনি মৃত বীজাণু থেকে যক্ষ্মার টিকা তৈরী করবার জন্যে চেষ্টা করেন—কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তারপরেই সুরু হলো বসন্ত রোগের টিকার মত জীবন্ত জীবাণু থেকে যক্ষ্মা রোগের টিকা প্রস্তুত করবার গবেষণা। বিখ্যাত লুই পাস্তুরের শিষ্য ফ্রান্সের ডাঃ অ্যালবার্ট ক্যামেৎ জীবন্ত বীজাণুকে শক্তিহীন করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই কাজে অক্লান্ত সাহায্য করেন পশুচিকিৎসক ডাঃ ক্যামিল গেরাঁ। ডাঃ ক্যামেৎ একটি বিশেষ মিডিয়াম বা মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগ বীজাণু বার বার কালচার করে দেখতে পান

পাতিয়ালা আর্য-কন্যা পাঠশালে শিশু ডাঃ যশোবন্ত সিং টিউবারকুলিন টেষ্ট করছেন

যে—বীজাণুগুলো তাদের ক্ষতিকর শক্তি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছে। তারা এভাবে আঠারো বছর জীবাণু কালচার করে তাদের রোগ-বিস্তারের শক্তি সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করতে সক্ষম হন। তারপর কুকুর, গরু, বানর ইত্যাদির দেহে প্রয়োগ করবার পর তা মানুষের দেহেও প্রয়োগ করা হলো। দেখা গেল—এই বীজাণু কারও দেহে যক্ষ্মা উৎপাদন করতে সক্ষম হলো না। শুধু তাই নয়, এই বীজাণু মানুষের দেহের মধ্যে একটি বিরুদ্ধ শক্তিরও জন্ম দিতে সক্ষম হলো, যাকে বলা হয়—অ্যান্টিবডি।

বি, সি, জি কাদের দেওয়া হয়ঃ

অন্যান্য সর্বজন পরিচিত টিকার মত বি, সি, জি টিকা সকলকেই দেওয়া যায় না। কারা এই টিকার যোগ্য তার জন্যে একটি পরীক্ষা করা হয়। এই যোগ্যতা পরীক্ষা না করে যদি সকলকেই এই টিকা দেওয়া হয় তাহলে যাদের শরীরে প্রতিরোধ-শক্তি আছে অথবা অজ্ঞাতসারে কোন না কোনও সময়ে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করেছে তাদের দেহে অনেক সময় এর বিক্রিয়া দেখা যায়। এই বিক্রিয়াকে বলা হয়—কক ফেনোমেনা বা কক্ উপসর্গ। এই যোগ্যতা অনুসন্ধানের জন্যে যে পরীক্ষা করা হয় তাকে বলা হয়—টিউবারকুলিন টেষ্ট।

টিউবারকুলিন কি?

১৮৮৯ সালে রবার্ট কক্-ই প্রথম টিউবারকুলিন আবিষ্কার করেন। এই টিউবারকুলিন তৈরী করবার জন্যে তিনি গ্লিসারিন ব্রথ্ বা গ্লিসারিন ক্কাথের মধ্যে যক্ষ্মা বীজাণুর কালচার করেন। তারপর ঐ বীজাণুগুলোকে উত্তাপের দ্বারা মেরে ফেলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নওয়া হয়। তারপর পরিস্রুত জলীয় অংশটুকু ইভাপোরেশন বা বাষ্পীভবনের দ্বারা আসলের দশভাগের এক ভাগে পরিণত করা হয়। এই জলীয় অংশকে বলা হয়—টিউবারকুলিন। টিউবারকুলিন প্রস্তুতের এই প্রণালী আজও ব্যবহৃত হয় এবং এভাবে প্রস্তুত টিউবারকুলিনকে বলা হয়—ওল্ড টিউবারকুলিন। এভাবে প্রস্তুত

টিউবারকুলিনে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ গ্লিসারিন থাকে।
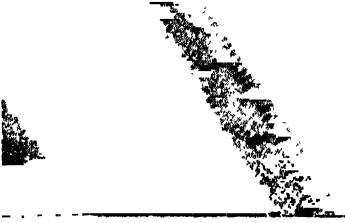
পজিটিভ অ্যাড্রিন্যালিন পিরকেট টেষ্ট। এতে বি, সি, জি টিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই

সম্প্রতি পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এই টিউবারকুলিন এক জাতীয় প্রোটিন ছাড়া আর কিছুই নয়। ফিলাডেলফিয়ার ডাঃ মিস্ ফ্লোরেন্স সিবার্ট সর্বপ্রথম টিউবারকুলিন থেকে প্রোটিন বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করতে সক্ষম হন। এই মহিলা বিজ্ঞানীই এর নামকরণ করেন—পিউরিফায়েড প্রোটিন ডেরিভেটিভ বা পি, পি, ডি।

এই পিউরিফায়েড প্রোটিন ডেরিভেটিভ বা সংক্ষেপে পি, পি, ডি, তৈরী করতে যক্ষ্মা বীজাণুকে কৃত্রিম মাধ্যমে কালচার করা হয়। এই মাধ্যমকে বলা হয় সাউটন মিডিয়াম। এই মিডিয়াম বা মাধ্যমে বীজাণুগুলোকে পাচ থেকে ছয় সপ্তাহ কালচার করবার পর মাধ্যমটি প্রোটিন তৈরীর যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমে বীজাণুগুলো মেরে ফেলে কাগজের ছাকনীতে ছেঁকে নিয়ে দেখা যায় যে, মাধ্যমটি প্রোটিনে পূর্ণ। অবশ্য বীজাণু কালচার করবার আগে মাধ্যমে কোনও প্রোটিন রাখা হয় না। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাধ্যমস্থিত এই প্রোটিন যক্ষ্মা-বীজাণুসঞ্জাত। তারপরে আবার শতকরা সাত ভাগ কলোডিয়ান মেমব্রেন দ্বারা পরিস্রুত করলে লবণ, গ্লিসারিন ইত্যাদি পৃথক হয়ে যায়। এই পরিস্রুতির পর যে জলীয় অংশ থাকে তা শুধু প্রোটিন মিশ্রিত জলীয় অংশ। এখন এই জলীয় অংশ থেকে ট্রাইক্লোরাসেটিক অ্যাসিডের দ্বারা প্রোটিনকে প্রেসিপিটেট্ বা অধঃক্ষেপণ করা হয়। এই প্রোটিন প্রায় বিশুদ্ধ টিউবারকুলিন।

এ থেকে আপনারা সহজেই ধারণা করতে পারেন যে, টিউবারকুলিনের মধ্যে জীবন্ত তো দূরের কথা, মৃত জীবাণুও থাকে না।

এভাবে একই উপায়ে টিউবারকুলিন প্রস্তুত করলেও টিউবারকুলিনের পোটেন্সি বা কর্মশক্তির
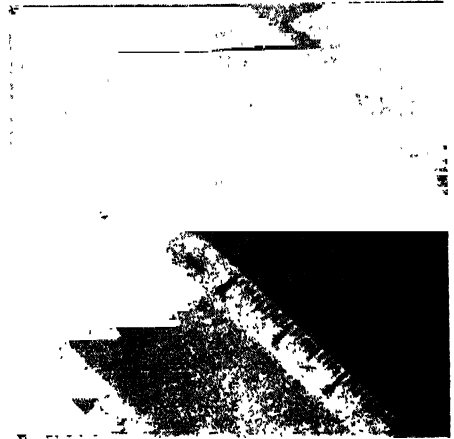
নেগেটিভ অ্যাড্রিন্যালিন পিরকেট টেষ্ট। প্রতিক্রিয়া নেগেটিভ হলে এই টেষ্ট পুনরায় করা দরকার, সম্ভব না হলে বি, সি, জি ভ্যাক্সিনেশন দেওয়া চলে

তারতম্য ঘটে। সেইজন্যে ব্যবহারের পূর্বে এই টিউবারকুলিনকে আন্তর্জাতিক টিউবারকুলিন মানের সঙ্গে সমানুপাতিক করে নেওয়া হয়। এভাবে নির্ধারিত মান বা প্রমাণ মাত্রার টিউবারকুলিন মাত্রাকে—টিউবারকুলিন একক বা টিউবারকুলিন ইউনিট বলা হয়। আজকাল ওয়ার্লড হেল্থ অর্গ্যানিজেসনের জৈব মাননির্ধারক উপসমিতি একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা ঠিক করেছেন।

১ টি, ইউ = ১/১০০ মিলিগ্র্যাম আন্তর্জাতিক মানের পুরাতন টিউবারকুলিন।

= ১/৫০০০০ আন্তর্জাতিক মানের পি, পি, ডি।

টিউবারকুলিন পরীক্ষা

এই পরীক্ষা নানাপ্রকারের আছে। যেমন—(১) ম্যানটিউ পরীক্ষা। (২) মোরো প্যাচ পরীক্ষা। (৩) অ্যাড্রিনালিন পিরকেট পরীক্ষা। (৪) ভল্মার্স প্যাচ পরীক্ষা। (৫) কক্ পরীক্ষা। (৬) ক্যামেৎ বা উল্ফ্ আইনার পরীক্ষা।

(১) ম্যানটিউ পরীক্ষা:—এই পরীক্ষায় এক ইউনিট টিউবারকুলিন বাঁ-হাতে (ঠিক ত্বকের নীচে) ইনজেক্শন দেওয়া হয়। এই টিউবারকুলিন একটি বাফার বা অবিমিশ্র দ্রাবকে ১/১০০০০ ভাগ কুইনোসল মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কুইনোসল এখানে অ্যান্টিসেপ্টিক বা বীজাণুনিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যানটিউ পরীক্ষায় সাধারণতঃ তিন প্রকার মাত্রা ব্যবহার করা হয়।

ম্যানটিউ—১ = ১ টি, ইউ বা ১/১০ সি, সি, টিউবারকুলিন ডাইলিউসন্।

ম্যানটিউ—২ = ১০ টি, ইউ; কিন্তু ডাইলিউসন একই থাকে।

ম্যানটিউ—৩ = ১০০ টি, ইউ।

দ্রাবকের পরিমাণ ঠিক রেখে, দ্রাবকে প্রথম মাত্রায় যে টিউবারকুলিন থাকে, দ্বিতীয় মাত্রায় তার ১০ গুণ এবং তৃতীয় মাত্রায় ১০০ গুণ করা হয়। সাধারণতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রাই ব্যবহৃত হয়। প্রথম মাত্রা ইন্জেকসন দেওয়ার পর যদি কোনও প্রতিক্রিয়া না ঘটে তবেই দ্বিতীয় মাত্রা ইন্জেকসন দেওয়া হয়।

প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

প্রথম ইনজেকসন (ম্যানটিউ-১) দেওয়ার পর ৭২ থেকে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়। যে স্থানে ইনজেকসন দেওয়া হয় সেইস্থানটি লাল হয়ে একটু ফুলে ওঠে। এই লাল হয়ে ফুলে ওঠা (Infiltration) গোলাকার স্থানটুকুর ব্যাস মিলিমিটারে পরিমাপ করা হয়। যদি এই ব্যাস ছয় মিলিমিটার বা তদূর্ধ্ব হয় তাহলে ব্যক্তিটির দেহ অস্তিবাচক বলে ধরা হয়। অর্থাৎ ঐ লোকটির দেহে যক্ষ্মা বীজাণুর প্রতিরোধ শক্তি বর্তমান। কোনও না কোনও সময়ে ঐ লোকটির দেহে যক্ষ্মা বীজাণু প্রবেশ করেছে এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মে দেহাভ্যন্তরে যক্ষ্মা প্রতিরোধশক্তি অর্জন করেছে। ব্যাস ছয় মিলিমিটারের কম হলে—নাস্তিবাচক বলে ধরে নিতে হবে। প্রথম মাত্রা ইনজেকসন দেওয়ার পর যদি লোকটি নাস্তিবাচক হয় তবে দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ ম্যানটিউ-২ ইনজেকসন দিয়ে আবার ৭২ থেকে ৯৬ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা করা হয়। দ্বিতীয় বারে নাস্তিবাচক হলে তবেই তাকে বি, সি, জি টিকা দেওয়া হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনজেকসনের পর যে কোনটিতে অস্তিবাচক প্রমাণিত হলে তাকে আর বি, সি, জি ইনজেকসন দেওয়া হয় না।

টিউবারকুলিন সাধারণতঃ ঠাণ্ডা জায়গায় বা শৈত্যাধারে রাখা হয়। তবে সামান্য উত্তাপে এর কোনও ক্ষতি হয় না। ইনজেকসনের জন্যে ২০ নং লোহার সূচ ব্যবহার করা হয়। ঠিক ইনজেকসন দেওয়ার পূর্বেই এই সূচটিকে একটু গরম করে সূচের মধ্যে একটু টিউবারকুলিন চালিয়ে আবার ঠাণ্ডা করে লওয়া হয়। টিউবারকুলিন প্রস্তুতের তারিখ থেকে মাত্র এক সপ্তাহ তা ব্যবহার যোগ্য থাকে।

মোরো প্যাচ টেষ্ট

এই পরীক্ষায় টিউবারকুলিন অয়েণ্টমেণ্ট বা মলম লাগানো হয়। এই মলম পুরাতন টিউবারকুলিনের চেয়ে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী। এর সক্রিয় অংশে পুরাতন টিউবারকুলিন এবং পি, পি, ডি, মিশ্রিত থাকে। যদি এই মলম ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা যায় তাহলে প্রায় একবছর কার্যক্ষম থাকে।

একটি দুইবর্গ-সেন্টিমিটার পরিমাণ আঠালো প্লাষ্টারের উপর, ঠিক মাঝখানে, একটি দেশলাই কাঠির মাথায় সাধারণতঃ যতটুকু বারুদ-মশলা থাকে ঠিক ততটুকু পরিমাণ টিউবারকুলিন মলম লওয়া হয়।

অ্যাড্রিন্যালিন-পিরকেট টেষ্ট—(প্রথম পর্যায়)
হোল্ডারে আটকানো গ্রামোফোনের পিনের সাহায্যে চামড়ার গায়ে আধ সেন্টিমিটার লম্বা গোটা দুই আঁচড় কাটা হয়। ব্যবহারের জন্যে প্রতি সি, সি, টিউবারকিউলিনে এক ফোঁটা ১% অ্যাড্রিন্যালিন মিশিয়ে দিতে হয়

মলমটি মাখিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় না। এমনি ফোঁটার মত এক জায়গায় রেখে পরীক্ষার্থী শিশুর বাঁ-দিকের স্তনের একটু উপরে এটিকে আটকে দেওয়া হয়। প্লাষ্টারটির চারপাশ ভালভাবে গায়ের চামড়ার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হয়, যেন কোথাও একটুকু ফাঁক না থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে এটি তুলে ফেলা হয় এবং তিন থেকে চার দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়। যদি মলম লাগানো স্থানটিতে তিন বা ততোধিক ফুসকুড়ি বা ব্রণ জন্মায় তবে পরীক্ষার্থী শিশুকে অস্তিবাচক বলে ধরা হয়। তিনের কম হলে—নাস্তিবাচক। এই পরীক্ষা সাধারণতঃ ১২ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের যোগ্য। এর চেয়ে বেশী বয়সের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পরীক্ষার উপর নির্ভর করা যায় না।

অ্যাড্রিনালিন পিরকেট টেষ্ট

এক সি, সি, টিউবারকুলিনে শতকরা একভাগ অ্যাড্রিনালিন মিশিয়ে টিউবারকুলিনকে আরও 'সেনসিটিভ্' বা সুবেদী করা হয়। এতে প্রতিক্রিয়া

অ্যাড্রিন্যালিন-পিরকেট টেষ্ট (২য় পর্যায়)
গ্লাস-রডের সাহায্যে অ্যাড্রিন্যালিন-টিউবারকুলিন আঁচড়কাটা জায়গায় ঘষে দিতে হয়

দেখতে বড় হয় এবং পরীক্ষারও সুবিধা হয়। অ্যাড্রিনালিন কিছুদিনের মধ্যেই তার শক্তি হারিয়ে ফেলে; কাজেই এই জাতীয় টিউবারকুলিন প্রস্তুত করার এক সপ্তাহের পর আর ব্যবহার করা হয় না। সাধারণ বসন্তের টিকার মত বাহুতে আঁচড় টেনে (১ বা ½ সেন্টিমিটার লম্বা) এক ফোঁটা টিউবারকুলিন দিয়ে একটি কাচের শলাকার দ্বারা ঘষে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয় শুকিয়ে যাবার জন্যে। এর প্রতিক্রিয়ার ব্যাস ৪ মিলিমিটার হলে পরীক্ষার্থী অস্তিবাচক; অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর বি, সি, জি টিকা লওয়ার প্রয়োজন নেই বলে ধরা হয়। দুই থেকে তিন মিলিমিটার ব্যাস হলে ফলাফল—সন্দেহজনক। অর্থাৎ পরীক্ষার্থী টিকার যোগ্য না অযোগ্য তা ঠিক করে বলা যায় না। ব্যাস দুই মিলিমিটারের কম হলে পরীক্ষার্থী নিঃসন্দেহে নাস্তিবাচক অর্থাৎ টিকার যোগ্য।

ভল্‌মার্স প্যাচ টেষ্ট

একটি আঠালো প্লাষ্টারের উপর পর পর তিনখণ্ড ফিল্টার পেপার রাখা হয়। মাঝেরটিকে বলা হয় 'কন্ট্রোল' এবং অন্য দুটি পেপারে ঘন বা আনডাইলিউটেড পুরাতন টিউবারকুলিন থাকে। এই প্যাচ সাধারণতঃ 'ষ্টারনাম' বা উরঃফলকের উপর লাগানো হয়।

কক্ টেষ্ট

জ্বর ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দেয় বলে এই পরীক্ষা আজকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রথমে ·০০০১ সি, সি, টিউবারকুলিন ত্বকের নীচে ইনজেকসন দেওয়া হয়। যদি কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়া যায় তবে প্রতি চতুর্থ দিনে এই মাত্রা অল্প অল্প বাড়িয়ে ·০১ সি, সি, পর্যন্ত করা হয়। এর

পজিটিভ মোরো প্যাচ টেষ্ট

প্রতিক্রিয়া হিসেবে জ্বরই প্রাথমিক লক্ষণ বলে ধরা হয়। এতে শিশুদের শরীরে সক্রিয় টিউবারকিউলোসিস্ দেখা দেয় এবং বয়স্কদের মধ্যে 'লেটেণ্ট' টি, বি বা প্রচ্ছন্ন যক্ষ্মা দেখা দেয়।

ক্যামেৎ বা উল্‌ফ্ আইনার টেষ্ট

নর্ম্যাল স্যালাইনে (দুই ড্রাম জল ও চার ড্রাম সাধারণ নুন) শতকরা ১০ ভাগ টিউবারকুলিন মিশিয়ে চোখের মধ্যের সাদা অংশে কয়েক ফোঁটা দেওয়া হয়। এতে চোখের সাদা অংশটি বারো ঘণ্টার মধ্যে যদি খুব লাল হয়ে ওঠে তবে পরীক্ষার্থীকে অস্তিবাচক বলে ধরা হয়। আজকাল এ পরীক্ষা আদৌ চলে না।

বর্তমানকালে একমাত্র ম্যানটিউ, মোরো প্যাচ এবং অ্যাড্রিনালিন পিরকেট পরীক্ষাই চলে। তার মধ্যে ম্যানটিউ পরীক্ষার চলন সবচেয়ে বেশী বলে মনে হয়।

বি, সি, জি, টিকা কি?

বি, সি, জি টিকা জীবন্ত গো-যক্ষ্মা বীজাণু থেকে তৈরী করা হয়। জীবন্ত গো-যক্ষ্মা বীজাণুকে বার বার কালচার করে বীজাণুগুলোকে শক্তিহীন

বি, সি, জি টিকা। প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সূচের সাহায্যে বাঁ-কাঁধের দিকে ১/১০ সি, সি,—বি, সি, জি ভ্যাক্‌সিন ব্যবহার করা হয়

করে ফেলা হয়। ইন্‌জেকসন দেওয়ার জন্যে এই শক্তিহীন জীবাণুকে একটি দ্রবণ বা সলিউশনে মিশিয়ে নেওয়া হয়। এই দ্রবণটিকে বলা হয় অবলম্বন বা সাস্‌পেনসন্। ১/১০ সি, সি—বি, সি. জি-তে প্রায় ১/২০ গ্রাম ওজনের বীজাণু বা সংখ্যায় ২০ লক্ষ বীজাণু থাকে। বি, সি, জি

টিকা তৈরী করার পর দু-সপ্তাহ তা ব্যবহারযোগ্য থাকে।

বি, সি, জি টিকা সাধারণতঃ কোনও শৈত্যাধারে রক্ষিত হয় এবং যাতে না জমে যায় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এছাড়া সূর্যের আলো থেকেও বাঁচিয়ে রাখতে হয়; কারণ বি, সি, জি-তে সরাসরি সূর্যকিরণ লাগলে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

যে দিন টিউবারকুলিন পরীক্ষা শেষ হয় সেই দিনই টিকা দেওয়া হয়। $\frac{1}{10}$ সি, সি, পরিমাণ বি, সি, জি বাঁ-দিকে ডেলটয়েড পেশী অঞ্চলে ঠিক ত্বকের নীচে ইনজেকসন দেওয়া হয়। ইনজেকসন দেওয়ার সময় স্থানটির অন্ততঃ আট মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত স্থান জুড়ে ফুলে ওঠা উচিত। সেজন্যে যাঁরা ইনজেকসন দেন তাঁরা বিশেষভাবে স্থানটি এবং ইনজেকসনের সিরিঞ্জটির উপর নজর রাখেন। পরীক্ষাকালে অথবা বি, সি, জি দেওয়ার সময় স্থানটিকে বীজাণুশূন্য বা ষ্টেরিলাইজ করার দরকার হয় না।

খুব ছোট ২০ নং সূচ ব্যবহার করা হয়। এই সূচগুলো প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর সংযোগে তৈরী করা হয়। ইনজেকসন দেওয়ার আগে সূচটিকে স্পিরিট ল্যাম্পের আঁচে পুড়িয়ে টক্‌টকে লাল করে লওয়া হয়। উত্তপ্ত করার পরক্ষণেই সূচটিকে ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে সিরিঞ্জের পিষ্টনটি সামান্য একটু ঠেলে অল্প বি, সি, জি বের করে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, টিউবারকুলিন পরীক্ষা করার সময়ও সূচটিকে উত্তপ্ত করা হয়; কিন্তু বি, সি, জি টিকার বেলায় যেরূপ উত্তপ্ত করা হয় সেইরূপ নয়। শিশুদের বেলায় তাদের চামড়া খুব পাতলা বলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ছয় মাসের কম বয়স্ক শিশুদের দু-দিকে একটি করিয়া দুটি ইনজেকসন দেওয়া হয় এবং দুটিই পূর্ণমাত্রিক।

সাধারণতঃ ইনজেকসন দেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুলা মিলিয়ে যায়। তিন চার সপ্তাহ পরে একটি ছোট ফুসকুড়ি বা ব্রণ দেখা দেয়। অবশ্য কখন কখনও সামান্য পুঁজও এই ব্রণে দেখা
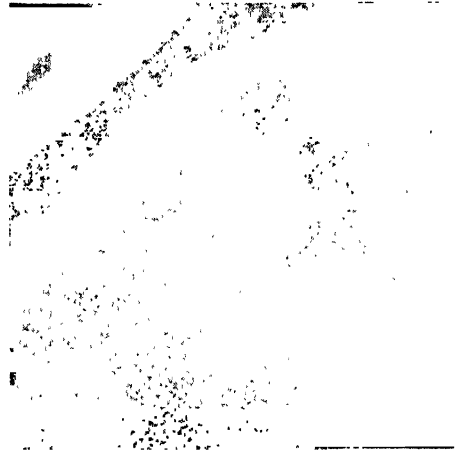
টিকা দেবার ৬ সপ্তাহ পরের অবস্থা

দেয়; কিন্তু এজন্যে কোনও ওষুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। আপনা থেকেই ঘা শুকিয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে ভাবে বি, সি, জি টিকা দেওয়া হয় তার বর্ণনা দিলাম। এই পদ্ধতি ছাড়া আরও দু একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি।

১। বোসেনথ্যাল্‌স্ মাল্টিপাঙচার মেথড।

২। ব্রেটির স্কারিফিকেসন মেথড।

বি, সি জি টিকা লওয়ার পর ছয় থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে টিকা দত্ত ব্যক্তি প্রতিরোধশক্তি অর্জন করে। প্রতিরোধশক্তি অর্জন করেছে কিনা, তা-ও পরে টিউবারকুলিন পরীক্ষার দ্বারা জেনে লওয়া হয়।

বি, সি, জি ইনজেকসন বা টিকার সাফল্য সম্বন্ধে আজও সকল চিকিৎসক একমত নন। কাচরাপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের অধ্যক্ষ যে অভিমত দিয়েছেন তা আশাকরি জনসাধারণের কাজে লাগবে। তিনি বলেছেন—গো-যক্ষ্মা বীজাণু এবং মানব-যক্ষ্মা বীজাণু প্রায় একরকম। সুতরাং বি, সি, জি ভ্যাক্‌সিন মানবদেহে প্রতিরোধশক্তি আনতে সক্ষম। অনেক ডাক্তার কিন্তু এর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন।

তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বি, সি, জি দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিসংখ্যানগুলো দেখলে বোঝা যায় যে, বি, সি, জি সত্যই উপকারী। তাছাড়া বি, সি, জি নিয়েছে, এমন একটি লোককেও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হতে দেখা যায়নি। অনেকেই বি, সি, জি-র অনুকূলেই মত প্রকাশ করেছেন। লেখকও বি, সি, জি নিয়েছেন এবং জামসেদপুরের সমস্ত স্কুলের ছেলে-মেয়ে এবং কারখানার শ্রমিকদের এই টিকা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে অল্পই আছেন যাঁরা টিকা নেননি। এই টিকা না লওয়ার কারণ অনিচ্ছা নয়—টিকা লওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার তাঁরা কোনও ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্যে করতে পারেননি।

বিশেষজ্ঞদের মতে—বি, সি, জি আদৌ ক্ষতিকর নয় এবং এই টিকা প্রত্যেকেরই লওয়া উচিত।

প্রবন্ধের ছবিগুলো আই, টি, সি র পাবলিক রিলেসন্স অফিসের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আলোক সম্বন্ধে দুই একটি কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আলোককে বিশ্বদূত বলা চলে। কারণ, ইহা দূতরূপে বাহিরের বহু তথ্য দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনের গোচরে আনিয়া দেয়। অবশ্য, সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারই এই প্রকার দূত সাহায্যে সাধিত হয়; তবে আলোক দূতের ন্যায় ব্যাপক কর্মক্ষেত্র আর কাহারও নহে। এই দূতের আনীত বার্তা সংক্ষেপে এই প্রকারঃ—আলোক বলে "আমি অমুক দিক হইতে আসিতেছি; কম্পন আমার স্বভাব, আমার তীক্ষ্ণতা এই প্রকার, এই প্রকার গতিবেগে আমি ধাবিত হই, জন্মের পর মুহূর্ত হইতেই আমি চলিতে আরম্ভ করি; চলার পথের কোন সংবাদ আমার মনে নাই; তোমার চক্ষের রেটিনাতে আমার পথের শেষ ও সেখানেই আমার মৃত্যু।" এই দূতের কার্যধারার এই পদ্ধতি। আমরা বস্তুর বর্ণ বা আকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাতে কিন্তু দূতের কোন হাত নাই।

সংবাদপত্রের নানা রিপোর্টার। তাহারা নানা দিক ঘুরিয়া সংবাদের কপি দেয় কাগজের পরিচালক সমিতির হাতে। এখানেই রিপোর্টারের কার্য শেষ। সমিতি এই সকল রিপোর্টের যথাযথ ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সহিত আলোক দূতের রিপোর্ট ও মস্তিষ্করূপী পরিচালক সমিতি গ্রহণ করেন ও মনকে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান প্রদান করেন। কাগজের পরিচালক সমিতি কিন্তু রিপোর্টারের কপির সত্যাসত্য সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচার করেন না, সংবাদগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ বিচার না করিয়া পর পর সাজাইয়া যান। কিন্তু জড়বিজ্ঞানী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রিপোর্ট তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন। এই জন্য অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন ও নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষণোপযোগী যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। ইহারই ফলে তিনি সংগ্রহ করেন এক সদা চঞ্চল পারমাণবিক বিশ্বের কাহিনী—যাহার নিয়ামক সকল বিধানই অত্যদ্ভুত।

আমাদের আলোক দূত ক্ষুদ্র পরমাণুময় জগতের চঞ্চলতারই একাংশ। শুধু পরমাণু জগৎই বা বলি কেন—ঊর্ধ্বে, মহাকাশে তারকারাজির অবকাশে বস্তুহীন শূন্য দেশের ভিতর দিয়াও তারকারই আলোকধারা দিকে দিকে প্রবাহিত হয়; আর আমাদের তেজোময় সূর্যেরই প্রতিরূপ তারকার সন্নিধানে উহারই পরমাণুর তাণ্ডব নৃত্য চলিয়া থাকে।

সাধারণতঃ আলোককে তরঙ্গগতিরূপেই ধরা

হয়। প্রতি বর্ণের আলোকধারার বৈশিষ্ট্য, তাহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। নিউটনের আমলে কিন্তু এই ধারণা সর্ববাদিসম্মত ছিল না। তিনি নিজে আলোক-ধারাকে কণা (কর্পাসল্) বৃষ্টিরূপে কল্পনা করিতেন। বস্তুর ছায়া দেখিলে আলোকের সরল পথে গতি নিঃসন্দেহে মানিতে হয় এবং নিউটন মনে করিতেন —আলোককে কর্পাসল্-স্রোত ধরিলেই তাহার এই সরলগতি সহজবোধ্য হয়। হাইগেন্স্ প্রবর্তিত তরঙ্গ-তত্ত্ব কি ভাবে আলোকের এই ধর্ম প্রতিপন্ন করে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; কারণ ইহা বুঝাইবার মত সমৃদ্ধি তরঙ্গ-তত্ত্ব তখনও আহরণ করিতে পারে নাই। আলোক বিজ্ঞানের অনেক তথ্য নিউটনের আবিষ্কৃত; তিনিই প্রথমে সাদা আলোকে রামধনুর সপ্তবর্ণের মিশ্রণ দেখান। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, বিজ্ঞানজগৎ আলোক—তরঙ্গ কি কণাস্রোত—এই প্রশ্নের সমাধানে হাইগেনসের পক্ষেই যোগদান করেন।

ইহার কারণ বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলা দরকার—সকল অবস্থায় আলোক সরলপথে গমন করে না। একটি অনচ্ছ পুরু কাগজ বা ধাতব পত্রে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া উহার পশ্চাতে কোন আলোকাধার স্থাপন করিলে দূর হইতে ছিদ্রটি এক জ্যোতিষ্মান বিন্দুরূপে প্রতীয়মান হইবে। এই তথ্যের মীমাংসা নিউটন-তত্ত্ব দিতে পারে না; কিন্তু হাইগেন্স্-তত্ত্ব পারে। এই তত্ত্ব অনুসারে উদ্ভাসিত ছিদ্রের প্রতি অংশ গৌণ আলোক-উৎসরূপে বর্তুলাকার আলোক-তরঙ্গ বিকিরণ করিতেছে। এই তরঙ্গ জল-তরঙ্গের ন্যায়—যদিও আলোক-তরঙ্গ ত্রিমাত্রিক দেশে গোলকাকারে প্রসারিত হয়, আর জলের তরঙ্গ ব্যাপ্ত থাকে তাহার পৃষ্ঠতলে। জলের স্থির পৃষ্ঠে ঢিল ছুড়িলেই চক্রাকার তরঙ্গ চারিদিকে প্রসারিত হইতে দেখা যায়। আলোক-তরঙ্গের জন্ম হয়—জ্যোতিষ্মান বস্তুর চতুষ্পার্শ্বে, কম্পনরত কণা হইতে। বহু দূর গমন করার পর এই সকল আলোক-তরঙ্গের সম্মুখ পৃষ্ঠ বক্রাকার ত্যাগ করিয়া সমতলে পরিণত হয়।

পুকুরের জলে দেখা যায়—দুই দিক হইতে ধাবিত দুই তরঙ্গধারা পরস্পর ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এই সাময়িক গলাগলির (Superposition) পরও তাহারা পূর্বের ন্যায় চলিতে থাকে। এই রীতি আলোক-তরঙ্গেও দেখা যায়; আর ইহা প্রচলিত না থাকিলে কোন বস্তুই দৃষ্ট হইত না। যখনই কোন দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন যে সকল আলোক-তরঙ্গ আমাদের চক্ষে প্রবেশ করে তাহাদের চলার পথে বহু দিগ্‌বর্তী অনেক তরঙ্গ তাহাদিগকে ভেদ করে। কিন্তু সেইজন্য উহা কোনরূপেই ব্যাহত হয় না। তাহা হইলে দুই তরঙ্গের গলাগলির কি ফল ঘটে?

এখানে একটি পরীক্ষা ও তাহার ফলের কথা বলিতেছি। স্থির জলের উপর দুইটি কাঠের বল ভাসিতেছে। উহাদের গায়ে সূতা লাগান আছে। তাহা ধরিয়া দুইটি বলই কিছুক্ষণ উঠানামা করাইলে সেই পর্যায় গতিতে জলপৃষ্ঠে তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বল চক্রাকৃতি তরঙ্গধারা প্রেরণ করে। কিন্তু ইহাদের গলাগলিতে এক আশ্চর্য নমুনার তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়। কোনও স্থলে চক্রাকার জল-তরঙ্গের ব্যতিচার ও কোন স্থলে উহারা বর্ধিতায়ন হইয়াছে, আবার কোথাও গলাগলি হইয়াছে লুপ্তির কারণ; যেখানে তরঙ্গের কোন নমুনাই নাই, জল সম্পূর্ণ শান্তাবস্থ।

তরঙ্গ-গতির ইহা এক প্রাথমিক প্রধান রীতি। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ব্যতিচার (Interference)। যে স্থলে দুই তরঙ্গের সুউচ্চ অংশের গলাগলি সেখানে ঘটিয়া থাকে আয়তনের বিবৃদ্ধি, আর এক তরঙ্গের সুউচ্চ স্থান অপরের সর্বনিম্ন স্থান বা তাহার পাশে পড়িলেই তরঙ্গের লোপ বা উচ্চতার সবিশেষ অবনতি ঘটে।

একই রীতি আলোক-তরঙ্গের বেলায়ও চলে। আলোক+আলোক সব সময় অধিক আলোক

নহে, বরং অবস্থাবিশেষে অন্ধকারও হইতে পারে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগের ন্যায় বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগও নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সমৃদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যে ইয়ং কর্তৃক আলোকের ব্যতিচার প্রতিপাদন ও ফ্রেনে কর্তৃক তরঙ্গ-তত্ত্বের বিকাশসাধন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। এই ব্যতিচার তথ্যই তরঙ্গ-তত্ত্বানুযায়ী আলোকের সরল পথে চলার কারণ ব্যক্ত করে। যদি একই বর্ণের আলোকধারা কোন সূক্ষ্ম খাড়া চিরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সম্মুখে স্থাপিত পর্দায় চিরের ছায়া পড়ে তাহা হইলে উহার ধারগুলি তখনই তীক্ষ্ণ দেখায় যখন চিরের বিস্তার আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বৃহত্তর। এই অবস্থায় চিরের বিস্তার কমাইতে থাকিলে তরঙ্গ-গতি ছায়ার সীমার বাহিরে চলিয়া যায়। তখন একমাত্র চিরের সাহায্যেও এক প্রকার ব্যতিচার দেখা যায়, যাহাকে বলা যায় গৌণ ব্যতিচার বা diffraction। এরূপ ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত চিরের প্রতি অংশ দ্বিতীয় আলোক-উৎসরূপে ক্রিয়া করে। চিরের প্রতি বিন্দুদেশ গোলকাকার তরঙ্গধারা বিকিরণ করে। ইহাদের মধ্যে ব্যতিচার ঘটিয়া পর্দার উপর চিরের ছায়ার বাহিরে উহারই সমান্তরাল আলোক ও অন্ধকারময় রেখাসকল দৃষ্ট হয়। আলোকের মুখ্য এবং গৌণ, দুই প্রকার ব্যতিচারই উহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণের প্রণালী স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই দুই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণের জন্য বহুপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে।

সর্বপ্রকার আলো ও জ্যোতি-বিকিরণশীল সর্বপ্রকার সত্তা এই সমস্ত যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহাতেই পাওয়া গিয়াছে, আলোকের বর্ণালী। দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোর বর্ণালী, পূর্ণ বর্ণালীর সামান্য অংশই অধিকার করে। দৃশ্য আলোর ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উহারই বৃহত্তম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক; অর্থাৎ লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেগুনির প্রায় দ্বিগুণ। অথবা শব্দ-বিজ্ঞানের ভাষায় দৃশ্য আলোতে বর্ণালীর এক অষ্টক মাত্র বিদ্যমান। ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৩.৬×১৮^{-৫} সেঃ মিঃ হইতে ৭.৮×১০^{-৫} সেঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। সমস্ত তরঙ্গের একই গতিবেগ ($= ৩ \times ১০^{১০}$ সেঃ মিঃ)। সুতরাং গড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৫×১০^{-৫} সেঃ মিঃ ধরিলে এইরূপ তরঙ্গের $\frac{৩ \times ১০^{১০}}{৫ \times ১০^{-৫}}$ বা ৬×১০^{১৪} সংখ্যা দেশস্থিত কোন স্থির বিন্দু প্রতি সেকেণ্ডে অতিক্রম করে। এই সকল তরঙ্গ কম্পনসঞ্জাত; সুতরাং কম্পন কত দ্রুত হইলে ইহাদের উদ্ভব সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। দৃশ্য আলোকের গড় কম্পন সংখ্যা ৬×১০^{১৪}।

সূর্য কিংবা সাদা আলোক বিকিরণশীল পদার্থের পূর্ণ বর্ণালীতে দৃশ্য আলোক অপেক্ষা বহু অংশে লঘুতর ও বহুগুণে গুরুতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিদ্যমান। ইহার এক প্রান্তে লোহিতের পর দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির দিকে লোহিতাতীত (Infra-red) আলো। তাহার প্রধান গুণ, দৃশ্য আলোক অপেক্ষা অধিকতর তাপ বিকিরণক্ষম। বর্ণালীর এইদিকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি বাড়িতে থাকে। অন্যান্য গুণে লোহিতাতীত ও দৃশ্য আলোতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। অপর দিকে, বেগনি আলোর পরে দৈর্ঘ্য-হ্রাসের দিকে আরও সূক্ষ্মতর তরঙ্গ বিদ্যমান। আল্ট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগনি উহার নাম। ফটোগ্রাফিতে এই আলোর ক্রিয়াতেই ছবি উঠে এবং এই বিশিষ্ট গুণই ইহার পরিচায়ক। সুতরাং বর্ণালীর দৃশ্য আলোক অপেক্ষা অদৃশ্য আলোকই অধিক। অতিবেগনি ধরিয়া অগ্রসর হইলে ক্রমে এক্স্-রে'র রাজ্য পাওয়া যায়। ইহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এত ক্ষুদ্র যে, আবিষ্কারের পর বহুকাল ইহার পরিমাপোপযোগী কোন যন্ত্র কল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্য ইহারাও যে আলোক-তরঙ্গ তাহা প্রমাণ করিতে বহুদিন অতিক্রান্ত হয়। যন্ত্র সম্বন্ধে এই অভাব দূর করেন স্বয়ং প্রকৃতিদেবী।

স্ফটিক ও সেই জাতীয় বস্তুর অভ্যন্তরের অণু পরমাণু-গুলি বিশিষ্ট শৃঙ্খলায় সজ্জিত থাকে। তাহার মধ্যে অবকাশ খুব কম; সেইজন্য একখণ্ড স্ফটিককে এক্স্-রে'র তুলনায় এক ত্রিমাত্রিক চিররাশির সমষ্টি বলা যায়। এই ভাবে স্ফটিক সাহায্যে এক্স্-রে'র গৌণ ব্যতিচার প্রতিপন্ন হওয়ার ফলে উহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণের পথ পাওয়া যায়। পরে আবার এই আবিষ্কারই বহু স্ফটিকের গঠনবিন্যাস বিজ্ঞানীর জ্ঞানগোচর করিয়াছে।

তেজস্ক্রিয় মৌল হইতে গামা-রশ্মি নামে এক প্রকার তরঙ্গধারা নির্গত হয়। ইহারা সর্বাংশে এক্স্-রে'র তুল্য; তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লঘুতর। আবার মহাজাগতিক রশ্মি হইতে গামা-রশ্মি অপেক্ষাও লঘুতর তরঙ্গ পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠে, কাহার কম্পনে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় ও কি ভাবে উহা প্রসারিত হয়? ইহার সদুত্তর খুঁজিতে গিয়াই বিজ্ঞানী ইথার কল্পনা করেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে ইথারকে স্থিতিস্থাপক বলা হইত। উহা ছিল জেলির ন্যায় এক বস্তু, তবে আরও হালকা ও কঠিনতর। সুতরাং ইহা অতি দ্রুত কম্পনক্ষম ছিল। কিন্তু পরে বিখ্যাত মাইকেলসন-মলির পরীক্ষার ফলে ও রিলেটিভিটি তত্ত্ব আবিষ্ক্রিয়ার ফলে এই ইথার পরিত্যক্ত হয়। দেখা যায় যে, ইথারের তুল্য যথার্থ কোন বস্তু এই জগতে নাই।

আবার তড়িৎ ও চৌম্বক বিজ্ঞানেও ইথারের প্রয়োজন দেখা যায়। কারণ জড়বিজ্ঞানের এই দুই শাখায় এমন সব তথ্য মিলে—শূন্য দেশেই যাহাদের প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য বহুপ্রকার ইথার বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ব-জগতের সর্বপ্রকার ধারণার ঐক্য নির্ধারণই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া বিজ্ঞানী এক ইথারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। মাইকেল ফ্যারাডের পরীক্ষার ফলে ম্যাক্সওয়েল প্রচার করিলেন যে, তড়িৎ-চৌম্বক বলের কম্পনে আলোক উৎপন্ন হয়। তাঁহার মতে কোন তড়িৎ-বর্তনীতে (Elictric circuit) পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ অতি দ্রুত বেগে পরিবর্তিত হইলে সেখান হইতে তড়িৎ-চৌম্বক বলের তরঙ্গ উদ্ভূত হইবে। এইরূপে উদ্ভূত তরঙ্গের অস্তিত্ব হার্ৎজ পরীক্ষায় প্রমাণ করেন। এই তরঙ্গই বেতারে সংবাদ বহন করে এবং রেডিওতে জনগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে।

বেতার ষ্টেশনের অ্যান্টেনাকে আলোক-তরঙ্গ উৎপাদনকারী পরমাণুর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই অ্যান্টেনায় পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইলে তাহার দুই প্রান্ত পর্যায়ক্রমে + ও - হয়। তাহাতেই উৎপাদিত হয়, উহার চারিদিকে এক তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র, যাহাতে চলে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালা। এই সকল তরঙ্গ সর্বথা আলোক-তরঙ্গের সমধর্মী। নানাপ্রকার পরীক্ষায় এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং পরমাণু ও অ্যান্টেনার ন্যায় দুই দিকে পর্যায়-ক্রমে + ও – হইয়া পরিবর্তী দ্বি-মেরুকে (dipole) পরিণত হয়। ইহা অসম্ভব নহে; কারণ পরমাণুর অভ্যন্তরে সমপরিমিত + ও – তড়িৎ বিদ্যমান। কারণবশে দুই প্রকার তড়িতাধান পৃথক হইয়া পড়িলেই দ্বি-মেরুকের উদ্ভব হইবে। বর্তমান শতকের আরম্ভ পর্যন্ত আলোক সম্বন্ধে তড়িৎ-চৌম্বক-তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঠিক এই সময়েই এরূপ ঘটনা ঘটিল যাহাতে তত্ত্বের মূলে কম্পন দেখা দিল। ঘটনাটিকে ঠিক আকস্মিক বলা চলে না। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ন্যায় ধীরে ধীরে বহুদিনের ক্রিয়ায় ক্রমে এই ঘটনা উপস্থিত হয়। এই ঘটনার জন্য দায়ী বিজ্ঞানী প্ল্যাংক্। উষ্ণ বস্তুর তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষার ফলে ইনি পরীক্ষালব্ধ ফল ও তৎকালে প্রচলিত যন্ত্র ও আলোক-বিজ্ঞানে গ্রাহ্য বিধানে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে সবিশেষ অনৈক্য দেখিতে পান। ঐ সকল বিধানের ছোটখাট পরিবর্তনের পর

তিনি তথ্যে ও তত্ত্বে মিল আনিতে পারেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রচার করেন যে, তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলানুযায়ী আলোকের নিঃসরণ বা শোষণকার্য নিবিশেষ ধারায় হয় না। শক্তির এক সবিশেষ ধারায় খণ্ডে খণ্ডে আলোক গৃহীত ও নিঃসৃত হয়। এই খণ্ডগুলিই প্ল্যাংকের কোয়াণ্টাম। ইহাদিগকে শক্তির পরমাণু বলা যায়। কোন বিশিষ্ট বর্ণের আলোকের (কম্পন-সংখ্যা r) কোয়াণ্টামে শক্তি পরিমাণ ($h \times r$.)

বর্তমান বিজ্ঞানে "h" প্ল্যাংক-ধ্রুবরূপে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার পরিমাণ অতি নগণ্য। যদি শক্তি "আর্গ"-এককে ব্যক্ত হয় ও কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডের হারে লওয়া যায়, তবে $h = ৬\text{'}৫ \times ১০^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড। দৃশ্য আলোতে গড় কম্পন-সংখ্যা ৬×১০^{১৪} একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আলোর কোয়াণ্টামের শক্তি $৬ \times ১০^{১৪} \times ৬\text{'}৫ \times ১০^{-২৭} = ৪ \times ১০^{-১২}$ আর্গ পরিমাণে এই শক্তি অতি সামান্য। অথচ নিবিশেষত্বের এই সামান্য ব্যতিক্রমই বিজ্ঞানে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ আনয়ন করিয়াছে। ৫ বৎসর পরে আইনষ্টাইন বলিলেন যে, প্ল্যাংক সব ব্যাপার ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। শক্তির সবিশেষত্ব কেবল আলোক গ্রহণ বা নিঃসরণে নয়, আলোক নিজেই নিবিশেষ-গঠন তরঙ্গধারা নয়। পক্ষান্তরে উহাও এক প্রকার আলোক-কণার স্রোত। এই কণার নাম ফটোন বা আলোক-রেণু বা আলোক-কোয়াণ্টা।

ইহাই প্রাচীন নিউটন-তত্ত্ব—নূতন প্রণালীতে পরীক্ষালব্ধ ফলে নব সাজে সজ্জিত। এই সম্বন্ধে একটি পরীক্ষা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—আলোক-তড়িৎ প্রতিক্রিয়া।

ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের ভায়োলেট আলো কোন বস্তুর উপর পড়িলে তাহা হইতে ইলেকট্রন বিতাড়ণ করে। Photo-electric-cell নামক যন্ত্র সহায়ে এই প্রতিক্রিয়ার পরীক্ষা চলে। এই যন্ত্র বর্তমানে সবাক-চিত্রে ও দূরদর্শন বা টেলিভিসনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে নিঃসৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা, গতিবেগ ও আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পন-সংখ্যার মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা যায়, প্ল্যাংকের বিধানানুযায়ী ইলেকট্রনের গতিবেগ পরিবর্তিত হয় আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনে। নতুবা, শুধু আলোকের তীক্ষ্ণতা বাড়াইলে ইলেকট্রন সংখ্যায় বাড়ে মাত্র।

উক্ত পরীক্ষায় ভাবিবার এক কথা এই যে, কোন পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থান কালে ইলেকট্রনে নিহিত শক্তি উহার নির্গমণ কালের গতীয় শক্তি-রূপে আশা করা যায় না। কারণ, অভ্যন্তরে উহার অবাধ স্বাধীনতা নাই; আশেপাশের পদার্থাংশের সহিত ইলেকট্রনের একটা বন্ধন আছে। সে বন্ধন ছিন্ন না হইলে উহা বাহিরেই আসিতে পারে না। সেজন্য উহাকে শক্তি দেওয়া প্রয়োজন। অভ্যন্তরের ইলেকট্রনগুলি যেন লিফ্‌টের আরোহীদের মত। লিফ্‌টের অভ্যন্তরে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারে বটে, কিন্তু উপর তলায় যাইতে হইলে লিফ্‌টে থাকিয়াই যাইতে হইবে। সেইজন্য লিফ্‌ট যে কায করিল, তাহা নির্ভর করে দুই তলার উচ্চতার ব্যবধানের উপর। একই প্রকারে ইলেকট্রনকে অভ্যন্তর হইতে পদার্থ-পৃষ্ঠে আনিতে হইলে উহাকে শক্তি দেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বাহিরের গতীয় শক্তি যদি E হয় এবং উত্তোলনে ব্যয়িত শক্তি A হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে—

$$h = \frac{E+A}{r}$$

শক্তি ও কম্পন সংখ্যার মধ্যে এই সম্পর্ক আলোকের তরঙ্গ তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায় না। সেই তত্ত্বানুযায়ী বিশিষ্ট গতিবেগের ইলেকট্রন কখনই নিঃসৃত হইতে পারে না, যতক্ষণ না ইলেকট্রন (E+A) শক্তি পায়। কিন্তু এইজন্য যে সময় অতিক্রান্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হয় না; আলোকপাত হওয়া

মাত্রই নিঃসরণক্রিয়া প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়।

আইনষ্টাইনের মতে এই সমস্যার অতি সহজ সমাধান পাওয়া যায়, যদি ফটোন বা আলোক-রেণুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। প্রতিটি কণায় নিহিত শক্তি (*hr*)। এই কণা কোন ইলেকট্রনের উপর পড়িয়া তৎক্ষণাৎ তাহার শক্তি দান করিতে পারে ও তাহাতেই ইলেকট্রন নিঃসৃত হইতে পারে। তাহা হইলে নিঃসৃত ইলেকট্রনের সংখ্যা একই সময়ে আপতিত ফটোন সংখ্যার সমানুপাতিক হইবে। সুতরাং উহার শক্তি আলোকের কম্পন-সংখ্যার সমানুপাতিক হইবে।

এই মতবাদ সহজে পাত্তা পায় নাই। কারণ তরঙ্গতত্ত্ব তখন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্রমে এমন সব পরীক্ষার ফল জমিতে লাগিল, যাহা তরঙ্গতত্ত্ব অপেক্ষা আইনষ্টাইন তত্ত্বেই সহজবোধ্য হইল।

তাহারই এক পরীক্ষার কথা বলিয়া জ্যোতি-প্রবাহ যে সবিশেষ কোয়ান্টা ধারায় ব্যক্ত হইতে পারে তাহার প্রমাণ দিতেছি।

এই কথা বহুকাল হইতে জানা আছে যে, আকাশের নীল রং ও সূর্যাস্তের লাল রং আলোকের বিচ্ছুরণ হইতে উৎপন্ন। আকাশে ভাসমান ধূলিকণা বা ধূম্রকণার জন্য বৎসরের সকল সময় উহার যথার্থ রং ধরা যায় না। বৃষ্টির পর বায়ুতে ভাসমান পদার্থ-সমূহ ভূতলে পড়িলেই আকাশের প্রকৃত রং দেখা দেয়। ইহা উজ্জ্বল গাঢ় নীল। উচ্চ পর্বতে আরোহণ করিলেও এই রং প্রতিভাত হয়। কারণ, তখন ভাসমান ধূলিকণা ইত্যাদি দর্শকের নীচের স্তরে থাকে। যতই উপরে যাওয়া যায়, মাথার উপরের বায়ুর অণু সংখ্যা কমিতে থাকে বটে, কিন্তু আকাশের নীল রং গাঢ়তর হয়। যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যাওয়া যাইত তাহা হইলে দিবাভাগের সূর্যালোকের মধ্যেও আকাশের রং হইত রাত্রির আকাশের ন্যায় কালো। আমাদের উর্ধ্বে আকাশ বায়ুময় স্বচ্ছ পদার্থ। সুতরাং ইহাই মনে হয় যে, বায়ুর অণুগুলিও নীল বর্ণের। স্বচ্ছ পদার্থের অণু এত রঙ্গীন হয় কি কারণে, তাহা বস্তুতই আলোচনার বিষয়।

যে বস্তুর নিজস্ব আলোক নাই তাহা প্রতিফলিত আলোকে দৃষ্টিগোচর হয়। বায়ু সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সূর্য হইতে আলোক পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করিলে, উহার এক অংশ বায়ুর অণুতে প্রতি-ফলিত হইয়া আমাদের চক্ষে আসে। এইখানেই প্রশ্ন উঠে যে, এই প্রতিফলিত আলোক এই প্রকার উজ্জ্বল বর্ণের হয় কেন? আর উহা সূর্যালোকের নীল রং-ই বা গ্রহণ করে কেন?

তরঙ্গ-তত্ত্ব মতে সকল বস্তুই তাহাতে আপতিত আলোকের কোন কোন রং শোষণ করে; তথাপি অবশিষ্ট প্রতিফলিত আলোকেই আমরা উহাকে দেখি। যে বস্তু সাদা সূর্যালোক হইতে নীল ও সবুজ শোষণ করিয়া রাখে, তাহা দেখায় জরদ। এই ভাবে রঙ্গীন বস্তুমাত্রেই সূর্যালোকের কোন না কোন রং শোষণ করে।

শোষিত ও প্রতিফলিত আলোকের বিভাগ হয় সাধারণতঃ বস্তুর বহিঃপৃষ্ঠে। সেই জন্য অতি ক্ষীণ প্রলেপ দ্বারা বস্তুর গায়ে কৃত্রিম রং করা যায়। আবার গলিত কাচের সঙ্গে ধাতুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে বিশিষ্ট ধর্মের কাচ (strained glass) পাওয়া যায় সেখানে আলোর বিভাগ হয় কাচের অভ্যন্তরে। স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ধাতুচূর্ণে শোষিত ও প্রতিফলিত হইয়া আলোক নানা রঙের দেখায়।

এমন অনেক বস্তুকণা আছে যাহার আয়তন (ব্যাস) দৃশ্য আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান। এরূপ স্থলে আলোকসম্পাতে যে ক্রিয়া হয় তাহা প্রতিফলন নহে। ইহার নাম বিচ্ছুরণ। এস্থলে প্রতিফলন হয় সকল দিকে। এই প্রকার বিচ্ছুরণ জল, শব্দ বা আলোক ইত্যাদি সকলপ্রকার তরঙ্গেই দেখা যায়। প্রতিফলক

কণার আকার অনুযায়ী বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোই অধিক বিচ্ছুরিত হয়। অতি ক্ষুদ্র কণা লাল অপেক্ষা নীল আলোই অধিক পরিমাণে বিচ্ছুরিত করে ও নীল দেখায়।

গতীয় তত্ত্ব মতে গ্যাসের অণু সর্বদা অস্থির। অতএব সর্বত্র অণুর ঘনত্ব সমান নহে। গ্যাসের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অণুগুচ্ছ গঠিত হইয়া উহাকে এক বিশিষ্ট গঠনের বস্তুতে পরিণত করে। কাচের অভ্যন্তরে ধাতুচুর্ণের যে ব্যবস্থা, এই ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সুতরাং যেস্থলেই অণুর ঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটিবে, সেখানেই প্রাথমিক তরঙ্গ হইতে দ্বিতীয় প্রকার গোলকাকার তরঙ্গধারা উৎপন্ন হইবে। যে ঘনীভূত অণুগুচ্ছ আয়তনে কোন বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান বা তুল্য তাহা হইতে সেই আলোক বিচ্ছুরিত হইবে অধিকতর মাত্রায়। ঘনত্বের আধিক্য আশা করা যায় অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে। সুতরাং ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নীল আলোকই বিচ্ছুরিত হয় অত্যধিক। আকাশের নীল রঙের ইহাই কারণ।

সান্ধ্য-গগনের রক্তিমচ্ছটার একই কারণ। সূর্য যখন ডুবুডুবু তখন আমরা অক্লেশে উহার দিকে তাকাইতে পারি। কারণ আলোক-রশ্মি আসে বহুদূর বিস্তৃত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া। পথে ক্ষুদ্র তরঙ্গসকল বিচ্ছুরণে সরিয়া পড়ে ও দীর্ঘ-তরঙ্গ-বিশিষ্ট লোহিত আলোক অবশিষ্ট থাকে ও আমাদের চোখে আসে। সুতরাং আকাশের নীল রং ও অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা একই নৈসর্গিক ক্রিয়ার দুই দিক মাত্র।

আলোকের এই বিচ্ছুরণ তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্বানুসারে বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তড়িৎ-ক্ষেত্রে পরমাণু দ্বি-মেরুকে পরিণত হইতে পারে। আলোক-তরঙ্গ অগ্র-গমনশীল তড়িৎ-চৌম্বকক্ষেত্র মাত্র। এই ক্ষেত্রে পরমাণু দ্বি-মেরুকে পরিণত হইয়া আলোক-তরঙ্গের সমান তালে কম্পমান হইবে ও নিজে গোলকাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর তরঙ্গ নিঃসরণ করিবে। সুতরাং আলোক-ক্ষেত্রের প্রতি বস্তু হইতেই আলোক বিচ্ছুরিত হইবে। তবে সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত প্রতি পরমাণুর বিচ্ছুরিত আলো ব্যতিচার ধর্মে পরস্পরের নাশের কারণ হইবে। কিন্তু পরমাণু সজ্জায় বিশৃঙ্খলা আসিলে সম্মুখগামী বিচ্ছুরিত আলো ব্যতিচারে লোপ পাইলেও দক্ষিণে, বামে বা ঊর্ধ্বে অধঃ যে আলোক যাইবে তাহা একেবারে লোপ পাইবে না। তাহাতেই পাওয়া যায় আকাশের নীল রং।

সাধারণ তরঙ্গ-তত্ত্বের প্রয়োগে দেখা গিয়াছে যে, বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত আলোকের সমান। বিচ্ছুরণে আলোকের কম্পন-সংখ্যা কিংবা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কিন্তু একস্-রে'র ন্যায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। একস্-রে'র বিচ্ছুরণ পরীক্ষা করিতে করিতে কম্পটন দেখিতে পান যে—ডাইনে, বামে কিংবা পশ্চাদ্দিকে বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আপতিত আলোর সমান নহে; অল্প অধিক। তরঙ্গ-তত্ত্বে এই রহস্য অবোধ্য; কিন্তু আলোক-রেণু বা ফটোন-তত্ত্বে ইহা সহজেই বোধগম্য হয়।

আলোকচিত্রে প্লেট ও ফিল্মের শক্তি

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত

আলোকচিত্রের প্রথম আবিষ্কারের দিনে কোন কিছুর ছবি তুলিতে হইলে আধ ঘণ্টারও উপর এক্সপোজার লইতে হইত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও ৫০০ H & D শক্তির অবদ্রব বা ইমালসনকেই চকিত-চিত্র তুলিবার সর্বোচ্চ শক্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোক চিত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ আজকাল এরূপ এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে যে, ক্ষীণ আলোকে গতিশীল বিষয়বস্তুরও ছবি তুলিবার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আজ উহার শক্তি ৮০০০ H & D-তে উন্নীত হইয়াছে; তবুও কিন্তু এই শক্তির পূর্ণসীমা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে বলা হয়।

সর্বপ্রথম ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডক্টর ফার্ডিনাণ্ড হার্টার ও ইঞ্জিনিয়ার সি, ড্রিফিল্ড ড্রাই-প্লেটের তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া বিশ্লেষণ করেন যে, পৃথক পৃথক সিলভার হ্যালাইডস্-এর উপর আলোকের ক্রিয়ার তারতম্য হয় এবং অবদ্রব প্রস্তুতকালীন তাপমাত্রার উপরও উহার শক্তির বিভিন্নক্রমের আলোক-অনুভূতিশীলতা নির্ভর করে।

জার্মান জ্যোতির্বেত্তা Scheiner জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ের জন্য Scheiner-ধারার প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ইহাকেও আলোকচিত্র-অবদ্রবের শক্তির মান নিধারণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অবদ্রবের বর্ণানুভূতি ও আলোকগ্রহণ শক্তির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাত্রা নির্ধারণের Scheiner-পদ্ধতি আলোকচিত্রে অকেজো হইয়া পড়ে। এইজন্য বাধ্য হইয়া উহা পরিত্যাগ করা হয়। ইহার পরে Eder-Hecht-ধারার প্রচলন হয় এবং এই বিষয়ের গবেষকগণের প্রস্তাব অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে এই ধারার পরিবর্তন করিয়া মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন যে প্লেট বা ফিল্মের মোড়কের উপর Scheiner-শক্তির নির্দেশ থাকে উহা কিন্তু আসলে আদি Scheiner-শক্তি নয়; Eder-Hecht নিয়মে পরীক্ষা করিয়া Scheiner-শক্তিরূপে লেখা হইয়া থাকে। এই শক্তি নির্ণয়ের প্রথা যে নিখুঁত হইয়াছিল তাহা নহে, যেহেতু একই শ্রেণীর অবদ্রব পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিলে প্রতিবারেই মান শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগের মত তফাৎ হইতে দেখা যাইত। সেই সময়ে ইহা হইতে উন্নত আর কোনও পদ্ধতি ঐ দেশে ছিল না বলিয়া উহাই জার্মানীতে সকলে মানিয়া লইয়াছিল, যদিও এইরূপ বিশৃঙ্খল শক্তি নির্ণয়ের প্রথা গবেষকগণের মনঃপূত হয় নাই। অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান গবেষকগণ আলোক গ্রহণের সঠিক যন্ত্রাদি ও পরিস্ফুটন রসায়ন (ডেভেলপিং সলিউসন) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অবদ্রবের শক্তির প্রায় সঠিক মাত্রা নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। এই পদ্ধতিকে Deutsche Indsutrie Norm-পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পর জার্মানীর অবদ্রব প্রস্তুতকারিগণ ওই পদ্ধতি দ্বারাই অবদ্রবের শক্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত তিন প্রকার শক্তি-নির্ণয়-পদ্ধতির সাংকেতিক পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল:—

Hurter & Drifield পদ্ধতি = (সংখ্যা) H & D
Scheiner „ = Sch (সংখ্যা)°
Deutsche
Industrie Norm „ = DIN. (সংখ্যা)°

সাধারণতঃ ইংল্যাণ্ডে H & D-পদ্ধতি এবং জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে Sch ও DIN-পদ্ধতিরই পোষকতা করা হয়।

উপরোক্ত তিন প্রকার বহুল প্রচলিত শক্তি নির্ণয়ক প্রথা ছাড়া Wyne, Watkin প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

প্লেট, ফিল্ম প্রভৃতির এক্সপোজারের পর পরিস্ফুটন দ্রবণের ক্রিয়ায় অবদ্রবের নিম্নমানের গাঢ়ত্বের উপরই প্রায় সকল পদ্ধতির শক্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেকেরই মূল বিচার পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। এই জন্য উহাদের একটিকে অন্যটিতে সঠিক পরিবর্তিত করা যায় না। মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য অতি নিকট সম্বন্ধ বিচারার্থে Western Electrical Instrument Corp. নিম্নলিখিত তথ্য প্রচার করিয়াছেন:—

H & D.	DIN	H & D	DIN
২০০	৮°/১০	১৬০০	১৭°/১০
৪০০	১১°/১০	২০০০	১৮°/১০
৮০০	১৪°/১০	২৫০০	১৯°/১০
১০০০	১৫°/১০	৩২০০	২০°/১০

আবার DIN-কে মোটামুটি ভাবে Sch-এ পরিবর্তিত করিতে হইলে DIN-এর ভগ্নাংশের হর সংখ্যাটিকে উপেক্ষা করিয়া লব সংখ্যাটির সঙ্গে ১০ যোগ করিতে হয়:—

DIN ৮°/১০ = Sch(৮+১০)° = Sch ১৮°

অনেক মোড়কের উপর Sch বা DIN শব্দ দুইটি লেখা থাকে না, মাত্র সংখ্যা ও ক্রম চিহ্ন দেওয়া থাকে। উভয়েরই শক্তির মাত্রা ডিগ্রির সাংকেতিক চিহ্ন ° দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। সাধারণের যাহাতে একই প্রকার ক্রম চিহ্নে ভুল ধারণা না হয় সেইজন্য প্রথম প্রচলিত Sch-কে অপরিবর্তিত রাখিয়া DIN-কে ভগ্নাংশের দ্বারা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; অর্থাৎ DIN. ১·৩° শক্তিকে ১৩°/১০ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অবদ্রবের শক্তির ক্রিয়া আলোকের উজ্জ্বলতার উপরই নির্ভর করে। যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হউক না কেন, যতই উচ্চ সংখ্যার নির্দেশ থাকিবে ততই কম এক্সপোজার লইতে হইবে। এ বিষয়ে H & D-পদ্ধতিই সরল; কারণ এক্সপোজারের সময় সর্বদাই বিষমানুপাতে থাকে। দ্বিগুণ শক্তি সংখ্যায় অর্ধেক এক্সপোজার বুঝায়। যেমন:—

১০০ H & D-তে যদি এক সেকেণ্ড এক্সপোজার দেওয়া হয় তবে ২০০ H & D-তে আধ সেকেণ্ড, ৪০০ H & D-তে সিকি সেকেণ্ড—এইরূপ হইবে। Sch ও DIN পদ্ধতি কিন্তু এইরূপ সরল নয়। প্রত্যেক ৩°/১০ বর্ধিতক্রমে DIN দ্বিগুণ শক্তি পাইয়া থাকে:—DIN ১৪°/১০-এর দ্বিগুণ DIN (১৪°/১০+৩°/১০) = DIN ১৭°/১০ হইতে Sch-এর প্রত্যেক তিন বর্ধিতক্রমে দ্বিগুণ শক্তি পায়:— Sch. ২৪°-এর দ্বিগুণ (২৪°+৩°) = Sch ২৭° হইবে।

অবদ্রবের শক্তির তারতম্য অনুযায়ী উহাদের উপর আলোক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও তারতম্য হয়। একই শ্রেণীর দুই শক্তির অর্থাৎ কম ও বেশী শক্তির অবদ্রবে আনুপাতিক এক্সপোজার লইয়া একই পরিস্ফুটন দ্রবণে প্রক্রিয়া করিলে দেখা যায় যে, একটিতে অন্যটি হইতে আলো-ছায়ার তীক্ষ্ণতা বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট শক্তির আনুপাতিক আলো-ছায়ার সমাবেশ উভয় অবদ্রবে সমান হয় নাই। আবার দুইটি বিভিন্ন কোম্পানির প্রস্তুত একই শ্রেণীর একই নির্দিষ্ট শক্তির অবদ্রবে একই এক্সপোজারে একই পরিস্ফুটন দ্রবণের প্রক্রিয়ায় প্লেট বা ফিল্মের উপরে ঘনত্বের তারতম্য হয়।

কোন কোন অবদ্রব একই পদ্ধতিতে বিচার করিয়া ইংল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড ব্যাতিরেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৃথক শক্তি নির্ণয় করা হয়:—

ইংল্যাণ্ডের গণনা	ইউরোপের অন্যান্য দেশের গণনা
৪০০ H & D.	১,৩০০ H & D (Sch. ২৩°)
৫০০ "	১,৭০০ " (" ২৪°)
১০০০ "	৩,৫০০ " (" ২৭°)

আরও দেখা যায় যে, প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রবগুলি

সূর্যালোকে যে শক্তির পরিচয় দেয় কৃত্রিম বিজলী আলোতে কিন্তু উহা হইতে অধিক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে :—

	সূর্যালোকে	হাফ্ ওয়াট বিজলী আলোকে
প্যানক্রোম্যাটিক	৭০০ H & D	= ২০০০ H & D.
	২৫০০ "	= ৮৭০০ "

পদ্ধতির এইরূপ অনৈক্য সুদক্ষ আলোক-চিত্রকর ভিন্ন অন্যের ভ্রমোৎপাদন করিতে পারে। আবার প্লেট-ফিল্ম ব্যবহারকারীদেরও উপকরণগুলির আলোক অনুভূতিসূচক চিহ্ন অবশ্য জানা দরকার, যাহাতে সে যে উপকরণগুলি ব্যবহার করিতেছে তাহার প্রায় ঠিক এক্সপোজার নিরূপণ করিতে পারে। প্রমাদশূন্য এক্সপোজারের আবশ্যকতাকে অধিক

অতিশক্তির প্লেটে সামান্য এক্সপোজারে চলন্ত বিষয়বস্তুর ছবি
ফটো—সি, আই, এস, হিষ্টোরিক্যাল সেক্সন, সিমলা

সাধারণ নিয়মে নিম্ন শক্তি অপেক্ষা উচ্চ শক্তির প্লেট বা ফিল্মে সিলভারের দানাগুলি অপেক্ষাকৃত মোটা হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য হ্রাস করিবে। সত্য বটে, বিশেষ পরিস্ফুটন দ্রবণের প্রক্রিয়ায় উচ্চ শক্তির উপকরণে মিহি দানা গঠনের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এইরূপ দ্রবণ ব্যবহারে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুপাতে অবদ্রবের কিছু পরিমাণ শক্তি হ্রাস পায়।

ইহাতেই বোঝা যায় যে, অবদ্রবের শক্তি নির্দেশক গুরুত্ব দেওয়া যায় না, কারণ কিছু পরিমাণ এক্সপোজারকে পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকালে আয়ত্ত করা যায়। অবশ্য খুব বেশী বা খুব কম এক্সপোজারের সংশোধন করা অসম্ভব।

এইরূপ বিরোধী বিষয়ের মীমাংসা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিক প্রস্তুতকারীরা আলোক-চিত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের জন্যই বিভিন্ন শক্তির ও পৃথক পৃথক বর্ণানুভূতির ঋণ-চিত্র তুলিবার

উপকরণগুলি সরবরাহ করিয়া থাকেন। রেখা-চিত্র বা ঐ জাতীয় বিষয়বস্তুর ছবিতে আলো-ছায়ার বৈপরিত্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে অবদ্রবের ব্যবস্থা আছে তাহার শক্তি বিচার করিয়া আনুপাতিক এক্সপোজারে হাফটোন বিষয়বস্তুর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইতে পারে না। বিষয়বস্তুর শ্রেণী বিচার করিয়া নির্দেশকগণ দ্বারা নির্দিষ্ট উপযুক্ত শক্তির প্লেট-ফিল্ম ব্যবহার করিতে হইবে।

হয়। রঙীন প্রলেপের তারতম্যানুসারে উহাদের শক্তি এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক হ্রাস পায়।

সামান্য কম বা বেশী এক্সপোজারে নিম্ন শক্তির উপকরণগুলিতে যে ক্ষতি অগ্রাহ্য করা চলে, অতি-শক্তির উপকরণে কিন্তু তাহা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে অতি-শক্তির প্লেট বা ফিল্মের উপর যে অস্বচ্ছ কলঙ্কপাত দেখা যায় তাহা দুর্লক্ষ্য ছিদ্র

উচ্চশক্তির প্লেটে খুব কম এক্সপোজারে চলন্ত বিষয়বস্তুর ছবি।
ফটো—সি, আই, এস, হিষ্টোরিক্যাল সেক্সন, সিমলা

স্বাভাবিক বর্ণ বা রঞ্জিত আলোকচিত্র তুলিতে প্যানক্রোম্যাটিক অবদ্রবকেই আলোক গ্রহণের মূল উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বর্ণবিকাশের জন্য ওই অবদ্রবের উপর তিনরঙা প্রলেপের আড়াল দেওয়া থাকে মাত্র। এই তিনরঙা প্রলেপ ভেদ করিয়া বাধাপ্রাপ্ত আলোক-রশ্মি অবদ্রবের উপর স্বভাবতঃই পূর্ণ তেজে পড়িতে পারে না; ফলে অবদ্রবগুলির মূল শক্তির হ্রাস

দিয়া ক্যামেরা বা ক্যামেরা-স্লাইডের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আলোক প্রবেশের জন্যই হইয়া থাকে; কিন্তু এই সামান্য আলোকে নিম্ন শক্তির প্লেট বা ফিল্মে এরূপ কোন অবাঞ্ছনীয় ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অবদ্রবের শক্তির অনুপাতে আলোকের আনুপাতিক দ্রুত ক্রিয়াই উহার কারণ।

প্রয়োজনবোধে বাজারে প্রচলিত প্লেট বা ফিল্মকেও সহজ প্রক্রিয়ায় পারদ বা নিশাদল

বাষ্পের সাহায্যে অধিক শক্তির করিয়া লওয়া যায়। এই প্রক্রিয়ায় নিম্ন শক্তির অবদ্রবগুলির শক্তি বৃদ্ধি অল্পই হইয়া থাকে, কিন্তু উচ্চ শক্তির অবদ্রবগুলির আনুপাতিক শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যেক প্রস্তুতকারীর শক্তি নির্ণয় পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজস্ব একই প্রথায় উপকরণগুলির সমানানুপাতিক শক্তি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যবহারকারী যদি একই প্রস্তুতকারকের উপকরণগুলি (অন্ততঃ ঋণ-চিত্র প্রস্তুতের জন্য) নিয়মিত ব্যবহার করেন তবে আলোকপাতের অবস্থা ভেদে নিঃসংশয়ে আনুপাতিক নির্ভুল এক্সপোজার লইতে পারিবেন।

ভিটামিন ও উদ্ভিজ্জ হরমোন

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

উদ্ভিদের দেহগঠন ও পুষ্টির জন্যে এমন কতকগুলো জিনিসের প্রয়োজন, যেগুলো ঠিক উদ্ভিদের খাদ্য-তালিকায় পড়েনা; কিন্তু উদ্ভিদ-দেহে বর্তমান থেকে এরা উত্তেজক পদার্থ হিসেবে দেহে একটা কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া এনে দেয়। ফলে, উদ্ভিদের দেহগঠন ও বৃদ্ধি দ্রুততর হয়ে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে প্রাণীজ সার অর্থাৎ গোবর, মলমূত্র, পচা পাতা, নর্দমার পাঁক ইত্যাদি সার হিসেবে প্রয়োগ করে অজৈব কৃত্রিম সারের চেয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। মনে হতে পারে যে, এই সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান ফস্ফরাস, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম প্রভৃতিই হয়তো এর কারণ। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, উদ্ভিদদেহে দ্রুত বৃদ্ধির একটা সাড়া এনে দেবার জন্যে দায়ী সেই জৈব সার নিহিত জলে দ্রবণীয় কয়েকটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ—অজৈব রাসায়নিক লবণ নয়।

আমেরিকার কোন এক পল্লীর কৃষিকলেজের একজন অধ্যাপক ক্লাশে পড়াবার সময় ছাত্রদের বলছিলেন যে, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী অর্থাৎ রুটি, ডাল, তরকারী ইত্যাদি ফেলে না দিয়ে গাছের গোড়ায় সার হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত। বক্তৃতার শেষে ঘরে ফিরে তিনি গৃহিণীকেও এই উপদেশ দিলেন। রাত্রির আহারের শেষে অধ্যাপক গৃহিণী তার সখের তরকারীর বাগানের গাছগুলোর গোড়ার-মাটি খুঁড়ে ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যগুলো সেখানে ঢেলে আবার মাটি চাপা দিয়ে ফিরে এলেন। গাছগুলোকে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করে এসে পত্র পুষ্প-ফলশোভিত সুস্থ-দেহ সব্জী বাগানের ছবি দেখতে দেখতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন প্রভাতে বাগানের গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করতে গিয়ে তার চক্ষু স্থির! প্রকাণ্ড বাগানটার ওপর দিয়ে যেন একটা প্রবল বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে—সমস্ত গাছগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে' মূলসমেত কে যেন উপড়ে ফেলেছে। পরবর্তী দৃশ্যে রণরঙ্গিণী বেশে অধ্যাপক-পত্নী স্বামীর সম্মুখীন হলেন। খাবারের গন্ধ পেয়ে লুব্ধ শেয়ালের দল মাটি খুঁড়ে সেই খাবার খেতে গিয়ে গাছগুলোর এই দুর্দশা করেছে। আত্মভোলা অধ্যাপকের এতক্ষণে উপলব্ধি হলো—তার হিসেবে ভুল হয়েছে, ফেলে-দেওয়া এই সব খাদ্যসামগ্রী প্রথমে পচিয়ে তারপর সার হিসেবে গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এসব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ দ্রব্যগুলো পচে গিয়ে এমন কতকগুলো

জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে, যেগুলো গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত সহায়তাকারী এবং একান্ত আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধিসংক্রান্ত এই জিনিসগুলো সম্বন্ধেও চাষীর যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

গাছের শিকড় ও পাতার কুঁড়ি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের ডালপালার বিস্তার হতে থাকে। পাতা থেকে পাতার কুঁড়িতে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের প্রবহণের ফলেই নাকি কুঁড়ির দ্রুত বৃদ্ধি হয়। যে কুঁড়ির দিকে প্রথমতঃ সেই প্রবাহ সঞ্চালিত হয় সেই কুঁড়িটিই প্রথম বড় হয়ে থাকে এবং অন্যান্য কুঁড়িগুলোর বৃদ্ধি স্থগিত থাকে। কাজেই দেখা যায় যে, গাছের কোন কোন অংশ বেশ বড় হচ্ছে, আবার কোন কোন অংশ মোটেই বাড়ছে না। সেই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে যদি কোনক্রমে সেই দিকে চালনা করা যায় তাহলেই আবার সেই অংশগুলো বড় হতে আরম্ভ করবে। গোলআলুতে যখন অঙ্কুর সঞ্চার হয়—প্রচণ্ড উদ্দীপণার সঙ্গে সেই অঙ্কুর অতিদ্রুত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে আরম্ভ করে। অঙ্কুরের বৃদ্ধি-সহায়ক রাসায়নিক জিনিসগুলোর উপস্থিতিই এর কারণ। বীজ-আলুর আয়তন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শাখাবিস্তারের পূর্বেকার সেই উত্তেজনাও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসে এবং সেই বীজ থেকে যে গাছ হয় তাতে খুব কম আলু জন্মে থাকে। এর কারণ—গাছের খাদ্যের অভাব নয়, গাছের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্যই বীজদেহে বর্তমান থাকে। আপেলম্যান নামক একজন কৃষিবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, আলুর বীজে বৃদ্ধি-সহায়ক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ স্বল্প পরিমাণে বর্তমান থাকে। বীজ থেকে প্রথম কুঁড়ি নির্গমনের সময় তার চারদিকে কোষগুলোর সংখ্যা ও আয়তন যদি খুব কম থাকে তাহলেই সেই বৃদ্ধি-সহায়ক পদার্থগুলো কুঁড়ির ডগায় ঠিকভাবে ক্রমাগত সঞ্চালিত হতে পারে না। ফলে, সেই বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ শীর্ণদেহ ও ক্ষীণ-প্রসবিণী হয়ে থাকে। আরও অনেক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, এই বৃদ্ধি-সহায়ক পদার্থগুলো উদ্ভিদের অজৈব রাসায়নিক খাদ্য নয়—এগুলো জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ—ভিটামিন ও হরমোন জাতীয়।

প্রাণীদেহের গঠন ও পুষ্টির জন্যে ভিটামিন প্রয়োজন। এই ভিটামিন খাদ্য হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি উদ্ভিদ থেকে। স্বচ্ছ জলের শ্যাওলা জাতীয় নিম্নশ্রেণীর কতকগুলো উদ্ভিদের নাকি অজৈব পদার্থ থেকে জটিল জৈব পদার্থ—ভিটামিন তৈরীর সামর্থ্য আছে। কোন কোন চা'লে ভিটামিনের পরিমাণ বেশী, আবার কোন কোন চা'লে কম। উৎপত্তি-স্থান ভেদে ভিটামিনের পরিমাণের এই তারতম্য হয়ে থাকে। মাটির মধ্যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা থেকে উদ্ভিদ ভিটামিন তৈরী করতে সমর্থ হয়। জীবদেহের পুষ্টিসাধনে ভিটামিন অপরিহার্য, সন্দেহ নেই; কিন্তু উদ্ভিদ কি শুধু জীবের প্রয়োজন মেটাতেই ভিটামিন তৈরী করে—তার নিজের স্বার্থ কি এতে কিছুই নেই? দশহাজার ভাগ জলে একভাগ অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড অর্থাৎ ভিটামিন সি মিশিয়ে দেখা গেছে, তাতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম খুব দ্রুত হয়েছে; কিন্তু এই ভিটামিনের পরিমাণ ৫০ গুণ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুর বৃদ্ধির দ্রুততা এবং নির্গত ডালপালা ও শিকড়ের ওজন যথাক্রমে শতকরা ৩০ ও ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন গাছের পক্ষে এই বৃদ্ধির পরিমাণও বিভিন্ন। এখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিটামিন গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সহায়ক। কাজেই গাছের গোড়ায়ও নাকি ভিটামিন সিঞ্চণ দরকার। গাছ থেকে ভিটামিন পেতে হলে গাছকেও ভিটামিন খাওয়াতে হবে—ব্যাপার মন্দ নয়! ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৬, নিকোটিনিক অ্যাসিড, ফোলিক অ্যাসিড, ও ভিটামিন-সি গাছের বৃদ্ধির পক্ষে আবশ্যক বলে জানা গেছে।

মানুষের জীবনীশক্তির মূল আধার—উৎসাহ

ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির সহায়ক এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি-নিঃসৃত এক প্রকার জটিল রাসায়নিক পদার্থের নাম হরমোন। শরীরযন্ত্রের বিচিত্র ক্রিয়া নির্বাহের এরাই কর্মীস্বরূপ। উদ্ভিদদেহেও নাকি হরমোন আছে। তাদের দেহ বৃদ্ধি ও গঠনকার্যে এদের কার্যকারিতা অসীম। গাছের এক অংশে উদ্ভূত হয়ে ক্যাম্বিয়াম সূত্র-নালী অবলম্বনে তার দেহের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয়ে এই হরমোন শিকড়ের দিকে অগ্রসর হয়। এই প্রবাহ-পথের যেখানে যেখানে হরমোন জমতে সুরু করে সেখানেই কোষগুলো দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে। কোথাও শিকড় দ্রুত প্রসারিত হয়, কোথাও গাছে শীঘ্র ফুল ধরে, আবার কোথাও দ্রুত ফল-ধরা ও পাকা আরম্ভ হয়ে যায়। গাছের এই বহুমুখী কর্মধারার ধারক ও বাহক এই হরমোন। বীজনির্গত অঙ্কুরের পাতা ও শিকড়ের ডগায়, পাতার কুঁড়িতে এবং সবুজ শ্যাওলার মধ্যেও এই হরমোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরমোন গাছের কাণ্ডের ডগায় সর্বোচ্চ কোষগুলোতে জন্মলাভ করে' কোষের সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বড় এপিডারম্যাল কোষগুলোতে প্রবেশ করে। ফলে সেই কোষগুলো বৃদ্ধি পেয়ে প্রসার লাভ করে এবং গাছের অগ্রভাগ একটু বেঁকে যায়। গাছ যেদিকে আলো পায় তার বিপরীত দিকের অংশে হরমোনের স্রোত প্রবাহিত হয় বলে সেদিকের কোষগুলো বড় হওয়ায় উদ্ভিদদেহ আলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে, অর্থাৎ যেদিক থেকে আলো আসছে গাছের ডগা সেইদিকেই বেঁকে যায়। অনেকে বলেন—উদ্ভিদ-কোষের ভাঙ্গন কার্যেও (অর্থাৎ একটি কোষ ভেঙ্গে গিয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়—সে দুটি কোষ বড় হয়ে আবার ভেঙ্গে গিয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়—এভাবেই গাছ বড় হয়ে থাকে) প্রেরণার সঞ্চার করে এই হরমোন।

আগেই বলা হয়েছে যে, হরমোন কতকগুলো জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ থেকে এই সমস্ত পদার্থ নিষ্কাশন করে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন এবং কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অনেক পদার্থও উদ্ভিদদেহে প্রয়োগ করে কয়েকটির এই বৃদ্ধি-সহায়ক গুণ আবিষ্কার করেছেন। এই কৃত্রিম হরমোন-মিশ্রিত জলে উদ্ভিদের শাখা বা পল্লব বসিয়ে রাখা হয়। উদ্ভিদ দেহে এই মিশ্রণ সূচীপ্রয়োগে ব্যবহৃত হতে পারে, কিংবা মলমের মত কাণ্ডে বা পাতায় মাখিয়ে দেওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদ-শাখা থেকে বহু শিকড় গজিয়েছে, কোথাও কাণ্ডদেশ ফুলে উঠে বেঁকে গেছে, কোথাও পত্র শীর্ষ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কোথাও বা পত্রদণ্ড দীর্ঘতর হওয়ায় বেঁকে গেছে। এগুলো সবই হরমোনের ক্রিয়া। কৃত্রিম হরমোনের মধ্যে ইনডোল-প্রপিওনিক অ্যাসিড, ফিনাইল-অ্যাক্রিলিক অ্যাসিড, ফিনল-প্রপিওনিক অ্যাসিড, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, ন্যাপথেলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। গাছের বৃদ্ধিসহায়ক এই পদার্থগুলো হয়তো তারা নিজেরা তৈরী করে না—হয়তো মাটি থেকেই এগুলো শোষণ করে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন হরমোনের আবার ভিন্ন ভিন্ন কাজ—কোন কোন হরমোন কোষ-বিভক্তিকরণে সাহায্য করে, আবার কেউ কেউ শিকড়ের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। শীঘ্র ফুল ও ফল উৎপাদন করা, ফল পাকার সময়কে দীর্ঘতর করা, ফল হওয়ার আগেই ফুল ঝরে না পড়া, ফলের আকার বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বহুবিধ কার্যে বহুপ্রকার হরমোন নিয়োজিত আছে।

কলমের গাছে ভাল ফুল বা ফল ধরে। গাছের ডালেই শিকড় উৎপাদন করতে হয়। কৃত্রিম হরমোনের সাহায্যে এই কলম তৈরী করা সহজ হয়েছে। কোন কোন গাছের ডাল কেটে ইনডোল অ্যাসেটিক,—প্রোপিওনিক ও বিউটিরিক অ্যাসিড বা ন্যাপথেলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে রেখে দেখা গেছে—তাতে দ্রুত শিকড় সঞ্চার হয়েছে এবং সংখ্যায়ও তারা হয়েছে

অজস্র। চারাগাছের মূলসমেত তুলে এনে যদি কিছুক্ষণ কার্বন মনোকসাইড গ্যাস বা এসিটিলিন, ইথিলিন, বিউটারিক অ্যাসিড প্রভৃতির সংস্পর্শে রাখা যায় তাহলে শিকড়গুলো দ্রুতবেগে বেড়ে উঠবে এবং আরও অনেক নতুন শিকড় গজাবে। কার্বন মনোকসাইড মানুষের পক্ষে তীব্র বিষাক্ত গ্যাস—কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে নয়।

কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ কৃষিকার্যে একটা বিশেষ উন্নতধরণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হয়েছে। একলক্ষ ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগ ন্যাপথেলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ কোন কোন গাছের পক্ষে প্রভূত উপকার সাধন করেছে। কোন কোন স্থানে আপেল ও পীচ ফল পাকার আগেই গাছ থেকে ঝরে পড়তে দেখা যায়। এই হরমোনের দ্রাবণ সিঞ্চনে গাছ এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে। আঘাত পেয়ে বৃক্ষদেহের কোন স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হলে বা মচ্‌কে গেলে সেই স্থানে মলমের মত করে এই পদার্থটি (১%) লেপন করলে ক্ষত বা আঘাত-প্রাপ্ত স্থান নিরাময় করা যায়। অনেক সময় গোল-আলু, মিষ্টিআলু, আদা, কচু প্রভৃতি মাটিতে রোপণ করে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরেও অঙ্কুর বা শিকড়োদ্গম হয় না। ফিনাইল অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রয়োগে তাদের সেই সুপ্তি ভঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে। এলানটয়েন নামক পদার্থটি উদ্ভিদদেহে সূচী-প্রয়োগে প্রবেশ করিয়ে গাছে খুব শীঘ্র বড় আকারের ফুল ধরানো যেতে পারে। থায়ো-ইউরিয়া প্রয়োগ করে ফলের বিকৃত রং ধরা বন্ধ করতে পারা যায়। মানুষ ও জীবজন্তুর প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণ ইউরিক অ্যাসিড আছে; তা থেকে সহজেই এই পদার্থটি তৈরী করা সম্ভব। গাছপালা পচে গিয়ে যে আবর্জনার সৃষ্টি করে তাতে হিউমিক অ্যাসিড তৈরী হয়। এই অ্যাসিড গাছে প্রয়োগ করলে গাছের রং হয় গাঢ় সবুজ, সেই জন্যে পচা পাতা ইত্যাদি গাছের গোড়ায় সাররূপে দেওয়া হয়ে থাকে। ২-৪ ডি নামক রাসায়নিক পদার্থটির আজকাল খুব ব্যবহার চলছে। আমেরিকার বহু কৃষিক্ষেত্রে আগাছা নিবারণ ও ধ্বংসের কাজে এই পদার্থটির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু স্বল্প পরিমাণে এই পদার্থটি ব্যবহার করলে নাকি এটা উদ্ভিদদেহে বৃদ্ধি-সহায়ক বস্তুরূপে কাজ করে থাকে। অধিক পরিমাণে যেটা বিষ, অল্পমাত্রায় সেটাই আবার ওষুধ। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের সরকারী কৃষিবিভাগ একলক্ষ ভাগ জলে ৭ ভাগ ২-৪ ডি গুলে নিয়ে ফলধরার কয়েক সপ্তাহ আগে সিঞ্চণ করে দেখেছেন যে, তাতে ফল পাকার আগেই যেসব ফল ঝরে যায় তাদের তুলনায় সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, ক্লোরো-ফিনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং ন্যাপ্‌থক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিডের দ্রাবণ সিঞ্চণে কালোজামের গাছে প্রচুর ফল ধরেছে এবং ফলের আকার এবং ওজনও বেশ বেড়ে গেছে। (এই দুটি পদার্থের জলজ আগাছা ধ্বংসকারী শক্তির পরীক্ষা লেখক করে দেখেছেন)। সুখের কথা আমাদের দেশেও বহু গবেষণাগারে উদ্ভিজ্জ হরমোন নিয়ে পরীক্ষা চলেছে এবং অনেক স্থলে সাফল্য লাভও ঘটেছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, হরমোন কেবলমাত্র উদ্ভিদদেহে উত্তেজনা বা প্রেরণার সঞ্চার করে। সুস্থদেহ গাছ ও প্রচুর ফুল ফল পেতে হলে শুধু হরমোনের প্রাচুর্য থাকলেই চলবে না—আহারের প্রাচুর্যও চাই; কারণ খাদ্যই তাকে করে তুলবে সুস্থ ও সবল। সুস্থদেহ উদ্ভিদই হবে বহু ফল-প্রসবিণী। উপবাসী দেহে শুধু হরমোন ইন্‌জেকসন্‌, দুর্বল দেহধারী লোকের প্রচুর মদ্যপানের মত এনে দেবে—উত্তেজনার শেষে, জড়তা, অবসাদ ও ক্ষয়রোগ। কাজেই কৃষিকার্যে সাফল্য লাভ করতে হলে দরকার—জমিতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ, গাছের ব্যালেন্স ডায়েটের ব্যবস্থা, উদ্ভিদের দেহগঠন ও খাদ্য উৎপাদনপ্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে-পড়া উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার সঞ্চার।

আস্‌ভান্ত্‌ আরেনিয়াস্‌

শ্রীসরোজকুমার দে

যা সত্য, তা প্রকাশ পাবেই একদিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিবিজ্ঞ মানুষ যে নতুন সত্যের রূপকে গ্রহণ করতে পারে না—স্বার্থবশতঃ তাকে মিথ্যা বা অসম্ভবের কোঠায় ফেলে দিতে দ্বিধা করে না, তারাই পরে বাধ্য হয় সেই সত্যকে সাদরে গ্রহণ করতে—যখন সত্য তার আপন প্রভায় বিকশিত হয়ে ওঠে। আরেনিয়াসের প্রথম গবেষণালব্ধ 'ইলেক্‌ট্রো-লাইটিক্‌ ডিসোসিয়েশন থিয়োরী' সেদিনের সনাতন মতাবলম্বী বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা 'অসম্ভব' বলে অবহেলা করেছিলেন; কিন্তু তাঁদেরই একদিন পরাজয় স্বীকার করে এই থিয়োরীকে গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তারই ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

লেক মালারের অন্তর্গত উইজক্‌ গ্রামে ১৮৫৯ সালে ১৯শে ফেব্রুয়ারি আরেনিয়াসের জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কৃষক শ্রেণীভুক্ত—চাষবাস করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। ক্রমে তাদের সেই চাষের কারবার উঠে যায়। আরেনিয়াসের যখন জন্ম হয় তখন তাঁর পিতা ছিলেন ঐ গ্রামের একটি জমিদারীর ম্যানেজার। কিছুকাল পরে উইজক্‌ থেকে বসবাস উঠিয়ে তাঁরা উপসালা নামক একস্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

স্কুলের পড়া শেষ করে আরেনিয়াস উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। কলেজ জীবনে তিনি যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন তা নয়—তবু তিনি অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছে একটি কারণে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন। উপসালায় ছাত্র-পরিচালিত 'অরোরা ক্লাব' নামে একটি ক্লাব ছিল। ক্লাবের বৈশিষ্ট্য ছিল—এর যা কিছু আলোচনা, বক্তৃতা সমস্তই রাত্রে হতো এবং সারা রাত্রিই চলতো। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে ক্লাবটি জনসাধারণের কাছে খুবই পরিচিত ছিল। এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন আরেনিয়াস, তাই তাঁর নামটা অনেকেই জানতো।

কলেজের পড়া শেষ হলে আরেনিয়াস রসায়নে গবেষণা করবার জন্যে ষ্টক্‌হল্‌মে চলে যান। সে সময়ে চিনি প্রভৃতি বস্তুর আণবিক পরিমাপ স্থির করা একটি দুরূহ কাজ ছিল। কি উপায়ে এদের আণবিক পরিমাপ স্থির করা যায় সেই সম্বন্ধে আরেনিয়াস গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তিনি যা ভেবে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তিনি কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। তখন তিনি নানা-রকমের 'সল্ট সল্যুশনে' বিদ্যুৎ-পরিবাহন সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করলেন।

ক্লসিয়াস প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পূর্বেই আবিষ্কার করে-ছিলেন যে, অ্যাসিড, বেস বা সল্ট, মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এদের বলা হয় ইলেকট্রোলাইট। ইলেকট্রোলাইটকে জলে দ্রবীভূত করে যদি তাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায় তাহলে সেই মৌলিক পদার্থগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পর দুটি বিপরীত ইলেকট্রোড্‌ বা তড়িৎদ্বারে গিয়ে অবস্থান করে। আরেনিয়াস পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কোন ইলেকট্রোলাইট জলে দ্রবীভূত হলে তার মৌলিক পদার্থগুলো বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন অণুতে বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে। তিনি এই অণুগুলোর নাম দেন আয়ন। এই আয়নগুলো দুটি বিপরীত তড়িৎযুক্ত অবস্থায় থাকে। যখন ইলেকট্রো-লাইটের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয় তখন তড়িৎযুক্ত আয়নগুলো নিজ ধর্মানুযায়ী দুটি বিপরীত

তড়িৎদ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং সেখানে তড়িৎ-বিযুক্ত হয়ে যায়। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইডের (লবণ জল) সোডিয়াম পজিটিভ এবং ক্লোরিন নেগেটিভ আয়নে বিভক্ত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সোডিয়াম আয়ন নেগেটিভ তড়িৎ-দ্বারে যায়, কারণ সেটি পজিটিভ তড়িৎযুক্ত এবং ক্লোরিন আয়ন পজিটিভ তড়িদ্বারে যায় কারণ সেটি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। একে বলা হয় "ইলেকট্রো-লাইটিক ডিসোসিয়েসন বা আইয়োনাইজেসন"। আরেনিয়াস আরও দেখালেন যে, এই তড়িৎযুক্ত আয়নের জন্যেই ইলেট্রোলাইটের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্ভব হয়, কারণ তড়িৎযুক্ত আয়নগুলো বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজ করে।

প্রশ্ন ওঠে—কোন কোন সল্যুশনে খুব সহজেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে পারে এবং কতকগুলোতে আবার প্রবাহ কম হয়; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সল্যুশন যত তরল হয় ততই তার বিদ্যুত-প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যায়—এর কারণ কি? আরেনিয়াস পরীক্ষা করে বললেন, যে সকল ইলেকট্রোলাইট জলে দ্রবীভূত হলে বহুসংখ্যক আয়নে বিভক্ত হয় তাতে অতি সহজেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত হওয়া সম্ভব; যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, কষ্টিক সোডা, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রভৃতি। এবং যে সমস্ত ইলেকট্রোলাইট জলে দ্রবীভূত হলে কম সংখ্যক আয়নে বিভক্ত হয় তাতে কম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়; যেমন অ্যামোনিয়াম হাইড্রেট, অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতি। এ ছাড়া সল্যুশন যত বেশী তরল হয় তত বেশী আয়নে বিভক্ত হয়; সেজন্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মানও বেড়ে যায়। আরেনিয়াস আরও দেখলেন যে, কোন সল্যুশনে বিদ্যুৎ-পরিবাহন দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—একটি আয়নের সংখ্যা ও অপরটি আয়নের গতি। উগ্র অ্যাসিড, বেস বা সল্ট সল্যুশনে বিদ্যুৎ-পরিবাহন বেশী; কারণ অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং বেসের হাইড্রোক্সাইড আয়নের (OH^-) গতি খুব বেশী। তাছাড়া প্রতি সল্ট সল্যুশনের বিদ্যুৎ-পরিবাহন বেশী।

১৮৮৩ সালে এই সকল বিষয় এবং পরীক্ষালব্ধ ফল সহযোগে আরেনিয়াস একটি থিসিস লিখলেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু হলো "ইলেকট্রিক্যাল কণ্ডাকটিভিটি অফ্ ইলেকট্রোলাইট্‌স্ ও এক্সট্রিম্‌লি ডাইল্যুট অ্যাকোয়াস সল্যুশন্‌স্ এবং কেমিক্যাল থিয়োরী অফ্ ইলেকট্রোলাইট্‌স্"। এদিকে 'আয়ন' কথাটি নতুন বলে তিনি থিসিসের মধ্যে ঐ কথাটিকে সোজাসুজি লিখতে সাহস পেলেন না। কাজেই 'আয়ন' বস্তুটিকে বোঝবার জন্যে তাঁকে বহু অনাবশ্যক কথা লিখতে হলো; ফলে থিসিসটি অত্যন্ত বড় হয়ে গেল। থিসিসটি তিনি 'অ্যাকাডেমি অফ্ সাইন্সেস্'-এ রসায়ন সম্বন্ধে থিসিস গ্রহণের ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারীর হাতে দিয়ে এলেন। লোকটির কাজই ছিল, যে সমস্ত থিসিস তার কাছে আসবে সেগুলোকে নিয়মানুযায়ী উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া। আরে-নিয়াসের থিসিসটি হাতে নিয়ে কর্মচারীটি বিস্মিত হয়ে বললেন যে, এর পূর্বে সে কোনদিন এতবড় থিসিস পায় নি। তাই সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, আরেনিয়াস বুঝি একজন খুব বিজ্ঞ রসায়নবিদ!

এদিকে পরীক্ষকবৃন্দ থিসিসটি পড়ে আরেনিয়াসকে একেবারে নিরেট বোকা বলে মনে করলেন। আয়ন সম্বন্ধীয় ব্যাপারটিকে তাঁরা 'অ্যাবসার্ড' বলে উড়িয়ে দিলেন। অতি সামান্যের জন্যে তিনি ডক্টরেট পরীক্ষায় ফেল হবার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। শেষে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে একটি চতুর্থশ্রেণীর 'ডক্টরেট' উপাধি দেওয়া হলো।

পরীক্ষকবৃন্দের এই আচরণে আরেনিয়াস খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তবু রসায়নে গবেষণা করবার আগ্রহ তাঁর অদম্য। তিনি একদমই নিরাশ হলেন না। তাঁর কাছে থিসিসের যে ক'টি প্রতিলিপি ছিল সেগুলোকে তিনি ডাক মারফৎ বিখ্যাত কয়েকজন রসায়নবিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আশা ছিল যে, তাঁরা তাঁর থিসিসের মধ্যে নতুন কোন সত্যের সন্ধান পেতে পারেন—যা পরীক্ষকবৃন্দ পাননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একজন ছাড়া আর কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিলেন না।

বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলহেল্‌ম্ অষ্টওয়াল্ডের কাছেও থিসিসের একটি প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছিল। আরেনিয়াসের রচনাটি তিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লেন; কিন্তু সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারলেন না। তাই বলে তিনি সেটিকে বাজে রচনা ভেবে অবহেলা করলেন না। আরেনিয়াস কি বলতে চেয়েছেন তা সঠিক জানবার জন্যে তাঁর মন উৎসুক হয়ে উঠলো। তিনি উদীয়মান বিজ্ঞানীদের কখনই অবহেলা করতেন না—চিরদিনই তাঁদের ছিলেন উৎসাহদাতা। আরেনিয়াসের বিষয়বস্তু নতুন, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকবৃন্দ সেটি সঠিক না বুঝে অবহেলা করেছিলেন; কিন্তু এই বিষয়বস্তুর মধ্যেও যে সত্য নিহিত থাকতে পারে—অষ্টওয়াল্ড তা অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তাই আরেনিয়াসের সঙ্গে নিজে আলোচনা করবার জন্যে তিনি যাত্রা করলেন সুইডেনের পথে।

অষ্টওয়াল্ডের উপসালায় আসবার ফলে বিজ্ঞানী-মহলে বেশ সাড়া পড়ে গেল—বিখ্যাত বিজ্ঞানীর আগমনে সকলেই উৎসাহিত হলো। কিন্তু যখন জানা গেল যে, তিনি আরেনিয়াসের ন্যায় একজন সামান্য চতুর্থ শ্রেণীর ডক্টরেটের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে চান, তখন সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন।

সেখানকার রসায়ন-বিভাগের কর্মকর্তা অধ্যাপক ক্লিভের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অষ্টওয়াল্ড তাঁর বিজ্ঞানাগারে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আরেনিয়াস কোন কাজে সেখানে এসে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রতি কারুর দৃষ্টি পড়লো না। তিনি দেখলেন যে, অধ্যাপক ক্লিভ অষ্টওয়াল্ডকে একটি গ্লাস দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—এরমধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশন রয়েছে। আপনি কি বলতে পারেন যে, এর মধ্যে সোডিয়াম ও ক্লোরিন পৃথক অবস্থায় রয়েছে? এগুলোর অস্তিত্ব কি আপনি লক্ষ্য করতে পারছেন? অষ্টওয়াল্ড বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই—এর মধ্যে কিছু সত্য আছে। এর পরই আরেনিয়াসের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়াতে আলোচনা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তখন আরেনিয়াস তাঁর অসতর্ক আগমনের জন্যে বেশ লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন।

অষ্টওয়াল্ড ও ক্লিভ যে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তার সমাধান সেদিন পাওয়া যায়নি একটি কারণে। যখন প্রমাণিত হয় যে, কোন মৌলিক পদার্থের অণু তড়িৎযুক্ত অবস্থায় যে গুণাগুণের অধিকারী হয় তা সাধারণ অবস্থার অণুর গুণাগুণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক—তখন সেই বিষয়টি খুব সহজেই মীমাংসা হয়ে গেল। যেমন একটা লিডেন জারকে বৈদ্যুতিক চার্জ করলে তার যে গুণ দেখা যায়, সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ আনচার্জড্ অবস্থায় তা একেবারেই থাকে না। তেমনি তড়িৎযুক্ত সোডিয়াম ও ক্লোরিনের অণু সাধারণ অবস্থার অণু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্যুশনের সোডিয়াম ও ক্লোরিনের গুণাগুণ সাধারণ অবস্থায় অণুর গুণাগুণ থেকে বিভিন্ন—কারণ সাধারণ অবস্থার অণু সল্যুশনে তড়িৎযুক্ত আয়নে পরিণত হয়।

অষ্টওয়াল্ড যে কদিন উপসালায় ছিলেন আরেনিয়াসের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিলেন। এমনি এক তরুণ বিজ্ঞানীর প্রতি উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের অবিচারে তিনি সত্যই মর্মাহত হয়েছিলেন। সনাতনধর্মী প্রৌঢ় বিজ্ঞানীরা চিরদিনই নবীন বিজ্ঞানীর প্রতি অবিচার করে থাকেন—তাঁদের সামনে অযথা নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করে' তাঁদের স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভাকে অকালে বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেন। এ যে কতবড় অন্যায় অষ্টওয়াল্ড একদিন নির্ভয়ে তার প্রতিবাদ করেন। তিনি

আরেনিয়াসের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই উপসালা পরিত্যাগকালে তিনি আরেনিয়াসকে তাঁর অধ্যাপনাস্থল রিগাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। আরেনিয়াস সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না। একদিকে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা এবং অপরদিকে সে সময়ে পিতার মৃত্যু বশতঃ সুইডেন ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে আরেনিয়াস 'সুইডিস্ অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেস্' থেকে একটি বেশ ভাল বৃত্তি পেলেন। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীমহলে ঘোরাফেরা করবার সুযোগ হলো। তিনি পাঁচটি বছর ধরে ইউরোপের নানা-স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রিগাতে অধ্যাপক অষ্টওয়াল্ড, কোল্‌রসচে ভোর্জস্‌বার্গ, গ্রাজে বোল্টজ্‌ম্যান, কিএলে প্লাঙ্ক, আমষ্টারডামে ভ্যাণ্ট হফ প্রভৃতি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং পুনরায় অষ্টওয়াল্ডের সঙ্গে লিপজিগে (রিগা ছেড়ে তিনি এখানে চলে আসেন) প্রাকৃতিক রসায়ন সম্বন্ধীয় কাজে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়েই তিনি তাঁর আয়ন সম্বন্ধীয় মতবাদকে সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

ভ্যাণ্ট হফ এবং আরেনিয়াসের সম্মিলন অপূর্ব হয়েছিল। এই দুই বিজ্ঞানী পরস্পর পরমাত্মীয়ের মত এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন। দুজনেরই গবেষণার বিষয় ছিল 'সল্যুশন' সম্বন্ধে। তাঁদের স্ব স্ব গবেষণার বিষয়বস্তু পরস্পরের সাহায্যে একরকম সম্পূর্ণ হয়েছিল বলা যায়। ভ্যাণ্ট হফ তাঁর 'অস্‌মোটিক প্রেসার' সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। তিনি একটি বিষয়ের সমাধান কিছুতেই করতে পারছিলেন না যে, কেন সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল সল্যুশনের মান নির্ধারিত মান অপেক্ষা দ্বিগুণ হচ্ছে—কেন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের তরল সল্যুশনের মান নির্ধারিত মান অপেক্ষা ত্রিগুণ হচ্ছে? আরেনিয়াসের সূত্রের সাহায্যে যেন একনিমেষে তিনি সেই কঠিন বিষয়ের সমাধান খুঁজে পেলেন। সোডিয়াম ক্লোরাইডের তরল সল্যুশনের দ্বিগুণ মান হয়—কারণ সেটি সোডিয়াম ও ক্লোরিন এই দু-টি আয়নে বিভক্ত হয় বলে; তেমনি ক্যাল-সিয়াম ক্লোরাইডের তিনগুণ মান হয়—কারণ সেটি একটি ক্যালসিয়াম ও দুটি ক্লোরিন আয়নে বিভক্ত হয় বলে। এর সাহায্যে ভ্যাণ্ট হফ যেমন তাঁর সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন তেমনি আরে-নিয়াসেরও তাঁর 'থিয়োরী অফ ইলেক্‌ট্রোলাইটিক ডিসোসিয়েশন'-এর সত্যতা সম্বন্ধে আর দ্বিধা রইল না। তিনি সেই থেকে 'আয়ন' কথাটিকে রসায়ন-বিজ্ঞানে ক্রমান্বয়ে ব্যবহার করতে লাগলেন।

আরেনিয়াসের 'থিয়োরী অফ ডিসোসিয়েসন' এবং ভ্যাণ্ট হফের 'অস্‌মোটিক প্রেসার'-এর কথা বিজ্ঞানজগতে প্রচারিত হলো। কিন্তু কয়েকজন সনাতন মতাবলম্বী বৃটিশ বিজ্ঞানী তখনও আরে-নিয়াসের মতবাদকে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা মতলব করতে লাগলেন, কেমন করে আরে-নিয়াস, ভ্যাণ্ট হফ, অষ্টওয়াল্ড প্রভৃতির 'থিয়োরিস্ অফ সল্যুশন' সম্বন্ধীয় মতবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করা যায়।

১৮৯০ সালে লিডসে 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন মিটিং' অনুষ্ঠিত হয়। এরকম একটি সুযোগ তাঁরা খুঁজছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁরা অষ্টওয়াল্ড, আরেনিয়াস ও ভ্যাণ্ট হফকে 'সল্যুশন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। মতলব অনুযায়ী তাঁরা তাঁদের বক্তৃতার সময় সভার শেষের দিকে স্থির করে দিলেন। তাঁরা মনে করলেন যে, তাঁদের বক্তৃতার পূর্বে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানীর ওই বিষয়ে বক্তৃতা শুনে তাঁরা নিজেদের মতবাদকে নিশ্চয়ই ভুল বলে মনে করবেন।

সভা যথা সময়ে আরম্ভ হলো। অষ্টওয়াল্ড ও ভ্যাণ্ট হফ উপস্থিত হলেন; কিন্তু সভার মাঝে তাঁদের দেখা গেল না। তাঁরা সভার বাইরে

দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েকজন উদীয়মান রসায়নবিদ তাঁদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছিলেন, আর তাঁরা অসঙ্কোচে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। সভায় অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা করে গেলেন। আর অষ্টওয়াল্ড ও ভ্যাণ্ট হফ বক্তৃতা করবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশ করলেন সভায়। সনাতনধর্মী গ্রেট ব্রিটেনের বিজ্ঞানীদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। আরেনিয়াস এই সভায় যোগদান করতে পারেন নি, সেজন্যে তিনি তাঁর বক্তব্য একটি কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি সভায় পাঠ করেন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক জেম্‌স্ ওয়াকার। সভায় উইলিয়াম রাম্‌জে ও জেম্‌স্ ওয়াকার নতুন আয়নিক থিয়োরীর সত্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। অবশেষে উপস্থিত সকল বিজ্ঞানী এই থিয়োরীকে সমর্থন করে নিতে বাধ্য হলেন।

১৮৯১ সালে জার্মানী থেকে আরেনিয়াসের কাছে গিসেনের রসায়নের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ এলো। কিন্তু আরেনিয়াস ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, আপন মাতৃভূমি সুইডেন ছেড়ে তিনি কোথাও যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই তিনি গিসেনের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। তবু তখনও তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছিলেন না—একজন প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানীর যোগ্যতা সম্বন্ধে তখনও তাঁরা সন্দিহান ছিলেন।

আরেনিয়াস এতদিন ষ্টক্‌হল্‌মের টেকনিক্যাল হাই স্কুলের সামান্য শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে তাঁকে এই পদ থেকে অধ্যাপকের পদে উন্নীত করবার জন্যে একটি প্রস্তাব উঠলো। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানালেন। তখন সুবিবেচনার জন্যে লর্ড কেলভিন, হ্যাসেল্‌বার্গ এবং খ্রিষ্টীয়ানসেন্ এই তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হলো। তাঁরাই আরেনিয়াসের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করবেন স্থির হলো। কিন্তু ভোটে তাঁর পরাজয় হলো, তাঁর স্বপেক্ষ কেবলমাত্র খ্রিষ্টিয়ানসেন্ ছিলেন; বিপক্ষে কিন্তু আরেনিয়াসের উপযুক্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় অবশেষে তাঁকেই অধ্যাপকের পদে উন্নীত করা হয়। পরবৎসর তিনি স্কুলের রেকটার অর্থাৎ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ছ'বৎসর পরে তাকে রয়েল সোসাইটি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ডেভি মেডেল অর্পণ করেন। পরবৎসর (১৯০৩) তিনি রসায়নে নোবেল প্রাইজ পান।

অতঃপর তিনি আমেরিকা পরিভ্রমণ করে এলেন, তারপরে গেলেন বার্লিনে। সেখানকার 'প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি' তাকে তার পুরাতন বন্ধু ভ্যাণ্ট হফের সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। ইতিমধ্যে 'সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেস' কর্তৃক নোবেল ইন্সটিটিউট নামে একটি প্রাকৃতিক রসায়নাগার প্রতিষ্ঠিত হলো—আরেনিয়াস তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। ষ্টক্‌হল্‌মের ঠিক বাইরে একটি ছোট সুদৃশ্য বিজ্ঞানাগার ও তার সঙ্গে একটি সরকারী বাসভবন—এইখানে আরেনিয়াস তাঁর শেষ জীবন একজন সহকর্মী ও কয়েকজন গবেষণা-কারীকে নিয়ে নানাবিষয়ে গবেষণা করে কাটিয়ে দেন। ১৯২৭ সালে ২রা অক্টোবর এখানেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

লুই পাস্তুর

শ্রীদিলীপকুমার দাস

ইতিপূর্বে পাস্তুরের জীবনের প্রথমাংশ আলোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার অবশিষ্ট জীবনের কার্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পাস্তুরের শরীরের একাংশ অবশ হয়ে পড়লেও তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে নিরস্ত হননি। রেশমের গুটিপোকার নানাপ্রকার রোগের কারণ তিনি ক্রমান্বয়ে ছ'বছর পরিশ্রম করে জানতে পারেন; তার ফলে তিনি রেশম ব্যবসায়ীদের গুটিপোকার রোগজনিত দুর্ভোগ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিস অবরোধের সময় জার্মানদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত এক পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ঢোকে। জার্মান সুরার তুলনায় ফরাসী সুরা নিকৃষ্ট। পাস্তুর একথা মানতে রাজী হলেন না। তিনি ঠিক করলেন যে, ফরাসী সুরা জার্মান সুরা থেকেও উৎকৃষ্টতর করে তুলতে হবে। ফরাসী সুরা উৎকৃষ্টতর করবার জন্যে পাস্তুর মেতে ওঠেন। তিনি যখন এই বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন আবার জীবাণুদের স্বতঃস্বম্ভবতার প্রশ্ন ওঠে। ফ্রেমি ও ট্রেকুল নামে দু-জন ফরাসী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ বলেন যে, আঙুরের মধ্যে ঈষ্ট নামক জীবাণু আপনা থেকেই জন্মায়। পাস্তুর পূর্বে একবার প্রমাণ করেছিলেন যে, জীবাণুরা আপনা থেকেই জন্মায় না। এবারও তিনি পরীক্ষা দ্বারা ফ্রেমির উক্তি মিথ্যা প্রমাণ করেন।

এইভাবে পাস্তুর যখন জীবাণু সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জীবাণুগুলো যে রোগ উৎপত্তির কারণ হতে পারে, এ-কথা তাঁর মনে জাগে। এই সঙ্গে তাঁর আরও মনে হয়, রোগ-জীবাণু সম্বন্ধে পূর্ব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করলে মানুষ হয়তো রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে।

কতকগুলো জীবাণু যে আমাদের নানাপ্রকার রোগের কারণ—একথা পাস্তুর সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবার পূর্বেই বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট কক্ রোগবাহক জীবাণুদের অস্তিত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করেন। রবার্ট ককের এই আবিষ্কারের পর পাস্তুরও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। তিনি জীবাণু সম্পর্কীয় গবেষণায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করলেন এবং এবিষয়ে তাঁর প্রধান সহায় হলেন রক্স ও চেম্বারল্যাণ্ড নামে দু-জন যুবক।

অন্যান্য রোগ-জীবাণু সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স জীবাণু নিয়েও কিছুদিন পরীক্ষা চালান। তিনি একটা বোতলের মধ্যে খানিকটা প্রস্রাব ফুটিয়ে রেখে দিয়েছিলেন এবং ওই প্রস্রাবের মধ্যে কিছু অ্যানথ্রাক্স জীবাণুও ছেড়ে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওই বোতলের মধ্যে কিছু নতুন জীবাণুর আবির্ভাব ঘটেছে; আর অ্যানথ্রাক্স জীবাণুগুলো নতুন জীবাণুগুলোর কাছে পরাভূত হয়েছে। নতুন জীবাণুগুলোর সহায়তায় তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগ দূরীকরণের এক পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে তাঁর সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এই সময়ে পাস্তুর শুনতে পান যে, ফরাসী অশ্ব চিকিৎসক লুভরিয়র নাকি অ্যানথ্রাক্স রোগের এক চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন। পাস্তুর তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ওই চিকিৎসা দেখতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান যে, লুভরিয়রের চিকিৎসা এক অমানুষিক ব্যাপার। অ্যানথ্রাক্স রোগগ্রস্ত গরুগুলোর গা কেটে তাদের

শরীরে তাপিন ঢুকিয়ে দেওয়া এই চিকিৎসার একটি অন্যতম অঙ্গ। পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে পাস্তুর চারটে গরু বেছে নেন ও তাদের শরীরে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেন। এই চারটে গরুর মধ্যে দুটোর চিকিৎসা লুভরিয়রের ব্যবস্থানুযায়ী করা হয়; আর বাকী দুটোর কোনও-রকম চিকিৎসাই করা হয় না। এই চিকিৎসার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় না। চিকিৎসিত দুটো গরুর মধ্যে একটা মারা গেল এবং অচিকিৎসিত গরুরও একটা মারা গেল।

যে দুটো গরু বেঁচে রইলো তাদের শরীরে পাস্তুর আরও খানিকটা মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ধৈর্য ধরে রইলেন, কি ঘটে তাই দেখবার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয়, গরু দুটোর কিছুই হলো না, তারা সুস্থ শরীরে বেঁচে রইলো।

এই ঘটনা থেকে পাস্তুর এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি ভাবলেন যে, অ্যানথ্রাক্স রোগমুক্ত কোনও প্রাণী ওই রোগে পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে না। তাঁর আরও মনে হলো, যদি কোনও রকমে কোনও প্রাণীকে সামান্যভাবে অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত করেও সুস্থ রাখা যায় তাহলে ওই প্রাণী অ্যানথ্রাক্স রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে।

ক্ষতিকর নয় এই পরিমাণ রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণীদের কি করে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, পাস্তুর তাই ভাবতে লাগলেন। এ সম্পর্কে তিনি নানাভাবে পরীক্ষাও চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর, কুক্কুট শাবকে কলেরা উৎপাদনকারী একপ্রকার জীবাণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন। যে পাত্রে ওই জীবাণুগুলো রাখা হয়েছিল সেই পাত্র থেকে কিছু জীবাণু তুলে নিয়ে অন্য পাত্রে পৃথকভাবে রাখা হচ্ছিল। এইভাবে পাত্রের পর পাত্র জীবাণুতে ভরে উঠছিল। পাস্তুর একদিন কয়েক সপ্তাহ ধরে রাখা কতকগুলো জীবাণু একটা কুক্কুট শাবকের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্যে রক্ষককে বললেন। রক্ষ পাস্তুরের নির্দেশমত কাজ করলেন। পরদিন তাঁরা লক্ষ্য করলেন, কুক্কুট শাবক-গুলোর মধ্যে প্রথমে ওই রোগে আক্রান্ত হবার সব চিহ্নগুলো দেখা গেলেও পরদিন কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখা গেল। এই ঘটনার কারণ কি—পাস্তুর প্রথমে সেটা ভেবে পেলেন না। কিন্তু অপর একদিন পরীক্ষা করবার সময় উক্ত ঘটনার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকটা কুক্কুট শাবকের প্রয়োজন হয়; কিন্তু গবেষণাগারে মাত্র দুটো কুক্কুট শাবক ছাড়া আর সমস্ত কুক্কুট শাবকের শরীরে পূর্বোক্ত কলেরার জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাস্তুর তখন ওই দুটো কুক্কুট শাবকের শরীরে ও অন্য যে সমস্ত শাবকের শরীরে পূর্বে একবার রোগ-জীবাণু ঢোকানো হয়েছিল তাদের কয়েকটার শরীরেও রোগজীবাণু ঢুকিয়ে দেন। পরদিন তিনি দেখতে পান যে, নতুন যে দুটো শাবকের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে দুটো মরে গেছে; কিন্তু যেগুলো এর পূর্বেও একবার রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বেঁচে গিয়েছিল সেগুলো এবারও বেঁচে গিয়েছে।

পাস্তুর বহু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির রাস্তা খুঁজে পেলেন। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে তিনি রোগ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন, এই আশা তাঁর প্রবল হয়ে উঠলো। কুক্কুট শাবকের ঘটনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, যে সমস্ত শাবকের শরীরে প্রথমে জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা ওই রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সেই জীবাণুগুলোর বয়স ছিল কয়েক সপ্তাহ। তারপর তাদের ও অন্য দুটো শাবকের শরীরে আবার যখন রোগ-জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তখন এই জীবাণুগুলো ছিল পূর্বের জীবাণুগুলোর তুলনায় অল্পবয়স্ক। পাস্তুর বুঝতে পারলেন যে, জীবাণুগুলো একটু বয়স্ক হলেই তাদের শক্তি মন্দীভূত হয়ে আসে এবং ওই বয়স্ক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোনও প্রাণী,

প্রথমে স্বল্প রোগ ভোগ করলেও ভবিষ্যতে ওই রোগের আক্রমণের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে পাস্তুরের বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে। বার্ধক্য ও শারীরিক অসুবিধার কথা ভুলে গিয়ে তিনি উক্ত ঘটনা ঘটবার পর গবেষণায় নবোদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন। বারংবার পরীক্ষা করে তিনি দেখেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল নয়। তিনি আবিষ্কার করেন যে, রোগজীবাণুগুলোর কয়েক সপ্তাহ বয়স হয়ে গেলেই তাদের শক্তি মন্দীভূত হয়ে আসে এবং তাদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া প্রাণীগুলো অনাক্রময়ণী হয়ে ওঠে। পাস্তুর এই পরীক্ষাগুলো কুক্কুট শাবক ও তাদের কলেরা রোগের জীবাণু নিয়ে করেন। তাঁর এই পরীক্ষায় তাঁকে সকল প্রকার সহায়তা করেন তাঁর সহকারীদ্বয় রুক্স ও চেম্বারল্যাণ্ড।

পাস্তুর প্রাণীদের রোগ জীবাণুর হাত থেকে অনাক্রমণীয় করে তোলা সম্বন্ধে আরও কতকগুলো পরীক্ষা চালান। ২।১টি পরীক্ষায় বিফলমনোরথ হওয়া সত্ত্বেও তিনি দমে যাননি। তিনি তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং একসময়ে ঘোষণা করেন যে—ভেড়া, গরু, ঘোড়া এদের মৃত্যু না ঘটে এইভাবে যদি অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত করা যায় তাহলে তারা পরে ওই রোগের আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। পাস্তুরের এই ঘোষণার পর তাঁকে আহ্বান জানানো হয়—পরীক্ষা দ্বারা তাঁর উক্তি প্রমাণ করতে। পাস্তুর সম্মত হন ও তাঁর সহকর্মিগণ সহ মেলানে যান।

পাস্তুর প্রথমে কতকগুলো প্রাণীর (গরু, ছাগল ইত্যাদি) শরীরে তাঁর গবেষণাগারে প্রস্তুত টিকা (পূর্বোক্ত হীনবল জীবাণু) দিয়ে দেন। বারো দিন পরে ওই সব প্রাণীর শরীরে পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জীবাণুর টিকা দিয়ে দেন। যে সমস্ত প্রাণীকে টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স রোগের কোনও রকম চিহ্ন দেখা দিয়েছে কিনা—সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, তাদের শরীরে কোনও রোগের চিহ্নই নেই। তারা বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

১৮৮১ সালের ৩১শে মে পাস্তুরের বৈজ্ঞানিক-জীবনের ঘটনাবলীর এক স্মরণীয় অধ্যায়। ওইদিন পূর্বোক্ত যে সমস্ত প্রাণীর শরীরে টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের দেহে এবং যে সমস্ত প্রাণীর টিকা দেওয়া হয়নি তাদের দেহেও মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অধীর আগ্রহে পাস্তুর লক্ষ্য করতে থাকেন তাঁর এই পরীক্ষার ফলাফল। বিজ্ঞানের যে রূপ তিনি পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছেন সেটা নিভর করছে এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর। ১৮৮১ সালের ২রা জুন ঘোষিত হলো পাস্তুরের পরীক্ষার ফলাফল। পরীক্ষায় দেখা গেল, যে সমস্ত প্রাণীকে টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের শরীরে সাংঘাতিক ধরনের অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দেবার পরও তারা অক্ষত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর যেগুলোকে টিকা দেওয়া হয়নি সেগুলো সবই উক্ত সাংঘাতিক ধরনের অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

পাস্তুরের এই পরীক্ষায় সফলতা লাভ করবার পর তাঁকে চারদিক থেকে সম্মানিত করা হয় এবং তিনি স্বনামধন্য হয়ে ওঠেন। এদিকে তাঁর কাছে অসংখ্য আবেদন আসতে থাকে, অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা পাঠাবার জন্যে। প্রচুর পরিমাণে টিকা প্রস্তুত হতে লাগলো এবং এজন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন পাস্তুরের সহকর্মীগণ—রুক্স, চেম্বারল্যাণ্ড ও থুইলিয়ার। টিকা প্রস্তুত করা ছাড়াও টিকা দেবার জন্যে রুক্স, চেম্বারল্যাণ্ড ও থুইলিয়ার সমস্ত ফ্রান্স এমন কি হাঙ্গেরী পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন।

পাস্তুরের এই সফলতা অর্জনের একবছর পার হতে না হতেই তাঁর কাছে অস্বস্তিকর সব সংবাদ এসে পৌঁছতে লাগলো। কতকগুলো জায়গায় অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা দেবার পর ভেড়ার মধ্যে অ্যানথ্রাক্স রোগ দেখা দেয়। এই রোগের জন্যে

তাঁর দেওয়া টিকাকে দায়ী করে পাস্তুরের কাছে অভিযোগপূর্ণ বহু চিঠি আসতে থাকে।

১৮৮২ সালে জেনেভায় পাস্তুরের এক বক্তৃতার উত্তরে জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ কক্‌ পাস্তুরের কাছে কতকগুলো অভিযোগ উপস্থিত করেন। সেই অভিযোগপত্রে ডাঃ কক্‌ পাস্তুরের অ্যানথ্রাক্স টিকা পরীক্ষা করে যেসব দোষ পেয়েছেন সেইগুলো জানান এবং তিনি আরও বলেন যে, টিকাগুলো ব্যবহার করবার পূর্বে টিকার মধ্যে অন্য জীবাণুর অস্তিত্ব আছে কিনা—সেটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। পাস্তুর জানতেন, ককের অভিযোগ মিথ্যা নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি এর যা উত্তর দেন সেটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। পাস্তুর বলেন, বহুদিন থেকেই তিনি জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। কাজেই সেক্ষেত্রে সদ্য আবির্ভূত ডাঃ ককের বিবৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে না।

ঘটনাটির পরিসমাপ্তি এইখানে ঘটলেই বোধ হয় ভাল হতো। ফরাসী জাতি জার্মান ককের কাছে পাস্তুরকে অপ্রস্তুত হতে দেখতে রাজী হলো না। পাস্তুর যেন কোনও ভুলই করেননি—বোধ হয় এ ভাবটিই বিশেষ করে দেখাবার জন্যে একজন ফরাসীর পক্ষে সম্মানজনক পদ, Academia Francaise-এ পাস্তুরকে নির্বাচিত করা হলো। জাতিগত বিদ্বেষে বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবহেলা করবার এই ঘটনা সত্যিই বিস্ময়কর!

যাই হোক, এর পর পাস্তুর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলেন—জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টায়। পাগলা কুকুরের মুখ থেকে লালা সংগ্রহ করে তার মধ্যে তিনি জলাতংক-রোগ-জীবাণুর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এই সময় জলাতংক রোগগ্রস্ত একটি শিশুর থুথুতে তিনি এক ধরনের জীবাণু দেখতে পান এবং সেই জীবাণুই জলাতংক রোগের জন্যে দায়ী, এই কথা তিনি মনে করেন। রক্স ও চেম্বারল্যাণ্ড সুস্থ লোকের থুথুতেও ওই জীবাণু খুঁজে পান। কাজেই ওই জীবাণু যে জলাতংক রোগের জন্যে দায়ী নয়—সেকথা প্রমাণিত হয়।

১৮৮২ সালের শেষের দিকে পাস্তুর মনস্থ করেন যে, গবেষণাগারের প্রাণীদের মধ্যে জলাতংক রোগ জন্মাতে হবে। কারণ সব সময়, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাগলা কুকুর ও জলাতংক রোগী পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তারপর একদিন একটা পাগলা কুকুর ধরে নিয়ে এসে পাস্তুরের গবেষণাগারে একটা খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। খাঁচার মধ্যে আরও চারটে সুস্থ কুকুর ছিল। রক্স এবং চেম্বারল্যাণ্ড পাগলা কুকুরটার মুখ থেকে খুব সাবধানে খানিকটা লালা সংগ্রহ করে গিনিপিগ ও খরগোশের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেন। কিছুদিন বাদে দেখা যায়, পাগলা কুকুরের কামড়ে সুস্থ চারটে কুকুরের মধ্যে দুটোর কিছুই হয়নি, আর দুটোর জলাতংক রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যেসব গিনিপিগ ও খরগোশের শরীরে পাগলা কুকুরের লালা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে কিছু রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল ও কিছু কোনও প্রকার অসুস্থতার লক্ষণ না দেখিয়েই সুস্থ অবস্থায় বেঁচে রইলো।

শরীরে রোগের বিষ প্রবেশ করা সত্ত্বেও ওই সমস্ত প্রাণী কি করে সুস্থ অবস্থায় টিকে রইলো—সে সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে পাস্তুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জলাতংক রোগের জীবাণু কোনও প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করবার পর সেটা গিয়ে জমা হয় মস্তিষ্কে ও সুষুম্নাকাণ্ডে। স্নায়ুতন্ত্রই যে এই রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেটা রোগের লক্ষণ থেকেই বুঝা যায়। পাস্তুর, জীবাণুগুলোকে কোনও প্রাণীর মস্তিষ্কের মধ্যে জন্মানোর পরিকল্পনা করলেন। কারণ, ইনজেকসন দ্বারা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেবার পর সেগুলো মস্তিষ্কে না-ও পৌঁছুতে পারে। এই পরিকল্পনার কথা শুনে রক্স কুকুরের করোটিতে ছিদ্র করে মস্তিষ্কে জীবাণু প্রবেশ করিয়ে

দেবার প্রস্তাব করেন। এটা একটা নিষ্ঠুর কাজ হবে বলে পাস্তুর এই কাজ করবার অনুমতি দিতে অসম্মত হন।

রক্স পাস্তুরের নিষেধাজ্ঞা শুনলেন না। পাস্তুরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে একদিন তিনি একটা কুকুরের করোটি ছিদ্র করে কুকুরটার মস্তিষ্কে জলাতংক রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেন। পরদিন এই ঘটনা পাস্তুরের গোচরে আনা হয়; পাস্তুর অবাক হয়ে যান। তাঁর জানা ছিল না যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ সুনিপুণভাবে অস্ত্রপ্রয়োগের বিধি প্রচলিত আছে। তাঁর ধারণা ছিল, রক্স যা করেছেন তাতে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে এবং কুকুরটা বিকলাংগ হয়ে যাবে। যখন প্রকৃতপক্ষে তা হলো না তখন তিনি সানন্দে রক্সের কাজে অনুমতি দিতে সম্মত হলেন।

যে কুকুরটার মস্তিষ্কে জলাতংক-জীবাণু ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা দু-সপ্তাহের মধ্যে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে পাগল হয়ে যায়। পাস্তুর ও তাঁর সহকর্মীরা প্রাণীদেহে জলাতংক রোগজীবাণুর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল খুঁজে বের করতে পারলেও জীবাণুটি অদৃশ্যই থেকে যায়। জীবাণু অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর ও তাঁর সহকর্মীরা হীনবল জলাতংক রোগজীবাণু আবিষ্কারের চেষ্টা করতে থাকেন। পাস্তুরের সহকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়েও সফল না হতে পেরে; কিন্তু পাস্তুর তাঁদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে দেননি।

হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে পাস্তুরের গবেষণাগারে এক ঘটনা ঘটে এবং এই ঘটনা থেকেই শেষ পর্যন্ত জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হয়। একদিন এক ক্ষিপ্ত খরগোশের মস্তিষ্ক থেকে খানিকটা পদার্থ নিয়ে একটা কুকুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। কুকুরটি প্রথমদিকে খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়লেও পরে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থেকে যায়। এরপর ঐ কুকুরটির মস্তিষ্কে পূর্ববর্ণিত উপায়ে মারাত্মক জলাতংক জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয় কুকুরটি জলাতংক রোগে আক্রান্ত না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থই থেকে যায়।

পাস্তুর এই ঘটনাটি অবহেলা করলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, একবার কোনও প্রাণী জলাতংক রোগের হাত থেকে নিস্তার পেলে সে ওই রোগের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়ে। একবার হীনবল জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে, পরে মারাত্মক জীবাণুর আক্রমণে আর কিছু হয় না। পাস্তুর উপায় খুঁজতে লাগলেন, কি করে জীবাণুগুলোকে হীনবল করে তোলা যায়।

পাস্তুর শেষ পর্যন্ত জলাতংক রোগজীবাণুকে হীনবল অবস্থায় সংগ্রহ করবার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। জলাতংক রোগে মৃত একটা খরগোশের সুষুম্নাকাণ্ড থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে সেই অংশটুকু একটা বোতলের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় ১৪ দিন রেখে দেন। তারপর ওই শুকনো নার্ভকলার খানিকটা অংশ একটা সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, কুকুরটা সুস্থই রয়ে গেছে, জলাতংক রোগগ্রস্ত হয়নি। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নার্ভকলাগুলো শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে কলামধ্যস্থিত জীবাণুগুলো হীনবল হয়ে পড়ে।

এর পর পাস্তুর ভাবলেন যে, জলাতংক রোগে মৃত কোনও খরগোশের সুষুম্নাকাণ্ডের কতকগুলো অংশ যদি চোদ্দদিন, তেরদিন, বারদিন এইভাবে দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে নেওয়া যায় ও তারপর ওই অংশগুলো যদি কোনও প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওই প্রাণী জলাতংক রোগের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়বে। পাস্তুর তাঁর চিন্তানুযায়ী কাজ করলেন। ১৪ দিন থেকে ১ দিন পর্যন্ত শুকিয়ে নেওয়া পূর্বোক্ত নার্ভকলা, পাস্তুরের নির্দেশক্রমে কতকগুলো কুকুরের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। সব চাইতে শেষে যেটুকু দেওয়া হয় সেটুকু, অর্থাৎ মাত্র একদিন শুকানো নার্ভকলা, সাধারণ অবস্থায় কোনও প্রাণীর শরীরে প্রবেশ

করলে সেই প্রাণী নির্ঘাৎ জলাতংক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তো।

কিছুদিন পর পাস্তুর পূর্বোক্ত টিকা দেওয়া কুকুরগুলোর মস্তিষ্কে মারাত্মক ধরনের জলাতংক জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেন। টিকা না দেওয়া আরও দুটো কুকুরের মস্তিষ্কে একই সময়ে ওই মারাত্মক জীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, টিকা দেওয়া কুকুরগুলো সুস্থ অবস্থায় রয়েছে, আর টিকা না দেওয়া কুকুর দুটো জলাতংক রোগগ্রস্ত হয়েছে।

এবার পাস্তুর বুঝতে পারেন যে, তাঁর তিন বছরব্যাপী কঠোর শ্রম সফল হয়েছে। তিনি ভাবতে থাকেন, কি করে তাঁর এই অভিনব আবিষ্কারকে কাজে লাগানো যেতে পারে। পাগলা কুকুরের কামড় থেকেই সাধারণতঃ মানুষের জলাতংক রোগ হয়। পাস্তুর ভাবেন, যদি কুকুরগুলোকে টিকা দিয়ে অনাক্রমণীয় করে তোলা যায়, তাহলে রোগ ছড়াবে কার মাধ্যমে? সমস্ত ফ্রান্সের কুকুরগুলোকে টিকা দেওয়াও যে এক অবাস্তব ব্যাপার। এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে পাস্তুরের মনে একটা কথা জেগে ওঠে। পাগলা কুকুরে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কোন ব্যক্তি বা প্রাণী জলাতংক রোগাক্রান্ত হয় না। পাস্তুরের মনে প্রশ্ন জাগে, জলাতংক রোগগ্রস্ত হবার আগেই এবং পাগলা কুকুরে কামড়াবার পরেই যদি টিকা দেওয়া যায়, তাহলে কুকুরে কামড়ানো লোক কি জলাতংক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবে না?

পাস্তুর প্রথমে কুকুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেন। একটা খাঁচার মধ্যে কতকগুলো সুস্থ কুকুর ও পাগলা কুকুর রেখে দেন। পাগলা কুকুরগুলো সুস্থ কুকুরগুলোকে কামড়াবার পর পাস্তুর, কামড়ানো কুকুরগুলোর শরীরে তাঁর আবিষ্কৃত টিকা ক্রমান্বয়ে ১৪ দিন ধরে প্রয়োগ করেন। কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর দেখা যায়, টিকা দেওয়ার ফলে পাগলা কুকুরে কামড়ানো কুকুরগুলোর কিছুই হয়নি। পাস্তুরের এই পরীক্ষা ফ্রান্সের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের দ্বারা গঠিত এক কমিশন বিচার করে দেখেন এবং তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, পাস্তুরের প্রদর্শিত নিয়মানুসারে কোনও কুকুরকে টিকা দিলে সেই কুকুর জলাতংক রোগের পক্ষে অনাক্রমণীয় হয়ে পড়বে।

এরপর এলো মানুষের উপর এই টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার পালা। পাস্তুর একবার ভাবলেন, তাঁর নিজের শরীরের উপর এই পরীক্ষা চালাবেন। এই সময় এক ভদ্রমহিলা তাঁর নয় বৎসর বয়স্ক ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট পুত্রকে চিকিৎসার জন্যে পাস্তুরের কাছে নিয়ে আসেন। ছেলেটিকে পাগলা কুকুরে সাংঘাতিকভাবে কামড়েছিল। পাস্তুর প্রথমে ইতস্ততঃ করছিলেন—তাঁর পরীক্ষা এই ছেলেটির উপর করবেন কিনা। কিন্তু ছেলেটির কিছু না করলেও তার মৃত্যু অনিবার্য। অবশেষে পাস্তুর তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধ (পূর্বোক্ত টিকা) প্রয়োগ করেন এই ছেলেটির উপর। চোদ্দদিন ধরে ছেলেটিকে ইনজেকসন দেওয়া হয়। চিকিৎসা হবার কিছুদিন পর ছেলেটি সুস্থ অবস্থায় বাড়ী ফিরে যায়।

এই ঘটনার পর নবাবিষ্কৃত ওষুধ সম্বন্ধে পাস্তুরের মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকুও কেটে যায়। পাস্তুর এবার সুনিশ্চিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, জলাতংক রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে।

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পাস্তুরের কাছে আবেদন আসতে থাকে, জলাতংক রোগীদের সাহায্যে করবার জন্যে। পাস্তুর সাধ্যমত তাঁদের সাহায্য করেন। এই সময় রাশিয়া থেকে ১৯ জন কৃষক ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট হয়ে প্যারিসে পাস্তুরের কাছে চিকিৎসার জন্যে আসেন। এঁরা প্যারিসে পৌছাবার ১৯ দিন পূর্বে ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট হন; আর এদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এঁরা পৌছবার পরেই পাস্তুর

এঁদের ইন্‌জেকসন দেবার ব্যবস্থা করেন। ইন্‌জেক্‌সনের ফলে তিনজন ছাড়া আর সবাই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

পাস্তরের জয়জয়কার পড়ে যায়। পাস্তর রাশিয়ার জার কর্তৃক সম্মানিত ও পুরস্কৃত হন। বিশ্বের চারদিক থেকে সম্মানিত ও বিজ্ঞান জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মহান কর্মযোগী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এই হলো পাস্তরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। জীবাণুদের স্বতঃসম্ভবতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মোহভঙ্গ থেকে জলাতংক রোগের ওষুধ আবিষ্কারের কাহিনী আমরা তার জীবনীতে পাই। পাস্তর হতে চেয়েছিলেন রসায়নবিদ, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে হতে হয়েছিল—জীবাণু অনুসন্ধানকারী। পথের পরিবর্তন হলেও, লক্ষ্যে ঠিকই পৌঁচেছিলেন—বিজ্ঞানের সহায়তায় মানব সমাজের কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন।

দ্রষ্টব্য—পাস্তর অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও জলাতংক জীবাণু দেখতে পাননি। প্রবন্ধে যেসব জায়গায় 'জলাতংক জীবাণু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেসব জায়গায় কোনও পদার্থে বর্তমান উক্ত জীবাণুর কথা বলা হয়েছে।

মাদাম কুরী

শ্রীহৃষীকেশ রায়

বৃটিশ-শাসিত ভারতে সুযোগের অভাবে এবং প্রতিকূল অবস্থায় যেমন বহু প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হয় নাই, জার শাসিত রাশিয়ার অধীন পোলাণ্ডেরও এক সময়ে অনুরূপ অবস্থা ছিল। পোলাণ্ডের সে এক ঘোর দুর্দিন। শাসকবর্গ সর্বতোভাবে পোলাণ্ডের জাতীয়তাবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রাশিয়ার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতে সচেষ্ট হয়। দেশের যখন এমনই অবস্থা, সে সময় ওয়ার-স নগরীতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর মাদাম কুরী জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের মধ্যে ইনিই কনিষ্ঠা। ভ্রাতার নাম জোসেফ, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ব্রুনা এবং মধ্যম ভগিনীর নাম হেলা। মাদাম কুরীর কুমারী নাম ছিল মার্যা স্ক্লোডোভস্কা, আদর করিয়া মাতা ডাকিতেন মার্যা, মান্না, মানুষা।

আর্থিক সম্পদ না থাকিলেও মাদাম কুরীর মাতাপিতা উভয়েই শিক্ষিত অভিজাত বংশের সন্তান। মাতা ছিলেন ওয়ার-স নগরীর এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। তাঁহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য, কার্যকুশলতা, জ্ঞানার্জন-স্পৃহা প্রভৃতি নানা দুর্লভ গুণের অধিকারিণী হইলেন মেরী—আমাদের মান্না। পিতা অধ্যাপক ভ্লাডিস্লাভ স্ক্লোডোভস্কি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বিবাহিত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মেরীর জন্মের পর তাঁহার মাতার ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তিনিও দীর্ঘদিন ক্ষয়রোগে ভুগিয়া কন্যার অনুসরণ করেন।

শৈশবেই মেরীর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কাহারও বিনা সাহায্যেই তিনি রুশীয় বর্ণমালা শিক্ষা করিতে সমর্থ হন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলে পিতার বসিবার ঘরে ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সহিত তাঁহারও পড়িবার ব্যবস্থা হইল। সেই সুসজ্জিত ঘরের মূল্যবান আসবাবপত্র ও মনোরম ছবিগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই; তিনি আলমারীতে সজ্জিত পিতার পদার্থবিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রপাতি দেখিতে ভালবাসিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার শিশুমনে "পদার্থ-বিদ্যা" আধিপত্য বিস্তার করে। বিদ্যালয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য

ছাত্রীদের অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট হইলেও ইতিহাস, অঙ্ক, জার্মান ও ফরাসী ভাষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কোন শিক্ষণীয় বিষয়ই তাঁহার নিকট দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হইত না।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মেরীর স্বদেশানুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মেরীর সহপাঠীগণের মধ্যে জার্মান, ফরাসী, রুশীয়, পোল প্রভৃতি নানা জাতির বালিকা ছিল; কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল বেশী স্বদেশীয় বালিকাগণের সহিত। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে তাঁহাকে সহপাঠী বালিকাগণের সহিত নৃত্য করিতে দেখা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন ক্রাকোভস্কি বুলভার্দের বিদ্যালয় ত্যাগের সময় বিদ্যার্জনে তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তিনি একটি সুবর্ণ-পদক ও কয়েকটি রুশীয় পুস্তক পুরস্কার লাভ করেন। এই পুস্তকগুলি পাইয়া সভাস্থলেই তিনি সেগুলিকে "ভয়ঙ্কর" বলিতে ভীত হন নাই। বিজেতার প্রতি তাঁহার ছিল এই রকমের মনোভাব। পরবর্তী জীবনে ফরাসী স্বামীর সাহচর্যে বাস করিয়া এবং ফ্রান্সের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও তিনি জন্মভূমি পোলাণ্ডকে ভুলিতে পারেন নাই। রেডিয়াম আবিষ্কারের পর তিনি অপর একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন এবং স্বদেশের নামানুসারে তাহার নাম দেন "পোলোনিয়াম"।

বিদ্যালয় ত্যাগের পর মেরী এক বৎসর নানা-স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী সাহিত্য পাঠ করেন; অবসর বিনোদনের জন্য গানের চর্চা করেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে অশ্বারোহণেও পটুত্ব লাভ করেন। বিদ্যালয় ও গৃহে অধ্যয়ন করিয়া তিনি জার্মান, রুষ, পোল, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা সুন্দরভাবে শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা স্ক্লোডোভস্কির আর্থিক অবস্থার এতই অবনতি হইয়াছিল যে, তিনি আর কন্যাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সক্ষম হইলেন না। ব্রনা ও মেরী অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির করিলেন যে, ব্রনা প্যারীতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইবেন এবং মেরী চাকুরী গ্রহণ করিয়া নিজের ও ব্রনার খরচ চালাইবেন। উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুসারে মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মেরী গৃহ-শিক্ষকের কার্য গ্রহণে বাধ্য হইলেন। প্রথমে ওয়ার-স নগরীতে বার্ষিক চারি শত রুবল (রুশীয় রৌপ্য মুদ্রা, মূল্যমান প্রায় ২ শিলিং ১½ পেন্স) বেতনে এক উকীলের গৃহে গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গ মনঃপূত না হওয়ায় তিনি সেই কায পরিত্যাগ করিয়া বাৎসরিক পাঁচ শত রুবল বেতনে ওয়ার-স-এর উত্তরে পল্লীবাসী এক সঙ্গতিপন্ন কৃষকের গৃহে গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি)। এই গৃহের প্রত্যেকেই তাঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। মেরীর বয়স তখন মাত্র আঠার বৎসর। দুইটি ছাত্রীর জন্য তাঁহাকে দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। অবসর সময়ে তিনি সেখানকার কৃষক, শ্রমিক ও ভৃত্য শ্রেণীর কয়েকটি বালক-বালিকাকে গোপনে পোল-ভাষা শিক্ষা দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরূপ কার্যের জন্য সে-সময়ে সাইবেরিয়ার বরফ আচ্ছাদিত প্রদেশে নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত।

এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। মেরী আশা করিয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবেন; কিন্তু হায়! তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল। এই হতাশার মধ্যেও তিনি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাজ-বিজ্ঞান, অঙ্ক-শাস্ত্র, রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যার চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার পিতা উচ্চ বেতনে একটি চাকুরী পান। পরবর্তী বৎসরে মেরী তাঁহার গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর কার্য পরিত্যাগ করিয়া আসেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ব্রনা প্যারীর এক ডাক্তারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ইহাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেরীর

প্যারী যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইল। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতার নিকট বিদায় লইয়া তিনি ওয়ার-স হইতে প্যারী যাত্রা করেন।

প্যারী তখন সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর মেরী সর্বোনের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ করেন। তাঁহার চির-অভীপ্সিত বিদ্যার্জন স্পৃহা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। প্রথমে তিনি ব্রনার নিকটেই থাকিতেন; ব্রনা ও তাঁহার স্বামী, ডাক্তার কাসিমীর ড্লুস্কি তাঁহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন। কিন্তু এখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করিতে তাঁহার অনেক সময় নষ্ট হইত। অগত্যা মেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এক দরিদ্র-অঞ্চলে তাঁহার বাসস্থল পরিবর্তন করিলেন—মেরীর সুকঠোর সাধনার সূত্রপাত হইল। অতি সাধারণ বাসগৃহে সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর তিনি বিজ্ঞানের আরাধনা করেন। স্বোপার্জিত ও পিতার প্রেরিত সামান্য অর্থে মাসিক মাত্র চল্লিশ রুবল খরচে তিনি অতি কষ্টে তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করিতেন; এমন কি, অনেকদিন তাঁহাকে অনাহারেও থাকিতে হইত। অর্থাভাবে অগ্নি প্রজ্জালিত করিয়া শীত নিবারণ করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এই কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও তিনি সংকল্পে অটল রহিলেন। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিদ্যায় (প্রথম স্থান) এবং পরবর্তী বৎসরে গণিতশাস্ত্রে এম, এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক কোভালস্কি সস্ত্রীক তাঁহার স্বদেশ পোলাণ্ড হইতে প্যারীতে বৈজ্ঞানিক অভিযানে আসেন। তিনি মেরীর গবেষণার সুবিধার জন্য পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পিয়েরী কুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। অধ্যাপক কুরীর সৌম্যমূর্তি এবং সদয় ব্যবহার মেরীকে মুগ্ধ করিল। উভয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় গভীরভাবে মগ্ন; অজ্ঞাতসারে অধ্যাপক কুরীও মেরীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। বিজ্ঞানীযুগলের এই আকস্মিক মিলন যেন কোন অদৃশ্য মঙ্গল-হস্তের পূর্ব-পরিকল্পিত ইঙ্গিত। মেরীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, গণিতশাস্ত্রে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া পোলাণ্ডের কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন; কিন্তু অধ্যাপক কুরীর সহিত পরিচয় হওয়ায় সে সঙ্কল্প তাঁহার কাযে পরিণত হইল না। পোলাণ্ড তাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইলেও সমগ্র জগৎ আজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই মেরী স্ক্লোডোভস্কা পিয়েরী কুরীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বিবাহের পর কয়েক সপ্তাহ নানাস্থানে মধুযামিনী যাপন করিয়া কুরী-দম্পতি স্থায়ীভাবে প্যারীতে বসবাসের ব্যবস্থা করিলেন। মেরী কুশলী গৃহিণীর ন্যায় গৃহকর্ম ও রন্ধনকায স্বহস্তে করিতেন। কার্যান্তে অধ্যাপক কুরীর সহিত বীক্ষণাগারে যাইয়া দৈনিক আট ঘণ্টা গবেষণা কার্যে রত থাকিতেন এবং সন্ধ্যায় উভয়ে পাঠে মগ্ন হইতেন। উদ্দেশ্য—ফেলোশিপ গ্রহণ করিয়া শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হইবেন। এক বৎসরের মধ্যেই মেরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ফেলোশিপ লাভ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর মেরীর প্রথমা কন্যা ভাবী "নোবেল লরিয়েট" আইরিন জোলিয়ো কুরীর জন্ম হয়।

সন্তানের জননী হইবার পর মেরী পুনবায় তাঁহার গবেষণাকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করা। এই সময়ে ফ্রান্সের বিশিষ্ট পদার্থবিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার বেকারেলের পুত্র, তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান হেনরী বেকারেল (১৮৫২-১৯০৮) আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম নামক ধাতু হইতে একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত আলোক-রশ্মি বিকিরিত হয় এবং এক্স-রে'র ন্যায় কালো কাগজে আবৃত

ফটোগ্রাফ প্লেটের উপর ক্রিয়া করে। ইহাই বেকারেল-রশ্মি। বেকারেলের আবিষ্কার কুরী দম্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এ-বিষয়ে তখন সমগ্র ইউরোপে আর কেহ কোনরূপ প্রচেষ্টায় অগ্রসর হন নাই।

কুরী-দম্পতির চিন্তার বিষয় হইল, ইউরেনিয়ামের এই রশ্মি আসে কোথা হইতে। পিয়েরী আবিষ্কৃত যন্ত্র সাহায্যে অতি সামান্যভাবে সজ্জিত গবেষণাগারে মাদাম কুরী তাঁহার পরীক্ষাকার্যে ব্রতী হইলেন। সত্য আবিষ্কারের জন্য অসীম ধৈর্যের সহিত মেরী দিনের পর দিন পরীক্ষাকার্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইউরেনিয়াম হইতে বিশেষ ফললাভ হইল না। তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, ইউরেনিয়াম ব্যতীত অন্য পদার্থ হইতেও এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিঃ বিকিরিত হইতে পারে। বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, থোরিয়াম নামক ধাতু হইতেও ইউরেনিয়ামের মত স্বতঃস্ফূর্ত আলোকরশ্মি বিকিরিত হয়। মেরী ইহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া বিবিধ খনিজ পদার্থের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিয়েরীও তাঁহার নিজস্ব গবেষণাগার ত্যাগ করিয়া মেরীর সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর উদ্বেলিত আনন্দে মুগ্ধ মেরী দেখিলেন, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম হইতে বিকিরিত রশ্মি অপেক্ষা কুড়ি লক্ষ গুণ শক্তিশালী এক রশ্মি পিচব্লেণ্ড নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতে নির্গত হইতেছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, পিচব্লেণ্ডের মধ্যেই সেই শক্তিশালী আলোক-রশ্মি বিকিরণকারী পদার্থটি বিদ্যমান রহিয়াছে; তাঁহারা ইহার নাম দিলেন—রেডিয়াম।

অমূল্য ধাতু রেডিয়ামের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা সংগ্রহ করিতে কুরী-দম্পতিকে চারি বৎসর কঠোর সাধনা করিতে হয়। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, পিচব্লেণ্ড হইতে ইউরেনিয়াম বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই পরিত্যক্ত অংশ হইতেই রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম পাওয়া যাইবে। ভিয়েনার সায়েন্স একাডেমীর চেষ্টায় বোহেমিয়ার কোন খনির কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে তাঁহাদিগকে এক টন (প্রায় ২৭৪/৫ মণ) ব্যবহৃত পিচব্লেণ্ডের পরিত্যক্ত অংশ প্রেরণ করিলেন। যে বিদ্যালয়ে পিঁয়েরী অধ্যাপনা করিতেন তাহারই কাষ্ঠনির্মিত অব্যবহার্য একটি পরিত্যক্ত গৃহে অতি কষ্টে তাঁহারা পরীক্ষাকার্য আরম্ভ করেন। উভয়ে সমবেতভাবে চারি বৎসর (১৮৯৮-১৯০২) চেষ্টা করিয়া এক টন পিচব্লেণ্ড হইতে মাত্র তিন গ্রেণ রেডিয়াম নিষ্কাশন করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহাদের সাহচর্যে আসিয়া ফরাসী যুবক বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডি ডেবিয়ার্ণ "অ্যাকটিনিয়াম" নামক একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন।

রেডিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ায় বিজ্ঞান-জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হইল। রাদারফোর্ড, রামজে, টমসন, সডি প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আণবিক-শক্তি সম্বন্ধে নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। অদ্ভুত এই নব জাতকের প্রকৃতি; সর্বত্র ইহার রশ্মির অবাধ গতি, কেবলমাত্র পুরু সীসক আধারে ইহাকে রক্ষিত করা যায়। রেডিয়াম হইতে আলোক-প্রভার ন্যায় তাপও স্বতঃস্ফূর্ত। পদার্থের অণু সম্বন্ধে ধারণা ছিল যে, তাহারা অবিনশ্বর; কিন্তু রেডিয়াম হইতে হিলিয়াম নামক বায়বীয় পদার্থের অণু অবিরাম গতিতে বাহির হইতেছে। সর্বোপরি দেখা গেল, রেডিয়াম দুরারোগ্য কর্কটরোগ নিরাময় করিতে অদ্বিতীয়। কুরীদম্পতি পুনরায় আট টন পিচব্লেণ্ডের অবশিষ্টাংশ হইতে মাত্র এক গ্র্যাম (প্রায় ১৫ গ্রেণ) রেডিয়াম বাহির করিলেন। রেডিয়াম নিষ্কাশনে সাহায্য করিবার জন্য ফ্রান্সের একাডেমী অফ সায়েন্স কুরীদম্পতিকে বিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক প্রদান করেন। অধ্যাপক ও মাদাম কুরীর উদারতা তখনই পরিস্ফুট হয়, যখন দেখি যে, স্বর্ণ অপেক্ষা পঞ্চাশ হাজার গুণ মূল্যবান যে রেডিয়াম, তাহার নিষ্কাশন প্রণালীর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত না করিয়া তাঁহারা তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন। ১৯০৩ সালের নভেম্বর

মাসে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি কুরীদম্পতিকে সর্বোচ সম্মান স্থচক "ডেভী মেডাল" দান করিলেন। ঐ বৎসরেই ১০ই ডিসেম্বর ষ্টকহলমের (সুইডেন) একাডেমী অফ সায়েন্স ঘোষণা করেন যে, নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক অর্থ বেকারেল এবং অবশিষ্ট অর্ধেক কুরীদম্পতি পাইবেন।

রেডিয়াম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্যারি বিশ্ব-বিদ্যালয় মেরীকে তাঁহার অভীপ্সিত "ডক্টরেট" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বার্ষিক ২৪০০ ফ্রাঙ্ক মাহিনায় পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তাঁহাদের দ্বিতীয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ; তার নাম ইভ।

প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া মেরী নূতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টিপাতও হইতেছে, পিয়েরী গৃহের বাহির হইলেন। তাঁহার অনেক কাজ। পিঁয়েরী পথে চলিয়াছেন, মন তাঁহার নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত, অন্যমনস্কভাবে রাস্তা অতিক্রম করিতেছেন, কোনদিকে লক্ষ্য নাই। হঠাৎ চাহিয়া দেখেন, তুইটি বোঝাই অশ্ব-শকটের মধ্যে পড়িয়াছেন। জীবনরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু হায়! সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিমেষে অশ্ব-শকট পিয়েরীর মস্তক চূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। মেরী তাঁহার জীবনের সহচর, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরুকে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় চিরতরে হারাইলেন।

পিয়েরীর মৃত্যুতে মেরী ধৈর্য হারাইলেন না। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক মাহিনায় পিঁয়েরীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া তিনি কাজ করিতে লাগিলেন। নানা কার্যের গুরুভাবের মধ্যেও তিনি তাঁহার কন্যাদ্বয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন ; তাঁহারই ফল "নোবেল লরিয়েট" কন্যা আইরিন। একক জীবন দুর্বহ হইলেও কর্তব্যে তাঁহার আস্থা ছিল অটল। অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগীর অর্থ সাহায্যে তিনি কয়েকটি ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন এবং ডেবিয়ার্ণের সহায়তায় রেডিয়াম সম্বন্ধে গবেষণায় পুনরায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দেশ-বিদেশের নানা উচ্চ সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত হইলেও রেডিয়াম সম্বন্ধে নূতন গবেষণার উৎকর্ষতা বিচার করিয়া সুইডেনের একাডেমী অফ সায়েন্স তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করেন।

মেরী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ার-স নগরীতে রেডিয়াম ভবনের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী বৎসরে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত চেষ্টায় মেরীর রেডিয়াম সম্পর্কীয় গবেষণাকার্যের উন্নতির জন্য প্যারীতে যে রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহার রেডিয়াম বিভাগের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাসমর আরম্ভ হইল। আইরিন ও ইভ তখন বৃটেনে, মেরী একাকী প্যারীতে। জার্মান সৈন্য ফ্রান্স আক্রমণ করিলে তিনি এক্স্-রে বাহিনী গঠন করিয়া আহতের সেবায় দৃঢ়চিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পূর্বে কেহ চিন্তাও করেন নাই যে, এক্স্-রে, যুদ্ধে আহত সৈনিকের কোন উপকার সাধন করিতে পারে। শত্রুসৈন্য প্যারী অবরোধ করিলে অসীম সাহসের সহিত তিনি তাঁহার ইনষ্টিটিউটের এক গ্র্যাম রেডিয়াম বোর্দো নগরে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সঞ্চিত স্বর্ণ এবং দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ যুদ্ধকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ফরাসী সরকারকে দান করেন। কিন্তু মেরীর এই মহানুভবতার কোন মূল্য ফরাসী সরকার দেন নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে নিমন্ত্রিত হইয়া কন্যাদ্বয়ের সহিত তিনি আমেরিকার প্রধান প্রধান নগরগুলি ভ্রমণ করিয়া আসেন। নিউইয়র্ক সহরের গুণগ্রাহী পৌর মহিলাগণ মেরীর প্রতি এতই আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা এক লক্ষ ডলার (প্রতি ডলার = প্রায় তিন টাকা) ব্যয়ে এক গ্রাম রেডিয়াম মেরীকে উপহার দেন। বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সুধী-সমিতি তাঁহাকে উপাধি, পদক প্রভৃতিতে ভূষিত করিয়া নিজেদের গুণগ্রাহীতার পরিচয় দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ফরাসী সরকারও তাঁহার জন্য বার্ষিক ৪০ হাজার ফ্রাঙ্ক বৃত্তি ধার্য করেন। জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে মাদাম কুরীর নাম পরিচিত নয়।

পিয়েরী কুরীর মৃত্যুর পর মেরী সর্বদাই গবেষণা কার্যে মগ্ন থাকিতেন। বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। আইরিন ও ইভের ন্যায় রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটও তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি অসুস্থ হইলেন; এক্স-রে পরীক্ষায় পিত্ত-পাথরীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইল; মধ্যে মধ্যে সামান্য জ্বরও হইত। চিকিৎসকের আদেশ সত্ত্বেও তিনি পুস্তক রচনা ও গবেষণাকার্যে বিরত থাকিতেন না। গবেষণাকার্যে রেডিয়াম-রশ্মির সংস্পর্শে আসায় এবং অতি শ্রমে তিনি ভীষণ রক্তাল্পতা রোগে এরূপ জীর্ণ হইলেন যে, তাঁহাকে এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করিতে হইল। ফ্রান্সের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই জগদ্বরেণ্য মাদাম কুরী অমরধামে প্রয়াণ করেন।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?······তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"—**বঙ্গে বিজ্ঞান** (বঙ্গদর্শন কার্তিক ১২৮৯)

মালয়ের রবার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট

উৎকৃষ্ট রবারগাছ জন্মাইবার উপযুক্ত বিভিন্ন জমির মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে

উন্নতধরনের বর্ণসঙ্কর রবারগাছ উৎপাদনের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে
রবার-ফুলে পরাগনিষেক করা হচ্ছে

বর্তমান যুগে স্বাভাবিক রবার শ্রমশিল্পও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে রবারের নানাপ্রকার নতুন নতুন রূপ উদ্ভাবিত হইতেছে এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।
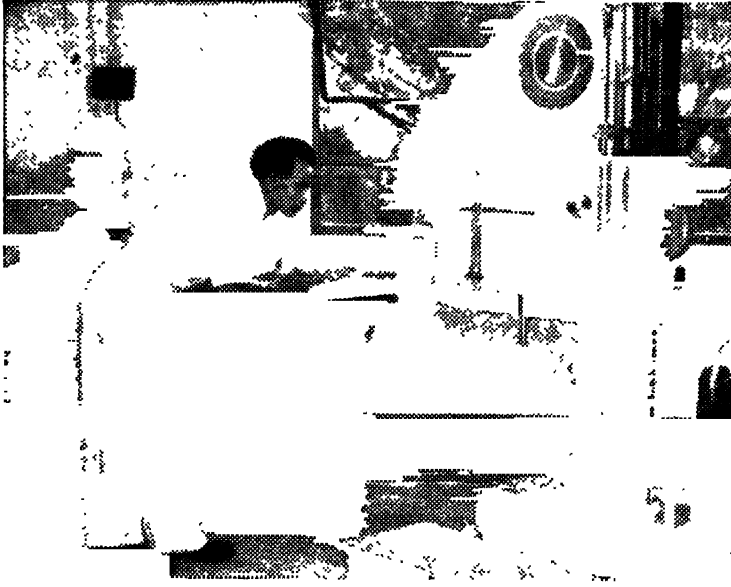
মালয় রবার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের একাংশের দৃশ্য

'ক্রিমিং' প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত করবার জন্যে মালয়ের রবার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পরীক্ষাগারে বিভিন্ন গাছ থেকে সংগৃহীত টাট্‌কা রস পরীক্ষা করা হচ্ছে

পৃথিবীতে যে পরিমাণ স্বাভাবিক রবার ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই উৎপন্ন হয় মালয়ে। মালয়ে রবার বৃক্ষের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০,০০০•এবং আবাদী জমির আয়তন ২০,০০,০০০ একর।

জাপানী আক্রমণ ও অধিকারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পসমূহের মধ্যে মালয়ের রবার শিল্পকেই সর্বপ্রথম পুর্গনঠিত করা হয় এবং বর্তমানে উপনিবেশের শিল্পগুলির মধ্যে রবার শিল্প হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ডলার আয় হইয়া থাকে। ১৯৪৯ সালে রপ্তানিকৃত রবারের পরিমাণ ছিল ৬,৭৯,৭১০ টন এবং ইহার অর্ধেকেরও অধিক রপ্তানি করা হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্রে।

উৎপাদিত বিভিন্ন নমুনার স্থায়ী রেকর্ড রাখবার জন্যে সুদক্ষ ফটোগ্রাফার ও ড্রাফট্‌স্‌ম্যানরা প্রোজেকশন মাইক্রস্কোপ ব্যবহার করছেন

মালয়ের রবার রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটের সাহায্য ও উপদেশের ফলেই এই সাফল্যলাভ সম্ভব হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ পরীক্ষাকার্য ও গবেষণা চালান হইতেছে এবং মৃত্তিকা, রাসায়নিক সার, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আবিষ্কৃত নতুন নতুন তথ্যসমূহ এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতির সহায়তা করিতেছে।
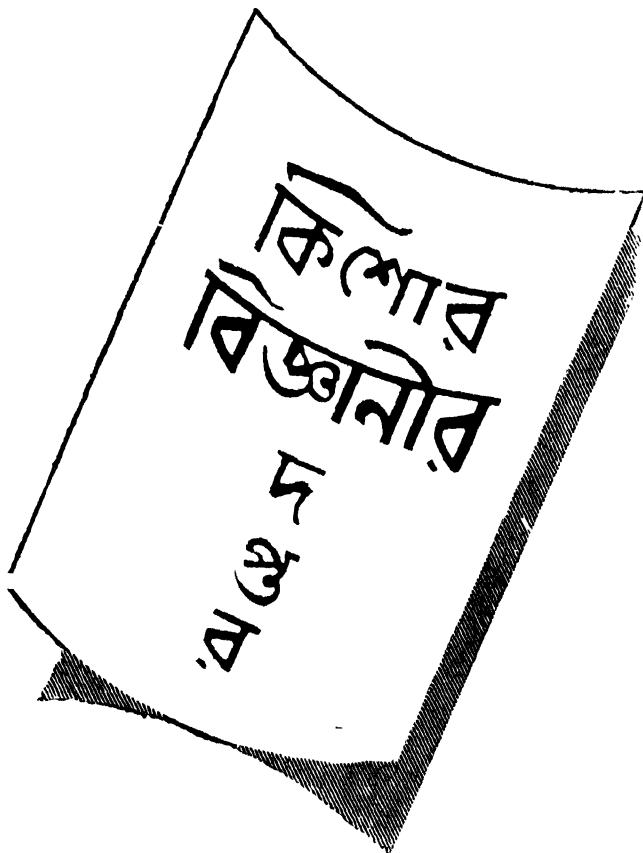
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৫০

তৃতীয় বর্ষ,—৬ষ্ঠ সংখ্যা

ধান ও কুমড়া-বীজের অঙ্কুরোদ্গম

৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
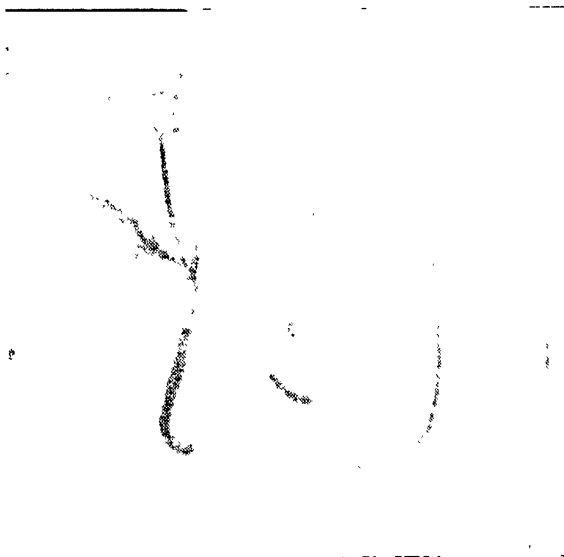
অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নি, এফ, আর, এস,

জন্ম—১৪ই নভেম্বর ১৮৯১ মৃত্যু—১০ই এপ্রিল, ১৯৪৯

৩৭২ পৃষ্ঠা।

করে দেখ

ফ্ল্যাসলাইট মাইক্রস্কোপ

এর আগে তোমাদিগকে জল দিয়ে তৈরী লেন্সের সাহায্যে মাইক্রস্কোপ তৈরীর কথা বলেছি। কিন্তু এপর্যন্ত তোমাদের কারুর কাছ থেকে কোন সাড়া পাইনি বলে মনে হচ্ছে—এ বিষয়ে তোমরা কেউ হাত দাওনি, অথবা হাত দিলেও সাফল্য লাভ করতে পারনি। তবে সেবারে হাতে-তৈরী মাইক্রস্কোপের যে নমুনা দেখিয়েছিলাম তাতে কাঠের ষ্ট্যাণ্ড, ব্র্যাকেট ইত্যাদি তৈরী করা তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে—ছুতোর মিস্ত্রির সাহায্য না নিলে চলে না। এই অসুবিধার কথা ভেবেই আজ তোমাদিগকে আরও সহজ উপায়ে ফ্ল্যাসলাইট মাইক্রস্কোপ তৈরীর ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, এ ব্যবস্থায় তোমাদের অনেকেই মাইক্রস্কোপ তৈরী করে দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগতের অনেক কিছু ব্যাপার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে।
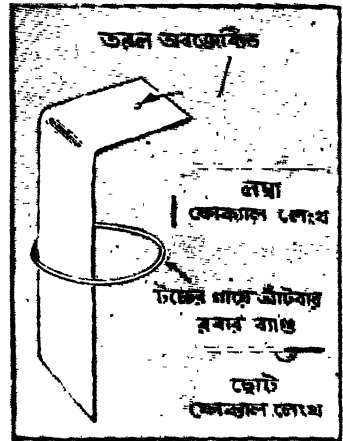
১ নং ছবি

এই মাইক্রস্কোপ তৈরী করতে হলে একটা ফ্ল্যাসলাইট টর্চ, একপয়সা কি দুপয়সা দামের একটা রাবার ব্যাণ্ড এবং একখানা টিনের বা পিতলের পাত যোগাড় করতে হবে। পাতটাকে ইংরেজী L অক্ষরের মত বাঁকিয়ে নিয়ে তার ছোট বাহুটার মধ্যেস্থলে সূচ দিয়ে ছিদ্র করে নিতে হবে। খুব সরু ফাইল বা এমারি-ক্লথ দিয়ে ছিদ্রটাকে বেশ নিখুঁৎভাবে মসৃণ করে নেওয়া দরকার। এই ছিদ্রের মধ্যে এক ফোঁটা গ্লিসারিন অথবা সাদা খনিজ তেল লাগিয়ে দিলেই মাইক্রস্কোপের লেন্স তৈরী হয়ে যাবে। তেলের পরিবর্তে অবশ্য জলের ফোঁটা দিলেও কাজ চলতে পারে। ছোট সূচের বদলে বড় সূচ দিয়ে ছিদ্র করলে দ্রষ্টব্য পদার্থ খুব উজ্জ্বল দেখাবে বটে; কিন্তু আকৃতিগত খুঁটি-নাটি অস্পষ্ট হবে। সরু ছিদ্রে আলোর ঔজ্জ্বল্য অনেকটা কম পেলেও সুস্পষ্ট আকৃতি দেখতে পাওয়া যাবে।

২ নং ছবি

যাহোক, টিনের বা পিতলের পাতের মধ্যে একটা সরু ছিদ্র করা কিছু শক্ত কাজ নয়। ইচ্ছামত বড়-ছোট ছিদ্র করে দেখবে—যেটাতে ভাল দেখায় সেটাই ব্যবহার করবে। এক নম্বরের ছবিটার বাঁ-দিকে বাঁকানো পাতের নমুনা দেখানো হয়েছে এবং কোথায় ছিদ্র করতে হবে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। গ্লিসারিন, তেল বা জলের ফোঁটা কোথায় কেমনভাবে দিতে হবে তা-ও দেখানো হয়েছে এক নম্বর চিত্রের ডানদিকে। তরল পদার্থের ফোঁটাটার বড়-ছোট হওয়ার উপর লেন্সের শক্তি নির্ভর করে। ফোঁটা পাতলা হলে লম্বা ফোক্যাল লেংথ পাওয়া যাবে, শক্তি হবে মাঝামাঝি; আর দৃশ্য বস্তুর আকৃতি দেখতে হবে—পরিষ্কার। ফোঁটাটা পুরু হলে ফোক্যাল লেংথ ছোট হবে; কিন্তু শক্তি বৃদ্ধি হবে। ছিদ্রের উপর লাগিয়ে দিলেই অবশ্য ফোঁটাটা নীচের দিকে ঝুলে পড়বে বেশী এবং উপরের দিকটা অপেক্ষাকৃত পাতলা থাকবে। এক নম্বরের ছবি থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবে।
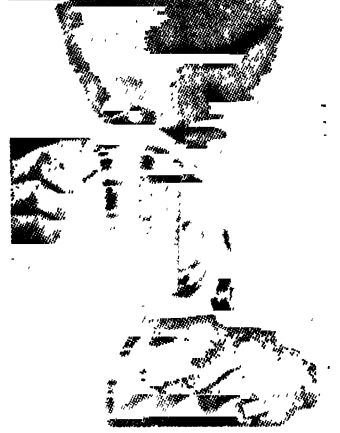
৩ নং ছবি

এবার বাঁকানো পাতখানাকে টর্চের এক পাশে রেখে রাবারের ব্যাণ্ড দিয়ে এঁটে দাও। টর্চের গায়ে পাতখানা শক্তভাবে লেগে থাকবে। যে সব বস্তু পরীক্ষা করতে চাও সেগুলো এবার একখানা কাচের শ্লাইডের উপর বসিয়ে নাও। শ্লাইডখানাকে টর্চের মুখের কাচখানার উপর রাখ। টর্চটির বোতাম টিপে আলো জ্বেলে লেন্সের ভিতর দিয়ে দেখ। দু-নম্বরের ছবিতে ব্যবস্থাটা পুরোপুরি দেখানো হয়েছে। ফোঁটাটা কমবেশী করতে হলে দু-নম্বর চিত্রের মত পিপেট ব্যবহার করবে। দ্রষ্টব্য পদার্থ থেকে লেন্সখানাকে যথাযথ দূরত্বে রাখবার ব্যবস্থারও কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। পাতখানাকে একটু নীচে নামিয়ে বা উপরে উঠিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব অনায়াসেই পাওয়া যাবে। কেমন করে এই ফ্ল্যাস-লাইট মাইক্রস্কোপ ব্যবহার করতে হবে তা তিন নম্বরের ছবিতে দেখানো হয়েছে।

গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

অঙ্কুরোদ্গমের বৈচিত্র্য

বীজ থেকে গাছ হয়—একথা তোমরা সবাই জান। কিন্তু কেমন করে হয়, লক্ষ্য করে দেখেছ কি? লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতির বীজ মাটিতে পুঁতলে কেমন করে চারাগাছ গজিয়ে উঠে সেটা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবে।

কুমড়া-বীজের সরু মুখটা উপরের দিকে রেখে মাটিতে পুঁতে দিলে দিন কয়েক পরেই দেখবে সূক্ষ্ম মুখ একটা মোটা শিকড়ের মত পদার্থ মাটির ভিতর প্রবেশ করছে। তারপর কাণ্ডটা বড়শীর মত বেঁকে মাটির উপরে ঠেলে উঠছে; মাথায় রয়েছে বীজের খোসাটা। অবশ্য বীজটাকে উল্টোভাবে পুঁতলে চারাটা সোজাসুজিই গজিয়ে উঠবে। দু-একদিনের মধ্যেই খোসাটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে মোটা মোটা গোলাকার দুটা পাতা। তারপর ধীরে ধীরে ওই দুটা পাতার মধ্যস্থলে কাণ্ড ও নতুন পাতা গজিয়ে গাছ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠবে। ছোলা, মটর প্রভৃতি বীজ ভিজা জায়গায় রেখে দিলেও এরকমের ব্যাপারই দেখতে পাবে। কিন্তু ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় কয়েকটা ধান ছাড়িয়ে রাখলে কি হবে? ধান থেকে অঙ্কুর বেরিয়ে বেশ লম্বা হয়ে উঠবে বটে; কিন্তু কুমড়া বীজের মত ধানটা কাণ্ডের ডগায় চলে আসবে না—সেটাকে
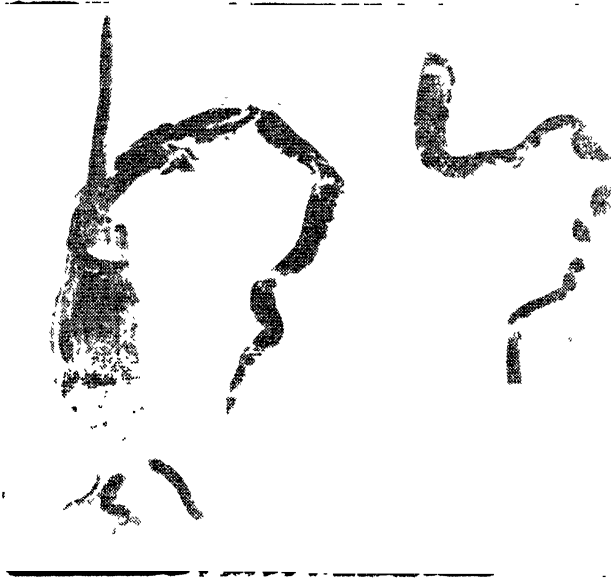
তালের আঁঠির অঙ্কুরোদ্গম

মাটিতেই এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখবে। কাজেই বুঝতে পারছ—সাধারণতঃ আমরা দু-রকমের অঙ্কুরোদ্গম দেখতে পাই। লাউ, কুমড়ার বীজের মধ্যে দুটি করে বীজপত্র লুকানো থাকে—এদের বলা হয় দ্বি-বীজপত্রী, আর ধান জাতীয় উদ্ভিদদের বলা হয় এক-বীজপত্রী। কিন্তু এ উভয়বিধ উদ্ভিদের মধ্যে এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের অঙ্কুরোদ্গম কৌশল বৈচিত্র্যপূর্ণ। তোমরা পাথরকুচি গাছের নাম শুনেছ নিশ্চয়। আমাদের দেশে এ গাছ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এ গাছের পাতা মাটিতে পড়লেই তার প্রত্যেকটি খাঁজ থেকে একটা করে ছোট চারা গজিয়ে থাকে। আলুর চোখ থেকে যেভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয় এ-ও অনেকটা সেরকম। মুকুট ফুলের গাছ দেখেছ

বোধ হয়! অনেকটা আনারসের গাছের মত দেখতে। পরিণত বয়সে গাছের মধ্যভাগ থেকে ১০।১২ হাত লম্বা, বেশ মোটা একটা দণ্ড নির্গত হয়। এর গায়ের প্রত্যেকটা গাঁট থেকে ফলের মত কয়েকটা করে গুটি নির্গত হয়। সেগুলো দেখতে ফলের মত হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ফল নয়; খুব আঁটসাটভাবে গুটানো ছোট ছোট চারাগাছ মাত্র। কিছুদিন পরেই সেগুলো বোঁটা খসে মাটিতে পড়ে যায় এবং ইতস্ততঃ নতুন গাছের পত্তন করে। গ্লোব্বা বাল্‌বিফারাস নামে এদেশে একরকম গাছ দেখা যায়। গাছগুলো দেখতে অনেকটা হলুদ বা আদা গাছের মত। এদের ডগা থেকে লম্বা একটা ফুলের বোঁটা বেরোয়। বোঁটার প্রান্তভাগে লালচে হলুদ রঙের ফুল ফোটে; কিন্তু বোঁটার মধ্যস্থলে, ফুলের আগে কতকগুলো পিণ্ডাকৃতি পদার্থ জন্মে। সেগুলো থেকে এক একটা করে চারা গাছ গজিয়ে ওঠে। চারাগাছগুলো ৪।৫ ইঞ্চি বড় হলে মাটিতে ঝরে পড়ে যায় এবং নতুন গাছের পত্তন করে। ম্যাংগ্রোভ জাতীয় গাছের নাম তোমরা শুনে থাকবে। এদের ফলের মধ্যে চারাগাছ জন্মে' সরু শিকড়টাকে বল্লমের মত নীচের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সময় মত মাটিতে পড়বার সময় তীক্ষ্মমুখ শিকড়টা নরম মাটিতে ঢুকে যায় এবং সেখানেই নতুন জীবন পত্তন করে। এরূপ আরও কত অদ্ভুত উপায়ে যে গাছের অঙ্কুরোদ্গম এবং বংশবিস্তার হয়ে থাকে সেকথা তোমরা পরে জানতে পারবে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাল, খেজুর প্রভৃতি এক বীজপত্রী দু-একটি উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের বিচিত্র কৌশল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে তোমাদের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগ্রত করবার চেষ্টা করবো। তালগাছ তোমাদের অপরিচিত নয়। দেখেছ তো কি বিরাট গাছ! গাছ যেমন বিরাট, ফলও ধরে তেমনি প্রচুর! তালগাছের একটা বিশেষত্ব তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে। কতককগুলো তালগাছে কেবল জটা হয়, আর কতকগুলো গাছে ফল ধরে। জটাওয়ালা গাছগুলো পুরুষ, আর ফলওয়ালা গাছগুলো স্ত্রী জাতীয়। যাহোক, তালের আঁঠি থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারটা কখনও লক্ষ্য করেছ কি? পূর্বে লাউ, কুমড়ার অঙ্কুরোদ্গমের কথা বলেছি; কিন্তু তালের আঁঠির অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারটা মোটেই সেরকমের নয়। আম-জাম, লাউ-কুমড়া প্রভৃতির উদ্ভিদ-শিশু বা ভ্রূণ বীজদলের সঙ্গে সংলগ্ন থেকে সোজাসুজি মাটিতে শিকড় পত্তন করে; কিন্তু তালের ভ্রূণ অদ্ভুত একটা নলাকার পদার্থের সাহায্যে আঁঠি থেকে বেরিয়ে মাটির অনেক নীচে চলে যায়। সেখানে শিকড় পত্তন করে' বৃক্ষ-শিশু অনেক দিনের চেষ্টায় ধীরে ধীরে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। অত বড় একটা বিরাট গাছকে ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই এভাবে সুদৃঢ় গোড়া-পত্তনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

তোমরা যে তালশাঁস খাও সেগুলো তালের আঁঠির কচি শাঁস ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিপক্ক অবস্থায় শাঁসের উপরের আবরণটা ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়;

ভিতরের শাঁসটাও শক্ত হয়ে ওঠে। পরিপক্ব তালের আঁঠি স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর পড়ে থাকলে কিছুকাল পরে মুখের দিক থেকে শিকড়ের মত বেশ মোটা একটা পদার্থ বেরিয়ে আসে। শিকড়ের মত এই পদার্থের ডগাটা পেন্সিলের মুখের মত সরু। এর অপর প্রান্ত থাকে আঁঠির মধ্যস্থিত ফোঁপলের সঙ্গে সংযুক্ত। শিকড়ের মত বলছি এজন্যে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এটা শিকড় নয় মোটেই। এটাকে এককথায় নাভিরজ্জু বলা যেতে পারে। এর ডগার দিকটা লম্বালম্বি চিরে ফেললেই দেখবে—ভিতরটা নলের মত ফাঁপা এবং নলটার ভিতরে রয়েছে—উল্টোমুখে বেশ লম্বা একটা চারাগাছ, তার গোড়ার দিকটা নাভিরজ্জুর সরু মুখটার সঙ্গে ভিতরের দিকে সংলগ্ন। এই চারাগাছটাই ভ্রূণ অবস্থায় আঁঠির মধ্যে ছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ভ্রূণটাকে ওই নাভিরজ্জুর সাহায্যে মাটির নীচে চালিয়ে দেয়। শিকড়ের মত পদার্থটা যত লম্বা হতে থাকে, ফোঁপলটাও সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে থাকে। ফোঁপলের সংস্পর্শে এসে শক্ত শাঁসটাও ক্রমশঃ মাখমের মত নরম হয়ে যায়। নাভিরজ্জুর সাহায্যে সেই পদার্থটা পরিবাহিত হয়ে বৃক্ষ-শিশু এবং নাভিরজ্জু উভয়েরই পুষ্টিসাধন করে। নাভিরজ্জুর মুখটা আঁঠি থেকে বেরিয়ে এসেই মাটির ভিতরে ঢুকে যায় এবং তা-ও একটু আধটু নয়—প্রায় হাত খানেক নীচে চলে যায়। যথেষ্ট নীচে ঢুকে যাবার পর সরুমুখ পদার্থটার প্রান্তদেশ থেকে পাশের দিকে মোটামোটা কয়েকটা শিকড় বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছবি দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এভাবে সুদৃঢ়রূপে গোড়া পত্তন করে' তালগাছের চারা মাটি ফুঁড়ে উপরের দিকে উঠতে সুরু করে। নাভিরজ্জু মাটির অনেক নীচে চলে গেছে—সে সময়ে ফোঁপলের লোভে কেউ আঁঠি ছিঁড়ে নিয়ে গেলেও উদ্ভিদ-শিশুর কোনই অনিষ্ট হবে না। মনে হতে পারে—আঁঠির মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উদ্ভিদ-শিশু মাটির নীচে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়, ততদিনে উদ্ভিদ-শিশু মাটির নীচে প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। বাইরে থেকে তার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই দেখতে পাবে না; কিন্তু দু-এক মাস পরে দেখবে, তালগাছের চারা মাটি ফুড়ে বেরিয়েছে। অন্যান্য উদ্ভিদ-শিশুর মত সহজে তাকে নির্মূল করা সম্ভব নয়। হাঁড়িকুড়ির মধ্যে একটু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় দু-চারটে তালের আঠি রেখে দিয়ে দেখো—কিছুদিনের মধ্যেই পেন্সিলের চেয়ে খানিকটা সরু, শিকড়ের মত একটা পদার্থ বেরিয়ে আসছে। এটাকেই নাভিরজ্জু বলেছি। এর মুখটা কেবল নীচের দিকে যেতেই চেষ্টা করবে। আঁঠিটাকে উল্টে ফেলে নাভিরজ্জুর মুখটা উপরের দিকে রেখে দেখো দু-একদিনের মধ্যেই সুচালো মুখটা ঘুরে আবার মাটির দিকে নেমেছে। পনেরো বিশ দিনের মধ্যে নাভিরজ্জুটা প্রায় হাত খানেক লম্বা হয়ে যাবে এবং মাথার দিকটা ক্রমশঃ মোটা হতে থাকবে। হাঁড়ির শক্ত খোলা ভেদ করে মাটিতে ঢোকবার উপায় নেই বলে সম্পূর্ণ অবস্থাটা পরিষ্কারভাবেই পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এবার দেখবে—নাভিরজ্জুর সরু মুখটা থেকে চারদিকে মোটা মোটা কয়েকটা শিকড় বেরিয়েছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই নাভিরজ্জুর

নলটা ফেটে প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রের ফলার মত উদ্ভিদ-শিশু বেরিয়ে আসছে।

এ তো গেল তাল গাছের অঙ্কুরোদ্গমের কথা ; কিন্তু খেজুরের আঁঠি থেকে অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাপারটাও অনেকটা তালের আঠির অঙ্কুরোদ্গমের মত। একটা খেজুরের
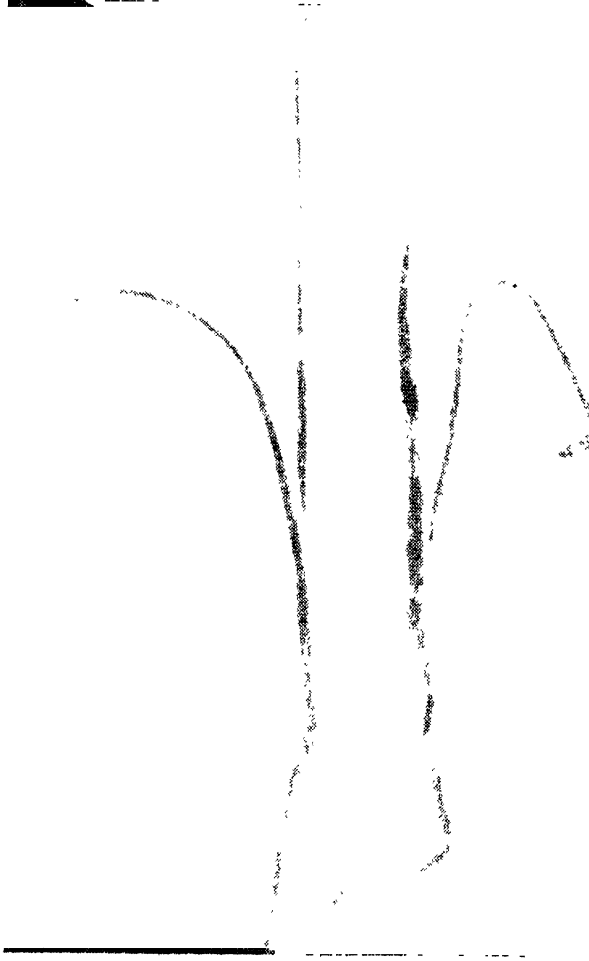
খেজুরের আঁঠির অঙ্কুরোদ্গম

আঁঠিকে কিছুদিন ভিজা অবস্থায় রেখে দিলেই দেখবে—লম্বাটে আঁঠিটার এক পাশ থেকে খুব সরু একটা ছিপির মত পদার্থ ঠেলে বেরিয়ে এলো। ছিপির মত পদার্থটা বেরিয়ে এলেই খুব সরু পরিষ্কার একটা ছিদ্র দেখা যাবে। এই ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে সরু একটা লম্বা নল। নলটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে যায়। এদেরও নলের সরু মুখটার ভিতরে থাকে শিশু-উদ্ভিদটি। বেশ খানিকটা মাটির ভিতর ঢুকে গিয়ে শিকড় বেরুবার পর উদ্ভিদ-শিশু মাটি ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। চারাগাছটা মাটি

ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে বেশ কিছুদিন সময় নেয়। মোটের উপর তাল ও খেজুরের অঙ্কুরোদ্গম-কৌশল প্রায় একই রকমের। কিন্তু নারকেল এই জাতীয় গাছ হলেও তার অঙ্কুরোদ্গম-কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এগুলো তোমরা ইচ্ছা করলে স্বচক্ষেই দেখতে পারবে। ব্যাপারটা একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে—শিশু-বৃক্ষকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার জন্যে তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছগুলো কি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা যে বুদ্ধি করে বা ইচ্ছামত হয়নি—একথা বুঝতে বোধহয় তোমাদের অসুবিধা হবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায়, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ধারায়—তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদ অঙ্কুরোদ্গমের অদ্ভুত ব্যবস্থার অধিকারী হয়েছে। উদ্ভিদ ও জীবজগতের সব কিছুই এরূপ কোন না কোন উপায় অবলম্বন করে বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলছে। —গ—

প্রবন্ধের ফটোগুলো লেখক কর্তৃক গৃহীত

অভিনব চিকিৎসা

চিকিৎসা তো কতরকম ভাবেই হতে পারে—আর সেগুলো তোমরা নিশ্চয়ই জান। কিন্তু আমি আজ যে চিকিৎসার কথা বলবো তাতে ওষুধপত্র বিশেষ কিছুই দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, দরকার হবে কেবলমাত্র কয়েকটি জিনিসের।

প্রাচীনকালে মানুষের অসুখ হলে চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হতো—তা জানিনা; কিন্তু আজকের যুগের মত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসা যে হতো না—সে কথা আশাকরি না বললেও চলবে। তবে বিজ্ঞানের যেদিন জন্ম হলো সেদিন থেকেই মানুষ যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিল তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। কত বিজ্ঞানী এর জন্যে নিজেদের জীবনও বিপন্ন করেছেন তবুও তাঁরা তাঁদের এই সাধনা থেকে কখনও অবসর গ্রহণ করেননি; বরং বিজ্ঞানকে কি ভাবে মানুষের উপকারে লাগানো যায় সেই চিন্তায়ই সারাজীবন অতিবাহিত করতেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় কতরকম ওষুধপত্র যে আবিষ্কৃত হয়েছে তার সংখ্যা নেই; তবে সেই সঙ্গে মানুষের যন্ত্রণাদায়ক যে ওষুধ বের হয়েছে সেগুলোকে কি ভাবে পরিবর্তন করা যায়—এর চেষ্টাও খুব চলছে।

তোমরা Psychology কাকে বলে তা হয়তো জান না। এটাকে বাংলায় বলে "মনোবিজ্ঞান"। এই মনোবিজ্ঞানে মানুষের মনের কতকগুলো বিশেষ গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এর সাহায্যে মানুষের মনের প্রকৃতিকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

এখন তোমরা হয়তো বলতে পার—মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসার কি সম্বন্ধ? চিকিৎসক যদি রোগীর মনের ভাব বুঝতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা করা কি আরও সহজ হবে না?

মনোবিজ্ঞানবিদ্‌রা রোগীর মনের ভাব চিকিৎসককে বুঝিয়ে দেন; তারপর চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। এইখানেই হলো মনোবিজ্ঞান আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্পর্ক। তবে আজকাল সমস্ত চিকিৎসকই যাতে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারেন—সেই চেষ্টাই চলছে।

আমাদের দেশে অবশ্য এখনও এই সব বিষয়ে ততটা উন্নতি হয়নি; তবে ইউরোপ, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয়ে খুব গবেষণা চলে।

তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে যে Switzerland-এ একটি হাঁসপাতাল আছে যেখানে কেবলমাত্র যাদের কোনও কারণে মাথাখারাপ হয় তাদেরই ভর্তি করা হয়। এখানকার চিকিৎসকেরা রোগীর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে রোগীর মনের ভাব বুঝে নেন। এর ফলে বহু রোগী একেবারে ভাল হয়ে যায়।

আচ্ছা, এবার শোন সঙ্গীত চিকিৎসার কথা। মানুষ সঙ্গীতপ্রিয়। সঙ্গীতের কতকগুলো বিভিন্ন রূপ আছে। কোনও সঙ্গীত মানুষের মনকে উৎসাহ দেয়, আবার কোন কোনওটা মানুষের মনে আনন্দ বা করুণরস পরিবেশন করে।

ইউরোপে হালে একটি হাসপাতাল হয়েছে। সেখানে সঙ্গীতের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়। হয়তো কোনও রোগীর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে—তখন তাকে এমন একটি যন্ত্রসঙ্গীত শোনানো হয় যাতে তার মনের পরিবর্তন দেখা যায়। এই ভাবে সঙ্গীতের সাহায্যে বহু রোগীকে ঘুম পাড়ানোও হয়।

এছাড়া রঙের সাহায্যেও যে চিকিৎসা চলে তার কথা হয়তো শুনে থাকবে। আমরা চারপাশে যে সমস্ত রং দেখতে পাই—যেমন লাল, নীল, বেগুনি ইত্যাদি—এগুলোর প্রত্যেকটাই আমাদের মনের উপর একটি প্রভাব বিস্তার করে। মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিতে রংকেও মস্তবড় প্রাধান্য দিয়েছেন।

এখন তোমাদের কাছে আগে কতকগুলো রঙের বিশেষ প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে নিই। লাল রংকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আগুন থেকে প্রচণ্ড শক্তি বা তেজ বের হয়—এ আমরা জানি। কাজেই লাল রং আমাদের মনে শক্তির খোরাক জোগাবে এ আমরা আশা করতে পারি। কোনও দুর্বল রোগীকে যদি এমন একটি ঘরে রাখা হয়—যে ঘরের দেয়াল, মেঝে, ছাদ, বিছানা ইত্যাদি সমস্তই লাল রঙের—তবে রোগী হয়তো তার মনে সাহস লাভ করবে। এগুলো কিন্তু বাজে কথা ভেবে উড়িয়ে দিও না। সত্যিকারের পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, খুব দুর্বল রোগীকে লালঘরে রাখলে তার মনের অনেকখানি পরিবর্তন হয়।

কমলা রং সাধারণভাবে মানুষের মনে জীবনীশক্তির প্রভাব বিস্তার করে। সবুজ রঙকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়—সে সর্বদাই নতুন কিছুর স্বপ্ন দেখে এবং মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে। এ ছাড়া আরও অনেক রং আছে—যেগুলো আমাদের মনে বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার করে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা জানা দরকার যে, সব রঙ-ই সমানভাবে মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একজন লোকের কাছে লাল রং হয়তো খুবই ভাল লাগে—আবার আর একজন হয়তো একেবারেই লাল রং পছন্দ করে না। তবে সাধারণতঃ বেশীর ভাগ মানুষের মনে একই রং প্রায় একরকম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

সর্বশেষে আমি তোমাদের আর একটি নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা বলবো।

ইউরোপে সম্প্রতি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার মাত্র কয়েকজন সুদক্ষ নার্সের সাহায্যে একটি ছোট হাসপাতাল খুলেছেন। যে সমস্ত রোগী শরীরে কোনও অংশে ব্যথা অনুভব করে তারাই এখানে চিকিৎসার জন্যে আসে। এখানে কোনও ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। ডাক্তার এবং নার্সেরা কেবলমাত্র মালিশের সাহায্যে রোগীর ব্যথা সারাতে সক্ষম হন।

আমাদের দেশে কবে এই সব পদ্ধতিতে চিকিৎসা হবে—জানিনা। কিন্তু যদি কোনও দিন এইসব ব্যবস্থা সত্যিই হয়—তবে আমাদের দেশবাসী বহু রোগের হাত থেকে যে মুক্তি পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীপূর্ণিমা পুরকায়স্থ

অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নি, এফ, আর, এস

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের দেশে যাঁরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন পরলোকগত অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৮৯১ সালের ১৪ই নভেম্বর পশ্চিম পাঞ্জাবের সাহ্‌পুর জেলায় বেহ্‌রা নামক স্থানে অধ্যাপক সাহ্‌নি জন্মগ্রহণ করেন। লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক রুচিরাম সাহ্‌নির তিনি ছিলেন দ্বিতীয় পুত্র। বিদ্যাবত্তায়, জ্ঞানে, সমাজসংস্কারাদি ব্যাপারে অধ্যাপক রুচিরাম সাহ্‌নি ছিলেন সর্বজন পরিচিত। পিতার নিকটই বীরবলের প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয়। ছোটবেলা থেকেই বীরবলের প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উপর বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল এবং ফুলফল, লতাপাতা, জীবজন্তুর খোলা, পাথরের কুচি প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থ সংগ্রহ করেই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। বালকের ঝোঁক দেখে পিতাও তাঁকে এবিষয়ে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করতেন না; এমন কি এসব জিনিস যথেচ্ছ সংগ্রহ করবার সুযোগ দেবার জন্যে ছুটির সময় পুত্রকে তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। ছোটবেলা থেকে প্রাকৃতিক পদার্থ সম্বন্ধে তাঁর এই ঔৎসুক্যই পরিণত বয়সে তাঁকে প্রখর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী করেছিল।

লাহোরের সেণ্ট্রাল মডেল স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করে বীরবল সাহ্‌নি গভর্ণমেণ্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তদানীন্তন প্রখ্যাত অধ্যাপক কাশ্যপের ছাত্ররূপে উদ্ভিদবিদ্যা

শিক্ষা করেন। ১৯১১ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করে সে-বছরেই বিলেতে চলে যান এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েটরূপে কেম্ব্রিজের ইম্যানুয়েল কলেজে প্রবেশলাভ করেন। সেখান থেকে ন্যাচারেল সায়েন্স-এ ট্রাইপস্ নিয়ে সার এ, সি, সিউয়ার্ডের অধীনে গবেষণার কাজে ব্রতী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাঁর কাছেই গবেষণা-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ কেম্ব্রিজে তিনি সাডবারি হার্ডিম্যান প্রাইজ লাভ করেন। প্রফেসর গোয়েবেলের পরিচালনাধীনে এই সময়ে তিনি মিউনিকে সামার সেমেষ্টারগুলোতে যোগদান করেন এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি, এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। সিউয়ার্ডের অধীনে গবেষণা করে ১৯১৯ সালে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত হন এবং ১৯২৯ সালে তাঁকে কেম্ব্রিজের এস-সি, ডি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯১৯ সালে ভারতে ফিরে এসে পর পর তিনি বেনারস এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদবিদ্যার চেয়ারে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপক সাহ্নি পাঞ্জাবের স্কুল ইন্স্পেকটর মিঃ সুন্দরদাস সুরির কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রী সুরির পাণিগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এবং ১৯৩৩ সালে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন নির্বাচিত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই উভয় পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌতেই অধ্যাপক সাহ্নির নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে আসতে থাকে। এই সময়ে তাঁকে গুরুতর পরিশ্রম করতে হতো। অনেক রাত্রি অবধি ল্যাবরেটরীতে কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। কাজের ঝোঁকে সময় সময় রাতও কাটিয়ে দিতেন। বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে সংগৃহীত ফসিলগুলোর কাটাকুটি করা, চূর্ণ করা, নক্সা আঁকা, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতেই করতেন; অবশ্য তাঁর স্ত্রীও তাঁকে এসব কাজে সহায়তা করতেন।

১৯২০ থেকে '২৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক সাহ্নি গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ না করে কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সংগৃহীত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদাদির তথ্যানুসন্ধানেই ব্যাপৃত থাকতেন। প্রথম দিকে তিনি আধুনিক যুগের জীবন্ত উদ্ভিদাদি সম্পর্কেই অধিকাংশ গবেষণা করেছিলেন। ১৯১৫ থেকে '৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি টেরিডোফাইটা এবং জিম্নোস্পারম্-এর অঙ্গসংগঠনাদি বিষয়ে বিবর্তনের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালে জাইগোপটেরিডি সম্পর্কে তাঁর অমূল্য গবেষণা-সমূহের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রোফেসর সিউয়ার্ডের সহযোগিতায় ভারতীয় গণ্ডোয়ানা উদ্ভিদাদি সম্পর্কিত বিবরণীর পুনঃসংস্করণের গুরুতর কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ১৯২০ সালে ইহা প্যালিওন্টোলোজিয়া ইণ্ডিকাতে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯২৮ ও '৩০ সালে এতেই ভারতীয় প্রস্তরীভূত কনিফার সম্পর্কীয় গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত এবং অন্যান্য দেশের প্রস্তরীভূত বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে বহুবিধ গবেষণা ছাড়াও

তিনি প্যালিওজিওগ্রাফিক্যাল ও পারমো-কার্বনিফেরাস উদ্ভিদ ও প্রাণী, ওয়েজেনারের মহাদেশের স্থানচ্যুতি, হিমালয়ের উত্থান ও অন্যান্য জিওলজিক্যাল সমস্যা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণমূলক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। শিলীভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদাদি সম্পর্কেও তিনি অনেক প্রয়োজনীয় গবেষণা করে গেছেন। মোটের উপর প্রাগৈতিহাসিক শিলীভূত উদ্ভিদ, বিশেষ করে ভারতের হিমালয়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রস্তরীভূত উদ্ভিদাদি সম্পর্কে তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গবেষণা করে গেছেন এস্থলে তার মোটামুটি হিসেব দেওয়াও সম্ভব নয়। পরে সেসব বিষয় তোমরা বিস্তৃতভাবে জানতে পারবে। ১৯৩৯ সালে তিনি নিজের সম্পাদনায় 'প্যালিওবটানি ইন ইণ্ডিয়া' নামে একখানি রিসার্চ বুলেটিন প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মোটের উপর ভারতের প্রস্তরীভূত উদ্ভিদাদি সম্পর্কে বর্তমান শতাব্দীতে যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে তা সর্বাংশে অধ্যাপক সাহ্‌নির দান বলা যেতে পারে।

১৯২১ এবং ১৯৩৮ সালে ছু-বার অধ্যাপক সাহ্‌নি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি জিওলজি বিভাগের সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪০ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। মূলতঃ প্যালিওবটানি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকলেও আর্কিওলজি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় তাঁর কম উৎসাহ ছিল না। ১৯৪৫ এবিষয়ে তিনি নেলসন রাইট পদক লাভ করেন।

১৯৩৬ সালে অধ্যাপক সাহ্‌নি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ এফ, আর, এস। তাছাড়া তিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং আমেরিকান একাডেমী অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্-এর সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইণ্টারন্যাশন্যাল বটানিক্যাল কংগ্রেসের ১৯৫০ সালের ষ্টকহল্‌মের অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি মূল্যবান মৌলিক গবেষণার জন্যে তাঁকে বার্কলে মেডাল দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং ১৯৪৭ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে তিনি সি, আর, রেড্ডি ন্যাশন্যাল প্রাইজ লাভ করেন।

এছাড়া তিনি ছিলেন বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির অবৈতনিক অধ্যাপক, ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর ছু-বার প্রেসিডেণ্ট, বটানিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেণ্ট ও ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অ্যাণ্ড দি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। পাটনা এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অনারেরি ডি, এস-সি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছাড়াও ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং রাজনৈতিক ধরনের না হলেও ভারতের শিল্প-কলা এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারা সম্পর্কিত তাঁর দেশপ্রেম ছিল অগাধ। শেষ জীবনে বছর সাতেক প্যালিও-

বটানির ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই তাঁর উদ্যম, কর্মশক্তি বহুলাংশে ব্যয়িত হয়েছিল। প্রস্তরীভূত উদ্ভিদাদি সম্পর্কে একটি তিনি আন্তর্জাতিক গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। আংশিকভাবে হলেও এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সাফল্য লাভ করেন। ১৯৪৯ সালের ৩রা এপ্রিল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর প্যালিওবটানি ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। জীবনের এই স্বপ্ন ও সাধনাকে স্বার্থক করে তুলতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছিল তাতে স্বাস্থ্য অনেকটা পঙ্গু হয়ে পড়ে এবং তারই ফলে এই ইনষ্টিটিউট স্থাপনের সাত দিন পরে ১০ই এপ্রিল হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি এই ইনষ্টিটিউটকে দান করে গেছেন।

—গ—

বৈদ্যুতিক আলো

মানুষ যখন প্রথম চক্‌মকি ঠুকে আগুণ জ্বালতে শিখলো—সে প্রায় হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। রাতের বেলা কিছু দেখা যায় না; চারদিকে ভয়াবহ জন্তু-জানোয়ারে পরিপূর্ণ অরণ্যানী; আত্মরক্ষার জন্যে আগুনের দরকার; আলোর দরকার। তারপর মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে চললো, মানুষের হাতে-গড়া কৃত্রিম আলোও অগ্রগতির পথে যাত্রা করলো। দীপের আলো, মোমবাতির আলো, লণ্ঠনের আলো, দেশলাই-এর আলো—সবই কৃত্রিম আলোর অগ্রগতির ইতিহাসে এক একটা বিরাট অধ্যায় বললে ভুল হবে না।

তারপর বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোর ইতিহাসেও একটা বিপ্লবের সূচনা দেখা দিল। কার্বন আর্ক ল্যাম্প-এর আবির্ভাব হলো। বড় বড় রাস্তায়, দোকান ঘরে কার্বন আর্ক ল্যাম্পের ব্যবহার সুরু হলো। দুটি কার্বন ইলেকট্রোডের (একটি ধনাত্মক অপরটি ঋণাত্মক) মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালাতে হবে। ইলেকট্রোড দুটি প্রথমে গায়ে গায়ে লেগে থাকবে। তড়িৎপ্রবাহ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোড দুটি একটু সরিয়ে দিলে মাঝখানে একটা উজ্জ্বল আলোর সেতু তৈরী হবে। একেই বলে কার্বন-আর্ক। এই রকম আলোর প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, ধনাত্মক ইলেকট্রোড থেকে কার্বন কণা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

এরপর এলো ফিলামেণ্ট ল্যাম্প। ফিলামেণ্ট ল্যাম্প সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। একটি তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চললে তারটি গরম হয় কেন? তারের গরম হওয়া দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—তড়িৎপ্রবাহ, আর তারটির বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা। মস্ত ঘরের একটা দরজা দিয়ে যদি অনেকগুলো লোক একসঙ্গে বেরোয় তবে দরজাটা যত অপ্রশস্ত হবে তত লোকগুলোর বেরোবার পথে বাধা দেবে।

তারের বেলায়ও ঠিক একই কথা। তারটা যত সরু হবে বৈদ্যুতিক প্রবাহকে তত বেশী বাধা দেবে। বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং তারের বাধা দেবার ক্ষমতা, দুটাই যদি খুব বেশী হয় তাহলে তারটা উত্তপ্ত হয়ে আলো বিকিরণ করতে পারে। ফিলামেণ্ট ল্যাম্পে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে। কার্বন ফিলামেণ্টকে কাঁচের বাল্‌বের ভিতর রাখা হয়। বায়ুর সংস্পর্শে কার্বন ফিলামেণ্ট যাতে পুড়ে ক্ষয়ে না যায়, সেজন্যে বাল্‌বটিকে বায়ু-শূন্য করা দরকার। কিন্তু দেখা যায় যে, উত্তাপের মাত্রা ২০০০° সেন্টিগ্রেডে ওঠবার আগেই কার্বন ফিলামেণ্ট কার্বন গ্যাসে পরিণত হতে থাকে, আর ঝুলের মত কাঁচের গায়ে লেগে বাল্‌বটির স্বচ্ছতা নষ্ট করে দেয়। কাজেই বেশী শক্তির আলো কার্বন ফিলামেণ্ট দিয়ে পাওয়া গেলনা।

ফিলামেণ্টের তাপমাত্রা নির্ভর করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আর ফিলামেণ্টের তড়িৎ-প্রবাহকে বাধা দেওয়ার শক্তির উপর। কাজেই ফিলামেণ্ট যে ধাতুতে তৈরী তা যত অধিক তাপমাত্রা পর্যন্ত টিকে থাকে ফিলামেণ্টের আলোক বিকিরণের শক্তিও তত প্রবল হয়। চারদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল, কোথায় সেই ধাতু—যে ধাতুর গলনাঙ্ক বেশী এবং বেশী তাপমাত্রা পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। অস্‌মিয়াম্‌, ট্যাণ্টালাম এবং টাংস্টেনের ব্যবহার সুরু হলো। দেখা গেল, টাংস্টেনের গলনাঙ্ক যদিও বেশী তাহলেও ধাতুটি বড় ভঙ্গুর। টাংস্টেন অক্সাইড থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নমনীয় ট্যাংস্টেন তৈরী হলো। বৈদ্যুতিক আলোয় টাংস্টেন ফিলামেণ্টের ব্যবহার সুরু হয়ে গেল।

এখন যদি মনে করা হয়, বাল্‌বের মধ্যে ধাতব যা কিছু সবই টাংস্টেনের তৈরী—তবে ভুল হবে। প্রথমে বাল্‌বের মধ্যে ঢুকে তড়িৎপ্রবাহ একটা মোটা তার দিয়ে সরু ফিলামেণ্টে যায়; আবার একটা অনুরূপ মোটা তার দিয়ে বেরিয়ে আসে। এই মোটা তার দুটাকে বলে লেড্‌-ইন-ওয়্যার। এর কিছুটা তামার আর কিছুটা নিকেল ধাতুর তৈরী। তাছাড়া পল্‌কা টাংস্টেন ফিলামেণ্টকে ধরে রাখবার জন্যে মলিবডিনাম্‌ ধাতুর তৈরী সাপোরটিং ওয়্যার আছে।

আগে একটা ধারণা ছিল, টাংস্টেন ফিলামেণ্টের যা কিছু অসুবিধা হয় তা বাল্‌বটিকে সম্পূর্ণভাবে বায়ুশূন্য না করার জন্যে। দেখা গেল, ফিলামেণ্ট থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাংস্টেন কণিকা বাল্‌বের গায়ে লাগতে থাকে, আর ঠিক কার্বন ফিলামেণ্টের কার্বনের মত টাংস্টেন কণিকার আচ্ছাদন পড়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে দিতে থাকে। গবেষণা চলতে থাকলো—কি রকমভাবে বাল্‌টিকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা যেতে পারে। আমেরিকায় জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীতে ব্যাপকভাবে গবেষণা চলতে থাকে। এই সময় আর্ভিং ল্যাংমুর নামে একজন যুবক, জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর গবেষণাগারে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার অনুমতি পেলেন। যখন সকলে বাল্‌বকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য করার চেষ্টায় মগ্ন তিনি তখন ঠিক তার উল্টোটি করলেন। তিনি নানা রকমের গ্যাস বাল্‌বের ভিতরে ঢুকিয়ে দেখতে লাগলেন ফল কি দাঁড়ায়। বহু পরিশ্রম

ও যত্নের পর তিনি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তিনি সকলকে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন যে, এমন অনেক বায়বীয় পদার্থ আছে যা ফিলামেণ্টের কোন ক্ষতি তো করেই না, পরন্তু টাংস্টেন ফিলামেণ্টকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য বৈদ্যুতিক আলোই বরং ফিলামেণ্টের পক্ষে ক্ষতিকর। অধিক তাপমাত্রায় টাংস্টেন গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়ে বাল্‌বের কাঁচের গায়ে আশ্রয় নেয়। সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য থাকলে তাতে বাধা দেওয়ার আর কিছু থাকে না। কিন্তু আর্গন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি এমন কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ আছে যেগুলোকে অল্প পরিমাণে বাল্‌বের মধ্যে ভরে দিলে তারা ফিলামেণ্টিকে ঘিরে অবরোধের সৃষ্টি করে। টাংস্টেন আর ছিট্‌কে পালাতে পারেনা; এই গ্যাসগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্বস্থানে ফিরে আসে। ফিলামেণ্টও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না, আর বাল্‌বও কালো হয় না। আলোর ঔজ্জ্বল্য অটুট থাকে এবং বাল্‌বটিও অনেকদিন টেকে। তাই বাজারে গ্যাস ফিল্‌ড ল্যাম্প-এর এত চাহিদা। বেশী শক্তির আলোই গ্যাস-ফিল্‌ড। যদিও গ্যাসে কিছুটা তাপের অপচয় হয় তা-হলেও উপকারের তুলনায় অপকারের পরিমাণ খুবই কম। ফিলামেণ্টের আকারের উপরও বাল্‌বের কার্যক্ষমতা অনেকটা নির্ভর করে। টাংস্টেন তারকে একবার ঘুরিয়ে কয়েল করে আবার কয়েল করা তারটিকে কয়েল করলে যে তার হয় তা বাল্‌বের কার্যক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। এরকম ফিলামেণ্টযুক্ত বাল্‌বকে কয়েল্‌ড-কয়েল ফিলামেণ্ট ল্যাম্প বলে।

আজকাল এ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে ডিস্‌চার্জ ল্যাম্প, ফ্লুওরেসেণ্ট ল্যাম্প। লম্বা কাঁচের নলের দু-পাশে দুটি ইলেক্‌ট্রোড; নলটির মধ্যে একটু মার্কারি কিংবা সোডিয়াম তরল আকারে থাকে। বৈদ্যুতিক প্রবাহ চলবার সঙ্গে সঙ্গে তরল পদার্থটি গ্যাসে পরিণত হয়ে নানারকম রং দেয়। ব্যাপারটা মোটামুটি এই। ফ্লুওরেসেণ্ট ল্যাম্প একটু ভিন্ন রকমের জিনিস, যদিও বৈদ্যুতিক প্রবাহ একই ভাবে চলে। সাতটি দৃশ্য আলো আছে যাদের সমবায়ে সাদা আলোর উৎপত্তি। এই সাত রঙের আলোর দুপাশে বেগনীপারের আলো ও লাল-উজানি আলো নামে দু-রকমের অদৃশ্য আলো আছে। ফ্লুওরেসেণ্ট আলোর মধ্যে অদৃশ্য বেগনীপারের আলোর উৎপত্তি হয় এবং তা নানা রঙের দৃশ্য-আলোতে পরিণত হয়। কেমন করে হয়? কাঁচের আধারের ভিতরের দিকে দেয়ালের গায়ে নানা রকম ফস্‌ফরেসেণ্ট পাউডার লাগান থাকে এবং ওগুলোই অদৃশ্য বেগনীপারের আলো-কে নানাবর্ণের দৃশ্য আলোতে পরিণত করে। দুই বা ততোধিক ফস্‌ফরেসেণ্ট পাউডারের মিশ্রণে দিনের আলোর মত আলো পাওয়া যেতে পারে। যেমন—ক্যালসিয়াম্‌ টাংস্টেট—নীল রং, ম্যাগনেসিয়াম্‌—নীলাভ সাদা, জিংক সিলিকেট্‌—সবুজ এবং ক্যাডমিয়াম বোরেট—গোলাপী রং দিয়ে থাকে।

শ্রীসুকুমার গুপ্ত